No. 412. May, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA:

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৭ বর্ষ। ৪১২ সংখ্যা । বৈশাখ ১৩০৬—মে, ১৮৯৯। ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভা ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

বঙ্গাব্দ ১৩০৬ সাল।

ইং ১৮৯৯-১৯০০।

শকাব্দা ১৮২১, সংবৎ ১৯৫৬।৫৭

ব্রাহ্মাব্দ ৭০-৭১।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র
৩১	৩২	৩১	৩২	৩১	৩০
*এ	মে	জুন	জু	আ	সে
†১৪	১৪	১৫	১৬	১৭	১৭
শ	সো	বু	শু	ম	বু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
ম	বৃ	শু	র	সো	বু
৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
১৭	১৬	১৫	১৪	১২	১৪
বু	শ	সো	ম	বু	শ
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩০

						‡										
বৃ	র	বৃ	র	বৃ	র	১	৮	১৫	২২	২৯	ম	বৃ	শু	র	সো	বু
শু	সো	শু	সো	শু	সো	২	৯	১৬	২৩	৩০	বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
শ	ম	শ	ম	শ	ম	৩	১০	১৭	২৪	৩১	বৃ	শ	র	ম	বু	শু
র	[illegible]	র	বু	র	বু	৪	১১	১৮	২৫	৩২	শু	র	সো	বু	বৃ	শ
সো	বৃ	সো	বৃ	সো	বৃ	৫	১২	১৯	২৬		শ	সো	ম	বৃ	শু	র
ম	শু	ম	শু	ম	শু	৬	১৩	২০	২৭		র	ম	বু	শু	শ	সো
বু	শ	বু	শ	বু	শ	৭	১৪	২১	২৮		সো	বু	বৃ	শ	র	ম

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃ এঃ	৯	৮	৫	৪	১	২৯
পূর্ণিমা	১৩	১২	৯	৭	৫	৩
কৃঃ এঃ	২৩	২২	১৯	১৮	১৫	১৪
অমা—	২৭	২৬	২৩	২২	২০	১৮

শুঃ এঃ—শুক্ল একাদশী। কৃঃ এঃ—কৃষ্ণ একাদশী।

*** পরীক্ষা—১৩ই বৈশাখ মঙ্গল বার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার পূর্ণিমা। ২৭এ বৈশাখ মঙ্গল, ২৬এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার অমাবস্যা।

* বৈ—বৈশাখ বৃহস্পতিবারে আরম্ভ, ৩১শে শেষ। এ-এপ্রেল শনিবারে আরম্ভ, ৩০শে শেষ ইত্যাদি।

† ১৪ই এপ্রেল ১লা বৈ, ১৪ই মে ১লা জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি।

‡ ১লা বৈশাখ বৃহস্পতি, ২রা শুক্র ইত্যাদি। ১লা জ্যৈষ্ঠ রবি ২রা সোম ইত্যাদি।

বৈ—বৃহ—১,৮,১৫,২২,২৯; জ্যৈ রবি ১,৮,১৫,২২,২৯; ১৪,২১,২৮ এপ্রেল শনি; ১৪ ২১, ২৮ মে সোম ইত্যাদি।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃ এঃ	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮
পূঃ	২	২	৩	২	৩	৩
কৃঃএঃ	১৪	১৩	১৪	১৪	১৪	১৪
অঃ	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৭

*** পরীক্ষা—২৮এ কার্ত্তিক সোমবার, ২৮এ অগ্রহায়ণ বুধবার শুক্ল একাদশী। ১৪ই কার্ত্তিক সোম, ১৩ই অগ্রহায়ণ মঙ্গল বার কৃষ্ণ একাদশী। এইরূপে দিন, বার ও তিথি ঠিক্ করিতে হইবে।

নববর্ষ।

১

বরষ গিয়াছে কেঁদে কেঁদে,
তা বলে কি আজি হাসিব না?
অবসাদে হরেছে চেতনা,
তা বলে কি আজি জাগিব না?
নিরাশার আঁধার মাঝারে
কে বাজায় আশার বাঁশরী
ঘোষি—"সমাগত শুভদিন,
উঠ সবে দেব-কৃপা স্মরি।"

২

ঐ যে বসন্তাগমে নব,
কি সুন্দর কুসুম পল্লব
ধরেছে পাদপ লতাগণ—
আছে যার কণিকা-জীবন!
মৃতপ্রায় কণ্টক-লতিয়া
ছুটী ফুল-হাসি বিকাশিয়া
ধন্য বলি জীবন-দাতারে
সেও আজি চাহে বরিবারে।

৩

শত কণ্ঠে বিহগ-নিকর
চারি দিকে ছড়ায় সুস্বর,
মধুর কোকিল কুহরিছে
দয়েল পাপিয়া তার পিছে,
বায়স নীরব নাহি রয়,
উচ্চে গায়—"জগদীশ জয়।"
যার যথা শকতি-বিধান,
প্রাণ ভ'রে করে স্তুতি গান।

৪

নগর কানন গ্রাম ছাড়ি
ভেটিলাম পয়োধি সুদূর,
তরঙ্গ তরঙ্গোপরি নাচি
শুনায় সঙ্গীত সুমধুর।
সমীর বহিয়া মহাবেগে
খেলা করে জলরাশি সহ,
স্বন্ স্বন্ নাহিক বিরাম,
স্তুতিগীত হয় অহরহ।

৫

বিশ্বভরা আনন্দ বাজার,
সমাচার—আনন্দ প্রচার!
জড় জীব সবে মাতোয়ারা,
ছুটেছে সুখের শত ধারা!
রবি শশী তারকা নাচিছে,
বায়ু মেঘ জলধি গাইছে!
পশু পক্ষী কীট সুখী সবে,
কে আজি নীরব মৃত রবে?

৬

জাগ উঠ করি হরিধ্বনি
যে যেখানে আছ নারী নর,
রুগ্ন ভগ্ন হৃদয় লইয়া
বল "জয় রাজ-রাজেশ্বর।"
জীবনের মহামেলা মাঝে
থেক না নির্জীব অচেতন,
পুরাতন লয়েছে বিদায়,
নববর্ষে সকলি নূতন।

৭

"গতস্য শোচনা" বৃথা আর,
ত্যজ শোক বিষাদের ভার।
"ভবিষ্য" কি জানি তুমি আমি,
কেন ভেবে মরি দিবা যামী ?
বর্ত্তমান বিধির বিধান,
এক রতি নহে বৃথাদান।
পলে পলে হয়ে সচেতন,
ডাকি দেবে সফলি জীবন।

৮

যত ক্ষুদ্র—যত মন্দ—আমি
—অসারের হই না অসার,
স্বর্গের পবিত্র জ্যোতিকণা—
আদরের বস্তু বিধাতার।
বুদ্ধি বল দিয়াছেন যাহা,
করি তার যোগ্য ব্যবহার,
জীবনের উদ্দেশ্য মহান্
সাধি—লভি দেব-পুরস্কার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-সংবাদ—পঞ্জিকার মতে এ বৎসর রবি রাজা, বুধ মন্ত্রী। রাজফল ভাল নয়, মন্ত্রীর গুণে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা।

মহারাণীর জন্মদিন—ভারত সাম্রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ৮০ বর্ষ পূর্ণ করিতেছেন, এজন্য আমরা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছি এবং তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছি।

বড় লাট ও ছোট লাট—বড় লাট সিমলায় গুরুতর পরিশ্রমে রত হইয়া পীড়িত হইয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাকে নিরাময় করুন্। ছোট লাট এই প্রখর গ্রীষ্মেও রাজধানীর সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-সাধনে দুঃসহ ক্লেশ ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া ১লা মে দার্জ্জিলিঙ গমন করিয়াছেন। তিনি আরও সতেজ ও সবল হইয়া রাজধর্ম্মপালনে সম্যক্ সমর্থ হউন।

বিনা তারে টেলিগ্রাফ—ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে ইংলিস চ্যানেল নামে যে অখাত আছে, তাহার দুই তীরে ৩২ মাইলের মধ্যে বিনাতের বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ইহার ব্যয় যেমন অল্প, কৌশলও তেমনি সহজ। ক্রমে তারের সংবাদ সর্ব্বত্র বিনা তারে চলিবে।

মহীশূর-শতবার্ষিক-উৎসব—১৭৯৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপু সুলতানের পতন হইয়া মহীশূরে হিন্দুরাজত্ব পুনঃ-স্থাপিত হয়, ইহার স্মরণার্থ সমারোহে এক উৎসব হইয়াছে। মহীশূরের বিধবা মহা-রাণী এ বিষয়ে উদ্যোগিনী।

মেয়ে পোষ্ট মাষ্টার—হুগলীর পোষ্ট মাষ্টার বিদায় গ্রহণ করাতে তাঁহার স্থানে কুমারী হেবারলেট নাম্নী এক ইংরাজ রমণী ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য কার্য্যক্ষেত্র যত উন্মুক্ত হয়, ততই ভাল।

সেন্সস্—আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের লোকসংখ্যার পুনরায় গণনা হইবে। রিজলি সাহেবের উপর অধ্যক্ষতা ভার অর্পিত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য ঘটনা—ইংলণ্ডে একটী স্ত্রীলোক ২৩ বৎসরকাল বোবা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার এক কন্যা আগুনে পুড়িয়া মরাতে কন্যাশোকে হঠাৎ তাঁহার বাক্-স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। আমরা একটী বঙ্গালী স্ত্রীলোকের বিষয় জানি, তাঁহার পুত্র তাঁহার অজ্ঞাতে হঠাৎ বিদেশে যাওয়াতে তাঁহার বাক্‌শক্তি লুপ্ত হয়, কয়েক বৎসর পরে তাহার সুসংবাদ পাইয়া তিনি পুনরায় কথা কহিতে আরম্ভ করেন।

কুমারী সোরাবজী—বিলাতে শিক্ষিত এবং ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও বোম্বাইয়ে যেমন এলাহাবাদেও সেইরূপ ব্যবসায় চালাইতে নিরাশ হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সভ্য ইংরাজ জজ-দিগেরও কুসংস্কার কত দিনে দূর হইবে?

বিবি ধর্ম্মপ্রচারিকা—রামকৃষ্ণ পরমহংসের দলে তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকটী বিবিকে দীক্ষিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কুমারী নিবেদিতা ও অভয়ানন্দ স্বামী এদেশে আসিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

বিপদে শুভ লক্ষণ—কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবে প্রায় সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক বিশেষ ভাবে স্বস্ব ইষ্ট দেবতাকে ডাকিতেছেন। হিন্দুরা যেমন মহোৎসাহে হরিসংকীর্ত্তন করিতেছেন, মুসলমানেরাও সেইরূপ দলবদ্ধ হইয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

জেন্‌কিন্‌স্ দম্পতী—কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ জজ জেন্‌কিন্‌স্ বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইয়া গিয়াছেন। ইনি এবং ইহাঁর গুণবতী পত্নী এ দেশের লোকদিগের বন্ধু ছিলেন এবং সকল সৎকার্য্যে উৎসাহ দান করিতেন। বঙ্গদেশ ইহাঁদিগকে হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

শ্যাম ফরাসী বন্ধুত্ব—গত ১৬ই এপ্রেল ইণ্ডো চায়নার ফরাসী গবর্ণর ব্যাঙ্ককে আসিয়া শ্যামরাজ কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। শ্যাম দেশে ফরাসী ভাষা শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে।

মাদাগাস্কারের অবনতি—ইহার সুযোগ্য রাণীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ফরাসীরা দেশের কি উপকার করিয়াছেন জানি না। ইতিমধ্যে এই দ্বীপের লোক-সংখ্যা অনেক কমিয়াছে, সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট নিঃসন্তান বিবাহিত লোকদিগের উপর এক নূতন টাক্‌স বসাইয়াছেন।

সর্পাঘাতের ঔষধ—আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, গাজীপুরের রেবরেণ্ড লরবিয়ারের ঔষধে বিষাক্ত সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিতেছে। দুই টাকায় ৩ শিশি ঔষধ পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান রহস্য।

সমুদ্রগর্ভ ও দীপ মৎস্য।

সমুদ্রগর্ভ বা সমুদ্র-তলদেশ যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে জানা যায় যে, উহা অতীব শীতল; এমন কি পৃথিবীর উপরিভাগস্থ পদার্থ সকল তথায় নীত হইলে অত্যন্ত শৈত্য প্রযুক্ত জমিয়া গিয়া থাকে। তথায় কিছুমাত্র আলোক নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! যেমন গভীর অমানিশার প্রগাঢ় অন্ধকার-মধ্যে ক্ষুদ্র দীপমক্ষিকা ও খদ্যোতিকা বন ও বনস্পতি সকল আলোকিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহাসমুদ্রের মহান্ধকারময় সুগভীর গর্ভ দীপমৎস্য সকল দ্বারা আলোকিত হয়। এই সকল মৎস্য আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত, ইহাদিগের পুচ্ছ ও ডানা হইতে আলোক বিকীর্ণ হয়। ইহারা যেমন অগাধ জলমধ্যে অবলীলাক্রমে পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ স্বল্পতোয় মধ্যে অথবা সমুদ্রের উপরিভাগেও ইতস্ততঃ বিহার করিয়া বেড়ায়। নৈশ সামুদ্রিক আলোকের প্রবাদ বোধ হয় এই সকল দীপমৎস্য দর্শনেই কল্পিত হইয়া থাকিবে। দীপমৎস্যের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব হেতু আলোকেরও স্বল্পতা ও আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে আলোকের এত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় যে, বোধ হয় যেন সমুদ্রের বিশাল বক্ষে প্রবল অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে। সূর্য্যাস্ত হইলে নগরী যেমন শ্রেণীবদ্ধ দীপমালায় পরিশোভিত হইয়া থাকে, সমুদ্রতলের কোন কোন অংশ ঠিক্ সেইরূপ আলোকিত হইতে দৃষ্ট হয়। গভীর জলসঞ্চারী দীপ-মৎস্য সকল যখন দলে দলে দুই বা তদধিক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জলবিহার করিয়া সমুদ্রগর্ভে পরিভ্রমণ করে, তখন বোধ হয় যেন দ্রুতগামী বাষ্পীয় পোত সকল শ্রেণীবদ্ধ আলোকমালায় পরিশোভিত হইয়া বেগে সিন্ধুদেশ পরিমাণ করিতেছে। সমুদ্র যত গভীর, জলের ভার (চাপ) তত অধিক হইয়া থাকে। প্রত্যেক সহস্র ফেদমের (৪০০০ হস্ত গভীরতা) মধ্যে এক বর্গ ইঞ্চ পরিমিত জলের ভার প্রায় এক টন অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ বস্তু তথায় নীত হইলে তাহার ভার ১৬০ গুণ বৃদ্ধি হয়।

গভীরজলসঞ্চারী মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তু সমগভীরতা না হইলে সঞ্চরণ করিতে বা জীবিত থাকিতে পারে না। তাহারা সমতল ছাড়িয়া জলের উপরি-ভাগে আসিলে মরিয়া যায়, পাঁচ শত ফেদম জলবাসী মকর উপরি ভাগে আনীত হইয়া মৃত হইয়াছে। কখন কখন স্বল্পগাধ জলসঞ্চারী ও জলবাসী জন্তু সকল প্রবল শক্তি বা বেগ দ্বারা তাড়িত হইয়া অগাধ জলে নীত হয়। তথায় তাহাদের পূর্ব্বাবস্থার

অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। নয় শত ফেদমের নিম্নেই তাহাদের দৈহিক বিকার সংঘটিত হইয়া থাকে এবং চক্ষুর্দ্বয় অপেক্ষাকৃত বড় হয়। সহস্র ফেদম নিম্নে আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ক্রমে যত নিম্নতলে পতিত হয়, ততই তাহাদের দৈহিক বিকার সাধিত হইয়া পরিশেষে মৃত্যু হয়।*

বৈদ্যনাথ, রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম।

বামাবোধিনীর পাঠিকারা অনেকে দেওঘরের নাম শুনিয়াছেন। শুনিয়াছেন কেন আশা করি দেওঘর দর্শনও করিয়াছেন। দেওঘর সাঁওতাল পরগণার একটী স্বাস্থ্যকর নগর এবং হিন্দুর এক প্রাচীন তীর্থস্থান। আজকাল অনেকে স্বাস্থ্যোদ্দেশে মাঝে মাঝে ঐ অঞ্চলে গিয়া থাকেন এবং বহুকাল হইতে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য দেওঘরে অনেক যাত্রীর আগমন হইয়া আসিতেছে। হাওড়া হইতে রেলপথে উহা ২০৫ মাইল দূর এবং তৃতীয় শ্রেণীর রেল-ভাড়া প্রায় ২৷৷০ টাকা।

অনেকের বিশ্বাস বৈদ্যনাথ দেবের অনুকম্পায় নানা রোগ আরোগ্য হয়; এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নানা স্থান হইতে কুষ্ঠরোগীরা দেওঘরে আইসে। ইহাদের অনেকেই দরিদ্র, অনাথ এবং নিরাশ্রয়। তাহারা একবার দেওঘরে আসিয়া পড়িলে সেই স্থানেই থাকিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই হতভাগ্যদের অবস্থা কিরূপ কষ্টকর, তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। একে উৎকট রোগের যাতনায় অধীর, তাহার উপর ইহাদিগকে এক মুঠা আহারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কুষ্ঠরোগীকে কেহ সহজে আশ্রয় দেয় না। অনাথ অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া অনেক হতভাগ্যের দুঃখময় জীবনের অবসান হইত।

ইহাদের অবস্থা দেখিয়া লোকের প্রাণ অবশ্য কাঁদিত; কিন্তু প্রাণ অনেক সময় কাঁদিয়াই ক্ষান্ত হয়। যাহা হউক এক সময়ে দেওঘরের তিনটী প্রাণ কুষ্ঠরোগীদের জন্য সুধু কাঁদিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। ভক্তিভাজন বাবু রাজনারায়ণ বসু, বৈদ্যনাথের একজন পুরোহিত পণ্ডিত গিরিজানন্দ দত্তঝা এবং দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু স্থির করেন যে, দেওঘরের হতভাগ্য কুষ্ঠীদের জন্য কিছু করা আবশ্যক। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সাধারণের নিকট কুষ্ঠীদের জন্য প্রথম সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের আবেদনের মর্ম্ম এই যে, ৩০।৪০ জন রোগীর বাসোপযোগী একটী বাড়ী

*Scientific American, 20th January 97.

চাই এবং তাহাতে প্রায় ১০০০ টাকা ব্যয় হইবে। ১৮৯১ অব্দের প্রারম্ভে পূর্ব্বোক্ত যোগীন্দ্র বাবুর ও সুরভির ভূত-পূর্ব্ব সম্পাদক বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসুর স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় প্রার্থনাপত্র বাহির হয়। ১৮৯১ অব্দের জুলাই মাসে প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত তৃতীয় প্রার্থনাপত্র বাহির হয়। ইহাতে ৫০ জন রোগীর বাসোপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণের কথা এবং তাহাদের অন্ন বস্ত্র, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কথা থাকে। প্রার্থনাকারীদের হস্তে তখন ১২৬৶৫ জমিয়াছে।

কুষ্ঠাশ্রমের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবু এ সময় উৎকট রোগশয্যায় শায়িত এবং পণ্ডিত গিরিজানন্দ দত্তঝা পরলোকগত। প্রধান শিক্ষক বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু কুষ্ঠাশ্রম সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক পদস্থ থাকিয়া ইহার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ দেওঘর যান। যোগীন্দ্র বাবু চাঁদার জন্য তাঁহার নিকট গমন করেন। তখন রোগীদের জন্য খড়ুয়া ঘর নির্ম্মাণের সঙ্কল্প ছিল এবং অনুষ্ঠাতৃগণ কেবল মাত্র ৫০০ টাকা চাঁদার আশ্বাস পাইয়াছিলেন। মহেন্দ্রবাবু দেওঘরে থাকিয়া কুষ্ঠীদের অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, যদি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামে আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত করিবার বাধা না থাকে, তাহা হইলে তিনি উহার জন্য পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিবার সমগ্র ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। অনুষ্ঠাতারা মহেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন।

সহরের প্রায় ১ মাইল দূরে বৈদ্যনাথ দেবের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী বেশ সুন্দর স্থান আশ্রমনির্ম্মাণের জন্য মনোনীত হয়। ১৮৯২ অব্দের ১২ই জুলাই সেই সময়কার বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার চার্লস্ এলিয়ট আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন। ৬০০০ টাকার উপর খরচ করিয়া মহেন্দ্র বাবু আপাততঃ ২৪টী রোগীর বাসোপযোগী সুন্দর বাড়ী তৈয়ার করিয়া দেন। তাঁর গুণবতী পত্নীর নামানুসারে আশ্রমের নাম হয় "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম।" ভিত্তি স্থাপনের সময় অনুষ্ঠাতাদের হস্তে ৭০০০ টাকা আসিয়া জমে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৫এ আগষ্ট দ্বারবঙ্গের সর্ব্বজনপ্রিয় লোকান্তরিত মহারাজা আশ্রমের দ্বার উন্মোচন করেন। এক কথা এখানে বলা উচিত। মহেন্দ্র বাবু আশ্রমের বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, আরও অনেক প্রকারে ইহার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন।

কুষ্ঠাশ্রমের উদ্দেশ্য—১ম রোগীদিগকে আশ্রয় দান; ২য় কুষ্ঠরোগ ব্যাপ্তি নিবারণোদ্দেশে তাহাদিগকে একত্র সংস্থাপন, ৩য় রোগ-চিকিৎসা এবং তৎসম্বন্ধে গবেষণার সাহায্য করা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে দেওঘরে নিরাশ্রয় কুষ্ঠরোগী অনেক। ইহাদের যথেচ্ছ পরিভ্রমণের ফল এই

দাঁড়াইয়াছে যে, নগরের অধিবাসীদিগের মধ্যেও রোগ সংক্রামিত হইতেছে। যদি অন্ততঃ ৫০ জন রোগীর বাসস্থান, আহার, ও চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে আশ্রমের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র আংশিক সংসাধিত হইবে। এতদিন আশ্রমে গড়ে ২০টী রোগী আশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বৈদ্যনাথ মন্দিরের সদাব্রত হইতে অনেক সাহায্য হইত। এক্ষণে তাহা বন্ধ হইয়াছে এবং কাজে কাজেই মূলধন ভাঙ্গিয়া আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। ইহার যদি কোন প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে আশ্রমটী কথনই স্থায়ী হইবে না। ইহার স্থায়িত্ব বিধান ও উপকারিতা প্রসারণ উদ্দেশে গত ১লা জানুয়ারিতে দেওঘর স্কুলগৃহে একটী সভা অহুত হয়। সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভা কর্তৃক একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু যোগীন্দ্র নাথ বসু সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক। সমিতির সভ্যগণ স্থির করিয়াছেন যে, ৫০ জন কুষ্ঠরোগীর আহার ও চিকিৎসাদির জন্য মাসে অন্যূন ২৪৫৲ টাকা আবশ্যক। সমিতির হাতে কেবল মাত্র ১২০০ টাকা আছে। অতএব আরও ৭০০০ টাকা মূলধন চাই। সভ্যেরা আশা করেন যে, তাহা সংগৃহীত হইলে মূলধনের সুদ ও স্থানীয় সাধারণের সাহায্যে তাঁহারা আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে সক্ষম হইবেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন। চাঁদাই হউক, এককালীন দানই হউক বা বস্ত্রাদিই হউক, যিনি যাহা দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। দেওঘরের কুষ্ঠাশ্রম স্থানীয় ব্যাপার নহে। ভারতের সর্ব্ব স্থান হইতে কুষ্ঠ রোগী এখানে আসিয়া থাকে। এমন হিন্দু পরিবার অল্পই আছেন, যাঁহাদের কেহ না কেহ একবার বৈদ্যনাথ ধামে পদার্পণ না করেন। সমিতির সভ্যেরা আশা করেন যে, দেওঘরের ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থান ও পুণ্য ভূমির মঙ্গলার্থে হিন্দুরা তাঁহাদের চির-প্রসিদ্ধ দয়া প্রদর্শনে কৃপণতা করিবেন না।

বামাবোধিনীর পাঠিকা অনেক। বঙ্গনারী হৃদয়ের কোমলতায় অতুলনীয়া। তাঁহাদেরই হৃদয়ের প্রভাবে অর্থনীতি-পাঠে বিকৃতমস্তিষ্ক শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী বাবুর গৃহ হইতে দোষগুণ-জড়িত মুষ্টি ভিক্ষার প্রথা আজও তিরোহিত হয় নাই। তাঁহাদের দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ ও কোমলতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থই মহেন্দ্রবাবু তাঁর স্ত্রীর নামে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করেন। এই প্রবন্ধ লিখিবার একমাত্র উদ্দেশ্য দেওঘরের হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীদের প্রতি বঙ্গমহিলার মনোযোগ আকর্ষণ করা। তাঁহারা সকলেই প্রায় প্রতি মাসেই সাধ্যানুসারে দেবোদ্দেশে কিছু কিছু উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের কাছে লেখকের বিনীত প্রার্থনা

যে তাঁহারা দিনান্তে, সপ্তাহান্তে, মাসান্তে বা বৎসরান্তে "রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রমের" উদ্দেশে যথাসাধ্য কিছু কিছু তুলিয়া রাখেন। যাহা রাখিবেন তাহা দেবতায় অর্পিত ভিন্ন আর কিছুই হইবেক না।

শ্রীদে।

দেবলরাজ।

চৌবেড়িয়ার যে স্থানে বুড়োশিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অরণ্য;—সেই অরণ্য-পরিধির বহির্ভাগে বহুসংখ্যক কেদার খণ্ড। সেই সকল কেদার খণ্ডে প্রতিদিনই অনেক কৃষক ও রাখাল স্ব স্ব কার্য্য করিত। যে দিন দেবনাথ পাল বুড়োশিবের মন্দিরে দৈববাণী শুনিয়াছিলেন, তাহার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্বোক্ত রাখাল কৃষকগণ মধ্যে মধ্যে অপরাহ্নে শিবের মন্দির হইতে নরকণ্ঠ-সমুত্থিত কাতর ধ্বনি শুনিতে পাইত। সে ধ্বনির মর্ম্ম এই,—"আমায় পাপিষ্ঠ সন্ন্যাসী দগ্ধ করিয়া মারিতেছে, তোমরা কে কোথায় আছ, আসিয়া আমায় রক্ষা কর।" রাখাল কৃষকগণ এবং দুই চারি জন ভ্রমণকারী কি পথিক সেই ধ্বনি শুনিয়া অরণ্যমধ্যে মন্দির-স্থানে ছুটিয়া আসিত। কিন্তু মন্দির সমীপে জনপ্রাণীও দেখিতে পাইত না—সেই কাতর ধ্বনিও শুনিতে পাইত না। ক্রমে ক্রমে সকলেরই বিশ্বাস হইল, ইহা বুড়ো শিবের এক প্রকার লীলা খেলা। কাতর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মন্দির-দ্বারে লোক জনের গতাগতি ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া গেল।

যে দিন প্রাতঃকালে দেবনাথ পাল ও তাঁহার জননী আপনাদিগের চাক-ঘরে সোণার কোদাল ও সোণার দা প্রাপ্ত হন, তাহার পূর্ব্ব দিন প্রদোষকালে চৌবেড়িয়ার বুড়োশিবের মন্দিরে ও চতুষ্পার্শ্বের অরণ্যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। সেই প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে দিগ্‌ দাহ হইতে লাগিল। অরণ্যস্থ পশুপক্ষী বিকট চিৎকার সহকারে পলায়ন করিতে লাগিল। মন্দির মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার কাতর ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে এই ধ্বনি শ্রবণ-মাত্র চতুষ্পার্শ্বস্থ লোক জন ছুটিয়া আসিত, আজ জনপ্রাণীও আসিল না; কেননা তাহারা ঐ ধ্বনিকে বুড়োশিবের এক প্রকার লীলা মাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ বহুধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। বিদীর্ণ লিঙ্গ মধ্য হইতে একটী অগ্নি-বর্ত্তুল নির্গত হইয়া অতি বেগে মন্দিরপ্রাঙ্গণে পতিত হইল। তাহার জ্যোতিতে চতুষ্পার্শ্বস্থ অগ্নিশিখা যেন মলিন হইয়া গেল। অগ্নি-বর্ত্তুল প্রাঙ্গণে পতিত হইবামাত্র সেই জনপ্রাণিশূন্য অরণ্যমধ্যে কোথা হইতে

একটী জটা-ত্রিশূলধারী ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর শুভ্রমূর্ত্তি উপস্থিত হইলেন এবং অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই অগ্নিবর্ত্তুল গ্রহণ-পূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এদেশে একটি প্রবাদ আছে যে "এক মাণিক সাত রাজার ধন"। চৌবেড়িয়ার শিবলিঙ্গ-মধ্যস্থ যে স্পর্শমণি, মহাদেব শ্রীনগরের অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীকে লইতে আদেশ করেন, তাহা সামান্য বস্তু নহে,—সাত রাজার ধন মাণিক। আজ সেই মাণিক, লিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া অগ্নি বর্ত্তুলাকারে বহির্গত হইল। যে মূর্ত্তি তাহা গ্রহণ করিয়া অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইলেন, তিনি সেই শ্রীনগরের ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী। এই মাণিকটিই পরদিন প্রত্যুষে দেবনাথ পালের চাক-ঘরের আড়ায় লম্বিত ঝোলার মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছিল।

১১

শিবভক্ত ক্ষত্রিয় সাধুকে যে কোন অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি শ্রীনগরের শার্দ্দূল-অজাগরপূর্ণ ঘোরারণ্যে রক্ষা করিয়া থাকে, শৈব সাধু তাহা পদে পদে অনুভব করিতে পারিতেন এবং তাহা যে তাঁহার দয়াল প্রভুরই কৃপা, তাহাও বুঝিতে পারিতেন। চৌবেড়িয়া গমন করিয়া কিরূপে বুড়ো-শিবের হৃদয়স্থ স্পর্শমণি লাভ করিতে হইবে, একদা নিদ্রাকালে স্বপ্নযোগে সেই শক্তির দ্বারা তাহার উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই চৌবেড়িয়া গমনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে গহ্বর-মধ্যে বাস করিতেন, মধ্যে মধ্যে গ্রাম নগরে ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন এবং ঘুঁটে কুড়াইয়া মন্দিরপার্শ্বে তদ্দ্বারা একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত রচনা করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা ইতিপূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছেন। যখন দেখিলেন আবশ্যক পরিমাণে ঘুঁটে স্তূপীকৃত হইয়াছে, তখন হইতেই পার্শ্ব-বর্ত্তী জনগণকে তাঁহার উৎকট কার্য্যে সতর্কতাশূন্য করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত কাতর ধ্বনি করিতে আরম্ভ করেন। একাদশাধ্যায়ে যে দিনকার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, সে দিন পূজা অর্চ্চনার গোলযোগ শেষ হইবামাত্র মন্দিরমধ্যে শিবলিঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে ঘুঁটে সাজাইয়া প্রদোষকালে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করেন। পাছে সেই সময়ে দৈবাৎ লোক জন আসিয়া কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে, এজন্য তাহাদিগকে দিশাহারা করিবার উদ্দেশে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে এবং অরণ্যের স্থানে স্থানেও অনেক অগ্নিকাণ্ড করিয়াছিলেন। সেই জন্যই সেদিন শিবমন্দিরাধিষ্ঠিত অরণ্যে যেন ভীষণ দাবানল উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ শিবের বেশে আত্ম-গোপন করিয়া যথাস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। মণি নির্গত হইবামাত্র গ্রহণ করিয়া পলা-য়ন করিলেন। মণি হস্তগত হইতে রাত্রি অধিক হইয়াছিল; তাহার পর, পাছে এত সাধনের ধন অপরে কাড়িয়া লয়, এই ভয়ে, মনুষ্য-গতাগতির পথ ত্যাগ করিয়া বিপথাবলম্বনে পলায়ন আরম্ভ করিলেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া হাঙ্গরী-

বাঁকে উপস্থিত হইলেন। তখন রজনী অবসানপ্রায় এবং প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। সাধুর ইচ্ছা ছিল না যে, কোথাও বিশ্রাম করেন। এক টানা দেশে যাইবেন এবং "সাত রাজার ধন" মাণিক দুঃখিনী সাধ্বী পত্নীর হস্তে অর্পণ করিয়া চিরকালের জন্য সুখী ও নিশ্চিন্ত হইবেন, ইহাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দৈবচক্র কে অতিক্রম করে? প্রবল বারিবর্ষণ জন্য পথিপার্শ্বস্থ দেবনাথ পালের চাকঘরে আশ্রয় লইলেন।

সন্ন্যাসিগণ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শালগ্রাম, বাণলিঙ্গ, বা গোবর্দ্ধন শিলাদি রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সন্ন্যাসীর ভিক্ষা-ঝোলার মধ্যে এক বাণলিঙ্গ ছিল। মণিটিও প্রাপ্তিমাত্র সেই ঝোলায় রাখিয়াছিলেন। চাকঘরে প্রবেশ করিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আমাশয়ে এমন প্রবল বেগ উপস্থিত হইয়াছিল যে, মণি বাহির না করিয়াই ঝোলাটী চালার আড়ায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ঠাকুর থাকেন বলিয়া কখনই ঝোলা শুদ্ধ শৌচোদ্দেশে গমন করিতেন না। দীন দরিদ্র সন্ন্যাসীর ঝোলা কেহ স্পর্শ করিবে না, এই বিশ্বাসে তাহা যেখানে সেখানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যথা তথা বিচরণ করিতেন। আজ যে সাত রাজার ধন ভিক্ষুর ঝোলায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সহজেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শৌচক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক দৈবচক্রে চক্রগৃহে প্রত্যাগত হইতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। এই অবসরে দেবনাথের জননী উষার আলোকে সমস্তই দর্শন করিলেন। মাতা-পুত্রে পরামার্শ করিয়া সেই মণি হরণ করিলেন।

কি সত্য, কি অসত্য, কি সম্ভব, কি অসম্ভব, এককালে সে সকলের বিচার বিতণ্ডা না করিয়াই ইতিহাস ও দেশ-প্রচলিত জনপ্রবাদ অনুসারেই এই আখ্যায়িকা বিবৃত হইতেছে। আশা করি, পাঠক পাঠিকাগণও বিচার-বিতণ্ডা পরিশূন্য হইয়া এই উপন্যাস পাঠ করিবেন।

হিন্দু শাস্ত্রানুশীলনে অবগতি হয় যে, "স্পর্শমণি" নামে একপ্রকার মহামূল্য ও মহাগুণ-সম্পন্ন রত্ন আছে, তাহা প্রতিদিন শতভার স্বর্ণ প্রসব করে, অথচ নিজে সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে। কোন কোন স্থলে ঐ স্বর্ণ প্রসবের অন্যরূপ ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যা বলে যে, ঐ মণির সহিত স্পর্শ হইবামত্র লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা এই উপন্যাসে স্পর্শমণির যে ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছি, তদনুসারে ঐ ব্যাখ্যার আরও একটু সূক্ষ্ম টিপ্পনী করিতে পারি। স্পর্শমণির সহিত যেরূপ স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়, সেই স্পর্শ বিবিধ,—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। স্পর্শমণির সহিত পরোক্ষ স্পর্শেও লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়। তাহার প্রমাণ এই বৃষ্টির জলে সন্ন্যাসীর ঝোলা ভিজিয়াছিল,—ঝোলার সহিত মণি ভিজিয়াছিল,—সেই মণির গাত্র-ধৌত জল স্পর্শে লোহার কোদাল ও দা স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছিল।

(১২)

সন্ন্যাসী ঠাকুর বহুদিনের তপস্যার আশাতীত সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আনন্দের পরিসীমা নাই। শৌচক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক দেবনাথ পালের চক্রগৃহে শুভাগমন করিলেন। ঝোলাটী স্কন্ধে লইয়াই প্রস্থান। কোথাও অবস্থান করিলেন না, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না, পাছে কথাবার্ত্তা ভাব ভঙ্গীতে মাণিকের কথা কেহ জানিতে পারে। মাণিক যে এদিকে দেবনাথের প্রতি প্রযুক্ত দৈববাণীর সফলতা সম্পাদনার্থ তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, সন্ন্যাসী তাহা স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই। অন্তর আনন্দে গরগর করিতেছে। পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গৃহে উপস্থিত হইলেন। সাত রাজার ধন মাণিক হস্তে দিবেন বলিয়া সহাস্যবদনে গৃহিণীকে নিকটে আহ্বান করিলেন। কিন্তু ঝোলার মধ্যে মাণিক পাইলেন না। এই ঘটনায় ক্ষত্রিয় সাধুর কি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ উপস্থিত হইল, পাঠক পাঠিকা কল্পনায় অনুভব করুন্—লেখক তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। সাধুকে এই ভীষণ পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার জন্যই মহাদেব প্রথমে তাঁহাকে ধন দিতে স্বীকার করেন নাই। ফলে মনুষ্য-জীবনে যাহা হইতে অধিক বিড়ম্বনা আর নাই, মাণিকের শোকে সাধু সেই স্তম্ভিত বায়ু রোগে আক্রান্ত হইলেন। দুঃখের অবধি রহিল না। এই সাধুটী বাস্তবিক অনাসক্ত ও পরমার্থপরায়ণ ছিলেন, ঘটনাচক্রে বিষয়লালসা করিয়া এই দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেন। ভগবৎ-প্রিয় সাধুগণ বিষয়াসক্ত হইলে এইরূপ দণ্ডই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সন্ন্যাসীকে আপাততঃ এই স্থলেই পরিত্যাগ করা গেল। ইনি বহুদিন পরে আর একবার আমাদিগকে দর্শন দিবেন।

এখন আমরা একবার দেবনাথ পালের গৃহে গমন করিব এবং সাত রাজার ধন মাণিক পাইয়া মাতা পুত্রে রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে কিরূপ কথোপকথন করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিব। দেবনাথ জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"মা, এ সব কি? আমরা কি স্বপ্ন দেখিতেছি?" দেবনাথ-জননীর রূপ যেমন রাজকন্যার ন্যায়, বুদ্ধিশুদ্ধিও তদ্রূপ। হাসিতে হাসিতে কহিলেন;—

"তোমার মা পাগল,—তোমার মার সাত গোষ্ঠী পাগল,—সন্ন্যাসী ঠাকুর পাগল,—দৈবজ্ঞের কথাও বিশ্বাস করিবার যোগ্য নয়,—এমন স্থলে এ সকল যে কি, আমি তা কিরূপে কহিব?" এই কথা কহিয়া আরও হাসিতে লাগিলেন। দেবনাথ যেন একটু অপ্রতিভের ন্যায় কহিলেন,—

"কেন মা! বুড়োশিবের ঘরে দৈববাণী শুনিয়া অবধি আমিত তোমাদের সকল কথায় বিশ্বাস করিয়াছি।"

"তা যদি করিয়া থাক, তবে যা বিশ্বাস করিয়াছ, এ সকলও তাই। যে মাণিক

সাত রাজার ধন, বুড়োশিব আজ তোমাকে সেই মাণিক দিলেন। ঐ মাণিকের শক্তি দেখ! মাণিকের গা ধুইয়া বৃষ্টির জল পড়ায় তোমার লোহার কোদাল ও লোহার দা সোণা হইয়া গিয়াছে। উহার সঙ্গে যত লোহা ছোঁয়াইবে,—ততই সোণা পাইবে!” দেবনাথ, জননীর কথা যত শুনিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়ে ততই অবসন্ন হইতেছিল। জননীর কথা শেষ হইবামাত্র, দেবনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন।

দেবনাথ পাল হাঁড়ীগড়া কুমারের পুত্র হাঁড়ীগড়া কুমার মাত্র; এ সকল উচ্চ অঙ্গের কোন সংবাদই রাখিতেন না। যে বস্তুর স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়, সেই বস্তু তাঁহার ঘরে আসিয়াছে, এ আনন্দের বেগ সহিতে পারিলেন না। মূর্চ্ছিত হইবামাত্র বুদ্ধিমতী জননী ধরিয়া তাঁহার মস্তক আপন উরুদেশে স্থাপনপূর্ব্বক শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকালের মধ্যেই দেবনাথ সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন অতিশয় ভীত হইয়া জননীকে কহিলেন,

“মা, আমাদের ত এই অবস্থা! এ সকল দ্রব্য কিরূপে সামলাইব?” জননী কহিলেন,—

“তুমি হাঁড়ীগড়া কুমারের ছেলে, তোমার রাজা হওয়া যত কঠিন বোধ হইতেছে,-আমার কিন্তু রাজার মা হওয়া তত কঠিন বোধ হইতেছে না। তুমি প্রতিদিন যেরূপ কাজ কর্ম্ম করিয়া থাক, আমি যে কয়দিন চৌবেড়িয়া হইতে ফিরিয়া না আসি, সেই কয়দিন সেইরূপ কাজ কর্ম্ম কর। আমি আজি বিকালে পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও পরমার্শ করিবার জন্য চৌবেড়িয়া যাইব।” পুত্রের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়া দেবনাথ-জননী স্বর্ণময় কোদাল, দা ও মাণিক অতিশয় যত্নসহকারে সিন্ধুকে রক্ষা করিলেন এবং দেবনাথকে সেই সিন্ধুকের উপর প্রতি রাত্রে শয়ন করিতে আদেশ করিয়া আহারান্তে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিলেন। (ক্রমশঃ)

ইংরাজী শিক্ষা ও জাতিভেদ।

ভারতের অন্যত্র কি তাহা বিশেষ জানি না, কিন্তু বাঙ্গলায় শুনিতে পাই আজকাল প্রধানতঃ দুইটী জাতি মাত্র বর্ত্তমান—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ অবশ্য নানাপ্রকারের আছেন, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিতর আদান প্রদান দূরে থাকুক অন্ততঃ প্রকাশ্যে আহার পর্য্যন্ত প্রচলিত নাই। শূদ্র যে কত প্রকারের আছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই:—অবশ্য বৈদ্যের শূদ্রত্ব

বাদ দিলেও কায়স্থ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই শূদ্রশ্রেণীভুক্ত। এ সব কথা আমরা অবশ্য ব্রাহ্মণদিগের নিকট শুনিতে পাই। তাঁহাদের কথা কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য পাঠক পাঠিকারা বিচার করিবেন। তবে একটা কথা অনেকের মনোমধ্যে উদয় হয়, চতুর্বর্ণের মধ্যে আমাদের এই মাতৃভুমি বঙ্গদেশে কি ২য় ও ৩য় বর্ণের একেবারেই শুভাগমন হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা আজিকালি কোথায়? এবং যদি তাঁহারা কষ্ট করিয়া আর্য্যভূমি হইতে এতদূর না আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরাও যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে কি কিঞ্চিৎ সন্দেহ হয় না?

যাহা হউক উপরি-উক্ত জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা আজ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানিয়া লইলাম বাঙ্গলায় কেবল মাত্র ১ম ও ৪র্থ বর্ণের পদার্পণ হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় আজকালকার ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে জাতিভেদ প্রথার কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না।

ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী বিজ্ঞান, ইংরাজী নীতিশাস্ত্র, ইংরাজী ব্যবহারশাস্ত্র এবং ইংরাজচরিত্র যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরাসম্বন্ধে জাতিভেদের বিরোধী তাহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। সাম্যবাদ ইংরাজীর মূল মন্ত্র। ইংরাজ আসিবার ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান এদেশে আসিয়াছিলেন। মুসলমান দেশের রাজা হওয়াতে দেশের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তিকে পারসী—এমন কি আরবী পর্য্যন্ত পড়িতে হইয়াছিল। ইংরাজ এদেশের লোকের সঙ্গে মিশেন না সত্য, কিন্তু মুসলমানদিগের সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। মুসলমান বিজয়ের কিছুদিন পরেই মুসলমানেরা এদেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার হিন্দুদের কতদূর আনুগত্য জন্মিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে এবং ভাষায় স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত। মুসলমানদের সঙ্গে মিশামিশি খুব ছিল বটে, দেশের অনেক লোক যে কারণেই হউক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল বটে এবং মুসলমান সংযোগে হিন্দুদের মধ্যে নানা বিষয়ে কতক কতক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু জাতিভেদ প্রথার উপর মুসলমান সহবাস এবং মুসলমান সাহিত্য-চর্চ্চা যে বিশেষ কিছু ক্ষমতা বিস্তার করিয়া উঠিতে পারিয়াছিল তাহা বোধ হয় না।

ইহার দুইটী কারণ অনুভূত হয়। (১) মুসলমানেরা এদেশের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং হিন্দু সংঘর্ষে তাঁহাদের চাল চলনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। (২) মুসলমান-সাহিত্য দেশে বিশেষ কিছু জলন্ত নুতন ভাব আনয়ন করে নাই। সুধু তাহা নয়, অনেক বিষয়ে মুসলমান সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্য অপেক্ষা নিকৃষ্টই ছিল। আর এক

কথাও এখানে বলা যাইতে পারে, ইংরাজী চর্চ্চার ন্যায় পারসী ও আরবী চর্চ্চার বহুল প্রচার হয় নাই।

ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নূতনত্ব সাম্যবাদ দেশের প্রথম ইংরাজী-শিক্ষার্থী-দের মধ্যে কি বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন। বিপ্লবের দুইটী কারণ ছিল; (১) ইংরাজী সভ্যতা ও সাহিত্য হঠাৎ দেশের মধ্যে কামানের জ্বলন্ত গোলার ন্যায় আসিয়া পড়ে। ইহাতে লোককে শশব্যস্ত করিয়া তোলে। নূতনত্বের খরবেগ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। (২) তখনকার হিন্দুসমাজের অপেক্ষাকৃত কঠোরতা। সমাজের মধ্যে নানা দোষ প্রবেশ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সমাজকে উপেক্ষা করিলে তখন শীঘ্র পার পাওয়া যাইত না। এখন আর সে দিন নাই। ইংরাজী বিজ্ঞান ও সাহিত্যের নূতনত্বের মোহ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ইংরাজী স্কুল হইয়াছে; হাজার হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে; ইংরাজী এখন ঘর-কন্নার একটা সাধারণ বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া সমাজবন্ধন এখন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং কাজে কাজেই লোকে অধিকতর উদারতা অবলম্বন করিয়াছে। আচার-বিরুদ্ধ কি সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করিলে আর পূর্ব্বের ন্যায় চারি দিকে হৈ চৈ পড়িয়া যায় না। জাতিনাশের বিভীষিকা এখন একপ্রকার অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গুরুতর সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য নিতান্ত প্রকাশ্যভাবে না করিলে আর কোন উৎপাতই নাই। এখন—

"এক টেবিলে বামন যবন
উইলসনের খানা খান,"

এবং তাহার পরেই ব্রাহ্মণসন্তান হয় গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, না হয় আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়োদ্ভাবনে মস্তিষ্ক পরিচালিত করেন। যাঁহারা আপনাদিগকে খাঁটি হিন্দু বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহাদের অনেকের কাছে শুনিয়াছি—"আহারে ও ধর্ম্মে সম্বন্ধ কি? পশ্চিম যাইতে হইলে সুবিধামত অন্য কোন স্থানে ভাল আহার পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে যদি কেল্‌নারের হোটেলে আহার করা যায়, তাহা হইলে হিন্দুত্বে কি দোষ পড়িল?" কি দোষ পড়িল? সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কথা কেহ বলিতে সাহসী হইতেন কি না সন্দেহ।

বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজীশিক্ষার বৈপ্লব-ভাবের খর্ব্বতার কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। ইংরাজী বিজ্ঞান সাহিত্যের নূতনত্বের ধাঁধা অনেকটা ঘুচিয়াছে এবং সমাজবন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা শিথিল হইয়াছে। এই শৈথিল্য ইংরাজী শিক্ষারই ফল। এখন জিজ্ঞাস্য সমাজবন্ধনের শৈথিল্য জাতি-ভেদ প্রথার প্রতিকূল কি না? আমাদের

ত এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম বৈপ্লবভাব এখন নাই সত্য, কিন্তু ইহার মূলমন্ত্র কি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? যখন নদীতে বাণ আসে, তখন গ্রাম প্রান্তরাদি ভাসিয়া যায়, অনেক স্থান নদীগর্ভে নিখাত হয়, এবং নদীর ভয়ঙ্করত্ব ও ধ্বংস ক্ষমতার জীবন্ত ছবি মনে অঙ্কিত হইয়া যায়। কিন্তু বাণ অল্পকাল স্থায়ী এবং সেই জন্য ইহার বিনাশিনী শক্তিও সীমাবদ্ধ। নদী নিঃশব্দে প্রত্যহ বহিয়া বহিয়া স্থলের যেরূপ ধ্বংস সাধন করিতেছে, তাহার সঙ্গে বাণকৃত ধ্বংসের তুলনাই হয় না। অথচ এই ধ্বংস কয় জনের মনোযোগ আকর্ষণ করে? ইংরাজীশিক্ষার প্রথম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহা অল্পে অল্পে জাতিভেদের মূল যে আল্‌গা করিয়া দিতেছে, তাহা অনেকে দেখেন না।

আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় একটু বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কেহ কেহ বলিবেন সমাজবন্ধন শিথিল হইয়াছে সত্য, কিন্তু আজকাল ইহার প্রতীকারের চেষ্টা হইতেছে। বিপ্লবের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে, ইংরাজীর নূতনত্বের চটক কমিয়াছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দু নামের গৌরব বুঝিতে পারিতেছেন, এক টেবিলে বামন যবনের খানা খাওয়া কমিতেছে এবং যাঁহারা আহার ও ধর্ম্মের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পান না, বিশাল হিন্দুসমাজের তুলনায় তাঁহারা আজও মুষ্টিমেয়। তর্কের অনুরোধে যদি এ সব কথা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও গুটিকত কথা বলিবার আছে।

(১) জাতিভেদের প্রচণ্ড কঠোরতা উপলব্ধি করিয়া অনেকে আজকাল বলিয়া থাকেন সামাজিক নিয়ম সব সময়ে খাটে না। কোনও সামাজিক কার্য্যে যাঁহার সহিত এক সঙ্গে ভোজন কি একত্র উপবেশন অসম্ভব, বন্ধুতার খাতিরে সচরাচর তাঁহার সঙ্গে পান ভোজনাদি করা যাইতে পারে। অনেক জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ দেখা গিয়াছে যাঁহারা তাঁহাদের শূদ্র বন্ধুর বাড়ীতে অন্ন ছাড়া আর প্রায় সবই আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও সামাজিক ব্যাপারের সময় হয়ত তাঁহারা সেই শূদ্র বন্ধুর বাটীতে পর্য্যন্ত আসেন না। এরূপ লোক দেশে বড় বিরল নন। কি যুক্তি দ্বারা তাঁহারা সামাজিক ও অসামাজিক ব্যাপারের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবে পার্থক্য সংস্থাপন করেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। আমাদের ত মনে হয় ইহা ইংরাজী শিক্ষার অন্যতম ফল এবং ইহাতে জাতিভেদ বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলিবেন উপরে যাহা উক্ত হইল উহা সাধারণ নিয়ম নয়, তাহার ব্যভিচার মাত্র। হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা যেন মনে রাখেন "ঠগ বাছ্‌তে গাঁ উজাড়।"

(২) জাতিভেদ ত ব্যবসা লইয়া। ব্রাহ্মণের ব্যবসা যাজন ও অধ্যাপনা;

ক্ষত্রিয়ের রাজকার্য্য ও যুদ্ধ; বৈশ্যের কৃষি ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের প্রথম তিন বর্ণের সেবা। কিন্তু এখন প্রায় ইহার কিছুই নাই। যাজন অবশ্য ব্রাহ্মণেরা আজও করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার কার্য্য এখন তাঁহাদের হস্ত হইতে একরূপ গিয়াছে বলিলেই চলে। দেশে যে কয়টী টোল আছে, তাহাতে অবশ্য ব্রাহ্মণ অধ্যাপক আছেন, কিন্তু এখন টোলই বা কত এবং তাহারাই বা আর কতদিন? যদি ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার স্রোত এইরূপ খরবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশে প্রাচীন ধরণের টোল আদৌ থাকিবে কি না সন্দেহ। ইংরাজাগমনে নূতন যে অধ্যাপকশ্রেণী সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৩৬ জাতি বিরাজমান। এক দিকে যেমন অধ্যাপনার ভার ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে যাইতেছে, অপর দিকে তেমন অন্যান্য ব্যবসায়ের দিকে তাঁহারা হস্ত প্রসারণ করিতেছেন। চণ্ডীপড়া হইতে জুতাগড়া পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণে আজিও নাই করুন, জুতার ব্যবসা পর্য্যন্ত তাঁহারা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণসন্তানও আজকাল ওকালতী ও অন্যান্য ব্যবসা এবং কেরাণীগিরি ও অন্যান্য চাকরী করিতেছেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যাঁহারা এরূপ করিতেছেন, তাঁহারা কি জাতিভেদের মূল শিথিল করিতে সাহায্য করিতেছেন না?

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যত বাঙ্গলায় নাই। বাঙ্গালীকে যুদ্ধ করিতে হয় না, সেইজন্য ক্ষত্রিয় না থাকাতে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না, কিম্বা অন্য কোন জাতি দ্বারা তাহাদের কার্য্য করাইয়া লইবারও আবশ্যক হয় না। বৈশ্যের কার্য্য না হইলে কিন্তু সমাজ চলে না। সেই জন্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই এখন বৈশ্যের কার্য্য করিতেছেন। একটু আলোচনা করিলে দেখা যায় ইংরাজীর ঢেউ অনেক দূর পৌঁছিয়াছে। সুধু যে ইংরাজীশিক্ষিত লোক ব্যবসায় সম্বন্ধে জাতিভেদের মস্তকে পদাঘাত করিতেছেন এরূপ নহে, অনেক নিরক্ষর অথবা ইংরাজী-অনভিজ্ঞ লোকের মধ্যেও জাতিব্যবসা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যবসায়ান্তর অবলম্বনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেক কর্ম্মকারকে স্বর্ণকারের ব্যবসায়, অনেক অন্যজাতীয় লোককে সূত্রধরের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ব্যবসায় সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খলতা যে ইহা ছাড়া আর নাই এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। একটু চিন্তা করিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে কত লোক আছে যাঁহারা জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছে।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, আমরা কি কি প্রশ্নের উৎপাদন করিয়াছি:—

(ক) ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে জাতি-

ভেদের কঠোর শাসন আহারাদি সম্বন্ধে কতকটা শিথিল হইয়াছে। সামাজিক নিয়ম ও অসামাজিক নিয়ম বলিয়া দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে।

(খ) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর জাতিভেদে ব্যবসায়ের পার্থক্য এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। খুব নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরাও আর ব্যবসা যে জাতিগত, এরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে অপারগ।

(গ) অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকদের মনেও ঐরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে এবং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে।

উক্ত বিষয়গুলির কারণ কি? তাহার আভাসও দিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, বা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক, ইংরাজদিগের এ দেশে আগমন ও ইংরাজীশিক্ষার প্রচারই একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। অনেকের মতে এই জাতিভেদ বন্ধনের শৈথিল্য ইংরাজী শিক্ষার একটী কুফল; এবং সেই জন্য তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে কিয়ৎপরিমাণে দণ্ডায়মানও হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কি ইংরাজীশিক্ষার স্রোত রোধ করিতে পারিবেন? যখন দেখিতেছি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র সংস্কৃত চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া উকীল বা হাকিম হইবার জন্য ইংরাজী অধ্যয়ন করিতেছেন এবং অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বাটীতেও ইংরাজী পুস্তক ক্রয়ার্থ টাকা খরচ একটা প্রধান খরচের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, তখন কি করিয়া বলিব ইংরাজীশিক্ষার গতি কখন প্রতিহত হইবে? আর নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে ইংরাজী না পড়িয়াই আপনাদের সুবিধামত ব্যবসা অবলম্বন করিতেছে, তাহাতে বাধা দিবার কি উপায় আছে? সমাজের কি এমন কিছু শক্তি আছে যে, তাহাদিগকে এই স্বধর্ম্ম ত্যাগ হইতে বিরত করে? সমাজে এমন কেহ আছেন—কি জন্মাইবেন কি—যাঁহার কথা তাহারা শিরোধার্য্য করিয়া আপন আপন জাতি ব্যবসায় পরিত্যাগের সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবে? যদি ইংরাজী চর্চ্চা বন্ধ করিতে না পারা যায়, যদি ইংরাজী প্রবেশের দ্বার অবারিত থাকে, তাহা হইলে ইংরাজ জাতির স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যভাব হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার যে কি উপায় আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের মূলভিত্তি। যদি ইহা শিথিল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ পাইবে। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে আজ হউক, কাল হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, জাতিভেদ বন্ধন যে শ্লথ হইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়। সমাজনেতৃগণ ভাবিয়া দেখুন রোগের কোনও ঔষধ উদ্ভাবন করিতে পারেন কি না।

শ্রীদে, না, ব।

সরোজিনীর মায়ের পরিত্রাণ।

সরোজিনীর মা এক ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভবা বিধবা। সে বালবিধবা ছিল কি না বলিতে পারি না। বিক্রমপুরের কোন এক গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তাহাকে রূপবতী না বলিলেও নিতান্ত রূপহীনা বলা যায় না। গ্রামে যখন বাস করিতেছিল, তখন কোন এক কুলোকের কুহকে পড়িয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয়। এইরূপ বুদ্ধিবিহীনা কুপথগামিনী স্ত্রীলোকদিগের পরিণাম যাহা ঘটিয়া থাকে, সরোজিনীর মায়ের তাহাই ঘটিল।

পাপের পথ অতি মসৃণ, একবার পদ স্খলিত হইলে, কাহারও দাঁড়াইয়া থাকিবার যো নাই। সরোজিনীর মাও এতাদৃশ বিপদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। জীবনের এই দুর্দ্দিনে কোথায় কি ভাবে জীবন কাটাইয়াছে, আমি তাহা পাঠিকাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে ঘটনা-স্রোতে পড়িয়া তাহার জীবনতরী অবশেষে আসিয়া ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হয়। এখানে সে কোন এক রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী সাজিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তাহার একমাত্র কন্যা বালিকা সরোজিনী তাহার সঙ্গে ছিল। সে যাহা উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা আপনার ও সন্তানেরও ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত। ইহাদিগের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে ঢাকা নগরীতে "উদ্ধারাশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল বারাঙ্গনা বালিকাদিগকে পাপের পথে চালাইবার জন্য প্রস্তুত, তাহাদিগের হস্ত হইতে ঐ সকল বালিকাকে উদ্ধার করাই উক্ত আশ্রমের উদ্দেশ্য।

সরোজিনীর মা যখন এই আশ্রমের বৃত্তান্ত শুনিল, তখনই তাহার কন্যা সরোজিনীকে তথায় প্রেরণ করিবার সংকল্প করিল।

সরোজিনীর মা পাপে ডুবিয়াছিল সত্য, কিন্তু ভদ্র পরিবারের কন্যা বলিয়া তাহার অন্তর হইতে সমস্ত সদ্‌গুণ বিদায় গ্রহণ করে নাই। সদ্ভাব ও বাৎসল্য তখনও তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। কিসে সরোজিনীর কল্যাণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিত। সরোজিনীকে পাপের কূপে ডুবাইয়া স্বার্থ সাধন করিবে ইহা তাহার নিকট জঘন্য বলিয়া বিবেচিত হইত, কিন্তু আপনাকে নিরুপায় ভাবিয়া কিছুই স্থির মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে বিধাতা পুরুষ তাহার সহায় হইলেন। সরোজিনী উদ্ধারাশ্রমে প্রেরিত হইল। সন্দেহবাদিগণ সরোজিনীর মায়ের অভিসন্ধির প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ভাবিলেন সরোজিনীর মায়ের কন্যা প্রেরণ কেবল মেয়ে-ধরা ফাঁদ পাতা মাত্র। সরোজিনীর সঙ্গে আরও কয়েকটী মেয়ে ধরিয়া

আনিবে উদ্দেশ্য করিয়াই সে ওরূপ করিয়াছে। বিধাতার কি লীলা! এক দিন সরোজিনী ও আশ্রমস্থা অন্যান্য আরও কয়েকটি বালিকা রাত্রিকালে আশ্রম হইতে পলায়ন করিল। তখন সন্দেহবাদীদিগের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল, সন্দেহের তরঙ্গ গড়াইয়া যাইয়া সরোজিনীর মায়ের উপর পড়িল। পাপের শাস্তি কি ভয়ানক! পাপী নির্দ্দোষী হইলেও অনেক সময় নিস্তার পাইতে পারে না। যে একবার সমাজের চক্ষে অবিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছে, সে সহজে নিস্কৃতি পাইতে পারে না। সরোজিনীর মা নির্দ্দোষী হইলেও পুলিস কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। কিন্তু স্বয়ং বিধাতা পুরুষই যেন তাহাকে রক্ষা করিলেন, তাহা না হইলে হয়ত তাহাকে বিচারালয়েও শাস্তি পাইতে হইত। পলাতক বালিকাগণ পরে ধৃত হইল এবং তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে ওরূপ করিয়াছিল এই কথা প্রকাশিত হইল। এই ঘটনার পর সরোজিনীর মা কন্যাকে পুনরায় আপনার নিকট আনয়ন করে। কিন্তু বিধাতা পুরুষ যাহাদিগের সুখের সোপান খুলিয়াছেন; তাহাদিগকে বন্ধ করে কে? সরোজিনী তদবধি আশ্রম-বাসিনী হইল। মাতা কন্যার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিতে যাইত, তদুপলক্ষে আশ্রমের অধ্যক্ষ শশি বাবুর সহিত তাহার পরিচয় হয়, এবং এই উপলক্ষে আরও দুই এক জন সাধু-চরিত্র পতিতা-নারীদিগের উদ্ধারাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিতও তাহার আলাপ হইল। এইরূপে তাহারও জীবন-পরিবর্ত্তনের সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু যত দিন পাপের পথ মধুর বোধ হয়, তত দিন ধর্ম্মোপদেশ ভাল লাগে না। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" এ কথা সত্য বটে, কিন্তু যাহার পরিত্রাণের সময় নিকটবর্ত্তী, তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মোপদেশ গূঢ়ভাবে পরিবর্ত্তন সংঘটন করে। উপদেষ্টা কিংবা উপদিষ্ট কেহই হয়তঃ প্রথমাবস্থায় তাহা জানিতে পারেন না, কিন্তু যখন জীবন বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন সকলেই তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারে। সরোজিনীর মায়ের প্রাণে এইরূপ গূঢ় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। অবশেষে যখন তাহা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইল, তখন সরোজিনীর মা পবিত্রতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইল। যতক্ষণ মানুষ অন্ধকারে বাস করে, ততক্ষণ অন্ধকারকেই ভাল বলিয়া মনে করে, কিন্তু এক বার আলোর সঙ্গে দেখা হইলে আর অন্ধকার ভাল লাগে না। সরোজিনীর মায়ের তাহাই ঘটিল। সে এক দিন শশি বাবুর নিকট তাহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিল। শশি বাবু তাহার এই মানসিক পরিবর্ত্তন সাময়িক মনে করিয়া আরও প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সরোজিনীর মায়ের পাপের জ্বালা তখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে আর পাপ জীবনের বিভীষিকাময় দৃশ্য

দেখিতে পারিল না। শশি বাবুকে তাহার উদ্ধারের জন্য জিদ করিতে লাগিল। যখন দেখিতে পাইল শশি বাবু তাহার প্রস্তাবে তখনও অসম্মত, তখন বলিল "আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, এক ভদ্রলোকের বাসায় রাঁধুনির কাজ কর্ব্ব, তবু এ ভাবে জীবন যাপন কর্ব্ব না। আপনি যদি আমায় নাই লন, তবে আমার ঐ কাজ ভিন্ন অন্য উপায় নাই।" শশি বাবু তাহার এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সোণার বালা কি কর্ব্বে?" তখন সে বলিল "ইহা সরোজিনীর জন্য রেখেছিলেম, নিন আপনি নিয়ে যান," এই বলিয়া খুলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। শশি বাবু তাহাকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন। এখন সে আশ্রম-বাসিনী। এখন বিষয়-বৈরাগ্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। সে মস্তকের সুন্দর কেশদাম খর্ব্ব করিয়া কাটিয়াছে, রঞ্জিত শাড়ীর পরিবর্ত্তে থান কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঈশ্বরের দিকে তাহার মন গিয়াছে। এখন তাহার বয়স ৩৩ কিংবা ৩৪ হইয়াছে। ভগবান্ সুমতি দিয়াছেন, সে আশ্রমের বালিকা-দিগের সেবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ মনের মত খাটিতে পারিতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করে। সরোজিনীর মায়ের পরিত্রাণের পথ খুলিয়াছে, ভগবানের বিধান কে বুঝিবে? তিনি কন্যাকে দিয়া মাতাকে আকর্ষণ করিলেন। ধন্য তাঁহার মহিমা! ধন্য তাঁহার শক্তি।

উদাসীন।

মানবদেহের বৃদ্ধি।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার মার্টিনো বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মানবসন্তান এক একটী ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই ডিম্ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র; এমন কি ইহার ব্যাস এক ইঞ্চের ১২০ এক শত বিংশতি ভাগের এক ভাগ। সুতরাং তাহা দূরবীক্ষণ ব্যতীত নগ্ন চক্ষে ভাল দৃষ্ট হয় না। যদি একটী ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে এরূপ ক্ষুদ্র ডিম্ব হইতে মানবের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। যাহা হউক মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদিগের পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে।

"মায়ের উদরে জন্ম জনক ঔরসে।
পঞ্চ রাত্রি গতে হয় বিদ্যুৎ প্রমাণ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী সমান॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে বাড়ে অতিশয়।
দিনে দিনে চন্দ্রকলা যেমন বাড়য়॥
মাসেক অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
হস্ত পদ নাই মাংসপিণ্ডের সমান॥
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তক উৎপত্তি।
তৃতীয় মাসেতে হয় হস্ত পদ গতি॥
চতুর্থ মাসেতে কেশ লোমের জনম।
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমে ক্রম॥
ষষ্ঠ মাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে।
চতুর্দ্দিকে ঘোর অগ্নি দহে কলেবরে॥

সপ্তম মাসেতে জীব নানা ক্লেশে রয়।
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উদরে ভ্রময় ॥
মায়ের ভোজন রসে বাড়ে দিনে-দিনে।
অষ্ট মাসে দিব্যজ্ঞান আপনারে জানে ॥”
(শান্তিপর্ব্ব কাশীরাম দাস)

ক্রমে দশম মাসে পূর্ণাবয়ব হইলে জীব ভূমিষ্ঠ হয় এবং স্তনপান দ্বারা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উদ্ধৃত কবিতার বৈজ্ঞানিক বিচার আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র বুঝেন, তাঁহারা তাহা অনায়াসে করিতে পারিবেন, আমরা কেবল অভিজ্ঞান-জাত প্রত্যক্ষ বৃদ্ধির উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম পঞ্চ বর্ষ বালক ও বালিকা উভয়ে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ বর্ষ হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বালকেরা বালিকাদিগের অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বালিকারাও একাদশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালকদিগের অপেক্ষা অধিকতর বাড়িয়া উঠে। বালকেরা একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় হয়, কিন্তু বালিকারা দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত পরিমাণে ভারী হয়। পঞ্চদশ বৎসর বয়সের পর বালিকারা অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়সে পূর্ণকায় হইয়া থাকে। পঞ্চদশ বর্ষ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত বালকেরা আবার অধিকর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বৎসরে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দৈহিক ভার ষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বালকেরা কিছু দিন সমভাবে থাকিয়া হঠাৎ বাড়িয়া উঠে। বাড়িবার এই সময় তাহারা স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গ ও কুৎসিত হইলে কৃত্রিম উপায়ে সবল ও সুন্দর হইতে পারে। ব্যায়াম এই সময়ে বিশেষ উপকারী, তদ্দ্বারা দৈহিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কান্তি ও শ্রীবৃদ্ধিও হইয়া থাকে। ক্ষীণ দীর্ঘকায় কদাকার যুবা, যাহার মাংশপেসী ও ধমনী শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম কৌশলে সেও সবল, দৃঢ়কায় ও সুন্দর হইতে পারে। ৩৫ বৎসর বয়সে এক ব্যক্তির স্বাভাবিক বৃদ্ধি হ্রাস হইয়াছিল, দুই মাস ক্রমাগত ব্যায়াম দ্বারা তাহার বৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে এবং বক্ষঃস্থল উন্নত ও ৪৷৷০ ইঞ্চ আয়তনে বৃদ্ধি হইয়াছে। আর একটি উনবিংশ বর্ষ-বয়স্ক ক্ষীণকায় দীর্ঘকায় যুবকের নয় মাস কাল ব্যায়াম করিয়া দৈহিক দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তে বক্ষঃস্থলের প্রসারতা ৪৷৷০ ইঞ্চ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা পরীক্ষিত বিষয়।

ব্যায়াম বহু প্রকার —“ডন” ফেলা ও মাংসপেশী সম্বর্দ্ধক ব্যায়াম দ্বারা হৃদয় প্রশস্ত ও ফুস্‌ফুস্ বিস্ফারিত হয় এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ সৌকর্য্য হেতু শরীরের স্ফূর্ত্তি ও স্বচ্ছন্দতা সংসাধিত হয়। ইহা স্থূলতা নাশের মহৌষধ।

পদব্রজে ভ্রমণ, দৌড়ন, লম্ফপ্রদান, সন্তরণ ইত্যাদি অনায়াসসাধ্য ব্যায়ামগুলিও শারীরিক পুষ্টিদায়ক ও শক্তি-সম্বর্দ্ধক। ব্যায়াম দ্বারা কেবল শারীরিক নহে, মানসিক শক্তি সকলেরও বিকাশ হয়, এবং আত্মপালন ও আত্মনির্ভরের ভাবও প্রবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্য ইহা সকল অবস্থার সকল লোকের পক্ষে ব্যবস্থিত। প্রাচীন স্পার্টার রমণীরাও ব্যায়াম করিত এবং বীরমাতা নামের যোগ্য হইত।

ঘটিকা যন্ত্র।

সময় নিরূপণ করিবার জন্যই ঘটিকা যন্ত্রের উদ্ভাবন। সভ্যতার অভ্যুদয়ে শ্রম ও বিশ্রামকাল বিভাগ করা আবশ্যক হইয়া উঠে এবং বিভাগ সমানাংশে নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই ঘটিকার প্রয়োজন। আধুনিক শিল্পজাত ঘটিকার ন্যায় প্রাচীন কালে যে কোন প্রকার সময়-নিরূপক যন্ত্র ছিল, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু তখন কৌশল দ্বারা ঘটিকার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। অতি প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যই ঘটিকার কার্য্য করিতেছে, কিন্তু মেঘাবৃত দিবসে বা অন্ধকার সময়ে সূর্য্য কার্য্যকারী হয় না; কারণ তখন ছায়া থাকে না। এই অসুবিধা নিবারণ জন্যই অন্য কৌশল আবশ্যক হইয়াছিল। ইহাই জলঘড়ি ও বালিঘড়ি।

জলঘড়ি। একটী সছিদ্র তাম্র বাটী অথবা অন্য ধাতুময় পাত্র জলপূর্ণ করিয়া অপর একটী পাত্রে বসাইয়া রাখিলে, যতক্ষণে সমস্ত জল বাহির হইয়া বাটী বা পাত্র শূন্য হয়, ততক্ষণ এক ঘণ্টা বা ঘটিকার পরিমাণ। অথবা সছিদ্র শূন্য পাত্র জলমধ্যে কৌশলপূর্ব্বক অবস্থাপিত হইলে যতক্ষণে তাহা পূর্ণ হয়, ততক্ষণই এক ঘটিকার পরিমাণ। শেষোক্ত জলঘড়ি রোমদেশে ব্যবহৃত হইত।

বালিঘড়ি। ডম্বরুর ন্যায় কাচপাত্রের অর্দ্ধাংশ বালুকার দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহা হইতে সমস্ত বালুকা নিঃসৃত হইয়া অপরাংশে পতিত হইতে যতটুকু সময় লাগে, ততক্ষণই এক ঘড়ির পরিমাণ। এই উভয়বিধ ঘটিকাই আমাদিগের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন্ সময় হইতে যে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার কোন লিখিত বিবরণ নাই, প্রত্যুতঃ আমরা কোথাও তাহার উল্লেখ দেখি নাই।

কথিত আছে যে খৃষ্টীয় শকের ২৬৭৯ অব্দ পূর্ব্বে চিন সম্রাট্ কোঙার রাজত্ব-কালে জলঘড়ি চিন দেশে প্রচলিত ছিল। খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দি পূর্ব্বে ইহা মিসরে প্রচলিত হয়। সিপিও নাসিকা গ্রীশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া রোমে জলঘড়ির প্রচলন করেন। সেই সময়ে ইহার ব্যবহার গলদেশে (ফ্রান্সে) প্রচলিত হয়। জুলিয়াস্ সীজর এই ঘড়ি দেখিয়া

চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে শ্যাম-দেশ ও ব্রহ্মদেশ,মঙ্গোলিয়া, পারস্য, মিসর, গ্রীশ ও রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যদেশ সকলে জলঘড়ির ব্যবহার ছিল, এবং অদ্যাপিও কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। অষ্ট্রোগথের রাজা থিয়োডরিকের আদেশে বোইস্ নামক একজন রোমীয় একপ্রকার ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহগণের গতি নির্ণীত ছিল; এই ঘড়িটী বরগণ্ডিয়ার রাজা গণ্ডিবণ্ডকে উপহার দেওয়া হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দিতে গাজার চোবিসিএন, একপ্রকার ঘড়ি নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে ১২টী পিত্তলের ঈগল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রক্ষিত ছিল, প্রত্যেকের চঞ্চুতে এক একটী মুকুট ছিল। উপরিভাগে সূর্য্য-দেব একহস্তে গোলক ও অপর হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। দণ্ড বিস্তার করিলেই হারকুলেশ উপস্থিত হইত; অমনি ১২টী ঈগল ১২টী মুকুট তাহার মস্তকে পরাইয়া দিত। ইহা হারকুলেশের দ্বাদশ শ্রমের পুরস্কার এবং রাশিচক্র ও দ্বাদশ মাস ও দ্বিপ্রহর বেলার পরিমাণ ছিল।

পারস্য-রাজদূত আবদুল্লা, জর্জ এবং ফেলিক্স নামক জরুসলমের দুইজন সন্ন্যাসীর সমভিব্যাহারে কালিফ্ হারণ অল-রাসেডের নিকট হইতে সম্রাট্ সারলামানের জন্য উপঢৌকন লইয়া যান, তন্মধ্যে একটী জলঘড়ি ছিল। তাহাতে ঘণ্টার সংখ্যানুসারে পিত্তলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তুল ছিল। তাহার এক একটী প্রত্যেক ঘণ্টায় তাম্রপাত্রে পতিত হইত। ঘণ্টা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে পাত্রের উপরিভাগে বারটী দ্বার দিয়া ১২টী অশ্বারোহী আসিত এবং দ্বারগুলি অমনি বদ্ধ হইত, পরে ঘণ্টা বাজাইয়া তাহারা চলিয়া যাইত, এই ঘড়িটী এ-লা-সেপল্ প্রাসাদে রক্ষিত ছিল।

৭৬০ হিজরা অব্দে আবুহাসনের রাজত্ব-কালে একটী বৃহৎ শিশামযী জলঘড়ি নির্ম্মিত হয়, তাহা একটী অপরূপ বস্তু বলিয়া অদ্যাপি সুরক্ষিত আছে। ইহার উপরিভাগে একটী রৌপ্যময় গুল্ম নির্ম্মিত আছে; একটী পক্ষী তাহার শাখায় বসিয়া পক্ষ দ্বারা শাবকদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বিবর হইতে একটা সর্প শনৈঃ শনৈঃ বাহির হইয়া শাখায় উঠিয়া একটী শাবককে লক্ষ্য করিতেছে। ঘণ্টা পূর্ণ হইবার অব্যবহতি পূর্ব্বে দুইটী ঈগল দুইটী দ্বার দিয়া আসিয়া নৃত্য করিতে থাকে এবং ঠিক্ সময় হইলে দুইটী তাম্র বর্ত্তুল ঠোঁটে করিয়া তাম্র পাত্রে ফেলিয়া দেয়, অমনি সর্প গর্জ্জন করিয়া গুহাস্থ একটী পক্ষিশাবককে দংশন করিয়া কবলসাৎ করে। সেই সময় হঠাৎ অপর একটী দ্বার দিয়া একটী স্ত্রীমূর্ত্তি বাহির হইয়া সম্রাট্কে অভিবাদন (সেলাম) করিয়া বামহস্ত আস্যদেশে অর্পণ করে এবং দক্ষিণ হস্তে একখানি পুস্তক প্রদর্শন করে—তাহাতে কালিফের প্রশংসাসূচক কবিতা খোদিত। মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত দৃশ্য

অন্তর্হিত হইয়া স্বাভাবিক ভাব পুনঃ প্রাপ্ত হয়।

জলঘড়ির পরেই আধুনিক শিল্পজাত ঘটিকাযন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে।

মশকের উপকারিতা।

দূষিত জলবায়ু, দুর্গন্ধময় প্রদেশ ও জঙ্গালপূর্ণ স্থানে মশকের উৎপত্তি, সুতরাং ইহার আবার উপকারিতা শক্তি কি? অনেকে ইহা বলিতে পারেন। কিন্তু পরমকারুণিক পরমেশ্বর কোন পদার্থই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই। ইহা মনে হইলে আর বিস্ময়ের কারণ থাকে না। মশকেরা ম্যালেরিয়া অর্থাৎ জলাভূমিজাত বা আর্দ্র স্থান হইতে উৎপন্ন বিষাক্ত বায়ু--যাহা জন্তুশরীরে সংলগ্ন ও প্রবিষ্ট হইলে জ্বর উৎপন্ন করে, তাহাই ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। ইহাদিগের জন্মস্থানের যেরূপ বিধান, আহারেরও সেইরূপ ব্যবস্থা। মশক না থাকিলে ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইত। মশকেরা বিষাক্ত বায়ুর সেই জ্বরবীজ আহার করিয়া পৃথিবীর মহোপকার সংসাধন করিতেছে।

মশক যখন দংশন করে—অর্থাৎ যখন তাহার দংষ্ট্র বা শুণ্ড জীবশরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া রুধির শোষণ করিতে থাকে, তখন তাহার সেই শুণ্ড দিয়াও একপ্রকার সূক্ষ্ম দ্রব দ্রব্য জন্তুশরীরে নিহিত হয়। উহাই বিষাক্ত বায়ুগত ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজ। বসন্তরোগের টীকার ন্যায় এই বীজ মশককর্তৃক আমাদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরস্থ ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত বীজাঙ্কুর বিনষ্ট করে। টীকা দ্বারা যেরূপ বসন্তরোগের ভয় নিবারিত হয়, মশকের দংশনও সেইরূপ ম্যালেরিয়া-জ্বর-নিবারক টীকা। মশকেরা মনুষ্যের প্রাণদায়ী রক্ত পান করে না। ইহারা কেবল দূষিত ও ম্যালেরিয়া-বীজ-মিশ্রিত রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। এই জন্যই মশকের দংশনে শরীর বিবর্ণ ও ঈষৎ স্ফীতও হইয়া থাকে। কিন্তু শোষণকালে ইহার শুণ্ডস্থ দ্রব পদার্থও বিবর্ণ দৃষ্ট হয়।

যে সকল লোক ম্যালেরিয়ার বিষাক্ত বায়ু স্পর্শে অক্ষুণ্ণ, অর্থাৎ যাহাদিগকে ম্যালেরিয়া জ্বর আক্রমণ করিতে অশক্ত, তাহাদিগের শরীরে মশকের দংষ্ট্র প্রবিষ্ট হয় না। মশকেরা কখন অনর্থক দংশন করে না। আমরা অনেক প্রাচীন ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মশক যখন দংশন করে, তখন তাহাদিগকে নিবারণ করা—মারা বা তাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহারা রক্ত পান করিয়া শরীরের উপর পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া যায়; তাহার দুর্গন্ধে

বিরক্ত হইয়া আর কোন মশক সেই শরীরে বসে না; কিন্তু যদি প্রথম হইতে মশককে মারা যায় বা উড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দলে দলে মশক আসিয়া বিষম উত্ত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া থাকে। এ কথা কতদূর সত্য তাহা সপ্রমাণ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ইহা যে উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিপোষক, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। মশকের দংষ্ট্রানীত ম্যালেরিয়া-বীজ একবার শরীরে প্রবিষ্ট হইলে রক্ত শোধিত হইয়া বসন্ত-টীকার প্রক্রিয়ানুক্রমে আর তাহাতে ম্যালেরিয়া-বিষ প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং তাহাতে আর মশকও দংশন করে না।

মশকের আতিশয্য বায়ুমধ্যে বিষাক্ত বীজের অস্তিত্ব বিজ্ঞাপন করিয়া থাকে। যে স্থলে বা যে গৃহে মশকের প্রাদুর্ভাব, তথাকার বায়ু নিশ্চয় দূষিত, তাহা সেবনে পীড়া অবশ্যম্ভাবী। মশকগণ তাহা আহার করিয়া আমাদিগের পরম হিতসাধন করিয়া থাকে, নতুবা আমরা ম্যালেরিয়া বিষাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতাম। পথে বা মাঠে ভ্রমণকালে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, মশকের দল সকল কেমন ঝাঁকে ঝাঁকে মস্তকের উপর চক্রাকারে উড্ডীয়মান হইয়া ভ্রমণের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে বিরক্ত হওয়া উচিত নহে; কারণ সেই স্থান নিশ্চয়ই ভ্রমণ বা বিহারের অনুপযুক্ত, তথায় কিছুক্ষণ থাকিলেই অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্যই মশক সকল আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়, সুতরাং সেই স্থান তদ্দণ্ডেই পরিত্যাগ করা উচিত। মশক এইরূপে আমাদিগের অনিষ্টের কারণ না হইয়া বরঞ্চ মহোপকারী বন্ধুর কার্য্য করিয়া থাকে।*

অভিমানের প্রতি।

১

কে বলিল সে দেবতা বড়ই নিঠুর,—
কে বলিল বুকে তার,
সেই স্মৃতি নাহি আর,
কে বলিল সে প্রতিমা করেছে সে চূর?
সে মোর তেমন নয়,
তাও কি সম্ভব হয়,
প্রিয় স্মৃতি ভুলে কবে বিয়োগ-বিধুর?

২

তেমন পবিত্র হৃদি মিলে না ধরায়,—
যতই পরিধি চাই,
তল তার নাহি পাই,
নীরবে উচ্ছ্বসি সে যে নীরবে মিলায়।
জগতের রীতি জানি,
দেহ ল'য়ে টানাটানি,
হেন তুচ্ছ ভালবাসা সেও নাহি চায়।

*English Mechancis or World of Science—30th April 1892.

৩

ফুলের সুরভি যথা বাতাসে মিলায়,
সে চায় তেমনি করে,
হৃদয়ে রাখিতে ধ'রে,
দেহের সম্বন্ধ চায় সে দলিতে পায়!
সে প্রেম অমৃতময়,
নাহিক একটু ক্ষয়,
নভেলের "হাহতোস্মি" মিলে না তাহায়।

৪

তা বলে নিঠুর আমি বলিব কি তায়?
"সে মোরে ভুলেছে" বলে,
অভিমানে যাব চ'লে,
প্রেমের মূরতি তবে দেখিব কোথায়?
ভবে সে দেবতা সম
আরাধ্য উপাস্য মম,
প্রেম যদি থাকে, আছে তারি সে হিয়ায়।

৫

কাঠিন্য কোমল হয় তার সে ছায়ায়,—
সাগর শুকাতে পারে,
তবু সে ভুলিতে নারে,—
তার সেই স্নেহলতা প্রেম-প্রতিমায়।
দূর হয়ে অভিমান,
'তার সে প্রাণের টান—
কমেছে'—ভুলি না আমি তোর ও ছলায়।

৬

বড় তুই ঈর্ষাভরা বুঝেছি এখন,—
প্রেমের বন্ধন হায়,
চাহিস দলিতে পায়,
সদা চাস ভেঙে দিতে সুখের স্বপন।
সে আমার—তার আমি,
জানেন অন্তরযামী,
যমুনা জাহ্নবী সম এ দুটী জীবন।

৭

তুই কেন ক'রে দিতে চাস ব্যবধান?
এ দুটি প্রাণের প্রেম,
অনল-কষিত হেম,
নারিবি ভাঙিতে তাহা দিয়া বজ্র টান।
দেহে হেথা নাহি টান,
শুধু বিনিময় প্রাণ,
কি করিবি হেথা তুই তুচ্ছ অভিমান?

মর্ম্মগাথারচয়িত্রী—বোলপুর।

সংসারাশ্রম।

পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী ইত্যাদি সহযোগে একত্র বাস করার নামান্তর সংসার। সংসার জীবনের মহা শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থান। এখানে যিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তিনি ইহলোকে সুখ ও শান্তি এবং পরলোকে পরমানন্দ লাভের অধিকারী হন। সংসার একটি আশ্রম। শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবার পক্ষে প্রেমই প্রকৃষ্ট সাধন। সেই পবিত্র প্রেম শিক্ষার ইহাই একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখানে আমরা পিতা মাতার

নিকট, ভ্রাতা ভগিনীর নিকট, স্বামী স্ত্রীর নিকট প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রেম শিক্ষা করিতেছি। এই প্রেম উর্দ্ধমুখীন হইয়া শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়। কিন্তু আমাদের প্রেম বড়ই সীমাবদ্ধ, আমরা ভগবানের অমূল্য চরণ বিস্মৃত হইয়া "আমার আমার" করিয়া তুচ্ছ সংসারে ডুবিয়া আছি। "আমি কে, আমার কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব" আমরা সংসারের থরশাণ চক্রে আবদ্ধ হইয়া তাহা একবারও ভাবিবার অবসর পাই না। আমরা প্রতি নিয়ত অমূল্য প্রেমরত্ন মনুষ্য-পদে ঢালিয়া দিতেছি, প্রেমকে উর্দ্ধমুখীন করিতে পারিতেছি না। তাহাতে শান্তি পাওয়া দূরে থাকুক, প্রাণ কেবল বিস্তৃত শ্মশান-ক্ষেত্রের ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে।

বলিতে পার যেখানে বাস করিয়া শান্তি নাই, সে আশ্রম শ্রেষ্ঠ কিসে? 'আমরা নিজের শান্তি নিজেই নষ্ট করিতেছি— সংসারের দোষ কি? আমাদের সংসার ভগবৎ-প্রদত্ত। আমরা সংসারে থাকিয়া ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যদি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি, তবে আর ভয় কি? শ্রীভগবান্ সংসারীদিগকে মায়াহ্রদে ডুবিয়া থাকিতে বলেন নাই। সংসারীকে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধনের উপদেশ বহু শাস্ত্র গ্রন্থেই পাওয়া যায়। শ্রী গৌরাঙ্গ দেবও বলিয়াছেন,—

"গৃহে বসি নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইবা।" চৈ চঃ

অনেকেই সংসার অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়া মুখের কথা নহে। অধুনা যে এত সন্ন্যাসী দেখা যায়। অনেক গৃহস্থের দ্বারেই "হাম সাধু হ্যায়, ঘিউ দেও, দাল দেও, আটা দেও" বলিয়া যে সকল সাধু সমাগত হন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন সাধু আছেন? সে সকল সাধু উদরান্নের জন্য মাত্র। সেরূপ সন্ন্যাসী সাজা কেবল বিড়ম্বনা! সন্ন্যাসী কাহাকে বলে? দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া কৌপীন পরিধান করিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেই সন্ন্যাসী হইতে পারা যায় না। যাবৎ হৃদয়-জাত প্রত্যেক কামনা বিবেকানলে পুড়িয়া ভস্মাবশেষ না হয়, তাবৎ কেহই প্রকৃত সন্ন্যাসী নামের যোগ্য নহেন। সংসার-বিরক্ত চিরকুমারদিগের চিত্তই অধিক পরিমাণে কলুষিত দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারাশ্রমে অবস্থান করত ভগবৎপ্রেম সাধন করাই কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী সাজিলেই চিত্ত কামনা-রহিত হয় না, বরং অধিক ত্যাগাভিমানীদিগের চিত্তই অধিক আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনস্থ কোনও মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন "বেশী ত্যাগী হইও না, অধিক ত্যাগী হইলে শেষে কৃষ্ণ ত্যাগ হইয়া বসে।" বাস্তবিক কথাটি বড়ই মূল্যবান্। এই যে আধুনিক বৈরাগিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া প্রকৃতিসহ এক একটি মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম কলঙ্কিত করিতেছেন, ইহা কি প্রশংসার বিষয়? ইহা অপেক্ষা সংসারাশ্রমে থাকিয়া

সাংসারিক সুখ সকল উপভোগ সহ ভগবন্নাম গ্রহণ কি অধিক প্রশংসার নহে? ফল পাকিলেই আপনি বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে, বৃন্ত খসাইবার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। তদ্রূপ জীব-হৃদয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাহাতে ভগবৎ-বিষয়ক জ্ঞানোদয় হইয়া মায়া বন্ধন বিদূরিত হয়। "গুরু অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে"। অতএব তজ্জন্য দৌড়াইয়া গাছ তলায় যাইতে হইবে এরূপ কোন বিধি নাই। সংসারে থাকিয়া শান্তি লাভ করিতে হইলে অহিংসা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিঃস্বার্থতা, দয়া, মমতা, ক্ষমা, পরদুঃখ-কাতরতা, পরলোকে বিশ্বাস এবং ধর্ম্মনীতির অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন। অনেকে বলিয়া থাকেন জিতেন্দ্রিয় হইলে সংসার চলে না। ইহা অতি ভ্রমাত্মক কথা। শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণচ।
অহিংসয়াচ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

মনু। ৬—৬০।

মনুর মতে ইন্দ্রিয় সকল দমন, রাগ ও দ্বেষ বিনাশন এবং অহিংসা দ্বারা জীব সকল অমৃতত্ব লাভ করে। সংসার পালনের জন্য অজিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে, ইহা কোনও শাস্ত্রে লেখা নাই। মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করে, তবে বড়ই বিষময় হইয়া থাকে।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি"।

ভীষ্মপর্ব্ব।

সমুদ্রে প্রবল বায়ু দ্বারা যেমন নৌকা জলমগ্ন হয়, সেইরূপ যে মন ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার প্রজ্ঞা নষ্ট হয়। অতএব সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সংসার পালন করিতে না পারিলে সংসার অশান্তি-ময় ও সেই অশান্তির তীব্র তাপে জীবন দগ্ধ হইয়া থাকে।

সংসারই জীবের শ্রেষ্ঠ আশ্রম, তাহাই দেখাইবার জন্য প্রেমের অবতার শ্রী গৌরাঙ্গ—চির অবৌধত নিত্যানন্দকে দারপরিগ্রহ করাইয়া সংসারী করিয়া-ছিলেন। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে সংসারই যদি শ্রেষ্ঠ আশ্রম, তবে শ্রী গৌরাঙ্গ নিজে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করি-লেন কেন? শ্রী গৌরাঙ্গ নিজের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, জীবকে হরি-নাম বিতরণের জন্য তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে হইয়াছিল। রূপ সনাতন প্রভৃতি কয়েক মহাত্মা বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারাও নিজের জন্য সংসার ত্যাগ করেন নাই।

শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ তৎ-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অস্ত্র স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাহারও দ্বারা লুপ্ত তীর্থোদ্ধার, কাহারও দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রচার প্রভৃতি কার্য্য সাধিত হইয়াছিল এবং সন্ন্যাস জীবনে মহা প্রভু স্বয়ং সংসার-বিরাগী সাধকদিগের আদর্শরূপে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। নচেৎ তিনি সংসার ত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন

না, বরং ধর্ম্মার্থীদিগকে সংসারে থাকিবারই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

বারান্তরে সংসারীদিগের কর্ত্তব্য বিষয় আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

আনি বেসাণ্ট।

আনি বেসাণ্টের সংক্ষিপ্ত জীবনী ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বিলাতের এক খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর গৃহিণী ও সহধর্ম্মিণী থাকিয়া ক্রমে কিরূপে ব্রহ্মবাদিনী হইলেন,তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখন এই অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ইংরাজরমণী হিন্দুজাতির সহিত একাত্মা ও একপ্রাণ হইয়াছেন এবং এই পতিত জাতির সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ও উন্নতির সহায়তা বিধানার্থ কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন। 'বিদ্যা সকল উন্নতির মূল, ইহা অনুভব করিয়া ইনি একটী আদর্শ মহাবিদ্যালয় স্থাপনার্থ উদ্যোগিনী হইয়াছেন এবং অল্পকালমধ্যে তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিছুদিন হইল কলিকাতার টাউনহলে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তির সম্মুখে ইনি এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তৎশ্রবণে আমরা অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। ইহাঁর অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইলে ভারতের বহু কল্যাণ সাধিত হইবে। হিন্দুমাত্রেরই ইহাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হওয়া এবং প্রাণপণে ইহাঁর কার্য্যের সহায়তা করা কর্ত্তব্য। আনি বেসাণ্ট কাশী মহানগরে একটী আদর্শ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কাশীর মহারাজা ইহার জন্য ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের এক বৃহৎ বাটী দান করিয়াছেন। ইহার জন্য একটী ফণ্ড সংস্থাপনার্থ অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। আনি বেসাণ্ট টাউন হলের বক্তৃতাতে বলেন কাশীতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এই যে ইহা হিন্দু জাতির একটী অতি প্রাচীন ও প্রধান তীর্থ স্থান; এখানকার বিদ্যালয় সকল হিন্দুরই সহানুভূতি, আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র হইবে; আর এই বিদ্যালয়ের আদর্শে ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। বিবি বেসাণ্টের শিক্ষার আদর্শ অতি উচ্চ ও উদার। তিনি মানব-প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ সাধন প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই শিক্ষা দ্বারা শরীর সুস্থ ও সবল হইবে এবং মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সমঞ্জস ভাবে সাধিত হইবে। ইনি হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র সকল হইতে সাধু দৃষ্টান্ত সকল সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদিগকে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দানে প্রয়াসী, কিন্তু কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক হিন্দুমত শিক্ষা দিবেন না।

যে সকল মত সকল শ্রেণীর হিন্দুর আদরণীয় ও গ্রাহ্য, সেই অসাম্প্রদায়িক সাধারণ হিন্দু মত ও ভাব সকল এবং হিন্দু সদাচার সকল তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের পরম হিতৈষিণী ইংরাজরমণীর শুভানুষ্ঠানে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি এবং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা জগদীশ্বরের নিকট ইহাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধির প্রার্থনা করিতেছি।

আনি বেসাণ্টের অভ্যর্থনার্থ কবিবর শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় যে অভিনন্দন-কবিতা রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে সাদরে প্রকটিত করিলাম।

জয়

তারা ব্রহ্মময়ী মা

কল্যাণী শ্রীমতী আনি-বেশান্ত-দেবী

করকমলেষু।

আশাজ্যোতিস্ত্বমসি খলু নো ঘোরদুঃখান্ধকারে
মাতর্বন্দ্যে সকলজগতামানি-বেশান্ত-দেবি !
শক্তিঃ সাক্ষান্মৃতজনগণোজ্জীবনী পাবনী ত্বং
সৃষ্টা নূনং সদয়বিধিনা ভারতোজ্জীবনায় ॥ ১॥

মা বিশ্বপূজ্যে দেবি ! আনি-বেশান্ত ! আমাদের গভীর দুঃখময় অন্ধকারে তুমি আশরূপ আলোক। বিধাতা আমাদের উপর সদয় হইয়াছেন, তাই তিনি এই মৃত ভারতকে পুনরায় জীবিত করিবার জন্য মৃতসঞ্জীবনী লোকপাবনী সাক্ষাৎ মহাশক্তি—তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ১

জাতা বংশে ত্রিদশমহিতে পূর্ব্বজন্মন্যভূস্ত্বং
ব্রহ্মর্ষীণাং ধরসি হি ততঃ পাবনং ব্রহ্মতেজঃ।
নো চেদ্বদেবাষয়সি নু কথং দেবি দেবর্ষিগীতং
পুণ্যং লোকেঽখিলনরগতিং শাশ্বতং ধর্ম্মতত্ত্বম্ ॥২॥

হে দেবি ! তুমি পূর্ব্বজন্মে দেবগণ-পূজিত ব্রহ্মর্ষি-কুলে জন্মলাভ করিয়াছিলে, সেই জন্যই তুমি জগৎপাবন ব্রহ্মতেজ ধারণ করিতেছ ; নহিলে, দেবর্ষিগণ যাহার মহিমা গান করিয়াছেন, সেই অখিলজীব-নিস্তারণ, সনাতন, পাবন, ধর্ম্মতত্ত্ব তুমি কিরূপে বিঘোষিত করিতেছ ? । ২ ।

সাক্ষাদ্ বাণী ত্বমসি বদনস্যন্দিতা বাক্সুধাস্তে
শ্রোতুস্তেজঃ কিমপি হৃদয়ে সদ্য উদ্দীপয়ন্তি।
ক্ষীণেঽপ্যাশার্চ্চিষি বত চিরং ভারতাভ্যুন্নতেস্তত্
চিত্তে চিত্তে জ্বলতি বচনৈর্ভূয়এব ত্বদীয়ৈঃ ॥ ৩ ॥

মা ! তুমি সাক্ষাৎ সরস্বতী, তোমার মুখচন্দ্র-বিনির্গত অপূর্ব্ব বচনসুধা শ্রোতার হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ কি এক অনির্ব্বচনীয় তেজ উদ্দীপিত করে! এ ভারত যে আবার সেই মহতী সমুন্নতি লাভ করিবে, আমাদের সে আশা প্রায় নির্ব্বাণ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার তেজোময় বাক্যে, সে আশা প্রত্যেকের হৃদয়ে আবার প্রদীপ্ত হইতেছে। ৩।

শিক্ষাবীজং জনগণহিতায়ার্য্যবিদ্যালয়াখ্যং
কাশীক্ষেত্রে বপসি যদহো সর্ব্বতীর্থোত্তমে ত্বম্।
তস্মাজ্জাতঃ শিবময়মহাপাদপো ব্যাপ্য বিশ্বং
কীর্ত্তিস্তম্ভস্তব হি ভবিতা ভাস্বরোঽনশ্বরশ্চ ॥ ৪॥

অহো ! তুমি ভারতবাসী আর্য্যসন্তান-গণের মহোপকারের জন্য, সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীক্ষেত্রে হিন্দুকলেজ নামে যে সুশিক্ষা-বীজ বপন করিতেছ, সেই বীজ-সম্ভূত মঙ্গলময় মহাবৃক্ষ অচিরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া, তোমার জাজ্বল্যমান

ও অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে পরিণত হইবে। ৪।

ভিন্নাচারা পরবিষয়জা ভিন্নভাষা বিজাতি-
র্যোষাহপ্যস্মজ্জনপদহিতে চেষ্টসেহশ্রান্তযত্না।
চিত্রং চিত্রং বয়মবিরতং বোধ্যমানাস্ত্বয়া যৎ
নোত্তিষ্ঠামোহশুভময়মহামোহতল্পাদ্ ধিগস্মান্॥ ৫॥

তুমি বিজাতীয়া ও বিদেশীয়া, তোমার বর্ণ, ভাষা আচার, প্রকৃতি, এ দেশীয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও এবং তুমি নারী হইয়াও, আমাদের দেশের মঙ্গলার্থে অবিশ্রান্ত যত্ন করিতেছ। তুমি আমাদিগকে স্বকর্ত্তব্য সাধনের জন্য নিরন্তর জাগরিত করিলেও, আমরা অশুভময় মোহ-শয্যা হইতে উত্থিত হইতেছি না। অহো! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমাদিগকে ধিক্। ৫।

মন্যেহস্মাকং ক্ষয়মুপগতা তামসী দুঃখরাত্রিঃ
কল্যাণি ত্বং নবরবিবিভেবোদিতা ভারতে তৎ।
হংহো লোকা ন খলু ভবতামেষ মৌনস্য কাল-
স্তামুদ্ধর্ত্তুং ত্রিভুবনস্তুতামার্য্যকীর্ত্তিং যতধ্বম্॥ ৬॥

আমাদের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্না দুঃখ-রজনীর বুঝি অবসান হইল; হে কল্যাণি! তাই তুমি ভারতাকাশে অরুণালোকের ন্যায় উদিত হইয়াছ। হে লোকবৃন্দ! তোমাদের এ সময় নীরব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার সময় নহে। প্রাচীন আর্য্যজাতির সেই ত্রিভুবনধন্য গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য তোমরা উত্থিত হও। ৬।

আচণ্ডালাখিলজনগণান্ বালবৃদ্ধাবলাদীন্
যাচে সর্ব্বান্ ধনবদধনজ্ঞানিমূর্খান্ নতোহহম্।
বিত্তৈশ্চিত্তৈস্তনুভিরসুভিশ্চাপি যূয়ং সমন্তাৎ
সাহায্যং ভোঃ কুরুত মিলিতা আনি-বেশান্ত-দেব্যাঃ॥৭

এ দেশের জ্ঞানী, গুণী, ধনী, মূর্খ, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত--বালক, বৃদ্ধ যুবা, পুরুষ, রমণী—সমস্ত লোককে আমি নতশিরে প্রার্থনা করিতেছি,—তোমরা সকলে সম্মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দেবী আনি-বেশান্তের সহায়তার জন্য—ধন, মন, দেহ ও প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ কর। ৭।

ন স্যাদীদৃক্ পুনরবসরঃ সার্থকীকর্ত্তুমর্থং
ভূয়োভূয়ঃ করুণবচনৈঃ প্রাঞ্জলির্বো বদামি।
আস্তে কাচিদ্ যদি হি মমতা লুপ্তভাগ্যে স্বদেশে
মা মা যূয়ং শুভমবসরং ব্যর্থমেতং কুরুধ্বম্॥ ৮॥

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বাক্যে বার বার তোমাদিগকে বলিতেছি,--তোমরা নিজ নিজ অর্থ সার্থক করিবার এমন সুযোগ আর পাইবে না। এই বিলুপ্ত-ভাগ্য জন্মভূমির প্রতি তোমাদের যদি বিন্দুমাত্র মমতা থাকে, তবে তোমরা এমন দুর্ল্লভ সুযোগ ব্যর্থ করিও না। ৮।

বিদ্যাহদ্য সা ব্যপগতা বিগতং যশস্তৎ
তন্নামশেষমধুনা সুকৃতং চ বীর্য্যম্।
দৃষ্ট্বা শ্মশানমিব শোচ্যমশেষদেশ-
মদ্যাপি হা কথমুদেতি ন চেতনা বঃ॥ ৯॥

হায়! আমাদের সে বিদ্যা ও সে কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে! আমাদের সে পৌরুষ ও সে পুণ্য এক্ষণে নামমাত্রে পর্য্যবসিত! সমস্ত ভারতবর্ষ আজি শ্মশানের ন্যায় শোচনীয়! জন্মভূমির এ দশা দেখিয়াও অদ্যাপি তোমাদের চেতনা হইল না!। ৯।

সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভা বিভবা ভবেহস্মিন্
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুচলস্বভাবাঃ।

পুণ্যং নৃণামিহ পরত্র চ বন্ধুরেকো-
নোচ্চৈঃ স্বদেশহিতসাধনতোঽস্তি পুণ্যম্ ॥১০॥

এ সংসারে ধন-সম্পদের শোভা, সান্ধ্য মেঘের শোভার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; মনুষ্য-জীবন, তৃণাগ্র-লগ্ন বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল। পুণ্যই মানবের ইহকালের ও পরকালের একমাত্র বন্ধু; স্বদেশের হিতসাধনের ন্যায় মহাপুণ্য আর কিছুই নাই। ১০।

পুরা যা ভূরেকাঽখিলভুবনশিক্ষাগুরুরভূৎ
পথভ্রষ্টা সেয়ং প্রলয়জলরাশিং প্রবিশতি।
অয়ে তারে মাতঃ পতিতজননিস্তারিণি শিবে!
পুমার্য্যাণাং ভূমাবিহ বিতর কারুণ্যকণিকাম্ ॥১১॥

* ॥"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ॥*

যে ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালে নিখিল জগতের ধর্ম্ম শিক্ষার অদ্বিতীয় গুরু ছিল, আজি সেই মহাদেশ আচার-ভ্রষ্ট হইয়া প্রলয়-সাগরের অতল সলিলে নিমগ্ন হইতেছে! মা গো! তারা ব্রহ্মময়ি! পতিত-নিস্তারিণি! সর্ব্বমঙ্গলা! তুমি এই আর্য্যভূমির উপর তোমার একবিন্দু কৃপা বিতরণ কর। ১১।

মুদ্রা-স্তোত্র।

হে শুভ্রবর্ণ রাজ্ঞী-মুখাঙ্কিত সাল সুশোভিত মুদ্রে! তোমায় নমস্কার। তুমি গঠনে ক্ষুদ্র হইলেও বিক্রমে বিক্রমাদিত্য অপেক্ষা বলীয়ান্, দীপ্তিতে দিবাকর অপেক্ষাও তেজোময়। ভূপতিগণ তোমার পূজা করে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তোমার আরাধনা এবং কৃষক তোমার চরণ সেবা করে। তুমি ধন্য! হে জগৎ-বিমুগ্ধকারী রজত-কান্তি টাকা, আপন বীণাবিনিন্দিত মধুর-স্বরে ত্রিভুবন ভুলাইয়া রাখিয়াছ। তুমি প্রলোভন দেখাইয়া দেশ দেশান্তর হইতে কত পঙ্গপাল আনিয়া ভারতক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছ। হে মনোমোহন সংসার-স্থিতি-বন্ধ-হেতু ক্ষুদ্রাবয়ব টাকা, তোমাকে নমস্কার।

হে বহুরূপী রজত-খণ্ড, তুমি কখন আপন স্বাভাবিক ধাতুতে অবস্থিতি কর, কখন কাগজরূপী হইয়া আবির্ভূত হও এবং কখনও সুন্দর সুবর্ণদেহে রূপান্তরিত হইয়া থাক। হে বহুমূর্ত্তে! তোমায় নমস্কার। অপর শ্রেণীর ব্যক্তি অপেক্ষা বণিক্ তোমার বিশেষ ভক্ত বলিয়া তাহাদিগের গৃহে তোমার গতিবিধি ঘন ঘন হইয়া থাকে। বাণিজ্য তোমার ঐশ্বর্য্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। তুমি বাণিজ্যের খাতিরে জলে জাহাজ ভাসাইয়াছ, স্থলে তাড়িতের তার দোলাইয়াছ এবং লৌহবর্ত্মে বাষ্পরথ ইঙ্গিতে ছুটাইতেছ। হে বাণিজ্যবর্দ্ধয়িত্রী সৌভাগ্য-লক্ষ্মী টাকা, তোমায় নমস্কার।

তুমি কাহাকেও হাসাইয়া থাক, কাহাকেও কাঁদাইয়া থাক, কাহাদিগের মধ্যে

আত্মীয়তার সূত্রপাত কর, কাহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদের বিষবৃক্ষ রোপণ কর। হে মায়াময়! তোমার মায়া বুঝে সাধ্য কার? তুমি পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইয়া থাক এবং বৃক্ষতলবাসী মোছাফেরকেও ছিন্ন কন্থায় শয়ন করাইয়া তোমার লক্ষাবয়বের স্বপ্ন দেখাইয়া উচ্চ সৌধ শিখরে তুলিতে পার। তুমি সাগরকে গোষ্পদ, হস্তীকে মশক, এবং ধরাকে সরা মনে করাইতে পার। অতএব হে মায়াবী বহুরঙ্গ-রূপী টাকা, তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

হে অধমতারণ পতিত পাবন, তুমি যাহাকে স্পর্শ কর, তাহার পাপ-রাশি বিদূরিত হইয়া যায়, তাহার কীর্ত্তি-মেখলায় বসুধা বেষ্টিত হইয়া পড়ে এবং সে গোজন্ম হইতে মনুষ্য জীবন, মনুষ্য জীবন হইতে দেবজীবনে আরূঢ় হয়। স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, শিশুহত্যা পিতৃমাতৃহত্যা, শত মহাপাতকের পাতকী হইলেও তোমার প্রভাবে মানব ত্রিভুবনপূজ্য হয়। হে মহাপাতকনাশন, মহাযশা ও পুণ্যকীর্ত্তি-ধ্বজ মুদ্রা, তোমাকে নমস্কার!

হে কল্পতরু, কামরূপ তোমার মন্দিরের দুয়ারে কতশত লোক অহরহ হত্যা দিতেছে। হায়! অনাহারে কত জনের দেহে অস্থিচর্ম্ম পর্য্যবসিত হইয়াছে, তুমি কাহার প্রতি প্রসন্ন নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বরদানে তাহার অভীষ্ট সাধন করিতেছ এবং কাহার প্রতি বিকট ভ্রূভঙ্গী করিয়া তাহাকে চক্ষুর জলে ভাসাইতেছ। সকলি তোমার লীলা! হে লীলাময়, তোমাকে নমস্কার।

তুমি আমেরিকায় সিলবর কিং, বিলাতে রথচাইল্ড এবং কলিকাতায় এজরা ও গব্বয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার।

তুমি সংসার আবর্ত্তে যাহাকে রাখ, সেই থাকে; যাহাকে ছাড়িয়া দাও, সে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় তলাইয়া যায়। যাহাকে রাখ, তাহার জন্য কত নূতন খেয়ালের সৃষ্টি কর, তাহাকে কত নব নব সুখ সম্পদের অধিকারী কর। তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় সকলি করিতে পার—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকল তোমাতে, তুমি এক তিন, তিনে এক। অতএব হে ত্রিমূর্ত্তে! তোমায় নমস্কার।

তুমি নব্য অপরিণামদর্শী যুবকের হস্তে যাইলে সে সরলপ্রাণ বয়স্যদিগের মজলিসে তোমার প্রতি যথেচ্ছাচার করিয়া তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। তুমি তখন মৃদুমধুর হাস্যে তাহাকে নানা ঐহিক সুখে বিভোর করিয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য করিয়া তোল। সে ক্রমশ সুখের কুসুম-শয্যায় গড়াইতে গড়াইতে উৎসেদের নরককুণ্ডে আসিয়া পড়ে। তুমি তখন তাহাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া যাও। অতএব হে যুবজনসুলভ বিলাসবিধাতা, সংসার রঙ্গ-ক্ষেত্রের রঙ্গপ্রদাতা, তোমায় নমস্কার।

তোমার জন্য কত শত লোক ব্যতি-ব্যস্ত, তাহা কে বলিতে পারে? বারিষ্টর,

উকিল, মোক্তার তোমার শ্রীমুখ দর্শন করিবার জন্য নানা বাক্‌পটুতায় তর্কজাল বিস্তার করিতেছেন, ডাক্তার রোগীদিগের বাটীর দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন, ইঞ্জিনিয়ার কাদা ধুলা মাখিতেছেন, বণিক্ দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই তোমার জন্য লালায়িত। অতএব হে সর্ব্বজন-বাঞ্ছিত টাকা, তোমায় নমস্কার।

হে অনাথের নাথ কাঙ্গালের গতি, পতিতপাবন, দীনবন্ধো, তোমায় নমস্কার। তোমার বিরহে সুখের ঘরে দুঃখের বাসা, হাসির মুখে বিষাদের রেখা, আনন্দের সংসারে নিরানন্দের মেঘ, উৎসাহের উৎসে নিরুৎসাহের আবিলতা, সুস্থশরীরে ব্যাধির মন্দির, সাহসের পদে ভয়ের সঞ্চার—এই সমস্তই ঘটিয়া থাকে, অতএব হে সংসারবন্ধো দীনতারণ, তোমায় নমস্কার।

তুমি সর্ব্বকাল সর্ব্বস্থানে বিরাজমান। লোকে জাগ্রত ও স্বপনে তোমায় ভাবিয়া থাকে ও তোমার সেবা করে। অতীত কাল তোমার জন্য লালায়িত, বর্ত্তমান তোমার জন্য ব্যতিব্যস্ত এবং ভবিষ্যৎ তোমার জন্য চিন্তিত। হে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালাধিপতি মুদ্রে তোমায় কোটি কোটি নমস্কার।

রথ বা মহাবোধিমহোৎসব।

রথ এ দেশের প্রধান উৎসব। এ পর্ব্বোপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের উল্লাসের সীমা থাকে না। কিন্তু রথযাত্রার প্রকৃত তাৎপর্য্য অনেকেই অবগত নহেন। এই হেতু এ প্রস্তাব তাঁহাদের আলোচ্য হইবে সন্দেহ নাই। রথের অর্থে শরীর, ইহাতে যানও বুঝায়, যাত্রা অর্থাৎ উৎসব। শরীরোৎসব রথ যাত্রার প্রকৃতার্থ ; গাড়ী টানা পর্ব্ব মনে করা উচিত নহে। বিবিধ চিত্রবিলেখিত, "সপ্তরত্ন" সমন্বিত, তুঙ্গ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট সচক্র যানই রথ। রথযাত্রা ঐতিহাসিক ব্যাপার, পৌরাণিক কল্পনা নহে।

"আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যাসংযুতা,
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মা ভদ্রয়াসহ।"

পুরুষোত্তম তত্ত্ব

আষাঢ়ীয় শুক্ল দ্বিতীয়াবধি সপ্তাহ পর্য্যন্ত রথোৎসব হয়। ইহার কারণ কি? জগন্নাথ দেবের অস্পষ্ট আকৃতি কেন? রথস্থ ত্রিমূর্ত্তির অর্থ কি? বস্তুত রথ-যাত্রার ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতীত তাহা জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। বঙ্গ দেশে সাধারণত রথসম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস পুরাণ শাস্ত্রানুগত। পৌরাণিক প্রসঙ্গ চিত্তাকর্ষক ও নীতিপ্রদ হইলেও ইহাকে সর্ব্বতঃ ঐতিহাসিক বর্ণনা বলা যাইতে পারে না। এইজন্য রথযাত্রা সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা হইলেও কল্পনা ও মিথ্যার আবরণে ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত উৎকল খণ্ডে এই পৌরাণিক উপাখ্যান উক্ত আছে।

একদা নৈমিষারণ্যে* মুনিগণ জৈমিনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনে! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, সকল তীর্থমাহাত্ম্য সবিশেষ অবগত আছেন। সকল তীর্থের সার পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ভগবান্ কিরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব কাহিনী সবিস্তর কীর্ত্তন করুন।" জৈমিনি বলিলেন, "আমি মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিবার জন্য মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। লোকনাথ মহাদেব শিখি-বাহনের নিকট যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, ষড়ানন দেবসভায় তাহা বলিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন সুন্দর কথা তোমাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে প্রজাপতি হইতে পঞ্চম পুরুষ সূর্য্যবংশ সমুৎপন্ন অবন্তীর অধিপতি পরম ধার্ম্মিক ও ন্যায়-পরায়ণ ইন্দ্রদ্যুম্ন নৃপতি একদা ইষ্ট দেবের পূজা করিবার জন্য বিষ্ণু মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় রাজপুরোহিত ও নানা তীর্থবাসিগণ উপস্থিত ছিলেন। পুরোহিতকে সম্ভাষণ করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয়! চর্ম্ম চক্ষুতে শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি, এমন পুণ্যতম মহাতীর্থ কোথায় অবস্থিত? পুরোহিত সমাগত তীর্থ-বাসী পণ্ডিত-গণকে ইঙ্গিত করিবা মাত্র এক সুবক্তা রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি বাল্যকালাবধি বহু তীর্থের ইতিবৃত্ত অবগত হইয়াছি। ভারত দক্ষিণ সমুদ্র তীরবর্ত্তী ওড্র নামে প্রসিদ্ধ দেশ আছে, নীলমাধব তথায় অবস্থিত। শাস্ত্রে উক্ত আছে ঐ স্থান ভগবানের বপুস্বরূপ। ধরাধামে এমন তীর্থ আর নাই। রাজা পুরোহিত বিদ্যাপতিকে নীলমাধবের অনুসন্ধান জন্য ওড্র দেশে প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাপতি বহুদেশ ভ্রমণ করত এক নির্জন অরণ্যময় পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তথায় ব্যাধগণের আবাস ছিল। সেই স্থানে বিশ্বাবসু নামে বৃদ্ধ শবর-পতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

"যত্রাস্তে আশ্রমশ্রেষ্ঠঃ খ্যাতঃ শবরদীপনঃ।
পশ্চিমস্যাং দিশি বিভো বেষ্টিতঃ শবরালয়ৈঃ।
দদর্শ শবরাগারং বেষ্টিতং সর্ব্বতো দ্বিজৈঃ।
ততো বিশ্বাবসুর্নাম শবরঃ পড়িতাঙ্গকঃ।
ইত্যাদি।

সেই বৃদ্ধ ব্যাধ ব্রাহ্মণ দর্শনে অতিমাত্র পুলকিত হইয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে নিজালয়ে আনয়ন করত যথোচিত আতিথ্য সৎকার করিল। বিদ্যাপতি শবর-পতিকে কহিলেন:—আমি নীল-মাধব মূর্ত্তি দর্শনার্থ বহুক্লেশ সহকারে এস্থানে উপনীত হইয়াছি। যদি সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি, তবেই গৃহে প্রত্যা-গমন করিব, নতুবা এ প্রাণ আর রাখিব না। ব্যাধ ব্রাহ্মণকে নীলমাধবের মন্দিরে লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা করিল। পরে এক সঙ্কীর্ণ পথে ব্রাহ্মণকে লইয়া চলিল।

তস্মাৎ একপদী মার্গো যেন বিষ্ণ্বালয়ং ব্রজেৎ।
যত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।"
উৎকলখণ্ড ৭ম অধ্যায়।

*নিমিষান্তর মাত্রেণ নিহিতং আসুরং বলং
যত্র ততস্তৎ নৈমিষং অরণ্যমিতি। নারদকল্পদ্রুম।

অনন্তর বিদ্যাপতি নীলমাধব দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। রাজা স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া ওড্র দেশে গমন-পূর্ব্বক তথায় এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞাবসানে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বলিলেন" রাজন্! ভারত মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে এক আশ্চর্য্য তরু উপনীত হইয়াছে। উহা অতীব বিস্ময়জনক। ঐ বৃক্ষ সূর্য্যের ন্যায় মহা তেজস্বী, উহার সৌগন্ধে সমুদ্র-কূল আমোদিত করিয়াছে। এরূপ আশ্চর্য্য তরু কেহ কখনও দর্শন করে নাই। বোধ হয় উহা দৈবতরু। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে ঐ বৃক্ষ এ স্থানে সমাগত হইয়াছে। রাজা ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্? এ মহাবৃক্ষ কি নিমিত্ত এ স্থানে উপনীত হইয়াছে?" নারদ কহিলেন, নরদেব! ইহা আপনার পরম সৌভাগ্যসূচক। স্বপ্নে যে মহাজ্যোতির্ম্ময় অনন্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, ইনিই সেই ভবভয়াপহারী,* আপনার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলস্বরূপ পরম করুণাপূর্ণ স্বয়ং বিধাতা দারু শরীর ধারণ করিয়াছেন। উহাতে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম ও সুদর্শন চক্র নির্ম্মিত হইবে। ঐ মূর্ত্তি দর্শনে মনুষ্য চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিবে। রাজা বলিলেন, ঐ মূর্ত্তি চতুষ্টয় কে নির্ম্মাণ করিবে? ঐ সময়ে দৈববাণী হইল, এক বৃদ্ধ সূত্রধর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইবে। দৈববাণী সফল হইল। বিশ্বকর্ম্মা বৃদ্ধ সূত্রধরের বেশ ধারণ করত জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও অচিন্তনীয় জ্ঞানরূপী সুদর্শন চক্র* এবং সিদ্ধ ও অমর-বৃন্দ-শোভিত রথ নির্ম্মাণ করিলেন। জগন্নাথ ও রথের উৎপত্তি এই-রূপ স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টা-বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত পুরুষোত্তম তত্ত্বে বলিয়াছেন,

"আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষং।"

ইহার সাংখ্যায়ণ ভাষ্য।

"আদৌ বিপ্রকৃষ্ট দেশে বর্ত্তমানং যদ্দারু দারুময় পুরুষোত্তমাখ্য দেবতা শরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপুরুষং নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপুরুষং।" তীর্থকাণ্ড কল্পতরু, বামণপুরাণ, অথর্ব্ববেদ।

ভগবানের শরীর জলে ভাসিয়া আসিয়া-ছিল, পুরুষোত্তম তত্ত্বেও বলিয়াছেন।

ভগবানের শরীর ভারত মহাসমুদ্র কূলে ভাসিয়া আসিয়াছিল, এ প্রবাদ শুদ্ধ পুরাণেই আছে এমন নহে। লঙ্কার মহাবংশ নামক পালী শাস্ত্রেও ঐ কথা উল্লিখিত আছে। তাহাতে লিখিত আছে, বুদ্ধ দেবের নির্ব্বাণ হইবার পরে কুশি নগরস্থ মল্ল নৃপতিগণ তাঁহার শব দাহ করিয়াছিলেন। শবদাহের পর চিতা ভস্ম, অস্থি ও অঙ্গার প্রভৃতি ওজন করিয়া অষ্ট দ্রোণ অর্থাৎ ৬৬ ছয় মণ

* উৎকল খণ্ড ১৬শ অধ্যায়।

*এ চক্রকে জ্ঞানরূপী বলিবার অভিপ্রায় কি? চক্র বুদ্ধের প্রতিরূপ, অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী রাজা।

ষোল সের হইয়াছিল।* পরে মল্ল নৃপতিগণ ঐ সমস্ত চিতাবশিষ্ট অস্থি, ভস্ম ও অঙ্গারাদি অষ্টভাগ করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে লইয়া গিয়া অষ্ট স্তূপ বা চৈত্য স্থাপিত করেন।†

রামগ্রাম এবং শ্বেত দ্বীপ এই উভয় স্থান হইতে মহা শরীর ভারত মহাসাগরে নীত হয়। এই উভয় প্রবাদের কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী মিথ্যা তাহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। বুদ্ধের অস্থি ও চিতাবশিষ্ট ভস্ম অঙ্গারাদির বিষয় ঐতিহাসিক, কিন্তু শ্বেত দ্বীপের শরীর বৃত্তান্ত আদৌ ইতিবৃত্তমূলক বোধ হয় না। জগন্নাথ দেব যে বিষ্ণুর শরীর শ্বেত দ্বীপের নির্ণয় না হইলে কিরূপে বিশ্বাস করিব? ইন্দ্রদ্যুম্ন সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, শবর কর্ত্তৃক সেবিত নীলমাধব মূর্ত্তি দর্শন জন্য তিনি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। নীল মাধবের আদি তত্ত্ব কি? ইংলণ্ডের অনুগ্রহে আমাদের চোক কান ফুটিতেছে, শারীরবল সঞ্চার না হউক, মাথা খেলিতেছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। ইহার বিচার করিতে পারিতেছি। নারদ সংবাদ যৎকালে রচিত হইয়াছিল, তখন রাহুল কুনাল, শুদ্ধোদন, মায়া দেবী কে? ত্রিপেটক

* ৩২ সেরে ১ দ্রোণ হয়।

† বুদ্ধের অস্থি শরীর বলিয়া অভিহিত হয়। শাস্ত্রে ইহাকে ধাতুও বলে। মহাযান সুবর্ণ প্রভাস গ্রন্থে উক্ত আছে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর ঐ শরীর ভূর্লোক এবং দেবলোকে পূজনীয় হয়। কাথালিকেরা বলেন—

"That to revere the relics of the saints, especially their bones and hairs, is not only no superstition, but is even acceptable to God.

Beauty of the Gospels p. 310.

বৌদ্ধ মতে, বুদ্ধের অস্থির পূজা করিলে জীবনের পরম উৎকর্ষ লাভ হয়। মহারাজাধিরাজ অশোক বুদ্ধের স্তূপ হইতে পুর্ব্বোক্ত অস্থি সংগ্রহ করিয়া তদুপরি ৮৪,০০০ সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রামগ্রামের স্তূপে বুদ্ধের যে সকল অস্থি ছিল, তাহা তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এতৎ সম্বন্ধে একটী অপূর্ব্ব গল্প আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ঐ স্তূপ গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত ছিল। স্রোতপ্রভাবে তাহা ভগ্ন হইয়া গঙ্গাগর্ব্ভে নিপতিত হয়। গাঙ্গেয় খর স্রোতে ধাতুপাত্র বা অস্থ্যাধার পরিচালিত হইয়া ভারত মহাসমুদ্রের রত্নোজ্জ্বল বেলায় নীত হইয়াছিল। সেই অস্থি হইতে পরিণামে জগন্নাথ দেবের উৎপত্তি হয়, ইহার সংশয়মাত্র নাই। উৎকলখণ্ডে বলিয়াছেন, শ্বেত দ্বীপ হইতে প্রভুর শরীর ভাসিয়া আসিয়াছে। প্রভুর শরীর শ্বেত দ্বীপে গেল কেন? মাদল পাঁজিতে লেখা আছে নাকি? শ্বেতদ্বীপ কোথায়? পুরুষোত্তম তত্ত্বের টীকাতে শ্বেতদ্বীপের উল্লেখই নাই। অগ্রে আপনারা এই দ্বীপটা কোথা স্থির করুন।

"The said, stupa, which stood at Ramagamo on the bank of the Ganges by the action of the current (in fulfilment of Budha's prediction) was destroyed. The casket containing the relics being drifted into the ocean stationed itself on the point where the stream of the Ganges spread into the opposite direction on encountering the ocean on a bed of gems dazzling by the brilliancy of their rays."

Pilgrimage of Fa Heau, 215.

বস্তুটী কি? কপিলবাস্তু কোথায়? বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘের প্রকৃত অর্থ কি?* এ সকল এদেশে দুর্জ্ঞেয় ছিল। সেই ঘোরতর অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে কৃষ্ণদাস নারদ সংবাদ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন জগন্নাথ দেব বুদ্ধেরই প্রতিরূপ। এ কিম্বদন্তির মূল কি?

"সিন্ধুতট নীলগিরিবর মধ্যে স্থাপনং।
ধন্য কীর্ত্তি ধন্য ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজনং।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শনঃ।
নমস্তে শ্রীবুদ্ধরূপং দেহি পদে শরণং।

নারদসংবাদ ৩৫।

নীলাচলটী তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইবার কারণ কি ছিল? কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন—

"অবশেষে অস্থি মম যে কিছু রহিবে।
ব্যাধগণে সেই অস্থি লইয়া যাইবে।
নীলগিরি মধ্যে মম করিবে স্থাপন।
নাম নীলমাধব কহিবে সর্ব্বজন।
সেই রূপ কিছুদিন থাকিব গোপনে।
যে রূপে প্রকাশ হব শুনহ শ্রবণে।
নীল গিরি মধ্যে অতি গোপনীয় স্থান।
ভূতে রাখিল কেহ না পায় সন্ধান।

নারদ সংবাদ ২৪।

কার অস্থি কে লইয়া যায়, ভাবিয়া দেখিবেন কি? আরও দেখুন—

এত বলি নারায়ণ হলেন অন্তর্দ্ধান।
বহু যত্নে রাজা মম পাইবে সন্ধান।
যত্ন করি আমারে আনিবে তথা হৈতে।
স্থাপন করিবে জলনিধির কূলেতে।
তদন্তরে শুনহ নারদ মহামুনি।
ঐ নিম্ব বৃক্ষ ভাসি আসিবে আপনি।
সেই কাষ্ঠে চারি মূর্ত্তি হইবে গঠন।
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
হেন মতে নীলাচলে বুদ্ধ অবতার।
হইল কহিল মুনি প্রকার তাহার।

নারদ সংবাদ ২৫।

অতঃপর—

"শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস।"

ইহাতে নীলাচলস্থ জগন্নাথ মন্দির বৌদ্ধ চৈত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না কি? উপরিউক্ত জনশ্রুতির কি বিশেষ কোনও কারণ নাই? যাহাহউক বিজ্ঞ পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমরা এ শাস্ত্রীয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া হয়ত অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করিব। (ক্রমশঃ)

প্রভাতী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শীতল চন্দ্রমার স্নিগ্ধ রশ্মি অভ্যুদয়ের কালে রঞ্জিত কৌষেয় বস্ত্রে প্রশস্ত বক্ষস্থল বিভূষিত করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন "অনিল! আমিত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে যে ব্যক্তি সংসার সৌন্দর্য্যে

মুগ্ধ হয়, সে দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দেয়। তোমার সঙ্গী বিষ্ণুপদ এখন সংসার হইতে অনেক দূরে গিয়াছে। সে যে স্থলে গিয়াছে, সে স্থলে সুখের মেলা, দেবতার খেলা। সেখানে কেবল পুণ্যের সরোবরে শান্তির স্রোত প্রবাহিত। বাছা দীর্ঘজীবী হউক।

অনিল কোন কথা কহিল না। তখন প্রভাতীর ইচ্ছায়, অনুরোধে ও আয়োজনে সন্ন্যাসী অনিলের সঙ্গে মধুমতীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। স্বামীর সহিত মধুমতীর বিবাহ হইয়া গেলে প্রভাতীর সেই বিষাদক্লিষ্ট গম্ভীর মুখের উপরে একটু হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কেন? তখন কি তাহার মনে এই বলিয়া গর্ব্ব হইয়াছিল যে সে অন্যের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য স্বামীরত্ন দান করিতে পারিয়াছে এবং স্বামীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এক সতিনী ঘরে আনিতে পারিয়াছে? না, তাহা নয়। স্বামীর পাশে মধুমতীকে দেখিয়া তাহার মনে একটু সুখের উদয় হইয়াছিল যে আজ প্রাণের সাথী মধুমতীর চিরদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল এবং প্রাণের প্রিয়তম স্বামীর মনোদুঃখও আজ দূর হইল। তখন প্রভাতী হৈমন্তিক প্রভাতবায়ু-বিকম্পিত পদ্মফুলের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর হস্ত ধরিয়া মধুমতীর হস্তে অর্পণ করিয়া কহিল "মধুমতি সখি! তুমিই যথার্থ নারীজন্ম ধারণ করিয়াছিলে।" এই কথাটি প্রভাতী পূর্ব্বেও একদিন মধুমতীকে বলিয়াছিল। বস্তুতঃ সে শৈশব কাল অবধিই মধুমতীকে ভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিত। তারপর স্বামীর পদধূলি লইয়া প্রভাতী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। বিদায়কালে যদিও তাহার চক্ষুযুগল অশ্রুশূন্য ছিল, তথাপি তাহার প্রাণের ভিতরটা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় তোলাপাড়া করিতেছিল। বিদায় লইয়া যাইবার সময় প্রভাতী অনিল ও মধুমতীকে বলিয়া গেল 'তোমরা এখন থাক, তোমাদের আপাততঃ যাইয়া কাজ নাই, কারণ তোমাদের বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়াছে। তোমরা দুইজন দুই বিভিন্ন জাতি, এখন হঠাৎ ইহা প্রকাশ হইলে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। আমি সময় বুঝিয়া জানাইব, তখন তোমরা দেশে ফিরিও।

অনিল কোনও কথা কহিল না। তখন তাহার কথা কহিবার শক্তিও ছিল না। কিন্তু মধুমতীর মলিন মুখের উপর একটী নিদারুণ ক্লেশের ছায়া পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখ খানিকে আরও সুন্দর—আরও মধুর করিয়া তুলিল। গোলাপ ফুল যেমন দল বিকশিত করে, মধুমতীও তদ্রূপ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সখীর কণ্ঠালিঙ্গন করিতে চাহিল। কিন্তু প্রভাতী স্বামীকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল, প্রাণের মধ্যে দারুণ অভাব অনুভব করিতে লাগিল। যেন আজ নিতান্ত

বিপন্ন, নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্ত নিরাশ্রয়। প্রভাতী প্রাণের শান্তি হারাইয়া শান্তি-ময়কে ডাকিতে ডাকিতে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া উপনীত হইল। সন্ন্যাসী তৎকালে ধ্যানমগ্ন ছিলেন না, প্রভাতীকে দেখিয়া কহিলেন "আজ তোমাকে এত উতলা দেখিতেছি কেন মা ?"

প্রভাতী কথা কহিল না। সন্ন্যাসী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন "নারীর পাতিব্রত্যধর্ম্ম উজ্জল অলঙ্কার। পতি-সেবাজনিত যে ধর্ম্ম, তাহাই অক্ষয়। কিন্তু স্বামীত চির কালের জন্য নয়, স্বামী-ধনত নশ্বর, ইচ্ছা করিলে বিধাতা আজই তোমার নিকট হইতে এ ধন কাড়িয়া লইতে পারেন। অতএব এ নশ্বর ধন দ্বারা যে তুমি অন্যের সুখ সম্পাদন করিতে পারিয়াছ, এ তোমার পক্ষে অতি সুখের হইয়াছে, তবে আজ তোমাকে এত উতলা দেখিতেছি কেন মা ?"

প্রভাতী। হাঁ বাবা, তুমি যাহা বলছ, সে সবি সত্য। আমি আজ তোমার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিতে এসেছি। তুমি আমাকে কিছু ধর্ম্ম কথা শুনাও।

সন্ন্যাসী। কি শুনিবে তুমি মা ?

প্রভাতী। এই পৃথিবীর বৃহৎ হইতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র সকলি কি অনন্তের অনুগৃহীত ?

সন্ন্যাসী। হাঁ, তিনি সকলেরই স্নেহ-ময় পিতা।

প্রভাতী। সকল কথার পূর্ব্বে আমাকে বল পাপীজন এবং পুণ্যবান্ সকলেই কি তাঁহার অঙ্ক-অধিকারী ?

সন্ন্যাসী। হাঁ, তিনি সকলেরই মুক্তি-দাতা।

প্রভাতী। এই সৃষ্টি কিরূপে হইল তাহা আমি জানিতে চাই, এবং কবেই বা লয় হইবে এবং লয় হইবে কি না হইবে, তাহা অধীনীর নিকট বর্ণনা কর।

সন্ন্যাসী। অনন্যমনে শ্রবণ কর। দেব মানবের সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইলে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের একবার মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে জ্যোতি, বায়ু ও পৃথিবী কিছুই থাকে না। সমুদয় প্রদেশই গাঢ়তর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। তৎকালে কি দিবস, কি রাত্রি, কি কার্য্য, কি কারণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই নিরীক্ষিত হয় না। কেবল ব্রহ্মস্বরূপ জলরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থায় অজর অমর ইন্দ্রিয়-শূন্য ইন্দ্রিয়াতীত অযোনিসম্ভূত সত্যস্বরূপ অহিংসক চিন্তামণিস্বরূপ প্রবৃত্তিবিশেষ-প্রবর্ত্তক সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্রষ্টা ঐশ্বর্য্যাদি গুণের একমাত্র আশ্রয় প্রকৃতি হইতে অবিনাশী নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন। শ্রবণ কর মহাপ্রলয়কালে কি দিবস, কি রজনী, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না। কেবল প্রকৃতিই বিরাজিত ছিলেন। তিনিই বিশ্বরূপ নারায়ণের জননীস্বরূপ। অনন্তর সেই প্রকৃতিসম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মার উদয় হইল। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি

করিবার অভিলাষ করিয়া লোচনযুগল হইতে অগ্নি ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ বিভাগ কল্পিত হইল।"

তখন সন্ন্যাসীর কথায় বাধা দিয়া প্রভাতী যোড়হাত করিয়া কহিল, "প্রভু! দাসীর ধৃষ্টতা মাপ কর। আমি আর এ সব কিছুই শুনিতে চাই না। এ সব শুনিয়া আমার কিছু ফল নাই— শান্তি নাই। প্রভু! ছোট বেলা হইতে ত শুনিয়া আসিতেছি বার বৎসরে এক যুগ উত্তীর্ণ হয়, তাই কি সত্য যুগের সময় বিভাগ? আমার নিকট বর্ণনা করিয়া কৌতূহল নিবারণ কর।"

সন্ন্যাসী। যে সময় সমস্ত পুরাণ ধর্ম্ম লয় প্রাপ্ত হয়, সমস্ত পুরাণ মানবের ধ্বংস হয়, সমস্ত পুরাণ দ্রব্যের ক্ষয় হয়, পূর্ব্বের কিছুই থাকে না, সমস্তই নূতন হইয়া দাঁড়ায়, সেই সময়কে এক যুগ অন্তে অন্য যুগ আসিয়াছে কহে অর্থাৎ সময়ের ঘোর পরিবর্ত্তনকে যুগান্ত কহে।

প্রভাতী। পঞ্চভূত কি কি?

সন্ন্যাসী। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

প্রভাতী। না, এ সব জানিয়া আমার শান্তি নাই। আমায় বিদায় দিন্।

সন্ন্যাসী। মা তুমি মর্ত্ত্যলোকের মানবী হইয়া স্বর্গলোকের দেবীর ন্যায় কাজ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সর্ব্ব দুঃখ ও অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর।

প্রভাতী। প্রভু, আমি কেমন করিয়া এ সমস্ত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব?

সন্ন্যাসী। তাহা আমি কহিব না, ভগবান্ ইহার নিরাকরণ করিবেন। যাও তুমি বৎসে! এই পর্ব্বতের একটী গহ্বর-অভ্যন্তরে একজন পক্ককেশা বৃদ্ধার দেখা পাইবে। তাহার কাছে যাও, তিনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবেন।

প্রভাতী সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় ও বরালিকার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল। পথিমধ্যে সে এত বিহ্বল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, অবশেষে তাহাকে সেই বৃদ্ধা দেবীর অঙ্কশায়িনী হইতে হইয়াছিল।

আমার ভ্রমর।*

১

আমার ভ্রমর—
তোমরা ভেব না কালো,
সে যে আঁধারের আলো,
পারিজাতে শুয়ে ছিল রাঙা মধুকর,
কে জানে কি ভালবেসে,

*ভ্রমর—পাঁচ মাসের শিশু।

মরতে পড়েছে এসে,
পুষেছি গরিব আমি প্রাণের ভিতর;
"কালামুখো অলি" নহে আমার ভ্রমর

২

আমার ভ্রমর—
মন্দার পাতিয়া কোল,
সদা তারে দি'ত দোল,
মুছা'ত গায়ের ঘাম নিজে শশধর,
সমীরণ চুপে চুপে,
ঘুম দিত কোনরূপে,
স্বরগ-পাপিয়া তারে শিখাইত স্বর,
সেই আদরের ধন, আমার ভ্রমর।

৩

আমার ভ্রমর—
মোর সে অমূল নিধি,
হাসি'তে গড়িলা বিধি,
তাই সে যে হাসি-মাখা আছে নিরন্তর,
চাঁদের সুধার সম,
তার হাসি মনোরম,
তা' দেখি বিভল হয় মানব-অন্তর,
সোণার পুতুল মোর সাধের ভ্রমর।

৪

আমার ভ্রমর—
সবারি আশীষ চায়,
তোমরা বলিও তায়,
থাক্ তার প্রাণ যুড়ি বিধাতার বর,
মা বাপের কোল যুড়ে,
থাক সে আনন্দপুরে,
সিত পক্ষ শশি-সম হোক নিরন্তর;
জগত হৃদয় খুলে—
—তার শিরে দিতে তুলে—
স্নেহাশীষ, প্রীতিধারা—হোন অগ্রসর;
হোক সে বিভুর দাস,
পূর্ণ হোক শুভ-আশ,
সুকীর্ত্তি করুন তারে অজর অমর,
মানুষ করুন বিধি আমার "ভ্রমর"। মা।

আত্মসংযম।

(৪০৭ সংখ্যা—২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

৫ম—আত্মাদর। আত্মপ্রীতি হইতেই আমাদিগের আত্মাদর প্রবৃত্তির বিকাশ। সংসারের অনেক হীনতা ও নীচতা হইতে, আত্মাদর প্রবৃত্তি মানবকে রক্ষা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির প্রকৃত আত্মাদর আছে, সে ব্যক্তি আপনাকে সহজে কোনও নীচ কার্য্যে লিপ্ত করিতে পারে না। "আমি এমন সদ্বংশে জন্মিয়াছি"—অথবা "আমি এত সুশিক্ষা পাইয়াছি"—অথবা "আমি ক্ষুদ্র হই, নীচ হই, মূর্খ হই, আমিও সেই দেবাদি-দেব ভগবানের সন্তান; আজি একটা রিপুর উত্তেজনায় আমি এত দূর জঘন্য কাজ করিব, কি করিয়া?" এইরূপ চিন্তা আমাদের জীবনের বর্ম্মস্বরূপ হইয়া থাকে। সে কালের অর্জ্জুন হইতে একালের গ্লাডষ্টোন পর্য্যন্ত যে কোনও মহাত্মার জীবনী আলোচনা করিলে

তাঁহাদিগের আত্মাদরের উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়। মহত্ত্বের উপাদানস্বরূপ আত্মাদর প্রবৃত্তিকে আমরা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলিতেছি এই. জন্য যে, এই প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া বিকৃত হইলেই "অহঙ্কার" নামক দুর্জ্জয় রিপু হইয়া থাকে।

অহঙ্কার ভিতরে প্রবেশ করিলে, আপনার বিশেষত্ব লইয়া মানব অস্থির হইয়া যায়। যে পরিমাণে নিজের রূপ, গুণ, ধন, যশ লইয়া সে উন্মত্ত হয়, সেই পরিমাণে তাহার প্রকৃত অবনতি সাধিত হইতে থাকে। সকলেই জানেন, মানব-জীবন বহু ত্রুটিপূর্ণ, সেই সকল ত্রুটি বুঝিয়া, তাহা সংশোধন করাই মানবের উন্নতির সোপান; তাহাই মানবের মনুষ্যত্ব লাভের এক প্রধান উপায়। ত্রুটি বুঝিতে হইলে আত্মদোষানুসন্ধান আবশ্যক। কিন্তু যে অহঙ্কারী, সে এক-দেশ দর্শী; নিজের দোষানুসন্ধান দূরে যাউক, গুণ বা ক্ষমতার গর্ব্বেই সে মত্ত; তাহার নিজের কোনও দোষের বিষয় সে নিজেও বোঝে না, যদি অন্য কেহ—এমন কি তাহার পরম বন্ধুও সে কথা বুঝাইতে চাহে, তাহার প্রতিও খড়্গহস্ত হয়। সুতরাং তাহার ত্রুটি ও দোষ সকল ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার নীচতা সাধন করে। আবার এ জগতে অহঙ্কারী ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধুবান্ধবশূন্য হয়; সে কাহাকেও নিজের "সমকক্ষ ব্যক্তি" মনে করে না; পক্ষান্তরে মানব-হৃদয় সকলকে আপনার করিতে চাহে, কিন্তু অহঙ্কারী লোককে সহানুভূতি করিতে চাহে না। অহঙ্কারী ব্যক্তি প্রীতি-মমতা-শূন্য, কারণ তাহার হৃদয় পরেতে মিশিতে জানে না; অহঙ্কারী এ জগতে সুখশান্তিশূন্য, কেননা সে জগতের বাজারে আপনার গুণ বা গৌরব বেচিয়া যে অনন্যদুর্ল্লভ যশঃ কিনিতে ব্যতিব্যস্ত, তাহার কোন দিকে একটু ক্ষতি অনুভব করিলেই সে মরমে মরিয়া যায়!—আহা, অহঙ্কারী কি কৃপা-পাত্র। এমন রিপুর হস্ত হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এ জগতে রূপ, ধন, যশঃ প্রভৃতি হইতে মানবের অহঙ্কার জন্মিয়া থাকে। সুরূপ রূপ লইয়া অহঙ্কার করেন, সুকবি তাঁহার কবিত্ব-শক্তির, সুবক্তা তাঁহার বক্তৃতা-শক্তির, ধনী তাঁহার প্রভূত ধন-রাশির অহঙ্কার করেন।—যিনি যে সৌভাগ্য অধিকতর প্রাপ্ত হন, তাঁহার তাহা হইতে অহঙ্কার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রতীত হয় যে, যিনি ভগবান্ হইতে যত দূরে, তাঁহারই মনে অহঙ্কারের ভাব তত বেশী। যিনি সকল কার্য্যের ভিতরে ভগবানের হস্ত দেখিতে পান, তিনি জানেন সৌন্দর্য্য, কবিত্ব, বক্তৃত্ব, ঐশ্বর্য্য এ সব কিছুই আমার নিজের আয়ত্তাধীন নহে; সেই অদৃশ্য দেবতা তাঁহারই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য এই সব আমাকে দান করিয়াছেন, অতএব তাঁহারই জিনিস

লইয়া, তাঁহারই অন্যান্য সন্তানদিগকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিবার আমি কে?" এইরূপ চিন্তাতেই মানবের অহঙ্কার চূর্ণ এবং মন বিনীত হইয়া থাকে।

আত্মোৎকর্ষের আলোচনা, নিজের সৌভাগ্য বা শ্রেষ্ঠতার সুখ্যাতি শ্রবণ, অহঙ্কারের সোপানস্বরূপ। অতএব সেই সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া পরের গুণের প্রতি মনোযোগ করা আমাদের কর্ত্তব্য। পরের গুণের প্রতি আমরা যতই আকৃষ্ট হইতে পারিব, আমাদের অহঙ্কারের ভাবও ততই দূর হইয়া যাইবে। সেই জন্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মাদিগের পুণ্যময় চরিত হইতে প্রত্যেক সাধারণ ব্যক্তির সদ্‌গুণ আলোচনা করাও আমাদের কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, আমরা যাহাকে সামান্য ব্যক্তি বলিয়া উপেক্ষা করি, সে ব্যক্তির এমন কোনও সদ্‌গুণ আছে, যাহাতে আমরা তাহার অনেক নিম্নতলে রহিয়া গিয়াছি। যাহা হউক এইরূপে পরের গুণ গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের গুণগ্রাহিতা শক্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে, অহঙ্কার রিপু দূর হইয়া আত্মাদর বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, আমরা মনুষ্যত্বের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিব। (ক্রমশঃ)

হিন্দু নীতি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

৫০। গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবেন।

৫১। কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক।

৫২। সন্তান হইলে পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও সে ঋণ পরিশোধ করা যায় না। অতএব সন্তান প্রাণপণে পিতা মাতার সেবায় যত্ন করিবেক।

৫৩। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, কনিষ্ঠ সন্তান তুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র কন্যা স্বীয় শরীরের ন্যায়, আর দাসবর্গ ছায়া স্বরূপ। ইহাদের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক।

৫৪। পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, তাহা শ্মশানতুল্য।

৫৫। পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী। সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেক।

৫৬। পুরুষ সর্ব্বাবয়বসম্পন্না সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধিসম্মত পত্নী নহে। স্ত্রী-রত্ন দুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করা যায়।

৫৭। কন্যা যতদিন পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্মশাসন

অজ্ঞাত থাকে, ততদিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।

৫৮। যে স্ত্রী যাদৃক্ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধিপূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণ প্রাপ্ত হয়।

৫৯। দক্ষতা, সন্তান, সম্পত্তি, সাধ্বীত্ব, প্রিয় বচন এবং পতির আনুকূল্য, এই সকল গুণযুক্ত ভার্য্যা স্ত্রীরূপধারিণী লক্ষ্মী।

৬০। যে কুলে অপস্মার (মৃগী) রোগ, ক্ষয়রোগ, অথবা কুষ্ঠ রোগ আছে, বিবাহ সম্বন্ধে সে সকল কুল পরিত্যাজ্য।

৬১। রোগহীনা, ভ্রাতৃমতী, সৌম্য-বদনা, মৃদুভাষিণী এবং আপনার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবেক।

৬২। হীনাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, অতিদীর্ঘা, অতিকৃশা, লোমহীনা এবং অতিলোমা এবং যাহার কেশ কৃষ্ণবর্ণ এই সকল কন্যাকে বিবাহ করিবেক না।

৬৩। কুলহীনা কন্যাকে বিবাহ করিবেক না। সদ্বংশজাত, সদাশয়া ও সুলক্ষণা কন্যা পতির আয়ু যশ এবং সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধির কারণ হয়।

৬৪। সন্তান উৎপত্তির জন্য স্ত্রী সকল বহু কল্যাণপাত্রী এবং আদরণীয়া। স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

৬৫। স্ত্রী পুরুষ মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; সংক্ষেপে তাহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে।

৬৬। যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারে নিশ্চিত কল্যাণ।

৬৭। যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ লাভ করেন।

৬৮। সেই ভার্য্যা, যিনি পতিপ্রাণা; সেই ভার্য্যা, যিনি সন্তানবতী এবং সেই ভার্য্যা, যাঁহার মন বাক্য এবং কর্ম্ম শুদ্ধ এবং যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী।

৬৯। ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনু-গতা এবং সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম-সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্টা থাকিয়া গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন।

৭০। কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না, এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে স্বামীর বিরোধিনী হইবেন না।

৭১। স্ত্রীরা স্বামীদিগের বাক্য প্রতি-পালন করিবেন। স্বামী সদাচারা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হন।

৭২। স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশেষরূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃকুল, মাতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল সকলেরই শোকের কারণ হয়।

৭৩। বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা

অরক্ষিতা।. যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।

৭৪। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী স্বরূপ,আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূ স্বরূপ।

৭৫। পতি হীনচরিত্র এবং নির্গুণ হইলেও সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা করিবেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিবেন।

৭৬। বেদিয়া যেমন গর্ত্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করিয়া লয়,সতী স্ত্রী সেইরূপ পাপ-কূপ হইতে স্বামীকে উদ্ধার করিয়া উভয়ে মিলিয়া ইহকালে পবিত্র সুখ ও পরকালে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করেন।

৭৭। যে গৃহে নারীগণ পূজিতা হন, সেই গৃহে দেবতারা আনন্দ করেন। যে গৃহে নারীদিগের সমাদর নাই, তথায় সকল ক্রিয়া নিষ্ফল।

৭৮। দম্পতীর পরস্পর আনুকূল্য ত্রিবর্গ প্রাপ্তির হেতু। পত্নী যদি সাধ্বী ও অনুকূলা হয়, তবে সংসারাশ্রম অপেক্ষা ধর্ম্মসাধনের আর স্থান নাই, এবং স্বর্গে প্রয়োজন কি? আর পত্নী যদি অসতী ও প্রতিকূলা হয়, তবে তদপেক্ষা নরকভোগ আর কি আছে?

৭৯। সন্তান প্রসবে ও সন্তান প্রতি-পালনে যাহাতে ব্যাঘাত না হয়, তদ্বিষয়ে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই অপ্রমত্ত হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

৮০। নারী বিধবা হইলে মৃত পতি ও ইষ্টদেবতাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবেন, বিলাস ও বেশভূষা পরিত্যাগ করিবেন, আশ্রয়-কুলের হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবেন এবং আশ্রয়দাতা গৃহস্বামীর অনুমতি লঙ্ঘন করিয়া কোনও কার্য্য করিবেন না।

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বরের নামাবলী।

অনন্ত মহিমাময় বিশ্বপতির কোনও নাম ও উপাধি নাই, অথচ তাঁহার অনন্ত নাম জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। ভক্তগণ হৃদয়ের এক এক ভাব লইয়া তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন। কবি ও ভাবুকগণ তাঁহার এক এক গুণের বিষয় চিন্তা করিয়া এক এক নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। ঈশ্বরের নামের অনন্ত মহিমা এবং নামের গুণে ধর্ম্মরাজ্যে অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়াছে। নামের গুণে অনেক অস্পৃশ্য মহাপাতকী উদ্ধার পাইয়া পুণ্যজীবন লাভ করিয়াছে। নামের গুণ এইরূপে কীর্ত্তিত হয়—"নামে অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবায় গীত গায়, বধিরে শুনে! নামে পাষাণ গলে, মরা মানুষ বেঁচে উঠে।" ঐহিক ভাবে এরূপ অলৌকিক কার্য্য সম্ভব না হউক, আধ্যাত্মিকভাবে ইহা যে পরম সত্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের নামে

অজ্ঞানান্ধ জীব জ্ঞানচক্ষু পাইয়াছে, গতিশক্তিহীন সদগতি লাভ করিয়াছে, পাপে মৃত ব্যক্তি নবজীবনে পুনর্জীবিত হইয়াছে; অকৃতী অধম লোক অত্যদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে।

সকল ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মাই নামের মাহাত্ম্য শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নামে জীবের পরিত্রাণ এই উপদেশ দিয়া অবিশ্রান্ত ইষ্টনাম জপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে যে প্রার্থনার আদর্শ দিয়াছেন, তাহার প্রথমেই আছে:—"Our Father which art in heaven, hallowed be thy name" হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা! তোমার নাম ধন্য হোক।" ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যদেব বলিয়াছেন, "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম, কেবল হরিনাম; কলিযুগে মুক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই। মহাপ্রভুর মতে জীবে দয়া ও নামে ভক্তি ধর্ম্মসাধনের এই দুইটী প্রকৃষ্ট উপায়। কবীর বলেন "রাম নাম সত্য।" বাবা নানক নামের আশ্চর্য্য গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন "হে প্রভো, তোমার নামের এমনি গুণ যে, তাহার প্রভাবেই লোকে আমার ন্যায় নির্গুণ লোককে পূজা করিতে আইসে।" বিশ্বাসী মহম্মদ বলিয়াছেন "ঈশ্বরের নাম লইয়া অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর।" মুসলমান সাধুরাও হিন্দুদিগের ন্যায় জপমালার সহিত ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধগণ যে নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের মধ্যেও সিদ্ধ মহাত্মাদিগের নামজপের বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে। ঈশ্বরের অষ্টনাম, দশনাম শতনাম, সহস্র নাম, কবিতাবদ্ধ করিয়া কত স্থানে কত ভক্ত আবৃত্তি ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা আত্মার শান্তি ও কল্যাণ অনেক পরিমাণে লাভ করিয়া থাকেন। যেন তেন প্রকারেণ ঈশ্বরের নাম সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে পারিলে জীবের কল্যাণ। এ নিমিত্ত কেহ কেহ দেহ নামাঙ্কিত করেন, কেহ নামাবলী বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া রাখেন। নাম মহামন্ত্র, ইহার স্মরণে অন্তরের বাহিরের দুর্জ্জয় রিপু সকল পরাস্ত হয়, মহাশক্তি লাভ হয়। নাম অভ্যাস করিবার জন্য জপ, তপ, ধ্যান, ধারণার কত প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে! নাম সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয় হইলেও সরল বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ইহা লইতে হয়, তবে সুফল লাভ হয়। অশ্রদ্ধা বা ঔদাস্যভাবে নাম করিলে নামাপরাধ হয়, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

আমরা ভগবদ্ভক্তগণের স্মরণের সহায়তার জন্য অকারাদি বর্ণ ক্রমে নামের যে একটী ক্ষুদ্র তালিকা করিয়াছি, তাহা বামাবোধিনীতে ক্রমে প্রকাশ করিব। ইহা ভগবানের গুণবাচক, সুতরাং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইবে, আশা করা যায়। এ স্থলে বক্তব্য ঈশ্বর মানুষের ন্যায় পুরুষ, স্ত্রী বা নপুংসক

নহেন অথচ মানব ভাষার শব্দ সকল পুং, স্ত্রী বা ক্লীববাচক। এইজন্য তাঁহার পর্য্যায়ে আমরা নানা স্থলে নানা লিঙ্গের শব্দ ব্যবহার করিব, আর স্থানে স্থানে বিদেশীয় ভাযোক্ত নামেরও অনুবাদ দিব, তাহাতে কেহ আপত্তি না করেন এই প্রার্থনা। শব্দের প্রকৃত ভাব লইলেই প্রকৃত বস্তুর সহিত পরিচয় হইবে

অকারাদি বর্ণ ক্রমে ঈশ্বরের নামাবলী।

অ, অউ ম (ওঁ-স্বৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, কর্ত্তা), অকম্পন, অকর্ণ, অকলঙ্ক, অকল্মষ (অপাপ), অকায়, অকারণ, অকাল, অক্ষর, অক্ষয়, অকিঞ্চন-ধন, অকিঞ্চনগুরু, অকিঞ্চননাথ, অকূল-কাণ্ডারী, অকৃতিজননী, অখণ্ড, অখিল-পতি, অখিলগুরু, অখিলতারণ, অখিল-নাথ, অখিলপিতা, অখিলমাতা, অখিল-বন্ধু, অগতির গতি, অগম্য, অগোচর, অঘনাশন, অঘোর (শান্ত), অঙ্গবিহীন, অচঞ্চল, অচলশরণ, অচিন্ত্য, অচ্যুত, অচ্যুতানন্দরূপ, অচক্ষু, অছিদ্র (দোষ-শূন্য), অজ, অজয়, অজর, অজ্ঞেয়, অটল, অণোহরণীয়ান্, অণুভ্যোহণু, অতল, অতনু, অতিদ্বয় (অদ্বিতীয়), অতিমহান্, অতিমহাপাতকনাশন, অতিসুন্দর, অতীন্দ্রিয়, অতুলন, অত্যদ্ভুত, অদীর্ঘ, অদৃষ্ট, অদ্বয়, অদ্বিতীয়, অদ্বৈত, অদ্ভুতকর্ম্মা, অধর (যাঁহাকে ধরা যায় না), অধিষ্ঠাতা, অধমতারণ, অনতিমহান্, অনাদি, অনন্ত, অনন্তবাহু, অনন্তশীর্ষ, অনি-র্ব্বচনীয়, অনণু, অন্ত, অন্তরঙ্গ, অন্তরতর, অন্তরতম, অন্তরাত্মা, অন্তর্যামী, অনাথনাথ, অনাথবন্ধু, অনাথশরণ, অনুত্তম, অনিকেত, অন্ন-পূর্ণা, অন্নদা, অন্তিমশরণ, অপরব্রহ্ম, অপরাজিত, অপরাধভঞ্জন, অপরূপরূপ, অপাণিপাদ, অপাপবিদ্ধ, অপূর্ব্ব, অপার, স্বপ্রকাশ, অপ্রতিম, অপ্রতিহততেজঃ অবাক্, অবদ্ধ, অবাধ, অবর্ণ, অবাঙ্মনসো-গোচর, অবিনাশী, অব্যক্ত, অব্যয়, অভয়, অভাজনবন্ধু, অভাবনীয়, অভিভাবক, অভিরাম, অভীষ্টফলদাতা, অমনা, অমর, অমরবন্দন, অমৃত, অমৃতানন্দরূপ, অমূর্ত্ত, অমোঘ, অম্বক, অম্বা, অম্বিকা, অম্লান, অযোনি, অযোনিজ, অযোনিসম্ভব, অযোধ্যা, অয়নাধীশ, অরজঃ, অরিসূদন, অরিষ্টসূদন, অরূপ, অর্ঘ্য, অর্চ্চিমৎ, অর্থপতি, অর্হণীয়, অলক্ষ্য, অলখনিরঞ্জন, অলজ্ঘ্য, অলৌকিক, অশব্দ, অশেষ, অশেষগুণধারী, অশোক, অশ্রোত্র, অসঙ্গ, অসাধারণ, অসীম, অস্তুত, অস্নাবির, অস্পর্শ, অস্বপ্ন, অসংখ্যনামা, অহিংসক, অহেতুক, অহিতনাশন, অংশ-হীন, অংশিহীন (লা-সরিক)।

(ক্রমশঃ)।

সতীর হাট।

(উদ্ধৃত)

মেদিনীপুর সহরের ৮ ক্রোশ দক্ষিণে ভদ্রকালী ও অলঙ্কারপুরের নিকটে "সতীর হাট" নামে এক বিখ্যাত হাট আছে। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার এই হাটে ৪।৫ হাজার লোক সমাগত হইয়া থাকে। এখানে নানাপ্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়। অনেক বিদেশীয় ক্রেতা এখানে উপস্থিত হইয়া মেদিনীপুর-জাত মাদুরাদি দ্রব্য ক্রয়পূর্ব্বক কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে চালান দেন। এই হাটের নাম "সতীর হাট" কেন হইল? এই বিষয়টী অনুসন্ধান করায়, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাহা বলিলেন—তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

পূর্ব্বে এই ভদ্রকালীর নিকট দিয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইবার পথ ছিল। সে অনেক দিনের কথা। তখনকার সেই পুরাতন পথের অল্প অল্প চিহ্ন ও বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশ হইতে শত শত ব্যক্তি এই পথে যাতায়াত করিত। প্রাচীনকালের পথ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় নিরুপদ্রব ছিল না। তখনকার পথের উভয় পার্শ্ব বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই সকল দুর্গম স্থানে যেমন হিংস্র শ্বাপদ জন্তু, তেমনি অধিকতর হিংস্র দস্যু তস্করাদি আশ্রয় করিয়া থাকিত এবং সুযোগ বুঝিয়া পথিকগণের উপর আক্রমণ করিত; তথাপি জগন্নাথ দর্শনার্থিগণের গমনাগমনের বিরাম ছিল না। "জয় জগন্নাথ" বাক্যে দশদিক্ মুখরিত করিয়া, প্রভুর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, অসংখ্য নরনারী আনন্দে কাতারে কাতারে এই পথে চলিত।

সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় এক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক এই পথে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে একদল দস্যু এই স্থানে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। দুরাচার দস্যুগণ ব্রাহ্মণের জীবন বিনষ্ট করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্বাপহরণ করে। সাধ্বী ব্রাহ্মণপত্নী কতই অনুনয়ে ও কাতর-বাক্যে পতির প্রাণ ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় দুরাচার দস্যুগণ কর্ণপাত করিল না! যখন পতির মৃত্যু হইল, তখন সতীর জীবনে আর ফল কি? তিনি দস্যুগণের নিকট কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন, তোমরা স্বামীকে হত্যা করিয়াছ, আমারও প্রাণ বিনাশ কর।

দুরাত্মারা প্রস্থান করিল। সতী পতির মৃতদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সাবিত্রীর ন্যায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। বিধুরা ব্রাহ্মণ-বালার বৈধব্য রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল।

ক্রমে ক্রমে দুই দশ জন করিয়া চারিদিক্ হইতে সকলে সমাগত হইল। যাহারা পুরুষোত্তম যাইতেছিল, তাহারাও স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সতীর নয়নে অশ্রু নাই—মুখে হাহাকার নাই—বদনে কাতরতা নাই; সে একভাব—সে ভাব বর্ণনার অতীত, ভাষার অতীত, বাক্যের অতীত।

সতী সমাগত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপ সব, তোমরা আমার সন্তান, অভাগিনী আমি, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে; তোমরা আমার মুখ চাহিয়া, একটী চিতা সাজাইয়া দাও—সন্তানের কাজ কর।"

সতীর বচন শুনিয়া কেহ মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কেহ ধূলায় লুটিতে লাগিল—কেহ হাহাকার করিতে লাগিল। অপার বিষাদ-সিন্ধু যেন সতীর বচনরূপ ঝটিকায় সদম্ভে স্ফীত হইয়া উঠিল!

যথাসময়ে চিতা প্রস্তুত হইল। রক্তবস্ত্র পরিধান—ললাটে সিন্দূর—গলায় ফুলহার, এই অপরূপ রূপে দশদিক্ আলো করিয়া সতী চিতারোহণ করিলেন। দশমীর বিসর্জ্জন শেষ হইলে বালকগণ যেরূপ প্রতিমার বেশভূষা লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়, সেইরূপ সমাগত ব্যক্তিগণ সেই পবিত্র চিতার পবিত্র ভস্ম লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল।

সহস্র লোক যাহার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে পারে, এইরূপ একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ দেখাইয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এই বট বৃক্ষের নিকট চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। তদবধি সেই পবিত্র দিন স্মরণ করিয়া বহু লোক সপ্তাহে সপ্তাহে এই স্থানে আসিতে থাকে। সেই সূত্রে এই সতীর হাট সংস্থাপিত হইয়াছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি এই হাট সেই পতিপ্রাণা সাধ্বী সতীর পবিত্র নামের ঘোষণা করিতেছে। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন এই ঘোষণার বিরাম হইবে না"।—ব-বা।

উন্নতি কাহাকে কহে?

আজি যে পৃথিবীর ঈশ্বর, কালি সে পথের ভিখারী। আজ যে পথের ভিখারী, কাল সে মহারাজা। লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে রাজা হওয়া বা ভিখারী হওয়া উন্নতি বা অবনতির অবস্থা বলিয়া পরিগণিত। রাজ্য লাভ করিলে উন্নত হওয়া যায় ভাবিয়া আরঙ্গজীব পিতাকে পর্য্যন্ত বন্দী করিয়া, রাজা হইয়াছিলেন। সেই রাজ্যকেই আবার বিশ্বামিত্র শাক্যসিংহ উন্নতির অন্তরায় ভাবিয়া, পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। অনেক লোকে কৃষকের

অবস্থাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, অবনতির অবস্থা মনে করে। আমেরিকার কয়েকজন প্রেসিডেণ্ট কিন্তু স্বহস্তে হলচালনা করিতেন, রোমের ডিক্টেটর সিনসিনেটসও তাহাই করিতেন। কৃপণ হইয়া যদি কোন লোক অনেক টাকা উপায় করে, অনেকে তাকে বড় মানুষ বলে, উন্নত-অবস্থাপন্ন মনে করে। আবার সকলে কিন্তু সর্ব্বত্যাগী হরিশ্চন্দ্র রাজাকেও বড় লোক বলে—উন্নত মানব মনে করে। ফলতঃ উন্নতির একটা কোন ধরা বাঁধা দর নাই। নাই বোধ হয় মানবের হিতেরই জন্য, কারণ জগতের অধিকাংশ লোকেই উন্নতির দিকে ধাবিত, উন্নতির আশায় আশান্বিত। যদি সকলে রাজা হইত, তবে প্রজা কে হইত? যদি সকলেই সন্ন্যাসী হইত, তবে সন্ন্যাসীকে অন্ন দিবার জন্য গৃহস্থ কে হইত? সকলেই যদি বক্তা হইত, তবে শ্রোতা কে হইত? সকলেই যদি সৈন্যাধ্যক্ষ হইত, সৈনিক তবে কে হইত? বাস্তবিক এইজন্যই আমরা দেখি যে, যে জাতির মধ্যে, যত অধিক লোক কর্ত্তা হইবার জন্য ব্যস্ত, সে জাতির অধঃপতনের মাত্রাও তত অধিক। যাহাহউক দেখা যাইতেছে যে রাজপদ, সেনাপতির পদ, কি বক্তার পদ কিছুই জগতের উন্নতির পরিচায়ক নহে, অথচ ভিন্ন রুচি অনুসারে সমস্ত নির্দ্দোষ পদই উন্নতির পরিচায়ক। প্রকৃত উন্নত যে ব্যক্তি সে ব্যক্তি কি রাজপদে, কি সৈনিকত্বে, কি সেনাপতিত্বে সর্ব্বত্রই সমুন্নতি করিবে এবং লোকসমাজে আপনাকে উন্নত বলিয়া পরিচিত করিবে।

দারুণ অন্ধকারে যেমন বিদ্যুৎ চমকাইয়া পথিকের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়া তাহাকে দ্বিগুণ আঁধারে নিক্ষেপ করে, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ যেমন একবার সুন্দররূপে জ্বলিয়া উঠিয়া পর মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, কতকগুলি উন্নতি সেইরূপ অবনতির পূর্ব্বসূচনা মাত্র। লোকে ইহাকে উন্নতি বলে, তাই উন্নতি বলিয়া আমরাও ইহাকে অভিহিত করিলাম। মাতাল, চোর, জালিয়াৎ ইত্যাদি সমাজের অনিষ্টকারী পাপিগণের উন্নতি এইরূপ। যাঁহারা এই সকল লোকের ক্ষণিক উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হন, তাঁহারা যেন ইহাদের পরিণাম একবার দেখিতে চেষ্টা করেন। ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, অনেক ব্যক্তি অসৎকার্য্য দ্বারা যদিও কিছুদিন উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু পরিণামে তাহাদিগের যে প্রকার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহাতে কখনই উন্নত-অবস্থাপন্ন বলা যায় না। ফ্রান্সের ১৫ পঞ্চ দশ লুই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। যাঁহারা তাঁহার শেষ জীবনের বিবরণ অবগত আছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার পাপের সমুচিত সাজা হইয়াছিল কি না। ফলতঃ অসৎকর্ম্ম দ্বারা যে উন্নতি হয়, তাহা প্রকৃত উন্নতি নহে।

অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিয়া নিজের পরিণাম কার্য্যকারিতা-শক্তি বিনষ্ট করিয়া থাকেন, ইহাদের উন্নতি যে প্রকৃত উন্নতি নহে এবং ইহারা যে সমাজদ্রোহী, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধিক বাক্যবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা যায় না।

তাই বলি, অর্থ কিম্বা যশ উন্নতির চিহ্ন হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রকৃত উন্নতি নহে। যে বন্দুক উৎকৃষ্ট শিকারীর হস্তে শোভা পাইয়া থাকে, সেই বন্দুক যদি তাহার ব্যবহারানভিজ্ঞ কোন কুলি স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়, তবে কি তাহাকে একজন উৎকৃষ্ট শিকারী বলিতে হইবে?

যাহার অন্তর ও বাহির বেশ পরিষ্কার, সুস্থ ও সবল, তিনিই উন্নত। যাঁহার হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সুস্থ ও কর্ম্মঠ এবং উহারা বিদ্যা ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ মনের দ্বারা পরিচালিত, তিনিই প্রকৃত উন্নত। যদি তিনি উন্নতির কোন সাকারা মূর্ত্তি দেখাইতে অভিলাষী হন, তবে তাঁহার সে অভিলাষ কথনই অপূর্ণ থাকে না। কি রাজার কার্য্যে, কি সৈনিকের কার্য্যে, কি সন্ন্যাসীর কার্য্যে, কি শিক্ষকের কার্য্যে, কি ছাত্রের কার্য্যে, সর্ব্বত্রই তিনি জগতের সমক্ষে আপনাকে উন্নত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন। যাহার শরীর সুস্থ ও কর্ম্মঠ, যাহার মন বিদ্যা ও বিনয়ভাবানত, ধর্ম্ম যাহার প্রধান অবলম্বন, কর্ত্তব্য যাহার পরিচালক, "ইহলোকে ও পরলোকে আমার ভীতির পাত্র কেহ নাই" বলিয়া যাহার বিশ্বাস, তিনিই প্রকৃত উন্নত। এরূপ মহাত্মা যদি জগতে উন্নত না হন, তবে আর কে? তবে কি ঐ খল প্রজাপীড়ক দস্যুবেশধারী রাজা, ঐ সুখ-শয্যায় শায়িত বিলাসগর্ভে নিমজ্জিত ধনী, জগতে উন্নত? যাহার মস্তক সহস্র অসির লক্ষ্যস্থানীয়, যাহার মৃত্যুতে সহস্র লোকে আনন্দিত হইবে—আপনাদের কণ্টক দূর হইল ভাবিবে, সেই ব্যক্তিই যদি জগতে উন্নত হয়, তাহার অবস্থাই যদি জগতে স্পৃহণীয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে উন্নতি অতল সাগর জলে নিমজ্জিত হউক, তবে উন্নতির রেখা পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাউক। সত্য বটে উন্নত মহাপুরুষদের মস্তক পাপিষ্ঠের অসিঘাত হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত নহে, সত্য বটে তাঁহাদিগেরও বিপদ আছে; তাঁহাদিগেরও অপমৃত্যু ঘটে; কিন্তু সে বিপদ, সে অপমৃত্যু তাঁহাদিগের পরীক্ষা মাত্র। তাঁহাদিগের মৃত্যুতে কোটি কোটি লোকে অশ্রুবিসর্জ্জন করে, তাঁহাদের অনিষ্টকারীকে দণ্ড দিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ধাবিত হয়। প্রকৃত উন্নত ব্যক্তি মৃত্যুই ঘটুক, আর যাহাই ঘটুক, কিছুতেই নিজের কর্ত্তব্যের রেখা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। আরঙ্গজীব যখন শিখবন্দিগণকে তাহাদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বা মস্তক প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, তাহারা

সন্তুষ্টচিত্তে মস্তকই প্রদান করিয়াছিল, ধর্ম্ম দেয় নাই। *ইংলণ্ডেশ্বরী মেরী যখন বিশপদ্বয় লাটিমার ও ক্রান্মারকে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ধর্ম্ম দেন নাই—জীবন দিয়াছিলেন—অগ্নিতে পুড়িয়াছিলেন। লোকে যে জীবনকে পরম প্রিয় মনে করে, সেই জীবন ইহাঁরা অবহেলে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিলেন? কোন্ শক্তির বলে ইহাঁরা সেই অসাধ্য সাধন করিলেন? সেই শক্তিকেই উন্নতি কহে। প্রাণ পরিত্যাগ উন্নতি নহে, তাহা উন্নতির সাকারা মূর্ত্তি মাত্র। যে উন্নতি এত দিন নিরাকারভাবে তাহাদের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা তাহাদের মৃত্যুতে প্রকাশিত হইল মাত্র। সকলেরই উন্নতির সাকারা মূর্ত্তি যে একই হইবে তাহা নহে, ক্রানমার বা লাটিমার যে উন্নতি যাজকত্বে দেখাইয়াছেন, নিউটনও সেই উন্নতি বিজ্ঞানে দেখাইয়াছেন, আবার নেপোলিয়ান সেই উন্নতিই সেনাপতিত্বে দেখাইয়াছেন। ফলতঃ একই উন্নতিকে ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোক ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখাইয়াছেন মাত্র।

বলেন্দ্র ও বলবতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনন্ত নীল আকাশের তলে স্নিগ্ধ সান্ধ্য বায়ু হিল্লোলিত সমুদ্র। সে সমুদ্রের কূল নাই, কিনারা নাই। অনন্ত নীলাকাশের ন্যায় সমুদ্রও অনন্ত নীল, কিন্তু আকাশের ন্যায় নিস্তব্ধ নহে, সমুদ্র সর্ব্বদা শব্দায়মান। তরঙ্গ উঠিতেছে—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটিতেছে। ঐ যে নীল পর্ব্বত তুল্য সফেন তরঙ্গমালা নাচিতে নাচিতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আবার দেখিতে দেখিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এই সান্ধ্য সমুদ্রতটে সান্ধ্য সমীর-সেবিতা পুষ্প-শোভিতা ব্রততীর ন্যায় বসিয়া এ কে? এ একজন রমণী।

"রমণীর গৌরকান্তি নয়ননীলিমা,
রঞ্জিত সায়াহ্নরাগে অলক্ত অধর,
রাজরাজেশ্বরী রূপ অঙ্গের মহিমা,
কি সাধ্য চিত্রিবে কোন নর চিত্রকর?"

রমণী অনিমেষলোচনে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছে। নীলাকাশে অতি সুন্দর নক্ষত্রগুলি ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, এবং সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অতি ভয়ে ভয়ে ক্ষীণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল, সময় সময় রমণীর দৃষ্টি তাহার উপরেও পড়িতেছিল। সান্ধ্য নক্ষত্রের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সিন্ধুসলিলে প্রতিফলিত হইতেছিল, রমণী এক একবার তাহাও দেখিতেছিল। কিন্তু সান্ধ্য প্রকৃতির এ রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়াও তাহার চিত্ত স্থির হইল না। বহুক্ষণ সমুদ্রের

দিকে চাহিয়া থাকিলেও তাহার বাঞ্ছিত কেহ আসিল না, তখন সে গাইল :—

অনন্ত নীল জলে, অনন্ত বায়ু খেলে,
অনন্ত লহরী ছুটিছে তায়,
অনন্ত অম্বর, দিক্ ও দিগন্তর,
যেন অনন্ত তরঙ্গে গ্রাসিতে চায়।
অনন্ত ফেনরাশি, হাসে অনন্ত হাসি,
আকাশে উত্থিত হয় সে ফণি-
গর্জ্জনে ঘনস্বন, পরান্ত পুনঃপুনঃ
হয়—জগত কম্পিত সে স্বর শুনি।
যেন—উদিত নিমজ্জিত হইছে আদিত্য,
উষায় সন্ধ্যায় তোমার নীরে,
যেন মধ্যাহ্নে নীল জলে, লাল মুকুতা জলে,
যেন সুবর্ণ লহরী অধীরে খেলে।
দিবসে একবার নিমেষে একবার,
জোয়ার ভাঁটাতে করিছ কেলি,
রবি করে উজ্জ্বল, সমীরণে চঞ্চল,
তটেতে অযুত বালুকাবলী।
মরি কিবা সুন্দর, মরি কি মনোহর,
তরঙ্গমালাময় মহান্ সিন্ধু।
আহা কি চমৎকার, মহিমা বিধাতার,
অনন্ত ঈশ্বর জগতবন্ধু।

সঙ্গীতের প্রতি পদ যখন কোমল কণ্ঠ-নির্গত হইয়া সুস্বরে সুতালে উঠিতে পড়িতেছিল, তখন পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "বলবতি!" রমণী ভীত-কম্পিত-চিত্তে চাহিয়া দেখিল তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান—বলভদ্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বলভদ্র ডাকিল "বলবতি"।

বলবতী তাহার দিকে চাহিল না, কোনও কথা কহিল না। বলভদ্র কহিল "তুমি জান বলবতী আমি কে?" বলবতী এবার কথা কহিল। সে স্থির ও গম্ভীর স্বরে কহিল "হাঁ জানি, তুমি এই বিদ্যাধর গ্রামে একজন ধনী লোক।"

বলভদ্র বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল "আর তুমি নিজে কে তা জান কি?"

বলবতী পরিষ্কার স্বরে কহিল "হাঁ তাহাও জানি। আমি একজন দরিদ্র-কন্যা—পিতৃমাতৃহীনা অনাথা ও তোমার অন্নে আজীবন প্রতিপালিতা এবং তোমার গৃহ-আশ্রিতা।

বলভদ্র। তবে তুমি কোন্ সাহসে আমার কথার অসম্মান কর?

বলবতীর অবনত চক্ষু হইতে অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল, সে জড়িতকণ্ঠে কহিল "দেখ বলভদ্র"—

বলভদ্র তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল "আর কথায় আবশ্যক নাই, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কিনা বল।" বলবতী মুক্তকণ্ঠে কহিল "না।"

বলভদ্র। তুমি আমাকে ভালবাস না?

বলবতী। ভালবাসি না ত কি? ভগ্নী কি ভ্রাতাকে ভালবাসে না।?

বলভদ্র। ভ্রাতা ভগ্নীর কথা আমি চাই না, আমি তোমাকে যে ভাবে ভাল-বাসি, তুমি আমাকে সে ভাবে ভালবাস কি না?

বলবতী। না।

বলভদ্র। তুমি বড় মূর্খ, আপনার সুখ দুঃখ কিসে হয়, তোমার সে বোধ নাই।

বলবতী। সুখ কাহাকে কহে আর দুঃখ কাহাকে কহে, তাহা তোমার বোধগম্য হয় নাই বলিয়াই এমন কথা বলিতেছ।

বলভদ্র। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি যথেষ্ট সুখী হইবে, নচেৎ তোমার ভবিষ্যৎ ঘোর দুঃখময়।

বলবতী। তোমাকে বিবাহ করাই আমার দুঃখ, নচেৎ আমি সুখী।

বলভদ্র দুঃখে ক্ষোভে গর্জ্জন করিয়া কহিল "তুমি জান, আমি ইচ্ছা করিলে এখনি তোমাকে জোর করিয়া বিবাহ করিতে পারি।"

বলবতী। আমি সব জানি।

বলভদ্র। কি জান।

বলবতী। তুমি আমাকে কখন জোর করিয়া বিবাহ করিতে পার না, তাহাই জানি।

বলভদ্র। তুমি কি জান না যে গ্রামের মধ্যে আমি প্রধান, ইচ্ছা করিলে আমি সবই করিতে পারি?

বলবতী। তুমি ইচ্ছা করিলে সব করতে পার সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা তোমার সাধ্যাতীত কর্ম্ম।

বলভদ্র। আমিত তোমার ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছি না, তোমাকে ধর্ম্মমতে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

বলবতী। তুমি কিরূপে আমাকে বিবাহ করিবে বল? পূর্ব্বেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

বলভদ্র। কোথাকার একজন লোক, তাকে তুমি চোখে দেখিয়া ভালবাসিয়াছ, এইত বিবাহ। ইহাতেই যদি অধর্ম্ম হইত, তবে এত দিন পাপে সংসারের অর্দ্ধ ভাগ ডুবিয়া পড়িত।

বলবতী। বর্ত্তমান জগতের অর্দ্ধখানা পাপে ডুবিয়া পড়ে নাইত কি? কিন্তু সে দৃশ্য ধর্ম্মচক্ষু ব্যতীত পাপ চক্ষুর গোচর নহে। ধর্ম্মের কথা কহিলেত তোমার কর্ণে প্রবেশ করে না। মহাভারত রামায়ণের সঙ্গে বোধ হয় জীবনে দেখা সাক্ষাৎ নাই। মহাভারতে পড়িয়াছি সাবিত্রী নামে এক রাজকন্যা ছিলেন। তিনি বনভ্রমণ করিতে গিয়া সত্যবান্ নামে এক রাজপুত্রকে ভালবাসিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চাতে মুনিগণপ্রমুখাৎ শুনিতে পাইলেন যে, সত্যবান্ অতি অল্পায়ু। তাহার পিতা মাতা তাহাকে সত্যবানের কথা ভুলিতে কহিলেন এবং অন্য এক রাজপুত্রকে বরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সাবিত্রী তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিলেন। কহিলেন

"যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি,
জীবন মরণে সেই সত্যবান্ স্বামী।"

এই সাবিত্রীই এক দিন ধ্রুব মৃত্যুর করাল কবল হইতে প্রাণপতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

রাম নাম শুনিলে ভূতেরা বড় অসন্তুষ্ট হয়, ধর্ম্ম প্রস্তাবে পাপীরাও বড় বিরক্তি প্রকাশ করে। তাই আজ বলবতীর কথায় বলভদ্রের বড় রাগ হইল, কর্কশ

স্বরে কহিল "বলবতী, তুমি নিশ্চয় জানিও এই এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তোমাকে জোর করিয়া বিবাহ করিব, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া সেই কোমল মধুর নিরুপম-সৌন্দর্য্য দেবী-প্রতিমার দিকে রোষ-কষায়িত লোচনে চাহিতে চাহিতে বলভদ্র গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

যে সময় বলভদ্র ও বলবতীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সে সময় সায়াহ্ন-সময় নহে—অপরাহ্ন। যে স্থানে তাহারা উপবিষ্ট ছিল, সে স্থান সিন্ধুতট নহে—সে স্থান সুদূর-প্রসারিত এক ভূমিখণ্ডে রমণীয় কুসুমোদ্যানের উপর বৃহৎ বাটীর একটি নির্জ্জন কক্ষ। সে কক্ষের সম্মুখস্থ স্থান স্নিগ্ধ ও ছায়াপ্রধান তরুনিকরে পরিশোভিত।

(ক্রমশঃ)

শেষ জীবন-সঙ্গীত।

ভোলা মন সব ভুলে যা, ভুলিস না সেই নিত্যধনে,
(ভুলিস না সেই) (সত্য ধর্ম্মে) (ব্রহ্মধনে), (হরি ধনে)
সার ধন পরম রতন সম্বল জীবন মরণে।
দেহ গেহ ধন জন, কিছুই নহে আপন,
ভুলে যা মায়ার ধোঁকা—দারা সুত পরিজনে।
সে যে রে সাধনের ধন, সাধনে হবে মিলন,
কর ধ্যান, কর জ্ঞান, সাধন কর প্রাণপণে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা ছাত্রীগণের তালিকা।

প্রবেশিকা পরীক্ষা।

এথিলিনা কক্স	প্রাইবেট	১ম বিভাগ।
ই, এ ডি সুজা	ডবটন কলেজ	„
বার্থা ফিস্‌চার	রেঙ্গুণ কনভেণ্ট	„
প্রভাবতী রায়	বেথুন কলেজ	„
ইন্দুলেখা বসু	বেথুন „	২য় বিভাগ।
কমলা	ক্রাইষ্ট চার্চ্চ	„
প্রসন্নকুমারী চৌধুরী	„	২য় বিভাগ।
এনি কর্ণেল	রেঙ্গুণ কনভেণ্ট	„
হেমন্তকুমারী দাস	ব্রাহ্মবালিকা স্কুল	„
মৃণালিনী দাস গুপ্ত	বাঁকিপুর এফ এইচ স্কুল	„
সুরবালা দাস গুপ্ত	ক্রাইষ্ট চার্চ্চ	„
এগনিস ঘোষ	„	„

জুলিয়া মেভিসন রেঙ্গুণ কনভেণ্ট ২য়
লুসি সেণ্ট ক্লেয়ার " "
এমিলি নিকোলাস সেণ্ট জোসেফস "
বিনোদিনী সরকার ব্রাহ্মবালিকা "
অনসূয়া সিংহ বেথুন "
মণিহারময়ী সিংহ ব্রাহ্মবালিকা "
ক্ষিরোদ বালা ভট্টাচার্য্য
ক্রাইষ্ট চার্চ্চ ৩য় বিভাগ।
ডেসি চেলুসন সেণ্ট জোজেফস্
কনভেণ্ট মোলমিন "
বেলা ডিভাইন্ শিক্ষক "
টি, এল্ ফন্সিকা প্রাইভেট "
মে জর্জ্জ সেণ্ট জোজেফস্ "
জেসি ল্যাম্বার্ট রেঙ্গুণ কনভেণ্ট "
হেমপ্রভা মজুমদার প্রাইভেট "

এফ্, এ পরীক্ষার ফল।

অমিয়া রায় ১ম বিভাগ
প্রেসিডেন্সী কলেজ
পি কেটি ১ম প্রাইবেট
রাজকুমারী বসু ২য় বেথুন কলেজ
শরৎকুমারী দাস
লেনা ঘোষ " প্রাইবেট
চারুবালা মণ্ডল
চারুলতা রায় " প্রেসিডেন্সী
মৃন্ময়ী সেন " বেথুন
আশালতা চৌধুরী ৩য়
বিভুবালা দত্ত " "
এল্ সি ডি সুজা " নাগপুর সেণ্ট ফ্রান্সিস

বি, এ, পরীক্ষার ফল।

ইসাবেলা জি সামুয়েল
(অনর ইংলিস)
২য় বিভাগ রাবেন্‌সা কটক
স্নেহলতা মজুমদার
(অনর গণিত)
২য় বিভাগ বেথুন
লিলী ক্রিশ্চিয়ানা ডভটন
সুপ্রভা গুপ্ত বেথুন

নূতন সংবাদ।

১। গত ১লা মে বাঙ্গলার ছোট লাট দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। সিয়ালদহে প্লেগ-পরীক্ষক ডাক্তারের নিকট তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

২। ইংলণ্ডেশ্বরীর শুভ জন্মদিনের উৎসব সর্ব্বত্র ২৪শে মে সম্পন্ন হইয়াছে, কেবল লণ্ডনে ৩রা জুন হইবে।

৩। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি বাবু গোপাল লাল মিত্রের লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি অতি সুবিদ্বান্ ও সুযোগ্য লোক ছিলেন।

৪। ছোট লাট ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায় ৫০০ টাকা দান করিয়া ইহার প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন।

৫। দিল্লীর হিন্দু কলেজ যতদিন

স্বপোষণক্ষম না হয়, ততদিন লালা শ্রীকৃষ্ণ দাস নামক এক ধনী বণিক্ ইহার সমুদায় ব্যয় ভার আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। যত মনুষ্য জন্মে, তাহার সিকি ৬ বৎসর ও অর্দ্ধেক ১৬ বৎসর না হইতে হইতে মরিয়া যায়।

৭। বিলাতে স্মিথ নামক এক সাহেব ভারতবাসী কুষ্ঠ রোগীদিগের সাহায্যার্থ ১৮০০ পাউণ্ড দান করিয়া গিয়াছেন।

৮। পারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক রুষ রমণী ডাক্তারী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্ ডি উপাধি পাইয়াছেন।

৯। পক্ষীর মধ্যে সোয়ান সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী। ইহা ৩০০ বৎসরেরও অধিক বাঁচিয়া থাকে।

১০। এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় ৩৫২৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০০২ প্রথম, ১৬৬৬ দ্বিতীয় এবং ৮৫৯ তৃতীয় শ্রেণীস্থ। এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২৫৭, তন্মধ্যে ৪৩ প্রথম, ২৩৮ দ্বিতীয় এবং ৯২৬ তৃতীয় শ্রেণীস্থ। বি এ ৪৭৬ উত্তীর্ণের মধ্যে পাস ৩৬৪, অনর ১১২ মাত্র।

১১। গত ২০এ মে গৌহাটীতে ভয়ানক ভুমিকম্প হইয়াছে, কম্পন ১৫ সেকেণ্ড ছিল।

১২। ২৪এ মে মহারাণীর ৮০ বার্ষিক জন্মদিনে উইণ্ডসর কাসলের চতুরস্র ভূমিতে নগরের সকল গানবাদ্য-সমিতি মিলিত হইয়া এক মহা তূর্য্যোৎসব করিয়াছিল, মহারাণী তথায় উপস্থিত ছিলেন।

১৩। মহারাণীর জন্মদিনে (২৪এ জুন) কলিকাতার হারিসন রোড ও অন্যান্য রাজবর্ত্মে মহোৎসাহে হরিসঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। ঐ দিবস মহারাণীর সম্মানার্থ ভারতের সর্ব্বস্থানে যথোচিত তোপধ্বনি হইয়াছে।

১৪। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কানাডার সীমাবর্ত্তী ডসন নগর সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মসাৎ হইয়াছে। এই নগরটী নূতন প্রতিষ্ঠিত এবং স্বর্ণের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখানে ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বর হইত। অনেকে আশা করেন, এই অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা নগরের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে।

১৫। এক জন ভারতবাসী মুসলমান মরিচ সহরে বাণিজ্য করিয়া ২ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছে।

১৬। হঙ্গেরীর গালেসিয়াতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বিশুদ্ধ গৈরিক লবণের খনি আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫৫০, প্রস্থে ২০ মাইল এবং ২৫০ ফিট পুরু।

১৭। ত্রিবাঙ্কুরে স্ত্রীশিক্ষার আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে। গত বৎসরের রিপোর্টে জানা যায়, তথায় ছাত্রীসংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ জন বৃদ্ধি হইয়াছে, ভারতের আর কুত্রাপি এরূপ দেখা যায় না।

১৮। বিলাতে ভারতবাসী ১৫০ ছাত্র ব্যারিষ্টার হইবার জন্য আইন অধ্যয়ন করিতেছেন।*

১৯। গত ১৯শে মে হইতে ২১শে মে পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। ফরিদপুরের বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রশংসার সহিত সভাপতির কার্য্য করিয়াছেন।

২০। ভিয়েনা নগরবাসী সুবিখ্যাত দানশীল ব্যারণ হার্সের বিধবা পত্নী অপুত্রক থাকায় মৃত্যুর পূর্ব্বে দরিদ্রদিগের জন্য তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি(৩৬০০০০০০০) ছত্রিশ কোটি টাকা দান করিয়াছেন। এ দেশে এরূপ সাধুদৃষ্টান্ত কবে দেখা যাইবে?

২১। বি, এ, পরীক্ষায় ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের কন্যা কুমারী স্নেহলতা গণিতে ও সামুয়েল ইসাবেলা ইংরাজীতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। বাবু রজনীনাথ রায়ের কন্যা কুমারী অমিয়া রায় এফ, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানীয় হইয়াছেন। ইনি সাহিত্যে প্রথম স্থানীয় পুরস্কার পাইবেন।

বামারচনা।

নববর্ষ আবাহন।

এস এস নববর্ষ অবনী মাঝার,
কি উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হৃদি পারাবার!
হাসিমাখা বিম্বাধরে, কত আশা থরে থরে,
হৃদয় কন্দরে আহা করিছে বিহার।
শুভ দিনে শুভক্ষণে বসি ধরা সিংহাসনে,
রাজদণ্ড ধরি কর ন্যায় ব্যবহার—
অভেদে অপক্ষপাতে করো সুবিচার। ১
এস এস নববর্ষ ডাকি বারে বার,
চারি দিকে করে সবে মঙ্গল আচার।
তোমারে বরিতে উষা, পরিয়া কনক ভূষা
আনন্দে হাসিছে খুলি পূরব দুয়ার।
ওই যে উষার পাশে, কনক তপন ভাসে,
হেরিতে ভূপতি আজি বদন তোমার,
খুলিয়াছে অরুণাক্ষ, হাসিছে সংসার।২
মঙ্গল বাজনা অই বিটপী বাজায়,
তালে তালে সমীরণ নেচে চলে যায়।
ভুবনে পড়েছে সাড়া, জেগেছে পাখীর পাড়া,
আগে ভাগে ছুটে তব যশোগান গায়।
বসি রাজ-সিংহাসনে, সুখী কর জগজনে,
করুন মঙ্গলময় মঙ্গল তোমার,
ফেলাওনা আঁখিজল—কাঁদাওনা হায়! ৩
খুলিয়া গিয়াছে আজি সপ্ত স্বর্গ দ্বার,
প্রফুল্ল মন্দারফুল সৌরভসম্ভার—
বহিছে সমীর চল, আশীর্ব্বাদে দেবদল,
যাচিছে অমরীগণে মঙ্গল তোমার,
মহান্ আদেশ রাশি, সমীরণ স্রোতে ভাসি,
আসিতেছে তব পাশে বিশ্ব বিধাতার!
প্রাণপণে পালিও হে আদেশ তাঁহার। ৪
তোমারি মতন হায় কত শত জন
এসেছিল হেসে হেসে প্রফুল্ল আনন।
শত যত্নে নারী নরে, লয়েছিল সমাদরে,
প্রেম প্রীতি ভক্তি পুষ্পে করিয়ে পূজন,

গেঁথেছিল আশা-নালে মালা সুশোভন।
আদরে পরিল গলে, সুখে রবে মহীতলে
ফুটিল বাসনা ফুল নয়ন-রঞ্জন,
অকালে শুখায়ে শেষে হয়েছে পতন। ৫
জ্যেষ্ঠগণ এসেছিল তোমার মতন
জল স্থল ব্যোম করি সুখে নিমগন,
এমনি নবীন বেশে, এসেছিল হেসে হেসে,
কে জানে উদরে তীব্র গরল ভীষণ
রেখেছিল লুকাইয়ে, মর ভবে ছড়াইয়ে,
জর্জ্জরিত করে গেছে নর নারী-মন,
কাঁদিয়া কাঁদায়ে শেষে করেছে গমন। ৬
কত অশ্রুনীর হায় হয়ে প্রবাহিণী
বহিতেছে ধরা-বক্ষে দিবস যামিনী।
ধবল হৃদয়ভাগে, কত যে কালিমা লাগে;
রঞ্জিয়াছে মুছিবেনা থাকিতে জীবনী।
অশনি অনল জলে, অঙ্গার দিয়েছে ঢেলে,
উঠিয়াছে সুধার্ণবে জীবন-ঘাতিনী,
উদ্গারিয়ে হলাহল কাল ভুজঙ্গিনী। ৭
হয়োনা কদাচ তুমি তাদের মতন,
প্রাণপণে করো ভবে মঙ্গল সাধন।
ঢেলনাকো হলাহল, সুখে রেখো মহীতল,
মঙ্গল-নিদান হোক্ তব আগমন।
শুভ কর্ম্মে দিও মন, সুখে রবে অনুক্ষণ,
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ আছে এক জন—
ধর্ম্মে জয় অধর্ম্মের অবশ্য পতন। ৮

শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসী।
বনফুলহার-রচয়িত্রী।

নব বর্ষের প্রার্থনা।

তোমারি মঙ্গল হস্তে গড়েছ এ বসুন্ধরা,
তাই এ জগত সদা নবীন সৌন্দর্য্যে ভরা।
নবীন প্রভাত, সন্ধ্যা, নিতি আসে ধরা-তলে,
মৃতেরে জীবন দিতে—হাসাইতে ফুলদলে।
একটি বরষ তুমি দিয়েছিলে ভগবান্!
পুরাণ মানবগণে দিয়ে যেতে নবপ্রাণ;
কত আশা, কত সাধ, দেছিলে তাহার সনে;
জাগাতে ঘুমন্ত যারা,—হাসাতে ব্যথিত জনে।
আজ সে বরষ তব হয়ে গেছে পুরাতন,
যা করিতে এসেছিল, হয়েছে তা সুসাধন,
আমরা কালিমা দিয়ে মলিন করেছি তারে
বিদায় চাহিছে এবে মানবের দ্বারে দ্বারে।
যাক্ চলে পুরাতন, এই কর দয়াময়!
নবীন বরষে যেন নবীন জীবন হয়।
মলিন প্রাণের তলে যা কিছু কালিমা আছে,
তোমার পবিত্র হাতে দাও তাহা—দাও মুছে।
আজ হ'তে এ সংসারে তুমি হও ধ্রুব-তারা,
বরিষ হে নিশিদিন আশীষ অমৃতধারা।
তাহলে জীবন মন হয়ে যাবে মধুময়,
সংসার স্বরগ হবে এ কথা কল্পনা নয়।

শ্রীবনলতা দেবী।

বোন।

কেন কাঁদি যদি নাহি ঝরে অশ্রুজল?
কেন ভাবি যদি নাহি ফাটে হৃদিতল?
ভোরে উঠি সাঁঝে ডুবি ফিরি মহীতল,
ঘুরে মরি নাহি পাই কোথা লক্ষ্যস্থল।
পথ দীর্ঘ তাহে অতি পদ দুরবল,
দিবা নিশি ভয়ে তাই পরাণ বিকল।
হাসি খেলা বলা কহা সকলি নিস্ফল,
ভবহাটে কেনাবেচা চলে অবিরল।
পার যদি লহ কিনি হীরা মুক্তাদল,
বেলা গেল সন্ধ্যাকালে হবে 'চল চল'।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সবি ভুল।

পূরব গগন প্রান্তে ওই শশী নিভে যায়,
মোর জীবনেরে যেন উপহাস করে হায়!
ওতো গো উদিবে পুনঃ ওই শুভ্র নীলাম্বরে,
জীবন কি গেলে পুন ফেরে দেহ কারাগারে?
এ ধরণী ছলনার কুহক-স্বপন ভরা,
ভালবাসা সেও ভুল, মায়াময়ী এই ধরা।
হরষ আনন্দ যেথা, ভালবাসা সেইখানে,
দুঃখীর দারুণ ব্যথা পশে না তাহার প্রাণে।
চির-রোগী যে সংসারে, কেবা তারে ভাল-বাসে?
নবীন মাধুরী-হীন, বাসিবে বা কোন্ আশে?
নাহি হাসি নাহি প্রীতি সুখে অশান্তির প্রায়,
আপন মরমে মরে আছে সংসারেতে হায়!
এ সংসার উপকূলে লয়ে চির দুঃখ-স্মৃতি,
ভুল সে ভেঙ্গেছে মোর আজ কোথা আশা প্রীতি?

পঙ্কজ কুমারী দেবী।

শেষ।

সাঙ্গ আজি মরমের ব্যথা
জীবনের কথা আজি শেষ,
মরণের তীরেতে দাঁড়ায়ে
গণিতেছি প্রত্যেক নিমেষ।
ধীরে ওই ডুবিছে দিবস
শিয়রেতে আঁধার ঘনায়,
যারা ছিল নিকটে আমার
ক্রমে ওই দূরে চলে যায়।
সুখ দুঃখ হাসি যাহা ছিল,
লুকায়েছে মরণের ছায়ে,
নিজবলে জানিতাম যারে
কাহিনী বলিয়া মনে হয়!
মরণের মরণ মাঝারে
হেরিতেছি জীবন নূতন,
পুরাতন জীবন যা ছিল
মনে হয় শুধু গো রোদন॥

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

ব্রততি !

নিরিবিলি বসিয়া　　নীলাকাশে চাহিয়া
কি দেখিছ ব্রততি ?
কোলে তোর বালিকা　কুসুমের মালিকা
ঢালে মৃদু বিভাতি।
নভ পটে থাকিয়া　　মৃদু আলো ঢালিয়া
তারা করে পিরীতি,
সমীরণে ঢলিয়া　　শ্যাম বাহু তুলিয়া
কর তারে প্রণতি।

মুখ-ভরা জোছনা　　হাসে কত শোভনা
তুলি সুধা লহরী।
শ্যাম বনে পাপিয়া　　পাদপেতে থাকিয়া
দেখে তব মাধুরী।
অমিয়ার সরসে　　মন অজ বিকাশে
তোরে দেখে রূপসী।
কোথা তুই পাইলি　কোন্ খানে শিখিলি
এ পবিত্র সুহাসি ?

শ্রীমতী অম্বুজা।

নিবেদন।

(আষাঢ় শুক্ল পক্ষ দশমী রথ যাত্রার দিন সন্ধ্যার সময়)

ব্যাকুলে ডাকিছে সখা ! তব দীন দাসী,
নিদ্রা পরিহর,
উঠ প্রাণাধার !
একি বেলা ঘুমাবার ?
পশ্চিম-গগনে দেখ শ্রান্ত দিবাকর।
শঙ্খ, ঘণ্টা বাদ্য বাজে দেখ দেবালয়ে
(আজি) বাহুড়া দশমী;*
বিভু পাদপদ্ম স্মরি,
উঠ নিদ্রা পরিহরি,
কার্য্যে তৎপর হও বিভুরে প্রণমি।
করেছি কি কোন দোষ তব শ্রীচরণে
বল প্রিয়তম !
নিদ্রা ত্যজি প্রিয়তম !
ক্ষম যত দোষ মম,
ভুলিলে কি আজি তব ধরম করম ?
একি সখা ! এত নিদ্রা এত অভিমান
বল কি কারণে ?
দেখ ভ্রাতা পিতা মম,
তব বন্ধু গুরুজন,
ডাকেন তোমারে কত করুণ বচনে।
একি সখা ! বল দেখি একি অভিমান
একি এ শয়ন ?
তব হৃদাকাশ চন্দ্র,
ইন্দিরা, সুধীরচন্দ্র,
ডাকিছে সচ্চিদানন্দ তব প্রিয় ধন।
যাদের মধুর ডাকে ভাসে প্রাণ মন
আনন্দ সলিলে,
সেই তব প্রাণধন,
প্রিয় পুত্রকন্যাগণ
নাহি শোন আজি কেন কাতরে ডাকিলে ?
বুঝিয়াছি এবে আমি এবে মহানিদ্রা
অনন্ত শয়ন !
বিশ্ব-জননীর কোলে,

*আষাঢ় শুক্ল পক্ষ দশমী জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রার দিন।

[illegible] অতি বিহ্বলে,
নিশ্চল নিস্পন্দ, মরি কি ধ্যানে মগন!
লভেছ যাহার ক্রোড়,—অমৃত সদন
[illegible] মুক্তি [illegible] ধাম
অনন্ত নিত্য বৈভব,
তার কাছে তুচ্ছ সব,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য রাশি ধূলির মতন।
পেয়েছ যে স্নেহ প্রেম বিশ্বজননীর
অমূল্য অক্ষয়,
কলঙ্ক কালিমাময়,
সংসারের স্নেহ প্রেম,
টানিতে কি পারে তব প্রাণ মন?
তাইহে আমার ডাক না শুনিলে সখা!
না ভাবিলে তুমি
কি তীব্র যাতনা ভার,
কেন বহে অশ্রুধার,,
কা'র কথা দিবানিশি ভেবে মরি আমি

শ্রীমতী রেবারায়।

শোকসন্তপ্তা জননীর বিলাপ।

হায় বুলু হায় বুলু প্রাণের তনয়া!
কোথা গেলে করি শূন্য জননীর হিয়া?
নন্দনের পারিজাত ইন্দ্রাণী গলে
পরিতে স্খলিত হস্তে পড়িল ভূতলে,
ত্রিদিবের আদরিণী স্বর্গ পুষ্পহার!
গেলি চলি মাতৃ-হৃদি করিয়ে আঁধার।
কোলে ছিল পুত্র ধন তুমি বুলু আর।
"মা"ডাকের কাঙ্গালিনী হইনু এবার॥
এখনও মনে পড়ে সে দিন আমার।
এ জনমে সেইদিন ভুলিব না আর॥
তোমার সঙ্কট পীড়া হেরিয়ে নয়নে,
এক মনে ডাকিলাম দেব দেবীগণে॥
'কিঞ্চিৎ হইল দয়া দেবীর অন্তরে।
কাটিল রজনী বুলু তোমা কোলে করে॥
আশা মাত্র নাহি ছিল, কিন্তুরে আবার
অভাগীর মনে হ'ল আশার সঞ্চার॥
ভাবিলাম তুমি মম যতনের ধন,
কোথা যাবে শূন্য করি মায়ের ভবন?
'তরুলতা' নাম দিল দাদাটী তোমার।
তরুলতা-পাশে বদ্ধ হৃদয় আমার॥
সেই লতা যদি কভু শমন ছিঁড়িবে।
লতা সনে এ হৃদয় উপাড়ি যাইবে॥
হায় বুলু! হায় বুলু যতনের ধন!
তোমার বিহনে আছে এ দেহে জীবন!
হবেনা মরণ মম বুলু কন্যা-শোকে।
কতই দেখেছি ভেঙ্গে প্রস্তর মস্তকে॥
সে সময় স্মরি মম কাঁপয় হৃদয়।
কণ্ঠাগত প্রাণ তব অন্তিম হিক্কায়!
আকুল নয়নে বুলু চাহিতে চাহিতে।
ত্রিদিবের ফুল গেলে ত্রিদিব পুরীতে॥
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখী যাও পলাইয়ে,
দেখরে জনক তোর আছে মুখ চেয়ে॥
তোর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র কচি শিশু হায়!
বুলু বুলু করে দেখ ভূ-লুণ্ঠিত কায়?
কচি শিশু মিষ্ট ভাষি ভাসে অশ্রুজলে।
"খুলি মা কোতায় বুলু এনেদে তাহালে॥"
দেখ আসি দশা তব দুখিনী মাতার।
দেখ রে সোণার বুলু দেখ একবার॥

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দেবী।

No. 414. July, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৭ বর্ষ। ৪১৪ সংখ্যা। আষাঢ় ১৩০৬—জুলাই ১৮৯৯। ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-সম্মিলন—রুসীয় সম্রাট সস্ত্রীক অবিলম্বে ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। ইংরেজ ও রুষ এখন পৃথিবীর বেশী ভাগের প্রভু, ইহাঁদের সম্মিলন জগতের পক্ষে শুভসূচক মনে করা যায়।

ভারত-গৌরব—এ বৎসর কেম্ব্রিজ গণিত ট্রিপোতে একজন ২৩ বর্ষীয় ভারতীয় যুবক সকলকে পরাভব করিয়া "সিনিয়ার র্যাঙ্গলার" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান স্থানীয় হইয়াছিলেন। ইনি বোম্বাইবাসী, ইহার নাম রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরঞ্জপি। ১৮৯১ সালে ১৫ বৎসর বয়সে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ইনি সর্ব্বপ্রথম হন, মধ্য পরীক্ষাতেও সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। ১৮৯৪ সালে বিএ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে ১ম শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম হন। ১৮৯৬ সালে গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। ইনি স্বদেশহিতৈষিতা ও ত্যাগস্বীকারেও আদর্শস্থল। ইনি ফার্গুসন কলেজের ছাত্র, রাঙ্গলার হইয়া আসিলেও তথায় ২০ বৎসর কাল অনধিক ৭০ টাকা মাসিক বেতনে কার্য্য করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছেন।

রাজ-প্রতিনিধির সৌজন্য — রঘুনাথের পরীক্ষার সুফল বাহির হইবামাত্র মহাত্মা কুর্জন ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ্যগণের নিকট তারযোগে মহানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এইত প্রকৃত প্রজাবাৎসল্য।

হাইকোর্ট জজদের শুভগ্রহ—ষ্টেট সেক্রেটারী আদেশ করিয়াছেন হাই কোর্টের জজেরা অতঃপর মাসিক ৩৭৫০ স্থলে ৪০০০ টাকা বেতন পাইবেন এবং ৫৫ বৎসরের পরিবর্ত্তে ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে পারিবেন, আর ১৪॥

বৎসর স্থলে ১১॥ বৎসর জজীয়তী করিলে পূরা পেনসন পাইবেন।

ভারতবাসীর উচ্চ সম্মান—ভারতেশ্বরীর হিন্দী শিক্ষাগুরু আবদুল করিম সম্প্রতি বিক্‌টোরিয়ান্‌ অর্ডারের অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—লেডী কুর্জ্জন সিমলায় ইহার সেণ্ট্রাল কমিটী লইয়া কার্য্য করিতেছেন এবং ইহার উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইয়াছেন।

রুসিয়ায় দুর্ভিক্ষ—উত্তর ও মধ্য প্রদেশে দারুণ শীতে শস্য নাশ এবং দক্ষিণ প্রদেশে অনাবৃষ্টি হেতু রুসিয়াতে দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিয়াছে। ভারতের দুঃসময়ে রুসিয়া অনুকূল হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন! ভারতবাসীদের পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ উপযুক্ত সময়।

হাতী ধরা—আসামের নানা হাতি-খেদা হইতে এ বৎসর ৩২৮টী হাতী ধৃত হইয়াছে। ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৪৮০০ টাকা লাইসেন্‌স কর পাইয়াছেন।

নিম্ন স্ত্রী-শিক্ষা পরীক্ষা—গত বৎসর বঙ্গদেশে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় ৪ জন, মধ্য বাঙ্গলায় ১৬ জন, উচ্চ প্রাইমারীতে ৮২ জন এবং নিম্ন প্রাইমারীতে ৮৯৯ জন বালিকা উত্তীর্ণা হইয়াছে। দিন দিন আরও ভাল ফল ফলিবে আশা করা যায়।

মাজেষ্ট্রেটী পরীক্ষার ফল—বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, ও শরৎকুমার রাহা বি, এ, ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি কলেক্‌টর হইয়াছেন। ৫ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছোট লাটের অনুগ্রহে সব-ডেপুটি পদ পাইয়াছেন।

বিলাত যাত্রা—বরদার গুইকুমার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শীঘ্র বিলাত গমন করিবেন।

উচ্চাঙ্গের বিবাহ—কুচবিহারের মহারাজার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের পুত্র সিবিলিয়ান্‌ জ্যোৎস্না ঘোষালের শুভ বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। নির্ব্বিঘ্নে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হউক।

বিজ্ঞান রহস্য।

সমুদ্রের বিস্তার ও গভীরতা।

স্থল ও জলময়ী পৃথিবীর স্থলভাগাপেক্ষা জলভাগ অনেক অধিক। এখনকার বৈজ্ঞানিক গণনানুসারে স্থলাংশের পরিমাণ প্রায় পাঁচকোটি দশলক্ষ বর্গ মাইল, কিন্তু জলাংশের পরিমাণ তের কোটি সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল; সুতরাং জলভাগ স্থলভাগাপেক্ষা আড়াই গুণেরও অধিক। ভূগোলের আধুনিক নিয়মানুসারে জলখণ্ড প্রধান পঞ্চ বিভাগে বিভক্ত। এই পাঁচটী,

জলভাগ মহাসাগর নামে খ্যাত। আমাদিগের পুরাণোক্ত সপ্ত সাগরের মধ্যে লবণ সাগর আধুনিক ভারত মহাসাগর বলিয়া বোধ হয়, অন্য ছয় সাগর খুঁজিয়া মিলে না। দধি ক্ষীর ইত্যাদি সাগরের অস্তিত্ব কেবল কাব্যে বা কল্পনায়—তাহা বহির্জগতের ব্যাপার নহে। পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা ভূগোল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন পাঁচটি মহাসাগরের নাম কি কি। আসিয়া ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার আয়তন ছয় কোটি সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল, ইহার আকার ডিম্বের ন্যায়। তৎপরে, আতলাস্তিক মহাসাগর। ইহা দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত, পরিমাণ তিন কোটি দশ লক্ষ বর্গ মাইল। ইহার পূর্ব্ব দিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং পশ্চিম দিকে আমেরিকা। ভারত মহাসাগর ভারতবর্ষের নিম্নে অর্থাৎ দক্ষিণে। ইহার পশ্চিমে আফ্রিকা এবং পূর্ব্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, পরিমাণ আড়াই কোটি বর্গ মাইল। পৃথিবীর উত্তর মেরু-বেষ্টিত উত্তর মহাসাগর, পরিমাণ প্রায় ছয় কোটি; ও দক্ষিণ মেরুবেষ্টিত দক্ষিণ মহাসাগর, পরিমাণ আট কোটি বর্গমাইল। প্রশান্ত মহাসাগর যেমন আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেইরূপ ইহার গভীরতাও সর্ব্বাপক্ষা অধিক। ইহার গভীরতম খাদ ২৯,৪০০ হাত। নদী ও তড়াগাদির গভীরতা যেমন মধ্যস্থলেই অধিক হইয়া থাকে, সমুদ্রের গভীরতা সেরূপ নহে। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে মহাসমুদ্রের গভীরতম খাদ স্থলের নিকট। জাপানের উত্তর পূর্ব্ব কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের স্থল হইতে কেবল ৫৪ ক্রোশ দূরের সমুদ্র-খাত ৪৬৫৫ ফেদম অর্থাৎ ২৭০০০ পাদ, কিন্তু ইহার ৩০ ক্রোশ উত্তর বা পূর্ব্বে তাহা স্বল্পগাধ ও অগভীর। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর উপকূল হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে সমুদ্রের গভীরতা ৪১৭৫ ফেদম। অন্যান্য স্থানেও স্থল হইতে অল্প দূরেই সমুদ্রের গভীরতম খাদ। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতার গড় পরিমাণ ২৫৮০ ফেদম* ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতা কিঞ্চিদূন ২৪০০ ফেদম। প্রশান্ত মহাসাগরই সকল সাগর অপেক্ষা গভীর। পৃথিবীর সমস্ত মৃত্তিকা ইহাতে ঢালিয়া দিলে ইহার সপ্তমাংশ মাত্র পূর্ণ হইতে পারে। আতলান্তিক মহাসাগর পাশ্চাত্য জাতিদিগের নিকট অধিক পরিচিত। ইউরোপ ও আমেরিকার পোত সকল নিয়ত ইহার উপর দিয়া যাতায়ত করিতেছে, সুতরাং ইহার অনেক স্থানের পরিমাণ যথাযথ নির্ণীত হইয়াছে। ইহার গড় পরিমাণ ২২০০ ফেদম। ভারত মহাসাগরের অনেক অংশ দ্বীপসঙ্কুল ও মগ্ন পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। অনেকে অনুমান করেন যে, সিংহলের দক্ষিণ হইতে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত একটী বিস্তীর্ণ নগশ্রেণী আছে ও তাহার দক্ষিণেই এক বিশাল ভূখণ্ড ছিল, তাহা কয়েক সহস্র বর্ষ মাত্র জলমগ্ন হইয়াছে। সমুদ্রের জল হ্রাস

* ৬ ফিট বা ৪ হাতে এক ফেদম।

হইলে অদ্যাপিও স্থানে স্থানে মগ্ন নগরের ধ্বংস-চিহ্ন সকল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যবদ্বীপের মহামেরুর অগ্ন্যুৎপাতে যখন তত্রত্য এক বিশাল ভূমিখণ্ড সমুদ্র-গর্ভসাৎ হয়, সেই সময়ে অনেক দূর সমুদ্রগর্ভে একটী নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হয়, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৌদ্ধ মূর্ত্তি ও সভ্যতা-পরিজ্ঞাপক অনেক বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ভারত মহাসাগরের গড় গভীরতা দুই সহস্র ফেদম। উত্তর ও দক্ষিণমহাসাগর সর্ব্বদা তুষারাচ্ছন্ন থাকাতে তথায় যাতায়াতের অসুবিধা নিবন্ধন অতি অল্প স্থানই আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের গভীরতা নির্ণয়েরও সুবিধা নাই। তবে অন্যান্য মহাসাগরের ন্যায় তাহাদের গভীরতা প্রশান্ত মহাসাগরের অপেক্ষা অধিক হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

লোক-মাতা ইবের* সমাধি-মন্দির।

মেক্কা বন্দরের সন্নিহিত জিডিয়া একটি প্রধান তীর্থস্থান। এখানে লোকমাতা ইবের সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। একটি প্রাচীন মন্দিরের প্রস্তর-ছাদ ভেদ করিয়া একটি প্রকাণ্ড তাল বৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে; তাহারই নিম্নে আদি মাতা ইবের সমাধি। বৃক্ষটী আতপত্রের ন্যায় দিবারাত্রি বৃষ্টি-হিমাতপ হইতে পবিত্র-সমাধি ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে। সমাধি-ক্ষেত্র সমুচ্চ শ্বেত প্রস্তরময় প্রাকারে বেষ্টিত। প্রতি সপ্তম বৎসরে এখানে এক একটি বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। দূর দূরান্তর হইতে অনেক যাত্রী এই সময় সমাধি-মন্দির সন্দর্শনার্থ আগমন করে। বিশেষতঃ জুনের তৃতীয় দিবস অতি পবিত্র দিন। এই দিন এবেলের† মৃত্যু হয়। কেইন তদীয় ভ্রাতা এবেলকে এই স্থানে বধ করিয়া পৃথিবীকে সর্ব্বপ্রথম শোণিতে কলঙ্কিত করে। এইদিন অনেক ভক্ত যাত্রীর আগমন হয়। মন্দিরের দ্বার চন্দ্রাতপের ন্যায় কবরের উপরে উদ্‌ঘাটিত হইয়া সমস্ত রজনী খোলা থাকে এবং নিশীথ-সময়ে সমাধি হইতে গম্ভীর শোকার্ত্ত-নাদ উত্থিত হয়, ভক্তবৃন্দ ইহা স্পষ্ট শুনিতে পান। আরবদিগের বিশ্বাস যে ঐ স্থানে এবেলের শবও নিহিত আছে। এই দিন তাঁহার প্রেতাত্মা সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। আরব্য পুরাণে উক্ত আছে যে ইব ২০০ পাদ অর্থাৎ কিঞ্চিদূন ১৩৪ হস্ত দীর্ঘ ছিলেন। সম্প্রতি

---

* ইহুদী ও মুসলমানদিগের মতে ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রথম মনুষ্য আদম এবং প্রথম রমণী ইব। আর সকল মানব ইহাঁদেরই সন্তান।

† আদম ও ইবের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কেইন ও কনিষ্ঠ এবেল।

ফরাসী বিজ্ঞান সভার একজন কোবিদ-প্রবর এই উপাখ্যানের সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া লিখিয়াছেন যে, আদম এবং ইব উভয়ের দেহই দুই শত পাদ পরিমিত ছিল। ইহাদিগের বাসস্থান পবিত্র ইদন-উদ্যানে (garden of Eden) কর্ণ নামক একটী স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানটী বাগদাদ হইতে ফাও নগরে যাইবার পথে সাটেল আরব (টাইগ্রিস) নদের উপকূলে অবস্থাপিত। কর্ণও আরবদিগের একটী তীর্থস্থান। সেখানে তাহারা মিলিত হইয়া উৎসব করে।

ধূলিকণা।

বায়ু-হিল্লোলে ধূলিকণা পরিচালিত হইয়া প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে পরিবর্ষিত হইতেছে। ঘূর্ণবাত্যানীত ধূলিরাশি যখন গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং সূক্ষ্মতর বায়ুমণ্ডল ভেদে অসমর্থ হইয়া চৌদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তখনকার দৃশ্য যেমন ভয়ানক, তাহার ফলও তদ্রূপ অনিষ্টকর। যাঁহারা নগরে বাস করেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন রাজপথের সমস্ত না হউক, অধিকাংশ ধূলি প্রবল বায়ু সহকারে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কেবল গৃহসজ্জা বিকৃত ও অঙ্গনাদি অপরিষ্কৃত করে না, ভক্ষ্য দ্রব্যাদিও স্পর্শ করিয়া ভোজনের ব্যাঘাত করে, ও শরীরে সংলগ্ন হইয়া ক্লেদকর ও ক্লেশকর হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের, বিশেষতঃ প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী স্থলের তো কথাই নাই। তথায় নিয়ত ধূলিরাশি উত্থিত ও বর্ষিত হইয়া কেবল মনুষ্যের নয়—পশু, পক্ষী ও উদ্ভিদ প্রভৃতিরও পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে উত্তপ্ত ধূলিরাশি অগ্নিময় বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে থাকে। এই সকল স্থূল ধূলির ব্যাপার। কিন্তু প্রত্যেক সমীরহিল্লোলে যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সূক্ষ্মতম ধূলিকণা অনবরত উত্থিত ও পতিত হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা দৃশ্যমান হয় না। তাহার কিয়দংশ মাত্র বাতায়নস্থ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা দৃষ্ট হইলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিবিধ আকারের ধূলিকণা নৃত্য করিতে করিতে আমাদিগের গৃহসামগ্রী সকল ছাইয়া ফেলিতেছে, পানীয় ও ভোজ্যে মিশ্রিত হইয়া খাদ্যের গুণের পরিবর্ত্তন করিতেছে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যোগে দেহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নানা ব্যাধির আকর হইয়া আয়ু হ্রাস করিতেছে। আবার অণুবীক্ষণ সহকারে যদি এই ধূলিকণার ব্যবহার সন্দর্শন করা যায়, তাহা হইলে অবাক্ হইতে হয়। আমরা ওতঃপ্রোতঃ পরিব্যাপ্ত ধূলিরাশির মধ্যে যে কি প্রকারে জীবিত আছি, তাহা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি না। বাস্তবিক এই ভূমণ্ডলাচ্ছাদক বায়ুমণ্ডল ধূলিরাশি ভিন্ন আর কিছুই নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আমরা বায়ুজীবী, সুতরাং ধূলিজীবী বলিলেও অসঙ্গত হয় না। অপর পক্ষে আমাদিগের শরীর ধূলিময় এবং খাদ্যও ধূলির বিকার, সুতরাং ধূলি হইতে আমাদিগের অনিষ্টাশঙ্কা কল্পনা মাত্র।

যে ধূলা হইতে এত অনিষ্টাশঙ্কা, সেই ধূলা হইতে জগতের কত প্রকার মহৎ কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে। করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা যে কি অনির্ব্বচনীয় কৌশলে এই জগতের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা কে নির্ণয় করিতে সমর্থ? ধূলিকণা না থাকিলে অনিলে জলাংশের সম্ভাবনা থাকিত না; কুজ্ঝটিকা, বৃষ্টি, তুষার প্রভৃতি কিছুই হইত না; পৃথিবীর উপরিভাগ নিরবচ্ছিন্ন কেবল শুষ্ক মৃত্তিকায় আবৃত থাকিত। বায়ুমণ্ডলে অহরহ যে সকল বিচিত্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, ধূলিকণা ব্যতীত তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হইত না। আমরা কখন কখন নভোমণ্ডলের যে উজ্জ্বল সুনীল বর্ণ দেখিয়া নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করি, তাহাও ধূলিকণার কল্যাণে। সূর্য্যের সূক্ষ্মতম কিরণকণা ও সূক্ষ্ম আলোক-তরঙ্গ সুনীল বর্ণের। সূক্ষ্মতম ধূলিকণা বায়ুর উপরিস্তরে চালিত হইলে উক্ত কিরণকণা স্পর্শে নীলবর্ণ হয়, তাহাই আমাদিগের নয়নমণিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত স্থূলালোক-তরঙ্গ হরিত, পীত, ও লোহিত; অপেক্ষাকৃত স্থূল ধূলিকণাও তাহা স্পর্শ করিয়া তৎ তৎ রঙ্গের হইয়া যায়। স্থূল ধূলি ধূসরবর্ণ। পৃথিবীর উচ্চ স্থলে সূক্ষ্ম ধূলির আবির্ভাব, সুতরাং তথায় রঙ্গেরও বৈচিত্র লক্ষিত হয়। উচ্চতম পর্ব্বতশিখরের উপরিস্থ নভঃ সুনীলবর্ণ বোধ হয়—যেন তথায় ধূলি নাই, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্ন দেশে স্থূল ধূলির প্রাচুর্য্য হেতু ধূলির" বর্ণ দৃষ্ট হয়। শুষ্ক বায়ু না হইলে সূক্ষ্মধূলিকণা ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং বায়ুমণ্ডলের উপরিতন স্তর নিয়ত নীলবর্ণে অনুরঞ্জিত। এই সূক্ষ্ম ধূলিকণা জলকণার সহিত বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করিতে করিতে যখনি শীতল হয়, তখনি গাঢ় হইয়া মেঘাকারে পরিণত হয় এবং অবশেষে বারিধারা সহিত বর্ষিত হইয়া ধরাতল সিক্ত করিয়া পৃথিবীর মহোপকার সংসাধন করিয়া থাকে।

যাঁহারা মরুদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম ধূলিকণার অত্যদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন ও জগদীশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে বিশেষ স্থানের বিশেষ অভাব পূরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া নিরস্ত হইতে পারেন না। আমরা এক সময় গ্রীষ্মের মধ্যভাগে রাজপুতানায় গিয়াছিলাম। গ্রীষ্মকালে এখানকার মরুপ্রদেশ দিবারাত্রি উত্তপ্ত হইয়া থাকে, একটু মেঘের সঞ্চার হইলে তাহা কোথায় উড়িয়া যায়, সুতরাং বৃষ্টিপাতের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। এক দিন গ্রীষ্মের এমন প্রখরতা যে বোধ হইল সপ্ত সূর্য্য উদয় হইয়াছে। গৃহপ্রাচীর, গৃহসামগ্রী, শয্যা যাহা স্পর্শ করি, উত্তপ্ত।

রাত্রিকালেও বায়ুহিল্লোল অগ্নিময়। জ্যোৎস্নাময় রাত্রি। রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দশদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইল। অন্ধকার গাঢ় হইতে এমন গাঢ়তর, যে নিজের হস্তপদ নিজের দৃষ্টি-গোচর হয় না। ইহা কি? প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, সে দেশের আঁধি বা সূক্ষ্ম ধূলাবৃষ্টি। এই আঁধির পর বায়ু এমন ঠাণ্ডা হইল যেন ভারী এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পরে সমস্ত দিন বেশ স্নিগ্ধ বোধ হইল। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জল দ্বারা যে কার্য্য করেন, জলাভাবে ধূলা দ্বারাও তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন!! তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাভারতের কথা।*

পুরা কালে ছিলা রাজা ভরত প্রবীণ,
যাঁ'হতে ভারতবর্ষ খ্যাত চির দিন।
তাঁর বংশধর কুরু পুরুষপ্রধান,
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যাঁ'হতে বাখান।
কুরু-কুলতিলক শান্তনু শান্ত ধীর,
যাঁর পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম মহাবীর;
প্রপৌত্র তাঁহার তিন খ্যাত তিনপুর,
জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, কনিষ্ঠ বিদুর।
অন্ধ বলি ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য না লভিল,
রাজা হয়ে পাণ্ডু প্রজাসকলে পালিল।
ধৃতরাষ্ট্র শত-পুত্র, জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন,
অধার্ম্মিক ঘোর ক্রূর পাষণ্ড দুর্জন,
অনুজ সকল গুণে তাহার মতন।
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চ—পাঁচটী রতন।—
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ সবাকার,
দ্বিতীয় তনয় ভীম বীর অবতার।
তৃতীয় অর্জ্জুন ধরাধামে নর-দেব,
মাদ্রীপুত্র কনিষ্ঠ নকুল সহদেব।
ভাগ্যদোষে পাণ্ডু রাজা অকালে মরিল,
কনিষ্ঠা মহিষী মাদ্রী সহমৃতা হৈল॥
জ্যেষ্ঠা রাণী কুন্তী পঞ্চ শিশু কোলে লয়ে,
বঞ্চেন দুঃখেতে কাল অন্ধের আলয়ে।
ক্রূরমতি দুর্য্যোধন সদা ছিদ্র ধরে,
পাণ্ডবনিধন তরে নানা যুক্তি করে,—
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ হয় তবে তার,
পাণ্ডবের মৃত্যু বিনা চিন্তা নাহি আর।
প্রধান সহায় কর্ণ—অঙ্গদেশ-পতি,
মাতুল শকুনি আর অন্ধ দুষ্টমতি;—
মন্ত্রণা করিয়া শেষে পাণ্ডুপুত্রগণে,
পাঠায় বারণাবতে জননীর সনে।
কৌশলে গালার ঘর করিয়া নির্ম্মাণ
নিরূপিল তাহাদের তরে বাসস্থান।
অর্দ্ধ নিশাকালে, যবে রহিবে নিদ্রিত,
অগ্নি দিয়া পোড়াইয়া মারিবে নিশ্চিত।
বিদুরের সাহায্যে বিপদে হয়ে পার,
পলাইয়া রক্ষা পায় পাণ্ডু-পরিবার।
দ্বাদশ বৎসর করি অরণ্যে ভ্রমণ,
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে করিলা গ্রহণ।
এক লক্ষ রাজা এসেছিল স্বয়ম্বরে,
সবাকারে ভীমার্জ্জুন জিনিল সমরে।
মাতার আদেশ আর ধাতার লিখন,
দ্রৌপদীরে বিবাহ করিলা পঞ্চজন।

আমরা বায়ুজীবী, সুতরাং ধূলিজীবী বলিলেও অসঙ্গত হয় না। অপর পক্ষে আমাদিগের শরীর ধূলিময় এবং খাদ্যও ধূলির বিকার, সুতরাং ধূলি হইতে আমা-দিগের অনিষ্টাশঙ্কা কল্পনা মাত্র।

যে ধূলা হইতে এত অনিষ্টাশঙ্কা, সেই ধূলা হইতে জগতের কত প্রকার মহৎ কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে। করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তা যে কি অনির্ব্বচনীয় কৌশলে এই জগতের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা কে নির্ণয় করিতে সমর্থ? ধূলিকণা না থাকিলে অনিলে জলাংশের সম্ভাবনা থাকিত না; কুজ্ঝটিকা, বৃষ্টি, তুষার প্রভৃতি কিছুই হইত না; পৃথিবীর উপরিভাগ নিরবচ্ছিন্ন কেবল শুষ্ক মৃত্তিকায় আবৃত থাকিত। বায়ুমণ্ডলে অহরহ যে সকল বিচিত্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, ধূলি-কণা ব্যতীত তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হইত না। আমরা কখন কখন নভোমণ্ডলের যে উজ্জ্বল সুনীল বর্ণ দেখিয়া নয়নের পরিতৃপ্তি সাধন করি, তাহাও ধূলি-কণার কল্যাণে। সূর্য্যের সূক্ষ্মতম কিরণ-কণা ও সূক্ষ্ম আলোক-তরঙ্গ সুনীল বর্ণের। সূক্ষ্মতম ধূলিকণা বায়ুর উপরিস্তরে চালিত হইলে উক্ত কিরণকণা স্পর্শে নীল-বর্ণ হয়, তাহাই আমাদিগের নয়নমণিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত স্থূলালোক-তরঙ্গ হরিত, পীত, ও লোহিত; অপেক্ষাকৃত স্থূল ধূলিকণাও তাহা স্পর্শ করিয়া তৎ তৎ রঙ্গের হইয়া যায়। স্থূল ধূলি ধূসরবর্ণ। পৃথিবীর উচ্চ স্থলে সূক্ষ্ম ধূলির আবির্ভাব, সুতরাং তথায় রঙ্গেরও বৈচিত্র লক্ষিত হয়। উচ্চতম পর্ব্বতশিখরের উপরিস্থ নভঃ সুনীলবর্ণ বোধ হয়—যেন তথায় ধূলি নাই, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্ন দেশে স্থূল ধূলির প্রাচুর্য্য হেতু ধূলির বর্ণ দৃষ্ট হয়। শুষ্ক বায়ু না হইলে সূক্ষ্মধূলিকণা ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং বায়ুমণ্ডলের উপরি-তন স্তর নিয়ত নীলবর্ণে অনুরঞ্জিত। এই সূক্ষ্ম ধূলিকণা জলকণার সহিত বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করিতে করিতে যখনি শীতল হয়, তখনি গাঢ় হইয়া মেঘাকারে পরিণত হয় এবং অবশেষে বারিধারা সহিত বর্ষিত হইয়া ধরাতল সিক্ত করিয়া পৃথিবীর মহোপকার সংসাধন করিয়া থাকে।

যাঁহারা মরুদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্ম ধূলিকণার অত্যাদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন ও জগদীশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে বিশেষ স্থানের বিশেষ অভাব পূরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া নিরস্ত হইতে পারেন না। আমরা এক সময় গ্রীষ্মের মধ্যভাগে রাজপুতানায় গিয়া-ছিলাম। গ্রীষ্মকালে এখানকার মরু-প্রদেশ দিবারাত্রি উত্তপ্ত হইয়া থাকে, একটু মেঘের সঞ্চার হইলে তাহা কোথায় উড়িয়া যায়, সুতরাং বৃষ্টিপাতের কিছু-মাত্র সম্ভাবনা থাকে না। এক দিন গ্রীষ্মের এমন প্রখরতা যে বোধ হইল সপ্ত সূর্য্য উদয় হইয়াছে। গৃহপ্রাচীর, গৃহসামগ্রী, শয্যা যাহা স্পর্শ করি, উত্তপ্ত।

রাত্রিকালেও বায়ুহিল্লোল অগ্নিময়। জ্যোৎস্নাময় রাত্রি। রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দশদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হইল। অন্ধকার গাঢ় হইতে এমন গাঢ়তর, যে নিজের হস্তপদ নিজের দৃষ্টি-গোচর হয় না। ইহা'কি? প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, সে দেশের আঁধি বা সূক্ষ্ম ধূলাবৃষ্টি। এই আঁধির পর বায়ু এমন ঠাণ্ডা হইল যেন ভারী এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পরে সমস্ত দিন বেশ স্নিগ্ধ বোধ হইল। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জল দ্বারা যে কার্য্য করেন, জলাভাবে ধূলা দ্বারাও তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন!! তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

মহাভারতের কথা।*

পুরা কালে ছিলা রাজা ভরত প্রবীণ,
যাঁ'হতে ভারতবর্ষ খ্যাত চির দিন।
তাঁর বংশধর কুরু পুরুষপ্রধান,
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যাঁ'হতে বাখান।
কুরু-কুলতিলক শান্তনু শান্ত ধীর,
যাঁর পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম মহাবীর;
প্রপৌত্র তাঁহার তিন খ্যাত তিনপুর,
জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, কনিষ্ঠ বিদূর।
অন্ধ বলি ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য না লভিল,
রাজা হয়ে পাণ্ডু প্রজাসকলে পালিল।
ধৃতরাষ্ট্র শত-পুত্র, জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন,
অধার্ম্মিক ঘোর ক্রূর পাষণ্ড দুর্জন,
অনুজ সকল গুণে তাহার মতন।
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চ—পাঁচটী রতন।—
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ সবাকার,
দ্বিতীয় তনয় ভীম বীর অবতার।
তৃতীয় অর্জ্জুন ধরাধামে নর-দেব,
মাদ্রীপুত্র কনিষ্ঠ নকুল সহদেব।
ভাগ্যদোষে পাণ্ডু রাজা অকালে মরিল,
কনিষ্ঠা মহিষী মাদ্রী সহমৃতা হৈল॥
জ্যেষ্ঠা রাণী কুন্তী পঞ্চ শিশু কোলে লয়ে,
বঞ্চেন দুঃখেতে কাল অন্ধের আলয়ে।
ক্রূরমতি দুর্য্যোধন সদা ছিদ্র ধরে,
পাণ্ডবনিধন তরে নানা যুক্তি করে,—
নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ হয় তবে তার,
পাণ্ডবের মৃত্যু বিনা চিন্তা নাহি আর।
প্রধান সহায় কর্ণ—অঙ্গদেশ-পতি,
মাতুল শকুনি আর অন্ধ দুষ্টমতি;—
মন্ত্রণা করিয়া শেষে পাণ্ডুপুত্রগণে,
পাঠায় বারণাবতে জননীর সনে।
কৌশলে গালার ঘর করিয়া নির্ম্মাণ
নিরূপিল তাহাদের তরে বাসস্থান।
অর্দ্ধ নিশাকালে, যবে রহিবে নিদ্রিত,
অগ্নি দিয়া পোড়াইয়া মারিবে নিশ্চিত।
বিদুরের সাহায্যে বিপদে হয়ে পার,
পলাইয়া রক্ষা পায় পাণ্ডু-পরিবার।
দ্বাদশ বৎসর করি অরণ্যে ভ্রমণ,
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে করিলা গ্রহণ।
এক লক্ষ রাজা এসেছিল স্বয়ম্বরে,
সবাকারে ভীমার্জ্জুন জিনিল সমরে।
মাতার আদেশ আর ধাতার লিখন,
দ্রৌপদীরে বিবাহ করিলা পঞ্চজন।

পূর্ব্ব অপরাধ স্মরি লজ্জিত হইয়া,
তোষিল পাণ্ডবে অন্ধ রাজ্য ভাগ দিয়া।
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী করিয়া নির্ম্মাণ,
রাজ্য কৈল পঞ্চ ভাই ইন্দ্রের সমান।
মহাযজ্ঞ রাজসূয় অনুষ্ঠানফলে
সার্ব্বভৌম সম্রাট্ পাণ্ডব ধরাতলে।—
হইয়া অস্থিরচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন,
পাশা ক্রীড়া ছলে হ'রে নিল রাজ্য ধন;
করি পণ ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস—
একবর্ষ অজ্ঞাত না হইবে প্রকাশ;
প্রকাশে পুনশ্চ বনবাস সুনিশ্চয়,
কপট পাশায় পাণ্ডবের পরাজয়।
বার বর্ষ নারী সনে ভ্রমি বনে বনে,
বিরাটে অজ্ঞাত বর্ষ বঞ্চে পঞ্চ জনে।
সময় কাটিয়া দেশে দিলা দরশন,
রাজ্যভাগ চাহিলা—না দিল দুর্য্যোধন।
অবশেষে মাগিলেন গ্রাম পাঁচখানি,
তাহাও না দিল দুর্য্যোধন অভিমানী।
"তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রভাগে যত ভূমি ধরে,
বিনা যুদ্ধে না দিব" কহিল দম্ভভরে।
অগত্যা পাণ্ডবগণ মহা ক্ষুণ্ণমন,
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা করে আয়োজন।
একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন,
কুরুক্ষেত্রে অষ্টাদশ দিন ব্যাপী রণ।
মহারণে কুরুবংশ হইল সংহার,
ধর্ম্মবলে জয়ী পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপিলা,
মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ কত অনুষ্ঠিলা;
অবশেষে রাজ্য দিয়া পৌত্র পরীক্ষিতে,
স্বর্গ আরোহণ কৈলা দ্রৌপদী সহিতে।
ভারত পঙ্কজ রবি মহাকবি ব্যাস,
মহাভারতের কথা করিলা প্রকাশ। *

* ইতঃপূর্ব্বে মহাকাব্য রামায়ণের সংক্ষিপ্ত কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য মহাভারতের কথা সঙ্কলিত হইল। যাঁহারা সমস্ত ভারত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা এতদ্দ্বারা মূল আখ্যায়িকা অবগত হইতে পরিবেন।

বলেন্দ্র ও বলবতী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বলবতী দেখিল আর রক্ষা নাই। তখন সে জীবনের আশা ত্যাগ করিল—ভাবিল এ দুঃখাবহ অসার জীবন আর চাহি না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা করে।

পরিচারিকা বলবতীর আহারের জন্য ক্ষীর সর নবনী লইয়া আসিল, দাসী কুসুম-বাসিত শীতল জল আনিয়া দিল।

বলবতী কহিল "তোমরা এ সব লইয়া যাও, আজ আমি কিছুই খাইব না। দাসীরা চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে একজন বৃদ্ধা আসিয়া কহিল "বাছা কিছু খেলে না?"

বলবতী। না, আহারে আর ইচ্ছা নাই।

বৃদ্ধা তখন অতি যত্নের সহিত সেই বিমুক্ত কুঞ্চিত কৃষ্ণ অলকাবলী বিন্যাস করিয়া বিকশিত সুচারু পুষ্পে খচিত

করিয়া দিল। বলবতী কেশ খুলিয়া সে সব দূরে নিক্ষেপ করিল—কহিল এ সবে আমার আর কোন দরকার নাই।

বৃদ্ধা। কাল তোমার বলভদ্রের সহিত শুভ বিবাহ হইবে, আজ তোমার বাছা, বড় আমোদের দিন; কিন্তু প্রফুল্ল না হইয়া তুমি বিষণ্ণ হইয়াছ কেন? তুমি মা যেমন রূপবতী, তেমনি বিদ্যাবতী ও গুণবতী; স্বামীও তদ্রূপ লাভ করিতেছ, তবে তোমার এ মনোমালিন্যের অর্থ কি?

বলবতী। মা, আমি বলভদ্রের এক-জন কুটুম্ব পরিবারের কন্যা। পিতৃমাতৃ-হীনা নিরাশ্রয়া অনাথা হইলে দয়াপরবশ হইয়া তুমিই আমাকে এই গৃহে আনয়ন কর। তখন আমি সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা, আর বলভদ্র দশমবর্ষীয় বালক ছিল। বল-ভদ্রের মাতা নাই, তুমিই আমাদের উভয়ের মাতৃস্থানীয়া। বলভদ্রের অনু-গ্রহে তোমার যত্নে রাজকন্যার ন্যায় সুখে লালিতা পালিতা হইয়াছি। কোন দিন কোন কষ্টানুভব করি নাই। বলভদ্র ও তুমি আমাকে এ গৃহে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া রাখিয়াছ। আজ দশ এগার বৎসর তোমার নিকট রহিয়াছি, তোমাকে মাতার সমান যত্ন ও ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু এক দিনের তরেও মনের কথা তোমাকে জানিতে দেই নাই।

বলবতী ক্ষণকালের জন্য নীরব হইল।

বৃদ্ধা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

বলবতী। মা, আগামী কল্য আমার জীবনের শেষ দিন বলিয়া জানিবে।

বৃদ্ধা বলবতীর মনোভাব বুঝিল—কহিল বুঝিলাম বলভদ্রকে বিবাহ করা তোমার অভিপ্রায় নহে।

বলবতী। আমি বলভদ্রকে বিবাহ করিব না, বরং প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে একবার আমি বড় পীড়িত হইয়াছিলাম, সে সময় বিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া দারজিলিং লইয়া যাও। সে স্থানে গিয়া অল্প দিনেই আমার ব্যাধির উপশম হইল। প্রত্যহ প্রভাতসময়ে ও সায়াহ্ন-কালে তোমার সঙ্গে পর্ব্বতপথে ভ্রমণ করিতাম।

সেই সময় একজন নর-দেবতার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমাদের বাসার নিকটবর্ত্তী স্থানেই তাঁহার ভদ্রাসন বাড়ী ছিল। তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইত, ক্রমে ক্রমে সম্বন্ধ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল। প্রথমে তাঁহার চক্ষে চক্ষু সংলগ্ন হইলে লজ্জায় লজ্জাবতী লতার ন্যায় গুটা-ইয়া পড়িতাম, পরিশেষে সেই চক্ষুতে আপন চক্ষু সংস্থাপন করিবার জন্য অধীর হইতাম। ক্রমে ক্রমে আমার সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইল। তাঁহার পরিচয়ে আমি জানিলাম তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বংশের কুলপ্রদীপ, এক্ষণে দরিদ্র। আমার পরি-চয় তিনি জানিলেন। তোমার অগোচরে আমরা সুগন্ধপূর্ণ পুষ্পিত কাননতলে নির্জ্জন গিরি-উপত্যকায় উপবেশন করিয়া উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া

থাকিতাম। কখন বা তিনি আপন অঙ্কে আমার মস্তক তুলিয়া লইতেন, কত মধুর কথা কহিতেন, আপন চম্পকাঙ্গুলী দ্বারা ধীরে ধীরে আমার কেশ বিন্যাস করিয়া দিতেন। আমি হতভাগিনী সেই স্বর্গীয় সুখে বিভোর হইয়া কত সুখের স্বপ্ন দেখিতাম। কিন্তু আমার সে সুখের স্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল। সে সুখের মন্দির অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল। তুমি আমাকে লইয়া গৃহে আসিলে। ঐ যে প্রশান্ত সমুদ্র-তট, ঐখানে তিনি আমাকে আর একবার দেখা দিয়াছিলেন। আমি তখন তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কহিলেন কিছু দিন অপেক্ষা কর, এই নির্জ্জন সমুদ্র-তটে পুনরায় আমার দেখা পাইবে। তখন আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। কিন্তু কৈ সেত অনেক দিনের কথা হইল, নিত্যইত আমি সেই সমুদ্র-তটে গিয়া উপবেশন করি, নিত্যইত হৃদয়-দেবতার উপাসনা করি—অনুসন্ধান করি, কিন্তু এক দিনওত দেখা পাই না।

অকস্মাৎ বৃদ্ধার প্রাণ কম্পিত হইল—সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল—আপন অজ্ঞাতে অপাঙ্গদেশে অশ্রুজল বহিল। সে বলবতীকে সান্ত্বনা করিয়া বলভদ্রের নিকটে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আজ বলবতীর প্রাণের মধ্যে চিৎকারের উপর চিৎকার উঠিতেছে। বলেন্দ্র! তুমি কোথায়? বলেন্দ্র! তুমি কোথায়? বলেন্দ্র তুমি একবার আসিয়া দেখ তোমার বলবতীর কি শোচনীয় অবস্থা। কাল তাহার শুভ বিবাহ, কাল তাহার মৃত্যু। কিন্তু মরিতে সে ভয় পায় না, তোমাকে যে একবার না দেখিয়া মরিতে হইবে তাহাতেই সে এত কাতর। বলবতী তখন স্খলিত-অঞ্চলে, বিমুক্তকেশে বলেন্দ্রকে স্মরণ করিয়া কতই কাঁদিল, যুক্তকরে ভক্তিভরে ঈশ্বরকে ডাকিয়া কতই কাঁদিল। কিন্তু প্রকাশ্যে কেহই তাহাকে দেখা দিল না, কেবল তাহার দুর্ব্বল মন নব বলে সতেজ হইল। সে উঠিল।

তখন রজনী গভীরা, কিন্তু আকাশে চন্দ্র নাই, তারা নাই। আকাশ ঘোর জলদাবৃত, সময় সময় বিদ্যুদ্বিকাশ হইয়া অন্ধকারকে গাঢ় অন্ধকারে পরিণত করিতেছে।

বলবতী নৈরাশ্য-পীড়িত যন্ত্রণাময় হৃদয় লইয়া উঠিল, ধীরন্যস্ত পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহির হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বলবতী চলিল—তারাশূন্য মেঘাবৃত তমিস্রাময় রজনী নিরীক্ষণ করিয়া সে ভয় পাইল না বা পশ্চাৎপদ হইল না। ক্ষণকাল পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রবল বায়ুভরে বৃক্ষশ্রেণী প্রকম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে ভয় পাইল না বা পশ্চাৎপদ হইল না। মনোহর বিদ্যুৎ-রেখা-বিশিষ্ট মেঘ সকল তাহার সেই বিদ্যুৎ তুল্য

মধুর মূর্ত্তিখানি শত্রুর চক্ষুপথ হইতে আবৃত করিয়া রাখিল।

সে চলিল—একাকিনী চলিল। তাহার সেই বিষাদ-কাতর অশ্রুসিক্ত বিবর্ণ মুখের পানে কেহ চাহিল না—কেহ তাহাকে ফিরাইতে আসিল না। হৃদয়ের অতিরিক্ত আবেগে অস্থির হইয়া সে ঘোর অন্ধকারাবৃত বর্ত্মে ছুটিয়া যাইতে লাগিল।

যখন রজনী প্রভাত হইল, তখন সে বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তথাপি তাহার ভয় দূর হইল না। শরীরে শক্তি নাই—হৃদয়ে বল নাই, দুর্নিমিত্ত-জনিত বিষাদে তাহার মুখারবিন্দ ম্লান হইয়াছে, তথাপি সে পথ চলিতে লাগিল।

সমস্ত দিবস হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বলবতী এক গহন বিপিনে প্রবেশ করিল। সেখানে বলবতী তরুকুসুম ও কিশলয় দ্বারা পূজিত হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইল। কুসুমোদ্ভাসিত গিরিকাননমধ্যে ফুল্লচন্দ্রিকা-মণ্ডিতা মধুযামিনীর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপতলে আলুথালুবসনা মুক্তকুন্তলা বলবতী প্রকৃত বনদেবী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন শিশির-সন্তাপ-শীর্ণা মৃণালিনীর ন্যায় অতিশয় দুঃখিতা বলবতী একাকিনী বসিয়া নানারূপ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে তাহার মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইল, সে তখন কাঁদিল। বলবতীর হৃদয়ের শিরা নিঙড়িয়া শত সহস্র ধারায় নেত্রপথ দিয়া অশ্রুজল বহিতে লাগিল। তাহার পার্শ্বদেশে কুন্দ-কুসুম মালতীফুল শোভা পাইতেছিল, তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইল না। সে তখন অবশ-শরীরে একটি নবতৃণাচ্ছন্ন স্থানে শয়ন করিল।

তখনও তাহার হৃদয় চিন্তায় বিদগ্ধ হইতেছিল। সেই মাতৃতুল্যা বন্ধার স্নেহ ভালবাসার কথা তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। সে আপনার পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করিতে চাহিল, কিন্তু স্মরণ হইল না। পিতামাতার পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণ করিতে চাহিল, ভাল স্মরণ হইল না, অস্পষ্ট মনে হইল। তৎপশ্চাৎ তাহার মনে দার্জ্জিলিঙ্গের কথা উঠিল। সেই পর্ব্বতপথ—সেই নির্জ্জন স্থান—সেই একজনের পবিত্রমূর্ত্তি মনে হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমস্ত প্রেমাদরের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। সে যে তাঁহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু গাইত—

"একটু আদর সথে, একটি * ।"

তাহাও মনে হইল। সেই নৈশ নির্জ্জন সমুদ্রতটে তাঁহার পুনরাগমন ও পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তনের কথা স্মরণ হইল। ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা হইল। স্বর্গ মর্ত্ত্য গিরি উপত্যকা বনভূমি নদ নদী সমস্ত তাহার সম্মুখে প্রবলবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেই সময় কে তাহাকে ধরিয়া তুলিল ও অতি আদরের সহিত আপনার কোলে বসাইল। (ক্রমশঃ)

শান্তি-সাধনা।

বৃথা হায়, বৃথা এ জীবন,
বৃথা সব পিপাসা কামনা,
চিরদিন ঘুরে ফিরে, বেড়াইব সিন্ধুতীরে,
এ জনমে একদিনও
তোমারে পাব না! ১।

—তবে কেন ঊষা আসে নিতি,
তবে কেন হাসে শশধর?
তুলি সোণা মুখখানি, কেন ফোটে ফুলরাণী
"বউ কথা কও" কেন
ছড়ায় সুস্বর? ২।

তবে সে বসন্ত আসে কেন
উছলিয়া শ্যামল কিরণ?—
শরতের নীলাকাশে, অত শোভা কেন হাসে?
বরষা-সুন্দরী কেন
মাতায় জীবন? ৩।

কেন তবে বাঁশীর সঙ্গীতে
কার কথা আসে যেন মনে,
মানবের কেন আশা, কেন স্নেহ ভালবাসা,
স্বরগের ছবি কেন
শিশুর আননে? ৪।

প্রাণে কেন প্রেমের বন্ধন
বুকে কেন অটল বিশ্বাস?
কেন গো অতীত-স্মৃতি, মরমে জাগায় প্রীতি?
শূন্য ঘরে লাগে কেন
দেবের নিঃশ্বাস"। ৫।

আমি যদি তোমারে পাব না,
কেন সুখ সৌন্দর্য্য ধরায়?—
জগৎ মরিয়া যাক্, শব হয়ে পড়ে থাক্
পুনঃ তার হাসি অশ্রু,
কেন সমুদায়? ৬

আমি যদি তোমারে পাব না,
জীবনের কিবা প্রয়োজন?
দুঃসহ অসহ ভার, কেন মিছা বহি আর?
কেন বহি আশা তৃষা,
সাধ' আকিঞ্চন? ৭।

বৃথা তবে মানব-জীবন—
মনুষ্যত্ব বিফল আমার?—
বিফল ভূতলে আসা, বিফল সাধনা আশা,
এ সবি বিফল শ্রম
বিশ্ব-বিধাতার?— ৮।

—না না প্রভো, তাওতো হবে না—
সে যে বড় নিদারুণ কথা,
তবে আমি ঘর বাঁধি, গড়ি, ভাঙি, হাসি, কাঁদি,
তোমাতেই মিশে যাক্
আমিত্ব মমতা। ৯।

যাহা কিছু এই অভাগার,
তাহাই তোমার কর তুমি,
"জড় দেহ কিছু নয়, জীবনের বিনিময়"
আমি যেন বেঁচে থাকি
সেই পদ চুমি। ১০।

তোমা লাগি গড়িয়া মন্দির
সঁপিব তা' জগতের তরে,
তোমারি বাতাসে হিয়া শতকাজে ঢেলে দিয়া
করিব তপস্যা তব
প্রাণ মন ভ'রে। ১১।

তোমারি সোহাগ-হাসি মেখে
ভূমণ্ডল উঠিবে হাসিয়া,
তোমারি স্নেহাশ্রুজলে, বিশ্ব ভেসে যাবে চলে,
আমি সেই মহাস্রোতে
থাকিব ডুবিয়া। ১২।
তোমা ছাড়া আমার জগতে
অণুকণা যেন গো থাকে না,
আত্ম হ'তে, দূর বিশ্বে, হেরিব তোমারি দৃশ্যে,
তোমাহীন স্বর্গে যেন
দেবতা ডাকে না। ১৩।

তবে—
বৃথা নহে সাধনা কামনা,
বৃথা নহে জীবন আমার,
তোমারে পাব না তাই, তোমাতেই মিশে যাই,
মিলন বিরহ-ভরা থাকুক আঁধার,
আমি হয়ে মিছা ফাঁকি, তোমাতেই বেঁচে থাকি,
অশান্ত পরাণে শান্তি আসুক আবার;
আমার কিছুই নাই সকলি তোমার। ১৪।

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

দেবল-রাজ।

(১৪)

যে দিন দেবনাথ পালের জননী পিত্রালয়ে গমন করেন, সেই দিন হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে দেবনাথের অদৃষ্টচক্রে যে সকল অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ও অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ বিবরণ বিবৃত হওয়া অসম্ভব। সে সকল বিষয়ের যথাযথ বর্ণন আখ্যায়িকা পাঠক পাঠিকাগণের প্রীতিপ্রদ হইবারও আশা নাই। এজন্য এই অধ্যায়ে তাহার স্থূল বিবরণ মাত্র বিবৃত হইবে।

বঙ্গের বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিভাগ সকলের মধ্যে যে দুইটি বিভাগের নাম ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ, পূর্ব্বকালে এই দুইটি বিভাগের নাম ছিল, বঙ্গ ও বগড়ী। এখনকার পরগণা সকল, তখন "চাকলা" নামে অভিহিত হইত। দেবনাথ পাল দেবলরাজ স্পর্শমণির প্রভাবে বঙ্গ ও বগড়ীর অন্তর্গত বিংশতি চাক্লার অধীশ্বর হইয়া "দেবলরাজ" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হাঙ্গরী বাঁক্, দেবগ্রাম নাম ধারণপূর্ব্বক দুর্গ ও পরিখায় পরিবেষ্টিত হইয়া দেবলরাজের রাজধানী হইয়াছিল। দেবগ্রামে এখন যে চারিটী থুব দেখা যায়, তাহাই দেবল-দুর্গের "বুরুজ" ছিল। উহার উপরিভাগ হইতে শত্রুগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষিত হইত। এককালে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ বাণী শ্রবণে লোকে যে তৃণকুটীরময় দরিদ্রাবাসকে রাজপুরী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল, দৈবচক্রে সেই আবাস সত্য সত্যই রাজপুরী হইয়াছিল। "দেওয়ান-

খানা,” “নহবৎখানা,” “হাওয়াখানা,” “আমখাস্,” অন্তরাবাস, যজ্ঞশালা, চণ্ডীমণ্ডপ, তোরণ, অশ্বশালা, গোশালা, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা, টোল, অস্ত্রাগার, কারাগার, সৈন্যাবাস ইত্যাদি বহুসংখ্য সুধাধবলিত অট্টালিকায় দেবল রাজধানী দেবগ্রাম পরিশোভিত হইয়াছিল। সহর গোবর্দ্ধনের “মানস সরোবর” এবং গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীকুণ্ড যাইবার পথবর্ত্তী “কুসুম সরোবর” অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। চতুষ্পার্শ্বে অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ঐ দুইটী স্বচ্ছসলিল সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা কেহই ভুলিতে পারেন না। দেবল দীঘিও চতুষ্পার্শ্বস্থ অট্টালিকানিচয়ে এইরূপ রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। মাতামহ রাজারাম পাল দেবলের করপ্রদ অধীন সামন্তরূপে পরিণত হইয়া “দাদা সাহেব” উপাধি ধারণপূর্ব্বক দেবলরাজের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মাতুল চতুষ্টয় রাজস্ব, সৈন্য, পূর্ত্ত ও সন্ধিবিগ্রহের সর্ব্বতোমুখী প্রভু হইয়াছিলেন। দুই ভগিনীপতি দুইটি চাক্‌লার “ক্রোরীয়ানের” পদে অধিষ্ঠিত হয়েন। এককালে যে দেবল বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও অসঙ্গতি নিবন্ধন দারপরিগ্রহে সমর্থ হন নাই, সেই দেবল, সুন্দরীগণের অগ্রগণ্যা ষট্ বরাঙ্গনার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন করপ্রদ ও মিত্রভাবাপন্ন মণ্ডলগণের নিকট হইতে ছয়টী কন্যা যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবলরাজপুরীতে ঐ দ্বাদশটী রমণীই রাজমহিষীরূপে সমাদৃতা হইয়াছিলেন। এই সকল মহিষীর মধ্যে নয় জনের গর্ভে দেবলরাজের ত্রিংশদধিক পুত্র কন্যার জন্ম হইয়াছিল। যে অবস্থায় মানবগণ “ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, কমলার কৃপায় দেবলরাজ সে অবস্থার উচ্চতম শিখরে উন্নীত হইয়াছিলেন।

যখন হাঙ্গরীবাঁকের হাঁড়ীগড়া কুমার দেবনাথ পাল দেবল রাজা হইয়াছিলেন, রাজারাম পালের কন্যা রাজমাতা হইয়াছিলেন, তখন যথাকালে একদিন রাজা ও রাজমাতায় যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, আমরা তাহা পাঠক পাঠিকার জন্য সঙ্কলন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জননী কহিলেন,—

“দেবল, তোমার ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবৎ যে চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে, ওটি কি?” দেবল এখন রাজা;—রাজোচিত শিক্ষা দীক্ষা অনেকই পাইয়াছেন। সৎ, অসৎ, উচ্চ, নীচ, বহুবিধ সঙ্গলাভ ঘটিয়াছে। রাজপদের সুখদুঃখ চিন্তা দ্বেষ ভয়াশা, সম্ভোগ ও প্রতিক্রিয়াদির সহিত বিশিষ্টরূপেই পরিচিত হইয়াছেন। জননীর প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন,—

“মা, বড় দুঃখিত হইতেছি যে, তোমার মনের মত উত্তর দিতে পারিলাম না। দৈবজ্ঞঠাকুর যখন ঐ চিহ্নকে রাজদণ্ড বলেন, তখন রাজপদকে সুখের অবস্থা বলিয়া আমার মনে ছিল। তখন ঐ অবস্থা আমার নিতান্ত দুর্লভ বলিয়াও

ধারণা ছিল। সেই জন্য তৎকালীন দুঃখ স্মরণ করিয়া উহাকে যমদণ্ড বলিয়াছিলাম। কিন্তু যমদণ্ডাপেক্ষা কোন গুরু দণ্ড আমার জানা থাকিলে, এখন ঐ চিহ্নকে তাহাই বলিতাম।" দেবল-জননী কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষিতা ও বহুল পরিমাণে বুদ্ধিমতী হইলেও স্ত্রীজাতি, সাংসারিক সুখৈশ্চর্য্য ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, সংসার ভিন্ন আর কোন অধিকতর সুখের বস্তু আছে, তাহা একবার স্বপ্নেও ভাবেন না। তাঁহার সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম, সকল দানধ্যান ব্রত নিয়মাদি সাংসারিক সুখের কামনামূলক। তাঁহার পুত্র রাজা এবং তিনি রাজমাতা, এজন্য তিনি আপনাকে এবং পুত্রকে অতিশয় সুখী মনে করিতেন। রাজপদ সুখের অবস্থা নহে, পুত্র-মুখে এই ভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ম্রিয়মাণা হইলেন। কহিলেন,—

"দেবল, রাজা হইবার পূর্ব্বে তোমার কি অবস্থা ছিল? আর এখন কি অবস্থা হইয়াছে, একবার মনে করিতে পার কি" ?

"পারিব না কেন? তখন আমার, এবং তোমার এবং দুই ভগিনীর এই চারিটীর উদরের অন্ন সংস্থান করিবার জন্য কত দুঃখ পাইতাম; কিন্তু সেই অন্ন সংস্থান হইয়া গেলে সুখের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু এখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে; অথচ একদিন স্বপ্নেও সে সুখের মুখ দেখিতে পাই না। মা, আমার মনে হয়, যে মহাপুরুষের মণি হরণ করিয়া আমি রাজা হইয়াছি, আমার মনের এই শোচনীয় অবস্থা সেই মহাপুরুষের অভিসম্পাতের ফল। যদি তাঁহার সাক্ষাৎ পাই, দেবগ্রামের রাজ-সিংহাসন তাঁহাকে অর্পণ করিয়া আমি তাঁহার তৃণকুটীরে গিয়া বাস করি। বিশেষ গত রজনীর শেষভাগে রাজত্ব সম্বন্ধীয় যে ভীষণ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি, তাহা মনে করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" এই কথা বলিতে বলিতে মহাবীর ও মহাসাহসী দেবলরাজের বদন বিষণ্ণ ও লোচন জলভারায়মান হইল। জননীও তদ্দর্শনে নীরব হইলেন। কৃষ্ণপক্ষায়া কালসন্ধ্যা আসন্ন হইল। তাঁহাদের উপবেশ প্রকোষ্ঠের বাতায়ন পার্শ্ব দিয়া একটা কালপেঁচা বিকট চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।

ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ॥"

সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গকবি ভারতচন্দ্র মহারাজ প্রতাপ আদিত্যের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যখন দিল্লীর শাসন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং তিন চারিটী ভৌমেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আপনার অধীন করপ্রদ সামন্তরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য দিল্লীর প্রধান সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ বঙ্গে আগমন করেন। তিনি প্রথমে প্রতাপ আদিত্যের সহিত সন্ধি করিবার বাসনায়

তাঁহার নিকট বিবিধ বহুমূল্য "খেলাত" প্রেরণ করেন। প্রতাপ, খেলাতের অন্তর্গত কেবল তরবালখানি রাখিয়া অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য মানসিংহের নিকট ফেরত্ পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে একখানি লিপিও প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে লিপির মর্ম্ম এই,—"দিল্লীশ্বরের প্রেরিত খেলাত প্রতাপ বামচরণস্পর্শে পবিত্র করিয়া ফেরত দিলেন এবং যমুনার জলে ধৌত করিবার জন্য তলবারখানি মাত্র রাখিলেন।" দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ আদিত্যের এই সকল কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অবধিই দেবলরাজের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সময়ে তিনি একদিন স্বপ্নযোগে অবগত হন যেন প্রতাপ আদিত্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। জননীর সহিত কথোপকথনকালে এই স্বপ্নের আভাস দেন। কাল সন্ধ্যাকাল পেচক-কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া স্বপ্ন দৃষ্ট ঘটনাকে তাঁহার সত্য বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। কেমন দৈবচক্র এবং কেমন ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য! দেবলরাজ সত্য সত্যই দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

যে দিন জননীর সহিত দেবলের কথোপকথন হইল, তাহার পরদিন মধ্যাহ্নকালে বঙ্গবিভাগীয় রাজ্য হইতে একটি অশ্বারোহী দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দূত যে পত্র আনিয়াছিল, তৎপাঠে দেবল অবগত হইলেন—তাঁহার পূর্ব্ব রাজ্যের অধিকাংশ প্রতাপ আদিত্য আত্মসাৎ করিয়াছেন। অচিরকালমধ্যেই রাজধানী আক্রমণ করিবেন। প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মানসিংহ-প্রেরিত বহুসংখ্য সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় ঐ রাজ্যে সমাগত হইতেছে। পশ্চিম দিক্ হইতে দিল্লীশ্বরের বিদ্রোহী প্রতাপকে আক্রমণ করিবার জন্য মহারথ মহারাজ মানসিংহ দেবলকে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই পত্রে মানসিংহের নামাঙ্কিত মোহর ছিল। এই পত্রের মর্ম্মসহ দেবলরাজের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ রাজধানী দেবগ্রামে ঘোষিত হইল। রণভেরি বাজিয়া উঠিল। সৈন্যমধ্যে যুদ্ধসজ্জা আবশ্যক হইল। অশ্ব, গজ, ভারবাহী উষ্ট্র গবাদি যূথে যূথে দেবগ্রামে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাজধানী অভিনব দুর্গ প্রাচীর পরিখাদি দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, তথাপি সেই সকলের পর্য্যবেক্ষণ ও পুনঃসংস্কার আরম্ভ হইল। কেননা দেবলরাজের যে দুইটী ভগিনীপতি রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার একজন প্রতাপের নিকট প্রতিপত্তি ও ধন সম্পত্তি লাভের প্রত্যাশায় প্রতাপকে দেবলের স্পর্শমণির সংবাদ দিয়াছিলেন। দেবলের অন্তঃপুর অপরিমেয় ধনরত্নে,—বিশেষতঃ পরমা সুন্দরী রমণীরত্নে পরিপূর্ণ, প্রতাপকে সে সংবাদও দিয়াছিলেন। এজন্য প্রতাপ, দেবল-রাজধানী আক্রমণ ও অন্তঃপুর লুণ্ঠন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। দেবলরাজ যুদ্ধযাত্রার কয়েক দিন পূর্ব্বে কোনও বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী দ্বারা সেই সংবাদ পাইয়াছিলেন। প্রতাপের

দুৰ্দ্ধর্ষচরিত্র দেবলরাজ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। যদি প্রতাপের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়, কি সমরভূমি হইতে রাজধানী প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে প্রতাপ তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করেন, তাহাহইলে মহিষীগণের ও অন্যান্য রাজ-পরিজনগণের কিরূপ অপমান ও বিড়ম্বনা ঘটিবে, কল্পনা-যোগে তাহাও পরিস্ফুটরূপে বুঝিয়াছিলেন। তজ্জন্যই রাজধানী ও অন্তঃপুর পরিরক্ষণের বিশেষ সুব্যবস্থা করেন। অভিযানের কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। জননীসহ মহিষীগণ ও পুত্র কন্যাগণকে একত্র আহ্বান করিলেন। সকলকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া কহিলেন "জননি, মহিষীগণ এবং পুত্র কন্যাগণ, তোমরা সকলেই অবহিতচিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ কর। যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য,—যিনি আমার মত চারি পাঁচটী রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন; — দিল্লীশ্বরের খেলাত বাম পায়ে ঠেলিয়াছেন;—দিল্লীশ্বরকে কাটিয়া যমুনার জলে তলোয়ারের রক্ত ধৌত করিবেন, এ কথা প্রধান সেনানায়ক মহারাজ মানসিংহকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন;—আমি এই মুহূর্ত্তে সেই আদিত্য-প্রতাপ যশোহরাধিপতির সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিব। যদি আমার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে আমার সংবাদবাহক ঘুঘু দুটিকে গড়ের বুরুজের উপর দেখিতে পাও, তবে এই পত্রে আমার যে আদেশ লিখিত আছে, তোমরা সকলে তাহাই পালন করিবে।" এই কথা বলিয়া জননীর হস্তে একখানি খাম-আঁটা লোহিতবর্ণের পত্র অর্পণ করিয়াই বেগে বহিস্তোরণে আগমন ও উচ্চৈঃশ্রবাবৎ অশ্বে আরোহণ করিলেন। শরীররক্ষী অশ্বারোহী সৈন্যগণও সম্মুখে, পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে সজ্জিত হইল। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। গুড়ুম গুড়ুম শব্দে দুর্গের বুরুজে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। বন্দিগণ পুষ্পমালা, পতাকা প্রভৃতি হস্তে লইয়া শুভ যাত্রার মঙ্গল গীত গাইতে লাগিল। দেবলরাজ অভিনির্যান করিলেন।　　(ক্রমশঃ)

টিকটিকি ও ফড়িঙ্‌।

প্রকৃত ঘটনা।

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৬ এ মে) শুক্রবার সন্ধ্যাকাল অতিশয় গরম, বহিরাকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। চিদাকাশও তদ্রূপ। এদিকে যেমন অকস্মাৎ পবন-হিল্লোলে দেহ ক্ষণকালের জন্য জুড়াইল, ওদিকে তেমনি কৃপা-হিল্লোলে অনেক

কালের জন্য সাংসারিক চিন্তা-মেঘ অপসৃত হইয়া তাপিত হৃদয় শীতল হইল। কিন্তু কোনওটী স্থায়ী হইল না, হইবার কথাও নয়; যেহেতু নশ্বর জগতে থাকিয়া, নশ্বর দেহ লইয়া কিছুই স্থায়ী হইবার নয়, উহারাই বা হইবে কেন? এপাশ ওপাশ করিতেছি। পুত্র পাশে বসিয়া পড়িতেছে। তাহার সম্মুখে প্রদীপ প্রজ্বলিত। প্রেমময়ের সংসার প্রেমময়। আমি স্নেহভরে পুত্রের পাঠে মধ্যে মধ্যে কর্ণপাত করিতেছি। পতিপ্রাণা প্রণয়িনী সন্তান লালন পালনের ও স্বামিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিতেছেন। এমন সময় প্রেমিক এক পতঙ্গ—যাহাকে ভাষায় ফড়িঙ্ বলে—প্রদীপালোকের সম্মুখীন হইল এবং বোধ হয় প্রেমে গদ্গদচিত্ত হইয়া তাহাতে আত্মবিসর্জ্জনও করিত, যদি না দীপাবরণ যথাসাধ্য অনুনয় বিনয় করিয়া দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক প্রদানে তাহার প্রাণরক্ষা করিত। কিন্তু সে জানে নাই, শমন তাহার নিকটে উপস্থিত। এক দিকে সে যেমন মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল, অপর দিক্ হইতে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইল। নিকটে, দেওয়ালের গায়ে এক টিক্‌টিকি উপস্থিত। সে অন্তরালে থাকিয়া উহার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। সুযোগ পাইবামাত্রই তাহাকে আক্রমণ করিল। একটি মরণ কামড় দিতেছে, অপরটি তাহার মরণ কামড় সহ্য করিতেছে ও নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত ধড়্‌ফড়্ করিতেছে—সাধ্যমত চেষ্টা পাইতেছে—কিন্তু কিছুতেই পলাইতে পারিতেছে না। ঘটনাটি হঠাৎ পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে বলিল "বাবা, একটা ফড়িঙ উড়িয়া আসিয়া বসিল। আমি বলিলাম "মারিও না, উড়াইয়া দাও, না হয়, আপনি উড়িয়া যাইবে।" এই কথা বলিতে না বলিতে যখন সে দেখিল যে, গৃহ-প্রাচীরস্থ টিক্‌টিকিটি উহাকে ধরিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা! ছাড়াইয়া দিব?" আমি যাহা উত্তর করিলাম পরে বলিব। এখন বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাকে জিজ্ঞাসা করি, একটি খাদ্য, অপরটি খাদক। সম্বন্ধ তো আপনারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ দয়াপরতন্ত্র। আপনাদিগের সম্মুখে কোনও একটি প্রাণী মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, আপনারা চক্ষে দেখিয়া কর্ণে শ্রবণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন কি? মনে করুন্ ফড়িঙটি যদ্যপি একটি মনুষ্য হইত, আর টিক্‌টিকিটি যদ্যপি একটি ব্যাঘ্র হইত এবং আপনাদিগের কাহারও সম্মুখে এই ঘটনাটি যদ্যপি সংঘটিত হইত, আর যাঁহার সম্মুখে দুর্ঘটনাটি হইতেছে. তিনি আত্ম-রক্ষায় সম্যক্‌রূপ পারগ, অথবা উক্ত খাদকের তিনি আদৌ খাদ্য নন—হইলেও তাঁহার দিকে ইহার আদৌ লক্ষ্য নাই; অথচ তিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মন্ত্রে দীক্ষিত—আপনিও জিঘাংসা করিবেন না, কাহাকেও করিতে দিবেন না,

এবং সকলের নিকট সনাতন ধর্ম্ম মূল মন্ত্র প্রচার করিতে কায়মনোবাক্যে প্রয়াস পাইবেন। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য?

শ্রীন—

সাউথপোর্ট শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সাউথপোর্টের বার্কডেল নামক স্থানে একটী ট্রেণিং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য স্ত্রীলোকদিগকে ব্যায়াম এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শারীরস্থান, শারীর বিধান, শরীরপালন, রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদি শিক্ষাদান। এ, আলেকজাণ্ডার, এফ আর জি এস নামক এক সুশিক্ষিত বহুদর্শী সাহেব ইহার প্রধান শিক্ষক। অনেকগুলি বিবি শিক্ষয়িত্রী ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তাঁহার সহকারিতা করিয়া থাকেন। শিক্ষাদক্ষ লর্ড হিথ, কুমারী হেলেন, গ্লাড্‌ষ্টোন এবং লিডস, লিবারপুল প্রভৃতি অনেক স্থানের স্কুলবোর্ডের সভাপতিগণ এই বিদ্যালয়ের প্রতিপোষক। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাগুণে ছাত্রীরা বেশ সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করিতেছেন এবং বালক ও বালিকা বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল প্রভৃতির কার্য্যের উপযুক্ত হইতেছেন। ইংলণ্ডের ৩টী প্রধান স্ত্রী-কলেজে এথান হইতে শিক্ষয়িত্রী সকল মনোনীত হইয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে এইরূপ শিক্ষয়িত্রীর জন্য এত আহ্বানপত্র আসিতেছে যে প্রয়োজন মত আয়োজন হইয়া উঠিতেছে না।

এই বিদ্যালয়ে যেমন স্বাস্থ্য ও শারীর বিজ্ঞানাদির শিক্ষাদান হয়, সেইরূপ অনেকগুলি সুকৌশলসম্পন্ন যন্ত্র আছে, তাহা দ্বারা বক্র শরীর ঋজু ও দুর্ব্বল শরীর সবল করা যায় এবং মেরুদণ্ডের নানাপ্রকার পীড়া যাহারা ভোগ করিতেছে, তাহারা আরাম ও আরোগ্য লাভ করে। ইংরাজ রমণীরা তাহাদিগের বিলাসজনক পরিচ্ছদ দ্বারা অনেক প্রকার অঙ্গবিকৃতি সাধন করিয়া থাকেন, সে সকলের প্রতীকারের জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে।

এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের জন্য যেরূপ গৃহকার্য্য সকলের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে শরীর বেশ সুস্থ ও সবল থাকে, এবং আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, বিলাতী বিলাসিতা আমাদের রমণীসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া যেন কৃত্রিম অঙ্গবিকৃতি উৎপাদন করিয়া আবার তাহার প্রতীকারের চিন্তা আনয়ন না করে। তবে শারীর বিজ্ঞান, শিশুপালন ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সকল শিক্ষা করা আমাদের রমণীগণেরও কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বালিকা-বিদ্যালয় সকলে মানসিক শিক্ষার আধিক্য হওয়াতে ছাত্রীদিগের শরীর রুগ্ন, দুর্ব্বল

ও অকালে ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গৃহকার্য্য করিবারও তত অবসর পায় না। ইহাদের জন্য বিশেষ ভাবনার বিষয়। ইহাদের জন্য বিদ্যালয়ে ব্যায়াম ও শারীর বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে স্ত্রীবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ মনোযোগী হন, ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ

নারী-সুহৃদ্।

(২)

ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে নিরাকার উপাসনা বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহনরায় পিতা কর্ত্তৃক গৃহ-তাড়িত হন। এই অল্পবয়সে পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া স্নেহ-বন্ধনসুলভ কোমল ভাবগুলি হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিল—সদ্ভাবের মধুর সঙ্গ না পাইয়া দীর্ঘকাল, সেগুলি সংসারের উত্তপ্ত ধূলায় লুণ্ঠিত ও শুষ্ক হইতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া শেষে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তিনি দুর্গম ও দুরারোহ হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রকৃতি ও প্রভাব অবগত হইতে অগ্রসর হন। এই তিব্বতদেশে অবস্থানকালেই নারীজাতির অশেষবিধ গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হন। ললনাকুলের কোমল ভাবই যে সংসারের লবণস্বরূপ, এই সংসার রমণীহৃদয়ের মধুমিষ্ট জ্যোৎস্নালোকে বঞ্চিত হইলে পুরুষভাবের মার্ত্তণ্ড তাপ ইহাকে মরুভূমি সদৃশ শুষ্ক করিত—স্বার্থের মহাসংসর্গে ইহা কুরুক্ষেত্র সমান ভীষণ প্রান্তরে পরিণত হইত, মহাত্মা রামমোহন রায় পরের দেশে পরের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাহার প্রভূত পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি তিব্বতে অবস্থানকালে বিরাট পুরুষ শাক্যসিংহের সঙ্কল্প ও সংগ্রাম, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ পর্য্যালোচনা করিয়া ও তাঁহার শান্ত ও সমাহিত প্রতিকৃতি সন্দর্শন করিয়া এবং তদ্দেশীয় লামাগণের জীবনে ও কার্য্যকলাপে তদ্বিপরীত আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ব্যথিত হইয়া পদে পদে প্রতিবাদ করিতেন। এই প্রতিবাদে অনেক সময়েই তাঁহার প্রাণ-সংশয় হইয়া পড়িত। কেবল রমণী-হৃদয়ের স্বভাবসুলভ স্নেহ ও অনুগ্রহে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইত। এই বিদেশে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকমণ্ডলীর মধ্যস্থলে তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করিয়া পরিত্রাণ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও তিব্বতীয়া কামিনীকুলের করুণায় কতশত বার রক্ষা পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। ভিন্নদেশবাসিনী নিঃসম্পর্কীয়া ও অপরিচিতা রমণীগণের দয়া সৌজন্যই তাঁহার

বিশাল হৃদয়টীকে নারীপূজার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিষয়কর্ম্মে ও অন্য নানাবিধ সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবার কালে তিনি যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নারীহৃদয়ের মহত্ত্ব ও বহু গুণের কীর্ত্তন করিতেন—তিনি যে প্রাণপণ করিয়া অবলা কামিনীগণের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত ছিলেন—ইহার মূলে সেই পার্ব্বতীয়া নারী-হৃদয় পরিচালক-রূপে কার্য্য করিয়াছে। তাই বলিতেছি ভারতকামিনীর হিতসাধনে রামমোহনের লেখনীমুখে যে সকল কল্যাণকর কথা ফুটিয়াছে, তাঁহার বাচনিক আলোচনা ও তর্ক বিতর্কে অবলার বলবৃদ্ধিকল্পে যে সকল যুক্তি উক্ত হইয়াছে, সে সকলেরই মূলে তিব্বত রমণীগণের অঙ্গুলি-সঙ্কেত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন ঃ—"তিব্বত-বাসিনী রমণী-গণের সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তিনি নারী-জাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন।"

রামমোহনের নারীহিতৈষণা এক বিচিত্র ব্যাপার। কিরূপ হৃদয় লইয়া কিরূপ উপকরণের সহযোগে তিনি ভারত-মহিলার হিতসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ভারত-ললনাগণ কতটা সুখ সুবিধা সম্ভোগের সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা ও আলোচনার বিষয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনে যে সুখ সৌভাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে, অর্দ্ধা-ধিক শতাব্দীর পূর্ব্বতন বঙ্গগৃহের সহিত বর্ত্তমান গার্হস্থ্য জীবনের তুলনায় যে অশেষবিধ পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে, স্ত্রীজাতির মানসিক ও নৈতিক উন্নতির যে চিত্র আমরা দেখিতে পাইতেছি, সে সকল উন্নতিসাধনের পথে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে রামমোহনের সহৃদয়তা, চিন্তাশীলতা ও শ্রমপটুতার রাশি রাশি প্রমাণ পড়িয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সমাজ-সংস্কার-ক্ষেত্রে মহাত্মা রামমোহন রায় যে সকল মহানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সে সকলের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য সতীদাহ-নিবারণের চেষ্টা। এই কার্য্যে তিনি যে শাস্ত্রজ্ঞান, কঠোর শ্রমস্বীকার ও অকাতর অর্থ্যব্যয়ের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের সুশিক্ষিত বঙ্গ-জননীগণ কি তাঁহাদের ক্রোড়ে লালিত পালিত সন্তানদের হৃদয়ে সে সদ্দৃষ্টান্তের মহদ্ভাব মুদ্রিত করিয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন না? জাতীয় জীবনের মৃতবৎ অবস্থার মধ্য হইতে যখন এরূপ মহাপুরুষের অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছে, তখন অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সজীব গৃহে শিশুরা সুশিক্ষা পাইয়া কি তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবার চেষ্টা করিবে না? যে নারীজাতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া—অধিক কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা যদি সেই যুগাবতার জাতীয় মহাগুরু রাম মোহনের শিক্ষা দীক্ষায় আপন আপন সন্তানগুলিকে মানুষ করিতে চেষ্টা না

করেন, তবে এ উৎকৃষ্ট ফলের উত্তরাধিকারিণী হওয়ার ফল কি হইল?

ইহার পর রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির ধর্ম্মাধিকারের আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, যে ধর্ম্মকর্ম্মে পুরুষের ন্যায় রমণীরও ষোল আনা অধিকার আছে —ধর্ম্মার্জ্জনে স্ত্রী পুরুষের অধিকার-ভেদ নাই। স্ত্রীজাতির জগদ্ব্যাপী হীনাবস্থার মধ্যে ধর্ম্মাধিকারে রমণী পুরুষের সমকক্ষ, ইহার যাথার্থ্যের প্রমাণস্থলে গার্গী ও মৈত্রেয়ীর প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মকর্ম্মেও গুণবতী ও তত্ত্বজ্ঞা রমণী বহু বহু পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট ফলের অধিকারিণী হইয়া থাকেন। মহাত্মা রামমোহন রায় গুণগত ব্যক্তিত্বের উপর স্ত্রীজাতির সর্ব্ববিধ অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইবে

(ক্রমশঃ)

তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যা।

সঙ্গীত সর্ব্বজন-মনোমোহন পদার্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীতের মাহাত্ম্য কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ নহে। আমেরিকার অরণ্যবাসী পশুবৎ অসভ্য জাতি হইতে বর্ত্তমান ইউরোপের সুসভ্য জাতি পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণেই সঙ্গীতের মর্ম্ম জ্ঞাত আছে। অসভ্যের কঠোর মনে মৃগয়া-ক্লিষ্ট দেহে শান্তি প্রদানার্থ গিরিগুহায়, নিবিড় অরণ্যে সঙ্গীতের যেমন আবির্ভাব লক্ষিত হয়, সুসভ্যের রাজনীতি পর্য্যালোচনায় ব্যতিব্যস্ত ও ন্যায়ের সূক্ষ্ম মীমাংসায় প্রপীড়িত হৃদয়কে ক্ষণকালের নিমিত্ত আনন্দানুভব করাইবার নিমিত্ত সযত্নে নির্ম্মিত, কারুকার্য্যমণ্ডিত, বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত রম্যহর্ম্ম্যেও ইহার তেমনি আবির্ভাব লক্ষিত হয়। দুর্ল্লভ সঙ্গীতের মোহন মন্ত্রে জীবসমূহ মুগ্ধ। পুরাবৃত্তালোচনায় জ্ঞাত হওয়া যায় যে, পুরাকালের সুসভ্য দেশমাত্রেই সঙ্গীতের বিশেষ চর্চ্চা ছিল! প্রাচীন গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ ও পারস্য প্রভৃতি স্থানে মহাকাব্যসমূহ ও অপরাপর যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নগরীর প্রত্যেক রাজবর্ত্মে গীত হইত, কেননা সে সময়ে লিখনপ্রণালীর প্রচলন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। সঙ্গীত হইতে তাহারা পুরুষানুক্রমে ইতিহাস ও কাব্যাদি আবশ্যক বিষয়সমূহ শিক্ষা করিত। যাহাহউক প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতের সঙ্গীতালোচনার তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অনেক রাগ রাগিণীর সুর, তাল, লয় প্রভৃতির বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এমন কি সঙ্গীতের অবস্থা ক্রমশঃ অবনত

হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণানুসন্ধান করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, অধীনতার দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর বন্ধন, রুচি পরিবর্ত্তন, শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ বলের অভাব এবং সাংসারিক অভাবের আধিক্য বশতঃ সঙ্গীতবিদ্যা অবনত অবস্থায় পতিত হইয়াছে। ফলতঃ ধনীর সময়ক্ষেপণের অবলম্বন সঙ্গীত। শোকাতুরের শোক দূরীকরণের শ্রেষ্ঠ সাধন সঙ্গীত। সাধারণতঃ ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তির উপায়-বিধায়ক এবং সাধকগণের পারলৌকিক পথপ্রদর্শকই সঙ্গীত। হৃদয়ের নিঢ়গূঢ়তম স্থানে প্রবেশ করিতে সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কে সমর্থ? দুর্দ্দম হৃদয়কে বশবর্ত্তী করিতে আর কে পারে? মর্ম্ম-স্থান স্পর্শ করিবার আর কাহার বা শক্তি আছে?

যাহা হউক, এক্ষণে সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত মূল সূত্র সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করা যাইতেছে। যথা—গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটী সমবায়ে তৌর্য্যত্রিক নামে অভিহিত এবং যদ্দ্বারা তৌর্য্যত্রিক প্রণালীর সুশৃঙ্খল সূত্র জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে সঙ্গীতশাস্ত্র বলে। তৌর্য্যত্রিকের মধ্যে গীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যথা 'গানাৎ পরতরং ন হি।' কেননা ইহা কর্ত্তৃক চিত্ত দ্রবীভূত, মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল, শোকানল নির্ব্বাপিত এবং আত্মচিন্তা বিস্মৃত হইতে পারে। ইহারই মোহিনী শক্তিতে পশু পক্ষ্যাদি জীবসমূহ স্তম্ভিত হয়। বিশেষতঃ ইহাই ধ্যান আরাধনার প্রধান সাধন। ভাবুক ভক্তগণ ইহার মোহিনী সঞ্জীবনী শক্তিতে অনির্ব্বচনীয়রূপে ভক্তিরসাভিষিক্ত হইয়া যান, এমন কি ইহার সুমধুর লহরীতে অসাধুর পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইতে পারে। সম্রাট্ আকবর সাহের সভাসদ মিঞা তান্‌সেন, রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ জয়দেব, উদয়পুরের মহারাণার পত্নী মীরাবাই, দোঁহাবলী-প্রণেতা তুলসীদাস, আর সুরদাস, আমির খস্রু, গোপাল, রাজা বাহাদুর, রামপ্রসাদ, নিধিরাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়কগণ যে চিরস্মরণীয় ও অক্ষয় কীর্ত্তির আস্পদ, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আদিতে আকাশ হইতে নাদ অর্থাৎ ধ্বনি উৎপন্ন হয়, এই ধ্বনিই সঙ্গীতের মূলভিত্তি। নাদ দ্বিবিধ; বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। কণ্ঠতালুর সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিই বর্ণাত্মক, আর দ্বিবিধ বস্তুর আঘাতে উৎপন্ন শব্দ বিশেষের নাম ধ্বন্যাত্মক। এই বর্ণাত্মক অথচ স্নিগ্ধ ও রঞ্জন গুণবিশিষ্ট ধ্বনিকেই সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বর অর্থাৎ সুর বলে। "যথা স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ স্বর ইত্যভিধীয়তে।" যেমন প্রথম নয়টী অঙ্ক ও শূন্যই অঙ্কশাস্ত্রের মূল, সেইরূপ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ" এই সপ্ত স্বরই গীতের মূল। সঙ্গীতশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে এই সপ্তস্বর ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, শৃগাল, কোকিল, অশ্ব ও হস্তীর স্বরাবলম্বনে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত সুরের উচ্চ গতির

নাম অনুলোম ও নিম্ন গতির নাম বিলোম।

স্বর, তাল সংযুক্ত হইয়া কণ্ঠে বা যন্ত্রে উচ্চারিত হইলে গীত হয় যথা—ধাতু-মাত্রা-সমাযোগঃ গীত ইত্যভিধীয়তে। আর নাভি, বক্ষ ও মস্তক হইতে যে স্বর-সপ্তক উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে যথাক্রমে উদারা, মুদারা, তারা বলে। গীতের চারিটী পদ আছে যথা—অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। গীত দুই প্রকার—কণ্ঠ্য ও যান্ত্রিক। অনুলোম ও বিলোম দ্বারা রাগাদির সম্যক্ বিস্তারের নাম তান। রাগ ছয়টি যথা, শ্রী, ভৈরব, পঞ্চম, বসন্ত, মেঘ ও নটনারায়ণ। প্রত্যেক রাগের ছয়টী রাগিণী, সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬টী রাগিণী—যথা ভৈরবী, বিভাষ, আলাহিয়া, দেবগিরি, কুকুভা, বাগেশ্রী, বাহার, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, ললিত, ভূপালী, জয়জয়ন্তী, মুলতান, মল্লার, পুরবী, অহং, বেহাগ, কাফি, মিশ্র, কালাংড়া, আশোয়ারী, জংলা, টৌরী, রামকেলী, ইমন, সিন্ধু, গৌরী, দেওগিরি, সরফরদা, তুরু, সোহিনী ইত্যাদি। গীতের ছন্দানুযায়ী কালবিভাগের নাম তাল। গীতের যে যতি, তাহাকেই লয় বলে। যথা "লয়ঃ প্রবৃত্তির্নিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে।" আর গীতের সময় যথায় তালের সংগতি হয়, তাহাকেই সম কহে। যে স্থান হইতে তাল আরম্ভ হয়, তাহাকে 'ফাঁক' বলে। এই তালের প্রারম্ভ হইতে গীতারম্ভ করিতে হয়। পক্ষান্তরে বাদ্য যেমন গীতের অনুগামী, নৃত্য আবার সেইরূপ বাদ্যের অনুগামী। তালানুযায়ী হাবভাব কটাক্ষাদির সহিত পাদবিক্ষেপ করাকেই নৃত্য বলে। পুং নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রী নৃত্যকে লাস্য বলে। সর্ব্বাগ্রে তা, দিৎ, থু, ন্না, এই চারিটী তালের বোল উৎপন্ন হয়। এই চারি প্রকার তাল হইতে এক্ষণে চৌতাল, খটতাল, ধামাল, কাওয়ালী, মধ্যমান, তেওরী, ঠুংরী, ঠেকা, আড়া-ঠেকা, তিওট, যৎ, খ্যামটা, ঢিমেতেতালা, ত্রিতালী, একতালা, পোস্তা, আদ্ধা, সোয়ারী প্রভৃতি বাদ্য উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক রাগ রাগিণী গান করিবার উপযুক্ত সময়ও সঙ্গীতশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—প্রত্যূষে রামকেলী, ভৈরবী, বিভাষ; মধ্যাহ্নে সিন্ধু, সারঙ্গ; অপরাহ্নে মুলতানী, পুরবী, পিলু; সন্ধ্যায় গৌরী, শ্রীরাগ; নিশীথে খাম্বাজ, বেহাগ এবং উষাতে ললিত রাগিণী গান করিবার উপযুক্ত সময়। ইদানীন্তন জনগণের মধ্যে কৃত্রিম কি শিক্ষালব্ধ ভাবের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। প্রাচীনকালে মানবহৃদয় প্রাকৃতিক ভাবে সতত পরিপূর্ণ থাকিত। সুতরাং পুরাকালের কবিগণের কবিত্ব কি পদাবলী নীরস কিম্বা কষ্টকল্পিত কৃত্রিমভাবে বিরচিত হইত না। পুরাকালে মানবের সরল হৃদয় প্রকৃতির মধুময় রঙ্গভূমি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং অনন্ত সুনীলাকাশের অত্যুজ্জ্বল প্রভা, অসীম সিন্ধুর

অনন্তবিস্তৃতি, অভ্রভেদী শৈলের শান্তিপূর্ণ বিশাল-বপু, তরঙ্গিণীর কল্লোল-নিনাদ, গিরিনির্ঝরের হৃদয়-মত্তকারী ঝর্ঝর-ধ্বনি, নিবিড় অরণ্যের মহান্ স্তব্ধভাব ও বন-বিহঙ্গকুলের হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শী কূজন আদিম মানবেরা সর্ব্বতোভাবে সম্ভোগ করিতেন। আমরা শুদ্ধ মধুর ধ্বনি শ্রবণ করি মাত্র, কিন্তু তাঁহারা শ্রবণ করিয়া তুষারের মত দ্রবীভূত হইয়া সঙ্গীতামৃতলহরীতে মিশিয়া যাইতেন ও সঙ্গীতামৃতে প্রেমানন্দে পান ভোজন ও বিচরণ করিতেন এবং অস্থি মজ্জা কি মাংসময় অবয়বকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। আমরা শুদ্ধ সৌন্দর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি, কিন্তু তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিরস্ত হইতেন না, প্রত্যুত সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনে রত হইতেন। সে যাহা হউক, পরাধীন ভারতভূমি সহস্র বিপ্লব ও লক্ষ পরিবর্ত্তনের মহা অবনতির মধ্যে ও ঘোর দুর্গতির আবর্ত্তাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়া আত্মজ্যোতি বিকাশ করতঃ ধীর স্থির অথচ নিশ্চিন্ত গতিতে শত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া এবং শত বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই। যদিচ পাশ্চাত্য ভূমি বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, ভৈষজ্য ও রাজনীতি চর্চ্চায় প্রাচীন ভারতকে সুদূরে পরাহত করিয়াছে, তত্রাপি সঙ্গীত-বিদ্যায় পরাস্ত করিতে পারে নাই। অতীতের স্মৃতিপূর্ণ অমিয় সঙ্গীত এই বিশাল রঙ্গভূমির সর্ব্বাঙ্গব্যাপী অবিনশ্বর কীর্ত্তি বলিতে হইবে।

অনন্ত বিশ্ব যাঁহার কার্য্য ও গ্রহ নক্ষত্ররাজি যাঁহার গীতছন্দরূপে বিরাজ করিতেছে, সেই অনাদি কবি পরমগুরু পরমেশ্বর পুণ্যাত্মাদিগের দ্বারা দুর্লভ সুধাময়ী সঙ্গীত বিদ্যা বিশ্বরাজ্যে প্রচার করেন। বস্তুতঃ ইহা স্বর্গীয় পদার্থ। রোগ, শোক ও দুঃখগ্রস্ত জনগণের যন্ত্রণা উপশম করণে; ক্লান্ত শ্রান্তের সান্ত্বনা প্রদানে; দুশ্চিন্তিতের তৃপ্তিসাধনে; এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ প্রভৃতি কলুষিত রিপুসমূহকে নিরস্ত করণে অর্থাৎ পাপ প্রলোভন হইতে সর্ব্বাক্ষণ রক্ষা করণে ইহা সততই সমর্থ। প্রকৃতপক্ষে আনন্দ বিস্তার করিতে এবং গম্ভীর যোগ ধ্যান বর্দ্ধন করিতে সঙ্গীত যেমন তৎপর, এমন অন্য কিছুই নয়। এই সমস্ত মহামহোদ্দেশ্য-সাধক বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসাবাদ ও চরম সিদ্ধান্ত করিয়া বলেন যে "ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা।" হায়! হায়! এতাদৃশ দুর্লভ পবিত্র পদার্থকে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কি অসদনুষ্ঠান জন্য কলঙ্কিত করা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়, ধর্ম্ম ও যুক্তি বিগর্হিত। যাহা হউক এতাদৃশ সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন, সর্ব্বসন্তাপহারী ও মোক্ষপ্রদ সঙ্গীতের প্রতি যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারা মানব-নাম ধারণের অযোগ্য।

সংপ্রতি রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদীয় সহচর বাবু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বিপুল যত্ন ও অধ্যবসায়—এমন কি প্রচুর অর্থ ব্যয়ের দ্বারা এই মুমূর্ষু সঙ্গীত

শাস্ত্রের কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য ইহাঁরা—বিশেষতঃ প্রথমোক্ত মহাত্মা—আমার ও সমস্ত বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আর বেশী বক্তব্য নাই, কারণ ইহাঁরা যে গ্রন্থাদি প্রচার করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট।

শ্রীত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী।

ভক্ত সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বিয়োগ সংবাদে আমরা অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছি। তিনি আমাদিগের ভক্তিভাজন একজন ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন এবং অনেক দিন তাঁহার সহিত আমরা এক পরিবারভুক্ত হইয়া বিশেষ আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ ছিলাম—নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনে সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই।

বামাবোধিনীর সহিত গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। যে কয়েকজন যুবক এই পত্রিকা প্রচারে প্রথম উদ্যোগী হন, তাহার মধ্যে তিনি একজন। আজও মনে জাগিতেছে ১৬ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রিটে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতিধ উপায় বিধানার্থ যে একটী সুহৃদ্ সভা হয়, তাহাতে তিনি উপস্থিত হইয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করেন এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য পত্রিকার নামকরণ "বামাবোধিনী" হইলে ঠিক্ হইয়াছে বলিয়া তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে এই নামের অনুমোদন করেন। প্রথম হইতেই বামাবোধিনীতে লিখিয়া অনেক সাহায্য করিয়াছেন। আশাবতীর উপাখ্যান নামে একটী আখ্যায়িকা অনেক দিন ধরিয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব এবং ধর্ম্মজীবনের সমীচীন অভিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া যত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সর্ব্বত্র বামাবোধিনী প্রচারে ও ইহার গ্রাহক সংগ্রহে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট বামাবোধিনীর ঋণ অপরিশোধ্য।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আর এক কারণে বামাবোধিনীর বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তিনি প্রাণপণে খাটিয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ভারতাশ্রমে যখন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাহার অধ্যাপনার প্রধান ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। এই সময় তিনি বয়স্থা মহিলাদিগকে যে প্রকার সুপ্রণালীতে শিক্ষা দিয়া সুফল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ এই সময় তিনি এক দিকে গুরুতর পরিশ্রমপূর্ব্বক বেহালা গ্রামের ম্যালেরিয়া-পীড়িত লোকদিগের নিত্য চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিতেন, অন্য দিকে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহার

উপর নব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা-বিদ্যালয়ের গুরু ভার বহন করিতেন। একজন লোক যত শক্তিশালী হউন না কেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ কার্য্য অসাধ্য-সাধন। মহা-তেজ ও উদ্যমসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তিনি এরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে এই সময়ে যে উৎকট হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, তাহাই তাঁহার সঙ্গের চিরসঙ্গী হইয়া দারুণ যাতনার কারণ হইয়াছিল।

বিজয়কৃষ্ণ স্ত্রীলোকদের শিক্ষার উপ-যোগী প্রবন্ধও পুস্তকাদি লিখিয়া ও তাহা-দের শিক্ষার সুবিধা বিধান করিতেন।

তাঁহার বাসগ্রাম শান্তিপুরে তিনি একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহার রক্ষণ ও উন্নতি সাধন জন্য দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংস্থান করেন। বালবিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ সম্পাদনে এবং পতিতা নারীদিগের উদ্ধার সাধনে এক সময়ে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং তাহাতে আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হন। তিনি একাধারে এতশত লোকের কার্য্য-ক্ষমতা ধারণ করিতেন, ইহার মূলে তাঁহার গভীর ঈশ্বরপ্রেম ও অটল ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে ভগবদ্‌-ভক্তি বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে এরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরম হংস ও তাঁহাতে একত্র ভাবোন্মত্ত হইয়া যে নৃত্য করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি—সে অতুলন স্বর্গীয় দৃশ্য কখনও ভুলিব না। শেষ জীবনে তিনি দিবা রাত্রির মধ্যে অধিকাংশ সময়ই ভক্তিরসে মগ্ন থাকিতেন, এবং সময় সময় আত্মহারা হইয়া যাইতেন, রামকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহারও সমাধি অনেক কষ্টে ভাঙ্গিতে হইত।

গোস্বামী মহাশয়ের দেবজীবন ধর্ম্ম-প্রাণতা, সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, জন-হিতৈষিতা, পরসেবা, বিনয় ও সাধুভক্তি প্রভৃতি অনেক মহদ্‌গুণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ, আমরা এখন তদ্বিষয়ে কিছুই বলিব না। এরূপ জীবন ধর্ম্মার্থী মাত্রেরই বিশেষ অনুকরণীয়। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।" বিজয়ের সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সার্থক। তিনি পবিত্র অদ্বৈত বংশের উপযুক্ত বংশধর। তিনি ইহলোকে জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরলোকে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। এরূপ সাধুভক্ত ভারতের চির-গৌরবস্থল।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, ত্রিপুরার মহারাজা দুঃস্থ অন্ধ বঙ্গ কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এক-কালীন ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

২। রুসিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাগণের সাহায্যার্থ রুস সম্রাট্ ৩০ লক্ষ রোবল মুদ্রা দান করিয়া আপনার প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন।

৩। গত মধ্যপরীক্ষায় পঞ্জাবের ৩টী মুসলমান রমণী সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি শুভসূচক।

৪। মধ্য ভারতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদিগের মধ্যে অধিক শিক্ষোন্নতি দেখা যায়। তথায় শতকরা ১৫ জন হিন্দু এবং ৩৮ জন মুসলমান বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ছাত্রীদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ২ জন মুসলমান, কিন্তু হিন্দু ১ জনেরও কম।

৫। ব্রহ্মদেশের একটী প্রৌঢ়া রমণীর প্রতি গোরারা অত্যাচার করাতে রাজপতিনিধি তাহার শাসনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ধন্য লর্ড কূর্জন।

৬। কুচবিহারের মহারাজা ইটালির প্রাচ্যভাষাবিৎ পণ্ডিতদিগের সম্মিলনীতে সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার্থ তাঁহার কলেজের অধ্যক্ষ বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ সিলকে পাঠাইতেছেন। ইনি এ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

৭। বোম্বাইয়ে সম্প্রতি একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর নাম সুরাজবাই। ইহাঁর ৯ বৎসরের সময় বিবাহ হইয়া ১০ বৎসরে বৈধব্য ঘটে, এখন ইহাঁর বয়স ২০ বৎসর।

৮। যে পুরুষোত্তম পাঞ্জেপি প্রধা "রাঙ্গলার" হইয়া জগৎকে চমৎকৃত ও ভারতকে মহা গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তিনি দাক্ষিণাত্যের এক চাষা ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বহস্তে হলচালনা করেন, তিনি ইংরাজী শিখিতে না পাইলে তাঁহারও সেই দশা ঘটিত।

৯। পৃথিবীর নানা স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ যুক্তরাজ্যের ২৪৯টী খৃষ্টীয় মিসনরী সমাজ আছে। উহাঁদের ষ্টেসন সংখ্যা ১৯৮৯৪ এবং মিসনরী সংখ্যা ১১৬৫৯ জন। স্থানীয় বার্ষিক আয় প্রায় ৪ কোটী টাকা।

১০। স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের সহোদর রায় রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বর্দ্ধমান জেলার সাকনাড়া প্রভৃতি গ্রামস্থ লোকের উপকারার্থ ১০০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে দুইটী বড় পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়াছেন এবং স্থানীয় অন্যান্য উন্নতির জন্য আরও অর্থব্যয় করিতেছেন।

১১। আমরা শুনিয়া যার পর নাই শোকসন্তপ্ত হইলাম ভারতের পরম গৌরবস্থল সুবিদ্বান্ ও আদর্শ-চরিত্র স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরিবার ও অসংখ্য বন্ধুবান্ধবকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গত ১৩ই জুলাই পরলোক গমন করিয়াছেন।

১২। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ স্বামী ওলাউঠা রোগে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তৈলঙ্গ স্বামীর পরে ইনিই কাশীকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। History of India—স্কুল সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্‌টর আবদুল কারিম বি, এ ইংরাজীতে ভারতবর্ষের একখানি সুন্দর ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহা সরল ও সুপাঠ্য এবং ছাত্রদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী।

২। কৌতুককাহিনী—শ্রীদ্বিজেন্দ্র-নাথ নিয়োগী বিএ বিরচিত, মূল্য ৸৵০ মাত্র। ইহাতে ৯টী গল্প আছে যথা (১) ষণ্ডাসুর, (২) ত্রিশির দানব, (৩) বজ্রবাহুবার ও দৈত্যগণ, (৪) মদিরা রাক্ষসী, (৫) মায়াবিনী কিরীটিনী, (৬) বীরদন্ত নাগ, (৭) সজীব কাষ্ঠপুত্তলি, (৮) পাতালেশ্বর তমোরাবণ, (৯) স্বর্ণপরশ বণিক্। গ্রন্থকার বিদেশীয় উপকথা সকল এরূপ নৈপুণ্যসহকারে ভাষান্তরিত করিয়াছেন যে, সে গুলি বঙ্গভাষার মৌলিক [illegible] বলিয়া বোধ হয়। নাম সকল উচ্চারণেও [illegible] তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য আছে। যে ৩ খানি চিত্র দিয়াছেন, তাহাও অতি সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তকখানি কিরূপ কৌতুকজনক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, তাহার পরিচয়স্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে ইহা সমালোচকের হস্তে পড়িবার পূর্ব্বে বাটীর এবং পাড়ার পাঠক্ষম বালক বালিকারা একে একে ইহা গ্রাস করিয়াছিল বলিলে হয় এবং অতি কষ্টে শত ছিন্ন অবস্থায় ইহাকে উদ্ধার করা গিয়াছে। ইহা গ্রন্থের পক্ষে কম প্রশংসার বিষয় নয়। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ কিছুক্ষণের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিতে পারিবেন। আমরা গ্রন্থকারকে অনুরোধ করি এইরূপ পুস্তক আরও প্রচার করিয়া বঙ্গসাহিত্যসমাজের একটী মহৎ অভাব পূর্ণ করুন্।

বামারচনা।

জিজ্ঞাসা।

বল দেব, আজি তুমি
কোথা আছ কত দূরে,
কি কার্য্যে রয়েছ রত
আজি সে অমরপুরে?
এমন বিষাদপূর্ণ

শোকার্ত্ত মরমগীতি,
ছাড়ি এ ধরণী সীমা
পরশে কি তব স্মৃতি?
স্বরগে অমরপুরে
থাকি দেবতার সনে,

পড়ে নাকি মনে তব
মরধাম-প্রিয় জনে?
কেমনে কাটিছে দিন
তব প্রাণ-প্রিয়জন,
জানিতে তাদের কথা
হতেছে কি ব্যগ্র মন?
ছাড়িয়া তোমারে দেব
ভগিনী মায়ের পাশে,
ছিনু যবে বহু দূরে
বিদেশেতে পিতৃবাসে।
তখন প্রাণেশ তুমি
মম হস্তলিপি নিত্য,
না পেয়ে কাতর হতে
ব্যাকুল ব্যথিত-চিত্ত।
আজি কিহে মনে নাই
পীড়াতে শরীর ক্ষীণ
অক্ষম দিতে যে পত্র—
ছিনু আমি তিন দিন,
না পেয়ে আমার পত্র
লিখিছিলে যাহা সখা!
সে সবি কি ভুলে গেছ
পাষাণে জলের রেখা?
(সাবাস্ প্রতিজ্ঞা তব!!
সাবাস্ স্মরণ বল!!।
এ নহে ক্ষমার যোগ্য!!
দেবতা কি জানে ছল?)
তৃপ্তিহীন মানবের
অপূর্ণ অসীম আশা,
না জাগে কি প্রাণে আর
প্রাণের নীরব ভাষা?
অকূলে ভাসায়ে জায়া

ছিঁড়িয়া সংসার-ফাঁস,
ছাড়ি সব প্রিয়জন
করি এবে স্বর্গবাস,
দূরে রাখি বাধা বিঘ্ন
পূজিছ কি সে চরণ
চির দিন পূজিবারে
ছিল যাঁরে আকিঞ্চন?
অনন্ত শান্তির রাজ্যে
পুণ্যের অমৃত খনি,
তব আত্মা প্রাণ মন
এবে কি নিয়েছে কিনি?
আত্মীয় স্বজন স্নেহ
সংসারের আকর্ষণ,
করে নাকি আজি তব
প্রাণ মন আন্দোলন?
অদৃশ্যে জগত-পিতা
দেখিছেন দিবানিশি,
তুমিত তাঁহারি ক্রোড়ে
পার যদি দেখ বসি।
এ তব অভাগী জায়া
নীরব অশ্রুতে ভাসে,
অথির পরাণ তার
যাতনার তপ্তশ্বাসে।
তুমি তার সুখ শান্তি
ধর্ম্ম মোক্ষ ভগবান্,
হারায়ে এবে সে নিধি—
অকূলে—আকুল প্রাণ।
তুমি বিনা বিশ্ব তার
অসীম অনন্ত শূন্য,
সে বুঝে তাহার দুঃখ
বুঝিতে কি পারে অন্য?

প্রাণে কি দারুণ ব্যথা
কেহ কি দেখেছে চক্ষে,
দেখিছ কি জানিছ কি
কি আছে এ পোড়া বক্ষে ?
আমি যে কেবল ছায়া
তুমি প্রাণ—তুমি কায়া,
নাহি প্রাণ নাহি কায়া
কেমনে রহিবে ছায়া ?
প্রাণ দিয়ে বেঁধেছিনু
প্রাণের অমূল্য নিধি,
ভাবি নাই এক দিন
কেড়ে নিতে পারে বিধি।
জানিছ সকলি দেব
বলিব কি আর কথা,
তুমি যদি না বুঝিবে
আর কে বুঝিবে ব্যথা ?
প্রসারি স্নেহের কর
লয়ে যাও তব পাশে,
থাকিতে চাহে না সে যে
দুঃখময় ভববাসে।

শ্রীমতী রেবা রায়।

নরেন্দ্র।

কোথায় প্রাণের ভাই নরেন্দ্র আমার।
বহু দিন ত্যজিয়াছ এ পাপ সংসার।
এ ভব ভবনে ভাই, তোমা হেন ধনে যেই
বঞ্চিত হ'য়েছে, তার কি সুখ জীবনে?
দু দিনের তরে দিয়া, সুখ স্বপ্ন দেখাইয়া,
কাঁড়িয়া নিলেন বিধি হৃদয় রতনে।
না মিটিল কোন সাধ,সাধেতে সাধিয়া বাদ,
অকালে গ্রাসিল তোরে নিঠুর শমন। ১
কঠিন পরাণ তার নাহি লেশ করুণার,
ক্রন্দন তাহার কাণে করে না গমন।
কেমন করিয়া তুমি ছাড়িয়া জনমভূমি,
গমন করিলে হায়! অচেনা সে দেশে?
ভয় হয় মোর চিতে, গিয়াছ অচেনা পথে,
অজ্ঞান বালক তুমি, পথহারা হও শেষে।
এখন মনেতে নাই, ভুলেছ সকল ভাই,
ভুলেছ এখন তুমি দুঃখিনী মাতারে। ২
একটু বিলম্ব হলে কাঁদিতে মা কোথা বলে,
সাত বর্ষ হ'লো এবে ভুলেছ তাঁহারে।
সে সকল মনে নাই, আর না কাঁদিবে ভাই,
ভুলিয়াছ এবে তুমি বিষম মায়ায়।
প্রভুহে!
জগতের পিতা তুমি, তোমার চরণে নমি,
দুখিনীর প্রতি তুমি হইয়া সদয়,
মোরে এই বর দিয়া, জুড়াও তাপিত হিয়া,
পুনঃ যেন নরেণের সঙ্গে দেখা হয়। ৩

শ্রীযামিনীপ্রভা দেবী।

স্মৃতি।

হৃদিবৃন্তে ছিল যে কুসুম,
প্রেমময় মৃণাল-আসনে,
দিবানিশি থাকিত ফুটিয়া,
এ মোর সাধের নিকেতনে।
কোথা সে আমার ? ১
বুকভরা ভালবাসা দিয়ে

আত্মহারা প্রেম দিয়ে যায়,
রাখিতাম চোখে চোখে যারে,
পাছে কভু শুখাইয়া যায়।
কোথা সে আমার? ২

যদি কভু অযতনে মোর
মু'খানি মলিন হ'ত তার,
অনিমেষে চেয়ে তার পানে
দেখিতাম জগৎ আঁধার।
কোথা সে আমার? ৩

স্নেহে মুছাইয়া অশ্রুধার,
মুখখানি চুমি বার বার,
কতই সোহাগে তারে পুনঃ
ধরিতাম হৃদয়ে আমার।
কোথা সে আমার? ৪

ধীরে ধীরে মুখখানি তুলি,
লুকাইত হৃদয়ে আমার,
অশ্রুজলে বুক ভাসাইত,
নিমীলিত আঁখি দুটী তার!
কোথা সে আমার? ৫

আসি বলে সে যে লুকায়েছে,
তাই বুক ভাসে অশ্রুনীরে,
শূন্য প্রাণে—শূন্যে চেয়ে আছি,
আর বুঝি আসিবে না ফিরে!!
কোথা সে আমার! ৬

ভাল করে দেখিনি সে মুখ!
ভাল করে কই নাই কথা!!
বলিব বলিব করি সদা,
বলি নাই হৃদয়ের ব্যথা!!
কোথা সে আমার! ৭

কে জানিত চির দিন তরে,
সে কুসুম শুখাইবে হায়!
তাহলে কি ছবিগুলি লয়ে,
কেঁদে কেঁদে দিন কেটে যায়?
কোথা সে আমার! ৮

শুধু স্মৃতিখানি বুকে লয়ে,
দিবানিশি একভাবে যায়,
যেন সে মলিন ছবিখানি,
চায় আর ফিরে ফিরে চায়?
কোথা সে আমার! ৯

পৃথিবীতে সব মুছে যায়!
স্মৃতি কেন রহেগো জাগিয়া?
বল স্মৃতি! কার তরে আর,
আশাপথ রয়েছ চাহিয়া?
কোথা সে আমার!! ১০

শ্রীস—

ভ্রম-সংশোধন।

[illegible]
বলীতে বামাবোধিনীর অগ্রিম মূল্য ২॥০ স্থলে ২॥৵০ হইবে। বৈদ্যনাথ রাজ-

[illegible]
২৭ ও ২৮ লাইনে ১২০০ স্থলে ১২০০০ এবং ৭০০ স্থলে ৭০০০ টাকা হইবে।

No. 416-17 September, October, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৭ বর্ষ। ৪১৬-১৭ সংখ্যা। | ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩০৬। | ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বামাবোধিনীর সপ্তত্রিংশ জন্মোৎসব।

জয় জয় বল জগদীশ-জয়,
বামাবোধিনীর নব বর্ষোদয়!
সর্ব্বদেশ কালে যাঁহার মহিমা—
যাঁহার করুণা অনন্ত অসীমা,
সর্ব্বসাক্ষী তিনি সাক্ষ্য দিতে তাঁর
দিয়াছেন সবে সম অধিকার।
সূর্য্য যথা মহা জ্যোতি পরকাশে,
তৃণগুচ্ছ মাঝে ফুলবালা হাসে;
কলকণ্ঠে যথা কোকিল কুহরে,
ক্ষুদ্র অলি গায় গুণ গুণ স্বরে;
নিনাদে ভীষণ সমুদ্র যথায়,
কুল কুল রবে নদী-স্রোত গায়।
বড় ছোট তাঁর সাক্ষী সমুদয়,
জয় জয় বল জগদীশ-জয়!

বামাবোধিনীর ক্ষুদ্র হীন প্রাণ
করুণাময়ের করুণার দান।
তাই বিশ্ব সহ হয়ে একতান
চায় গাহিবারে মহিমার গান—
চায় সাক্ষ্য দিতে, যথাশক্তি তার,
করুণাময়ের করুণা অপার!
বরষে বরষে কালের তরঙ্গে
ভেসে ভেসে প্রাণ ভীষণ আতঙ্গে
কত বিঘ্ন বাধা ঘাত প্রতিঘাতে,
দেখে মৃত্যুদ্বার সম্মুখে পশ্চাতে।
তবু বর্ষে বর্ষে জীবন বাঁচিল,
যুগ যুগান্তর অতীত হইল,
তবু প্রাণে নব আশার উদয়,
জয় জয় বল জগদীশ-জয়।

পুরুষ-প্রধান মানবসমাজে
রমণী অবলা সঙ্কুচিত লাজে।
পুরুষের বল বিক্রম গৌরব
বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি সম্পদ বৈভব
স্তাবকের কণ্ঠে কবির সঙ্গীতে
ইতিহাসপৃষ্ঠে রাষ্ট্র অবনীতে।

এ হেন সমাজে নারীর শাসন
দেশে কালে সুবিস্তৃত অতুলন,
"ভিক্টোরিয়া-যুগ" চিরস্মরণীয়
বিকাশে সভ্যতা কীর্ত্তি বরণীয়
শোভন উজ্জ্বল চিরদীপ্তিময়,
জয় জয় বল জগদীশ-জয়।

গৃহের সাম্রাজ্ঞী পূজনীয়া নারী,
সংসার-সাহারা প্রান্তরের বারি,
অন্নপূর্ণারূপা রন্ধনশালায়,
ভাণ্ডারের লক্ষ্মী—অভাব কোথায় ?
দেব-সেবাব্রতে সতত কুশল,
পূর্ণ গৃহধর্ম্ম পালনে অটল।
সেই নারী আজি দেখায় জগতে
বুদ্ধি জ্ঞানে হীন নহে কোন মতে,
পুরুষের সহ প্রতিযোগিতায়
উচ্চস্থানে নারী আসিয়া দাঁড়ায়।
নারী র‍্যাঙ্গলার, নারী ব্যারিষ্টার,
নারী বি এ, এম এ, পণ্ডিত, ডাক্তার,
নারী কবি, বাগ্মী, ধর্ম্ম-প্রচারক,
ব্যবহারাজীব, কেরাণী শিক্ষক—
সব কার্য্যে দক্ষা নারী যায় যথা,
পরীক্ষিত সত্য—কে করে অন্যথা।
অনুকূল আরও হইবে সময়,
জয় জয় বল জগদীশ-জয়।

একাকী পুরুষ! হবে সর্ব্বে সর্ব্ব,
শাসিবে সমাজ ত্যজ বৃথা গর্ব্ব।
রমণীকে নীচে ফেলে উঠিবার
চেষ্টা কর তায় পতন নির্দ্ধার।
রমণীকে লও করিয়া সঙ্গিনী,
যে সহ-ধর্ম্মিণী সে সহ-কর্ম্মিণী।
রমণী সহায় হইবে যখন,
পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়িবে তখন।
পুরুষের বল—রমণীর প্রেম,
মণিতে জড়িত বি-কষিত হেম,
তায় হবে ধরা পূর্ণ শোভাময়,
জয় জয় বল জগদীশ-জয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন শতাব্দীর নূতনত্ব—কোন কোন পণ্ডিত ইতিমধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে ইংরাজী ২০ শতাব্দীতে রমণী জাতি সমাজে প্রাধান্য লাভ করিবে। বাহুবল ও বুদ্ধিবল অপেক্ষা প্রেম ও চরিত্রের বল যে পরিণামে জয়যুক্ত হইবে, তাহা ধ্রুব সত্য।

রাজপ্রতিনিধির গতিবিধি—লর্ড কুর্জন ২৩এ অক্টোবর সিমলা শৈল ছাড়িয়া ১৬ই ডিসেম্বর কলিকাতায় আসিবেন। পথে দিল্লী, বিকেনীর, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, আজমীড়, বুন্দী, কোটা, ভূপাল ও আগ্রা পরিদর্শন করিবেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার ভ্রমণের সাথী হইবেন।

লেডী কুর্জনের আদব কায়দা—লেডী কুর্জন আত্মপদমর্য্যাদা রক্ষার্থ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি সামাজিক সমিতি প্রভৃতি যখন করিবেন, তিনি দাঁড়াইলে

গৃহস্থ সকলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে এবং তিনি না বসিলে কেহ বসিতে পারিবে না।

অবিবাহিতদিগের শাস্তি—জর্ম্মণির প্রুসীর রাজসভা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন রাজ্য মধ্যে বিবাহিত ব্যক্তিরা যত কর দিবে, অবিবাহিত ব্যক্তিদিগকে তদপেক্ষা শতকরা ২৫৲ টাকা বেশী কর দিতে হইবে।

স্ত্রীপুরুষের সাম্য—আইসলণ্ড দ্বীপে স্ত্রীগণ পুরুষদিগের সহিত রাজনৈতিক স্বত্বের তুল্যাধিকারী। তথায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণী হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া রাজ্যশাসন হইয়া থাকে।

স্ত্রী ব্যবহার-জীবিনী—ফরাসী মহাসভা আইন পরীক্ষোত্তীর্ণা রমণীদিগকে ওকালতীর লাইসেন্স দিবার আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

সৎকার্য্যে দান—(১) ডিনামাইট যন্ত্রের উদ্ভাবক আলফ্রেড নোবেল ৫টী সদনুষ্ঠানের জন্য ১৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সওয়া দুই কোটী টাকা দিয়াছেন—(১) রসায়ন, (২) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (৩) শারীর বিধান, (৪) সাহিত্য, (৫) জাতি-মৈত্র ভাব প্রচার। প্রত্যেক অনুষ্ঠান তাঁহার নামে আখ্যাত হইবে।

(২) জীবন্ত জন্তুর শরীরচ্ছেদ প্রথা রহিত করিবার জন্য বিলাতে যে সভা আছে, তাহার প্রতিষ্ঠাতা জি আর জেসি ইহার ফণ্ডে ১০ হাজার পাউণ্ড বা দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

জাপানে ভারত ছাত্রের সুবিধা—জাপানে যাইবার ২য় শ্রেণীর জাহাজ ভাড়া ২৪০ স্থানে ১৯৪ এবং ৩য় শ্রেণীর ১২০ স্থানে আহারাদি সহিত ৯৫ টাকা মাত্র হইয়াছে। টোকিও নগরে থাকিতে বাসাখরচাদির ব্যয় মাসিক ২০৲ এবং ছাত্র বেতন ৪৲ টাকা মাত্র। নানা প্রকার যন্ত্র বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার পক্ষে জাপান প্রশস্ত।

ভারত ছাত্রের জয়—বোম্বাইয়ের পরঞ্জপে যেমন গণিত পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন, ক্রাইষ্ট কলেজে গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষা পরীক্ষায় বঙ্গের হরিনাথ দেব সেইরূপ সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ২য় স্থানীয় ব্যক্তি অপেক্ষা ইনি ২০০ নম্বর অধিক পাইয়াছেন।

দুর্ঘটনা—(১) আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে ভীষণ ঝটিকায় প্রলয় কাণ্ড হইয়াছে—শত শত লোক মরিয়াছে ও লক্ষ লক্ষ লোক গৃহশূন্য হইয়াছে। পোর্টোরিকো নগর ধ্বংসপ্রায় হইয়া গিয়াছে। (২) রোম ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সকল ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ডাকের চিঠি পত্র—গত বর্ষে ভারতবর্ষে চিঠি পত্র পুলিন্দাদি যাহা ডাকে বিলী হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৪৭ কোটী, ৭৩ লক্ষ, ৩৬২৫৮; প্রতি দিন প্রায় ১৩ লক্ষ বিলী হইয়াছে!!

বৈদ্যুতিক ট্রাম—ইহা মান্দ্রাজে চলিতেছে, বোম্বাই ও কলিকাতায় চলিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে।

দেবলরাজ।

অস্মদ্দেশীয় রমণী সমাজে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে—"ননদেরও ননদ আছে।" ননন্দৃগণ নববধূদিগকে বড়ই জ্বালা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা আবার স্বামি-গৃহে গমন করিয়া ননন্দা কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা হন। এক গৃহে যিনি ননন্দা, অন্য গৃহে তিনিই নববধূ হইয়া ঐ প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য দেবলকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বন্দী ও কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। আবার মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিলেন। এই ঘটনায় উপরি উক্ত প্রবাদের অভিনয় দেখা যাইতেছে। মানসিংহ দেবলকে কারামুক্ত করিয়া যথোচিত সম্মানে স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতাপের দ্বারা দেবলের পূর্ব্ব রাজ্যে যে সকল বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইয়াছিল, মানসিংহের কৃপায় ক্রমশঃ সে সকলের পরিহার হইল। প্রতাপের পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র সন্ন্যাসী ঠাকুর অদৃশ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবলরাজ তৎকৃত প্রতিহিংসাকে মনেও স্থান দিলেন না। তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক আনাইয়া পূর্ব্ব রাজ্যের অন্তর্গত দুইটি চাক্‌লার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব প্রদান পূর্ব্বক মহা সমাদরে বিদায় করিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন, এবং দেবল রাজ্যকে চিরকালের জন্য নিষ্কণ্টক বোধ করিলেন। কিন্তু ক্ষাত্র-হৃদয়ের প্রতিহিংসানল আশ্রয়কে ভস্মীভূত না করিয়া নির্ব্বাণ হয় না। দেবলরাজের ব্যবহারে সন্ন্যাসী ঠাকুর বাহ্যে এত সন্তোষ ও নিস্পৃহতা প্রকাশ করিলেন যে, দেবল সহজেই আপনাকে নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক মনে করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী কিরূপে দেবলকে সবংশে ধ্বংস করিয়া রাজপুরীকে নিষ্প্রদীপ করিবেন, মনে মনে তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুর্ভাগ্যের পর সৌভাগ্যের উদয় বড়ই রমণীয় ও আনন্দজনক। আজ দেবলরাজ সেই আনন্দের স্রোতে ভাসমান। দেবল রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া অবধি একদিনও এমন আনন্দ অনুভব করেন নাই, কেননা এমন দুঃখ তিনি জীবনে কখনও ভোগ করেন নাই। এখন বুঝিলেন, দুঃখের দ্বারাই সুখের আস্বাদন হইয়া থাকে। সংসারে সুখের ন্যায় দুঃখেরও প্রয়োজন আছে। উৎকট চিন্তা, দস্যু ও প্রত্যাসন্ন রাজন্যবর্গের ভয়াদি কারণে যে রাজপদে বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, এখন সেই রাজপদকে স্পৃহণীয় ও সুখজনক বোধ হইতে লাগিল। যেমন আয়োজনে সমৃদ্ধি সহ রাজধানী হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, এখন তেমনি আয়োজন ও সমৃদ্ধির সহিত চতুরঙ্গিণী সেনার মধ্যবর্ত্তী হইয়া দেবগ্রাম অভিমুখে শুভ যাত্রা করিলেন। গৃহ হইতে যুদ্ধযাত্রাকালে দেবলরাজের হৃদয়ে কিরূপ ভীষণ ভাবের

সমাবেশ হইয়াছিল, তল্লিখিত পত্রে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এখন সে ভাবের পরিবর্ত্তে আনন্দ ও উৎসাহে গদ্‌গদ হইয়া সৌভাগ্যলক্ষ্মীর শোভনীয় বদনশ্রী দেখিতে দেখিতে গৃহে চলিলেন। মাতা, মহিষী-গণ ও পরিজনগণকে অকারণ অন্তিম আদেশ প্রদান করিয়া যার পর নাই দুঃখ দিয়াছেন, তজ্জন্য গৃহে গমনপূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া প্রত্যেককে অভিনন্দিত করিবেন, হৃদয় সমুদ্রে এইরূপ কতই রমণীয় ভাবের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। দেবলরাজের এই সময়ের মনের ভাব পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, তিনি তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, সংসারের সকল ঘটনাই মানুষকে বঞ্চনা করে,—ঘটনাবলী দেখায় একরূপ, ফল ধরে অন্যরূপ। দৈব চক্রের গতিকে দুর্জ্ঞেয় বলিয়া তখনও দেবলের পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। তাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া গৃহ যাত্রা করিলেন।

দেবলরাজ পূর্ব্ব রাজ্য হইতে রাজধানী দেবগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়া পরমানন্দে সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিলেন। যে দিন অপরাহ্ণে গৃহে উপস্থিত হইবেন অনুমিত হইয়াছিল, সেই দিন মধ্যাহ্ন-কালে সংবাদ পাইলেন তাঁহার সংবাদ-বাহক ঘুঘু দুইটী পিঞ্জরে নাই। কি সর্ব্বনাশ! ঘুঘু কোথায় গেল, কে এমন সর্ব্বনাশ করিল, দেবলরাজ এ সকল কিছুই সন্ধান করিবার অবসর পাইলেন না। অশ্ব পশ্চাতে অতি বেগে পুনঃপুনঃ কশাঘাত করিতে লাগিলেন। অশ্বরাজ প্রাণপণে বায়ুবেগ অতিক্রম করিয়া ছুটিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে দেবলরাজ অনুযাত্রিগণকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন

উপসংহার

যুদ্ধযাত্রাকালে দেবলরাজ জননীর হস্তে যে পত্র দিয়াছিলেন, সেই পত্র লিখিবার সময় তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, কি সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করা হইল। পত্রার্থ অন্তঃপুর হইতে রাজপুরী, রাজপুরী হইতে রাজধানীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। দুর্দ্দৈবের দুর্লক্ষ্যসূত্রে সেই সংবাদ সন্ন্যাসীর কর্ণগোচর হইল। দেবালয়-লাঞ্ছিত দেবল পুরীকে দগ্ধ শ্মশান করিবার জন্য সন্ন্যাসী হৃদয়ে যে কালানল পোষণ করিতেছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া সেই অনল গর্জ্জিয়া উঠিল। শৈব সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া অশ্বপালের বেশ পরিগ্রহপূর্ব্বক অতি গোপনে দেবলরাজের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করেন। সর্ব্বপ্রকার পশু পক্ষী বশীভূত করিবার কলাবিদ্যা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জানা ছিল। সৈন্যাবাসের ভৃত্যবর্গ মধ্যে ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানে তাহা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দৈবচক্রে এই সময়ে সংবাদবাহক পক্ষিগণের ও অন্যান্য পশু পক্ষীর পালনকারী ভৃত্যবর্গের মধ্যে একজনের মৃত্যু

হয়। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী সেই পদে নিযুক্ত হন। তিনিই যথাকালে পিঞ্জর হইতে সংবাদবাহক নির্দ্দিষ্ট ঘুঘু দুইটীকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা মুক্ত হইয়াই উর্দ্ধগগনে উড্ডীন হইল, এবং বদ্ধ সংস্কারবশে সরল রেখাক্রমে উভয়ে পাশাপাশি হইয়া দেবগ্রামাভিমুখে ছুটিল। অচিরকাল মধ্যেই দেবল দুর্গের বুরুজের উপর উপবেশন পূর্ব্বক "ঘুঘু,—ঘু;—ঘুঘু,—ঘু" এই অব্যক্ত ধ্বনিতে মনের আনন্দ বা ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল।

দেবলরাজ ঠিক্ গোধূলি সময়ে নগর-তোরণে উপস্থিত হইয়াই মহা হাহাকার ও কাতর ক্রন্দনের রোল শুনিতে পাইলেন। ধুধু শব্দে রাজপ্রাসাদ জ্বলিতেছে, দূর হইতে তাহাও দেখিতে পাইলেন। উচ্চ প্রাসাদে অভ্রস্পর্শী অগ্নিশিখা দেখিয়া বোধ হইল যেন স্বয়ং অগ্নিদেব মূর্ত্তিমান হইয়া দিগ্‌দাহ করিতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তঃপুরস্থ অগাধ-জল দীর্ঘিকা তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার অন্তিম আদেশ যথার্থ প্রতিপালিত হইয়াছে। অন্তঃপুরস্থ যাবতীয় মহাপ্রাণীর মৃতদেহ দীর্ঘির জলে ভাসিতেছে। অগণ্য সৈন্য ও নগরবাসী চতুঃপার্শ্বে হাহাকার করিতেছে। অগণ্য ব্যক্তি রাজপুরীর অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিতেছে। সে কালানল নির্ব্বাণ করে কাহার সাধ্য? যাহারা চৌবেড়ের বুড়োশিবের মন্দিরে অগ্নিকাণ্ড দেখিয়াছিল, তাহারা ভাবিতে লাগিল, মহাকাল বুঝি কালানল জ্বালিয়া স্বকীয় দেহদাহের প্রতিশোধ লইতেছেন! অশ্বারোহী দেবলরাজ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ক্ষণকাল এই ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিলেন। পরক্ষণেই অশ্ব সহ পরিজনগণের মধ্যে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে দেবলরাজের "সপুরী এক গড়" হইয়া গেল।

যথাকালে ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী আসিয়া এই প্রলয় কাণ্ড দর্শন করিলেন। তখন তাঁহার প্রতিহিংসানলে দগ্ধীভূত হৃদয় সুশীতল হইল। "উৎকট পাপের পরিণাম এইরূপ ভীষণ", স্পর্শমণির আখ্যায়িকা সবিস্তার বর্ণনপূর্ব্বক সকলকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া। স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কর্ত্তব্য ভার।

কর্ত্তব্য ভার অতি গুরুতর ভার। কর্ত্তব্য পথ অতি কঠোর পথ। দায়িত্বের গুরুতর চাপ যিনি জীবনে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই তাহার গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কর্ত্তব্য বোধ একবার প্রাণে উপস্থিত হইলে সে কর্ত্তব্য পালন

না করা পর্য্যন্ত আর কেহ স্থির থাকিতে পারেন না, দায়িত্ব জ্ঞান সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার প্রাণের সমস্ত শান্তি হরণ করিয়া লয়। আবার সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে কত বিঘ্ন, কত বিপদ, কত সংগ্রাম! এ পথে যেন কেবলই দুঃখ, কেবলই কষ্ট! অথচ এই গুরুতর কর্ত্তব্য ভার আছে বলিয়াই মানব মানব-পদবী বাচা হইয়াছে। অপর পক্ষে ইহাতেই জীবনের প্রধান সুখ। যদি এ জীবনের কোন কর্ত্তব্য না থাকিত তবে বহু পবিত্র সুখে বঞ্চিত হইতে হইত, তবে জীবন বাস্তবিকই ভারবহ হইত।

মানব জীবনের কর্ত্তব্য অনেক এবং অতি গুরুতর। কিন্তু বহু বিভাগে বিভক্ত হইলেও এক কর্ত্তব্যই অপর সকল কর্ত্তব্যের মূল। যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি, যিনি আমাদের জীবনের বিধাতা ও অদ্বিতীয় প্রভু, তাঁহার ইচ্ছানুসারে জীবন নিয়মিত করা আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তিনি আমাদের জীবনকে যে ভাবে গঠিত ও চালিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আমাদের দ্বারা জগতের যে কিছু কার্য্য করাইতে চাহেন, তাহার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা আমাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য—ইহাই অপর সকল কর্ত্তব্যের মূল। পরম প্রভু পরমেশ্বর আমাদের জীবনের নিয়ন্তা, তাঁহার আদেশ ও ইচ্ছা আমাদের সকল কর্ত্তব্যের মূল ভিত্তি, ইহা ব্যতীত কর্ত্তব্য অর্থহীন শূন্যগর্ভ বাক্য মাত্র। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের সকল কার্য্যের উৎস। তাহা অবগত না হইলে পৃথিবীর সমস্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, আমরা অজ্ঞান পশুর অধম হইয়া পড়ি। পাপ ও ক্ষুদ্রতার দাস অপূর্ণ মানবের পক্ষে পূর্ণ প্রেম ও পবিত্রতার আকর পরম দেবতার ইচ্ছাধীন হইয়া চলা, সমস্ত স্বার্থ মোহ ছাড়িয়া তাঁহার ইচ্ছা পালন করা যে নিতান্ত কঠিন তাহা আর বলিতে হইবে না। অপর পক্ষে সকল সুখ শান্তির আকর আনন্দময় দেবতার অধীনতাই যে সর্ব্ব প্রকার আনন্দ ও কল্যাণের মূল, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য, স্বামী স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য, পুত্র কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি কর্ত্তব্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য, পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য, ইত্যাদি কত কর্ত্তব্যই না আছে। ইহাদের কোনটীই সহজ নহে, প্রত্যেকটীই অত্যন্ত কঠিন অথচ তাহাদের মধ্যে আবার কত সুখই না রহিয়াছে। পিতা মাতা সন্তানের জন্য কত ব্যস্ত! কিসে সন্তানের শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে, কিসে সন্তানের হৃদয়ে সুকুমার শিক্ষাকৌশলে ভাবী সম্মানের বীজ ফুটিয়া উঠিবে, কিসে সে জ্ঞানী, মানী, ধনী হইয়া সংসারে সুখী হইতে পারিবে সে জন্য তাঁহাদের শরীর মন প্রাণ কত ব্যস্ত, সেজন্য তাঁহারা কতই না পরিশ্রম করিতেছেন, কতই না কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, নিজেদের সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতেছেন!

তাঁহাদের প্রাণের গভীর স্থল হইতে সর্ব্বদা সন্তানের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য কি করুণ প্রার্থনাই না উত্থিত হইতেছে! তাঁহারা সে কর্ত্তব্যের চাপে যেন পেষিত হইয়া যাইতেছেন। এই কর্ত্তব্যের সহিত তাঁহারা যেন এক হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে যেন সন্তান ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। কর্ত্তব্য জ্ঞান এমনই জিনিস ইহা সমস্ত জীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলে, নিজ জীবন অনায়াসে পরিত্যাগ করা যায়, কিন্তু কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করা যায় না। জীবন হইতে কর্ত্তব্য কম নহে বরং গুরুতর, কর্ত্তব্যের বন্ধন মায়ার বন্ধন হইতেও কঠোরতর।

দুর্দ্দান্ত ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত সন্তান সেণ্ট আগষ্টাইনের পরিবর্ত্তনের জন্য মাতা মণিকাদেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কত কষ্টে কত স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, আর অশ্রুজলে ভাসিয়া আকুলপ্রাণে কত প্রার্থনা করিয়াছেন! তাঁহার জীবনে যেন দুঃখের সীমা নাই। আবার স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্য সীতাদেবীকে কত কষ্টই না সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার কর্ত্তব্যময় জীবনে আর দুঃখের শেষ ছিল না। অথচ দুঃখ কষ্ট ও সংগ্রামের মধ্যে তাঁহারা যে অতুল সুখ ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আয়াসহীন আরামপূর্ণ জীবনে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। সত্যই তাঁহাদের সে সুখে আর কাহারও অধিকার নাই। তাঁহাদের সে অনুপম আনন্দ ও শান্তির তুলনা মিলে না। তাহা আর কাহাকেও বুঝানও যায় না। সে শান্তির কল্পনাতেও প্রাণে যে শান্তির ছায়া পতিত হয়, তাহাই প্রকাশ করা যায় না। একদিন নয় দুই দিন নয় সমস্ত জীবন প্রফুল্লচিত্তে পক্ষাঘাত রোগ-গ্রস্তা সহধর্ম্মিণীর শুশ্রূষা করিয়া—নিজ হস্তে তাঁহাকে আহার করাইয়া, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইয়া অপগণ্ড শিশুর ন্যায় তাঁহাকে লালন পালন করিয়া দাম্পত্য-জীবনের এই গুরুতর কর্ত্তব্য ভার বহনে জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক যে আনন্দ ও সুখ পাইয়াছেন, তাহার তুলনা আর কোথায় মিলে? পৃথিবীর ধনে মানে ঐশ্বর্য্যে, ভোগবিলাসে কিছুতেই এ সুখ মিলে না। পৃথিবীর যাবতীয় কর্ত্তব্য-পরায়ণ জীবন এ সুখের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধে ধন মান ঐশ্বর্য্য সর্ব্বস্ব অক্লেশে প্রফুল্লচিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা কর্ত্তব্য-পালনে যে সুখ—যে আনন্দ পাইয়াছেন কোন্ ধনী কোন্ মানী তাহা পাইয়াছে বা পাইবে? কখনও না। বাস্তবিক কর্ত্তব্য পালন ভিন্ন জীবনধারণ ভূতের বোঝা বহন মাত্র। যে জীবন এই কর্ত্তব্য পালনে বঞ্চিত, তাহাতে সুখ ও শান্তির আস্বাদ কখনও মিলিবে না; কারণ কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের যন্ত্রণার ন্যায় আর যন্ত্রণা নাই, আর কর্ত্তব্য পালনের সুখের তুল্য সুখও আর নাই। তাই বলিতেছি কর্ত্তব্যই সুখ, কর্ত্তব্যই শান্তি, কর্ত্তব্যই সব। কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যই লক্ষ্য, কর্ত্তব্যই

মনুষ্যত্ব, কর্ত্তব্যই স্থায়ী পবিত্র সুখ শান্তির একমাত্র অক্ষয় উৎস। কর্ত্তব্য জীবনের স্পর্শমণি, ইহার স্পর্শে সমস্ত জীবন পবিত্র হয়, আনন্দে উন্মত্ত হয়, সকল অবস্থার অতীত হয়।

আমরা ত সংসারে কত কর্ত্তব্য করিতেছি। কিন্তু কয় জনে এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া সুখী হইতে পারিতেছি? ইহার কারণ কি? আমাদের স্মরণ রাখা উচিত প্রথমতঃ কর্ত্তব্য ভারের,—কর্ত্তব্য বোধের ভীষণ চাপ, পরে কর্ত্তব্য পালনের অপার সুখ। কর্ত্তব্য পালনের সুখ পাইতে হইলে তাহার দুঃখটীও পাইতে হইবে। আমরা দুঃখ পাই না, তাই সুখও পাই না। আমরা যে সুখ পাইতেছি না, তাহা সকলেই বলিবেন, কিন্তু আমরা যে কর্ত্তব্য পালনের দুঃখও ভোগ করিতেছি না, ইহা হয় ত অনেকেই স্বীকার করিবেন না; তথাপি ইহা অতি সত্য কথা। আমাদের কয়জনের জীবনে সে দায়িত্ব বোধ আছে? আমাদের কয় জনের জীবন দায়িত্বজ্ঞানের গুরুভারে প্রপীড়িত? একটী কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিলে কি আমাদের প্রাণ অস্থির হয়? প্রকৃত পক্ষে আমাদের কি কোনও দায়িত্ব বোধ আছে? আমাদের কি যথার্থ কর্ত্তব্যজ্ঞানই আছে? কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলে দায়িত্ব বোধও থাকিত। দায়িত্ব বোধ কর্ত্তব্য জ্ঞানের ঔৎকর্ষের উপর নির্ভর করিতেছে। যাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান যত উজ্জ্বল, তাহার দায়িত্ব বোধ তত প্রবল। এই দায়িত্ব বোধই কর্ত্তব্য পালনের নেতা। আমাদের দায়িত্ব বোধ না থাকাতে কর্ত্তব্য পালনও নাই। তাই কর্ত্তব্য পালনের সুখও নাই। আবার আমরা জ্ঞানের অভাব বশতঃ প্রকৃত কর্ত্তব্য কি তাহা বুঝিতে পারি না। এই জন্য আমরা বহু কর্ত্তব্য সাধন হইতে বঞ্চিত হই এবং বহু অকর্ত্তব্যও সাধন করিয়া থাকি। মাতার গুরুতর কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত জ্ঞান আমাদের মধ্যে কয় জনের আছে? আমাদের মধ্যে কয় জন এমন আছি যে সন্তানকে উপযুক্ত-রূপে গঠিত করিতে পারি? সন্তানের অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বিদ্যা, বুদ্ধি, মান অপেক্ষা তাহার আত্মার উন্নতির জন্য অধিক ব্যাকুল এরূপ মাতা কয়টী আছেন? "হে প্রভু আমার সন্তান পথের কাঙ্গালী হউক, সংসারের ঘোরতর বিপদের মধ্যে পতিত হউক, কিন্তু তোমার পথে থাকিয়া তোমার কার্য্য সাধন করুক, ঝড় প্রবাহিত হউক কিন্তু তোমার পথে অটলভাবে অবস্থিতি করুক", আমরা কয় জন সন্তানের জন্য এরূপ প্রার্থনা করিতে পারি? এইরূপ মা হইতে পারিলেই সন্তানের প্রতি গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিয়া দায়িত্ব-ভার-মুক্ত হইতে এবং অতুল আনন্দ ও অপার সুখ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই এই একই কথা। সকলের মূলে জ্ঞান ও প্রেম। এই জ্ঞান ও প্রেম কর্ত্তব্যের মূল। আর এই কর্ত্তব্য জীবনের চালক হইলে প্রাণ এরূপ দ্রাঢ়িষ্ঠ হয় যে সংসারের

প্রকার ঝড়ে তাহা অচল অটল থাকে, কখনও পথভ্রষ্ট হয় না, ইহা জীবনকে ঠিক্ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং শান্তির সেই অনন্ত উৎস খুলিয়া দেয় যাহার আর বিরাম নাই, শেষ নাই, ক্ষীণতা নাই।

আত্মসংযম।

(৪১৩ সংখ্যা—৪৫ পৃষ্ঠার পর।)

৬। আনুরক্তি—সুন্দর বস্তু বা রমণীয় বিষয়ের প্রতি মানবের স্বাভাবিক যে অনুরাগ, তাহাকেই আমরা "আনুরক্তি" প্রবৃত্তির কার্য্য বলিতেছি। এই প্রবৃত্তির জন্যই মানব-হৃদয় প্রভাতের সূর্য্য, বিকশিত কুসুম, মধুর চন্দ্রালোক, সুন্দর মুখ হইতে পুণ্যের জ্যোতিঃ, দয়ার মাধুর্য্য, বিদ্যার মহত্ত্ব প্রভৃতি সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণে অনুরক্ত হইয়া থাকে। কুরুবংশীয় ধনঞ্জয় কবে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শূরত্বের কথায় আমাদের প্রাণ কেমন উল্লসিত হয়! রাণী অহল্যা বাই কোন্ কালে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার মহত্ত্বের কথায় এখনও তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতে হয়! মহারাষ্ট্রীয় ছেলে পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে সে দিন বিলাতের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়াছেন, তাঁহার প্রতিভার কথায় আমাদের প্রাণ পুলকিত হইতেছে! ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, সুকবি, সুশিল্পী প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিদিগের সদ্‌গুণের প্রতি এই যে অনুরাগ, ইহাই আমাদের আনুরক্তি প্রবৃত্তির কার্য্য। এই আনুরক্তি হইতে মানবের মহোপকার সাধিত হয়। যিনি যে গুণের প্রতি অনুরক্ত, তিনি সেই গুণ নিজ চরিত্রে গ্রহণ করিতে যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাতে মানব, আদর্শের সমতুল্য উন্নত না হইলেও, মনুষ্যত্ব লাভে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই আনুরক্তি লইয়া মানব যদি স্বার্থপরতার বশে গর্ব্বান্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের সেই অমৃত কালকূটের আকার ধারণ করে, তাহার আনুরক্তি প্রবৃত্তি হিংসা রিপুরূপে পরিণত হইয়া তাহাকে পিশাচবৎ অধম করিয়া ফেলে।

প্রণিধান করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হয় যে, কোনও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় ক্ষমতা নিজের আয়ত্তাধীন করিতে না পারিয়াই মানব হিংসুক হইয়া পড়ে। তোমাকে কোনও সদ্‌গুণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জানিয়া আমি তোমার সেই গুণের প্রতি স্বভাবতঃ অনুরক্ত হইলাম। যাহাতে তোমার মত হইতে পারি, তোমার আদর্শে তাহাই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইহাত আনুরক্তির

কার্য্য। তার পরে যখন নিজের অযোগ্যতা নিজে বুঝিতে পারিলাম—যখন বুঝিলাম, তুমি মহৎ, আমি ক্ষুদ্র, তুমি কৃতী, আমি অকৃতী, যখন বুঝিলাম আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, তোমার সূর্য্য কিরণের কাছে আমার জোনাকীর আলো কখনই ফুটিবে না, যখন সব বুঝিয়া নিরাশ হইলাম, তখনই তোমার মহত্ত্ব—তোমার সুখ্যাতি আমার নীচ হৃদয়ে অসহ্য বোধ হইল, আমি ছিলাম তোমার অনুরক্ত— হইলাম হিংসুক! তাই তোমার তুলনায় আমিও যে "একটা সামান্য লোক নই" এ কথা প্রথমতঃ নিজের মনের কাছে, পরে জগতের কাছে বিধিমত সপ্রমাণ করিতে বসিলাম। ক্রমশঃ তোমাকে ক্ষুদ্র করিয়া, আমার মহত্ত্ব দেখাইতে শত সহস্র "ফিকির, ফন্দি" খাটাইতে লাগিলাম। তার পরে যখন আমার নীচতা "ষোল কলায়", পূর্ণ হইল, তখন কেবল তুমি কেন? এ জগতে আমা ভিন্ন অন্য ধনী, মানী, জ্ঞানী, সাধু, যশস্বী প্রভৃতি সৌভাগ্য-বান্ আছে কেন? ভাবিয়া দারুণ হিংসার আগুনে পুড়িয়া মরিতে লাগিলাম!— হিংসার কার্য্য এইরূপই হইয়া থাকে।

ছয় রিপুর সকল কয়টাই মানবের সর্ব্বনাশক হইলেও হিংসাই মানবকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণচেতা করিয়া ফেলে। ইহার প্রধান কারণ এই যে হিংসার কার্য্য পরশ্রী-কাতরতা। পরের হিতসাধন মানব-জন্মের এক প্রধান কর্ত্তব্য; ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের সার এবং সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্মেরই সার। সকল উৎকৃষ্ট ধর্ম্মবেত্তারাই পরের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু হিংসুক স্বতন্ত্র জীব; সে পরের মঙ্গল চাহিবে কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহাতে পর ব্যথিত হয়, নিন্দিত হয়, দরিদ্র হয়, মূর্খ, নীচ এবং সর্ব্বাংশে হেয় হয়, হিংসুকের চিত্ত তাহাতেই লাগিয়া আছে। সে পরের মঙ্গল চাহিবে কি? পরের অমঙ্গল জন্য যদি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিতেও হয়, সে তাহাতেও সম্মত হইবে। গল্প আছে, এক হিংসুক প্রাণপণে ভগবানের সাধনা করিল; তাহার পরিশ্রমে দয়াময় দয়া করিয়া বর দিতে আসিলেন। সে প্রার্থনা করিল "ঠাকুর! আমি যখন যাহা চাহিব, তখন যেন তাহাই পাই।" ঠাকুর বলিলেন "তাহাই হইবে; কিন্তু তুমি যাহা পাইবে, তোমা কর্ত্তৃক হিংসিত প্রতিবাসিগণ তাহার দ্বিগুণ পাইবে।" ইহার পরে সে ভগবানের নিকটে একটী উৎকৃষ্ট অশ্ব চাহিল, অমনি তাহার একটী এবং তাহার প্রতিবাসি-দিগের দুইটী করিয়া উৎকৃষ্ট অশ্ব আসিল। এইরূপে সে সম্পদ যশঃ যাহা কিছু চাহিতে লাগিল, তাহার এক গুণ এবং তাহার প্রতিবাসীদিগের দ্বিগুণ লাভ হইতে লাগিল। হিংসুকের প্রাণে পরের এত শ্রীবৃদ্ধি আর সহ্য হইল না, তখন সে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিল "দেব! আমার এক চক্ষু কাণা হউক।" ইহাতে তাহার এক চক্ষু কাণা হইল বটে, কিন্তু প্রতিবাসীদিগের দুই চক্ষু অন্ধ দেখিয়া সে

যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইল। তখন হিংসুক মনের আনন্দে ঘুরিতে ঘুরিতে দৃষ্টির অসম্পূর্ণতা জন্য এক কূপে পতিত হইল। সে উদ্ধারের জন্য বহু আর্ত্তনাদ করিলেও অন্ধতা-নিবন্ধন তাহার প্রতিবাসিগণ তাহাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইল না। তখন সে নিজের দোষ বুঝিল, এবং ভয়ানক ক্লেশে মরিয়া গেল! এ ঘটনা উপকথা হইলেও প্রকৃত পক্ষে হিংসুকের প্রকৃতি এইরূপ। হিংসা মানবকে সত্য সত্যই নর-পিশাচ করে। সে রকম হতভাগ্যদিগের জীবন ধারণ যে বিড়ম্বনা, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

(ক্রমশঃ)

অন্তঃসলিলা।

১

চাহিয়া দেখিনি তারে
পাছে সে শুকিয়া যায়,
নিকটে বসিনি, যদি
মোর বায়ু লাগে গায়।

২

বলিনি মনের কথা
সে শুনি অবাক্ হবে,
সুধিনি তাহারে কিছু,
কেমনে খুলিয়া ক'বে?

৩

সাধিনি—ডাকিনি তারে,
না দেখিলে "মরে যাই,"
আপনি আসিত যদি,
আমি যেন সেথা নাই!

৪

দিইনি স্নেহের ভাষা,
অথবা একটু হাসি,
ভুলেও বলিনি কভু
কতখানি ভালবাসি।

৫

একটু আদর দিতে
বড় সাধ হ'ত চিতে,
বিলায়েছি পথে পথে,
তারেই পারিনি দিতে!

৬

আজি
প্রীতি, স্নেহ দিতে নিতে
কত কা'রা যায় আসে,
তারেই গুটায়ে হাত
বসেছিনু এক পাশে!

৭

স্বরগ-দেবতা সে যে,
হৃদয় স্বরগ তারি,
এ জগতে কিবা আছে
তাই তারে দিতে পারি?

৮

আজি তারে খোঁজে সবে
সে এখন কোন্ খানে?
(পরে জানে "বহুদূর",
আমি জানি, মোর প্রাণে)

৯

দু'পারে দু'জন আছি,
"বৈতরণী" আছে মাঝে,
আমি যেন তারে ভুলে,
রয়েছি আমারি কাজে!

১০

আমি যে প্রতিমা গড়ি
মনের নিরালা ঠাঁই
রেখেছি, জনমভরে
সেবিব—পূজিব তাই;

১১

দেছি তাহে সুখ-সাধ
দেছি তাহে সুখ-আশা,
যতখানি আছে বুকে,
দেছি তত ভালবাসা।

১২

বরষা-উচ্ছ্বাস দেছি,
বাসন্ত:ফুলের হাসি,
শারদ-চন্দ্রমা দেছি,
ঊষার সোহিনী বাঁশী।

১৩

স্বরগ-মন্দার দেছি
অঞ্জলি ভরিয়া আনি,
তপ্ত নয়নের জলে
ভিজায়েছি পা' দুখানি।

১৪

সদ্য-ছিন্ন হৃদি রক্তে
নিত্য করাইয়া স্নান,
প্রাণের সর্ব্বস্ব তারে
নীরবেই করি দান।

১৫

আমার সাধের যত,
সকলি সঁপিয়া তা'য়
একেলা রয়েছি আজি
শত বর্ষ দূরে হায়!

১৬

বাহিরে খুঁজিয়া কেহ
ছায়াটী পাবে না তার,
জলভরা ফল্গু নদী,
বাহিরে বালুকা সার!

শ্রীকনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

চন্দনতলার চাপ।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

চন্দনতলার ঘাটে আর একটী উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা সেই চন্দনতলার জলে শত শত বালবৃদ্ধ যুবকের জলক্রীড়া। বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শত শত মনুষ্য মহানন্দে জলখেলা করিয়া সন্তরণ-জনিত শ্রান্তি দূর করণোপ-যোগী এক একটী পাটথড়ীর (পাকাটীর) বোঝা সকলেই হস্তে করিয়া রাখে। মদন-মোহনের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে সন্তরণ-পটু বালকগণ ঘুরিয়া বেড়ায়। চন্দনতলা

জলের মন্দির ঊর্দ্ধে ২৫।৩০ হাত হইবে, বালকগণ তাহার শিরোভাগ হইতে জলে লাফাইয়া পড়ে। মুহূর্ত্তের জন্য জলে নিমগ্ন হয়, আবার ভাসিয়া উঠে। এইরূপ অনবরত উঠিতেছে-পড়িতেছে, উঠিতেছে-পড়িতেছে। চন্দনতলা পুকুরের অনতিদূরে ক্ষুদ্র তেলের দোকান আছে, যে আসিতেছে সেই আপাদ মস্তক তৈল মাখিয়া জলে লাফাইয়া পড়িতেছে। এত বড় পুকুর লোকে লোকারণ্য—ছিদ্রশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চারিদিকে কেবল মানুষের মাথা, পাট খড়ির বোঝা আর ঝপাঝপ শব্দ।

চন্দনতলা পুকুরে অনেক কুম্ভীর অবস্থিতি করে, বালকদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও ভাসিয়া বেড়ায়। কথিত আছে যে চন্দনতলা চাপের ২১ দিবস তাহারা কাহাকেও হিংসা করে না, অথচ শেষ দিন একটী না একটী উদরসাৎ করে, এ কথা সময় সময় সত্য হইতেও দেখা যায়। ফলকথা এখানকার মানুষেরা কুম্ভীরকে অতি কম ভয় করে। কুম্ভীর ভাসিয়া উঠিলে বালকগণ ইষ্টক খণ্ড লইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক তাহার অতি নিকটে যায় এবং এইরূপ কহে "কোটি গলা (কোথায় গেল), মারি পকারে, মারি পকা (মার মার), বিধাপকা বিধাপকা (কীল দে কীল দে)।"

জলক্রীড়ার পর মদনমোহন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলে সেই জনস্রোত কথঞ্চিৎ নির্জ্জনতায় পর্য্যবসিত হয়। চারিদিকে শান্তি শোভার সীমা পরিসীমা থাকে না। নক্ষত্র-খচিত সুন্দর প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বিত হইয়া চন্দনতলার জলরাশি নৃত্য করিতে থাকে, মৃদু মৃদু বায়ুহিল্লোলে মন্দিরের মধ্য হইতে ফুল চন্দনের সুগন্ধ ছড়াইতে থাকে, লহরীমালা ফুল বিল্বপত্র নাচাইতে নাচাইতে এ কূল হইতে ও কূলে যায়, ও কূল হইতে এ কূলে আসে।

এ সময় ভক্তবৃন্দের মনে আর আনন্দ ধরে না, কেহ মন্দিরের মধ্যে উপবেশন করিয়া ভাবে বিভোর, কেহ মদনমোহনকে দেখিতে দেখিতে তন্ময়চিত্ত, কেহ হরিচিন্তায় অনন্যমনা, কেহ কৃষ্ণ রাধিকার জলখেলার কথা উপকথার ন্যায় অন্যকে শুনাইতেছে, কেহ নিবিষ্ট মনে বসিয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছে, কেহ গাইতেছে—

"চাঁদবদনে একবার হরি বল ভাই,
লুচী মোণ্ডা ফুলবাতাসা হরির নামে লুটা ধনাই।"

কেহ গাইতেছে—

"হরি বলরে ভাই,
গৌর নিতাই।"

কেহবা দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া উচ্চ কণ্ঠে গাইতেছে—

"পতিতপাবন, এ পাতকীজন,
ভ্রমে কি কখন পাবে তোমারে।"

সঙ্গীতের তালে তালে বায়ু নাচিতেছে, লহরী কাঁপিতেছে, নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতেছে, প্রেমভরে জগতীতল ভাসিয়া যাইতেছে, মরি মরি কি স্বর্গের

শোভারে! কি হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যরে! এখানে আসিলে জানি না কোন্ এক অদৃশ্য অননুভূত অপরিজ্ঞাত শান্তির প্রভাবে প্রাণ আত্মহারা হয়, জীবনে এক অমৃত যোগের উদয় হয়! তখন ইচ্ছা হয় সেই মৃদু পবনের স্বন্ স্বন্ শব্দের সঙ্গে, সেই চন্দনতলার কুল্ কুল্ ধ্বনির সঙ্গে আর সেই গায়ক—কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া গাই—

"একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ।
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম উৎস উথলিল আজি —
বলহে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ, লহ তুমি কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লওহে নাথ।"

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস।

ইংরাজ রাজত্বের সুফল।

ইংরাজ-রাজের রাজত্বকালে, বিশেষতঃ ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সুশাসন-সময়ে আমরা অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক সময় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সুখ শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারত সাম্রাজ্ঞীর রাজত্বে ধন-জন-জীবন লইয়া ভারতের প্রজাবৃন্দের কোনও বিপৎপাত কি বিভ্রাটের ভয় নাই। দস্যু তস্করের দৌরাত্ম্যে পূর্ব্বকালের জন-সমূহ যেমন সতত সশঙ্কিত থাকিতেন, বর্ত্তমানে কেহই সেরূপ সশঙ্কিত নহেন। অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষবিশিষ্ট বাটী নির্ম্মাণকরতঃ তন্মধ্যে ফাঁপা কুলঙ্গী ও চোর কুঠরি ইত্যাদি রক্ষা করা আর কেহই প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রত্যয় করেন না। ধনাঢ্য কি ভূম্যধিকারীরা আর কেহই লাঠিয়াল পাইক ধনজন প্রাণ রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় জ্ঞান করেন না। বর্ত্তমানে পর্য্যটকেরা ধন সম্পত্তি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে দূর দূরান্তরে অহরহঃ ভ্রমণ করিতেও ভীত নহেন। প্রকৃত পক্ষে ইংরাজ রাজত্বে সাধারণের পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা ধন-জন-প্রাণ নিরাপদ হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা ইংরাজ-রাজের রাজত্বে যে সকল সুফল লাভ করিতেছি, তন্মধ্যে ডাক ও তাড়িত বার্ত্তার বন্দোবস্ত, রেলওয়ে ও ষ্টীমার এবং পুলিশ ও আদালতের সুব্যবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রকৃষ্ট বলিতে হইবে। আমরা বিজিত জাতি। রাজা বিদেশী অথবা স্বদেশীই হউন না কেন, তাঁহাকে শাসক ও পালক জ্ঞানে জনকের ন্যায় ভক্তি ও সম্মাননা করা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমরা যখন প্রায় ৮০০ শত বর্ষকাল অনেক অত্যাচারী দুর্বৃত্ত আফগান, তুর্কী, মোগল প্রভৃতি যবনরাজের অধীনে সদা সশঙ্কিত অবস্থায় অশান্তিতে অবস্থিতি করিয়াও রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হই নাই, তখন সুসভ্য ও সদাশয় ইংরাজ রাজত্বে অতুল শান্তিতে অবস্থিতি করিয়া কেন অকৃতজ্ঞচিত্তে রাজাকে অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিব? প্রকৃত পক্ষে ইংরাজ রাজা প্রজার পালক ব্যতীত পীড়ক নহেন। প্রজার বিলাপ ক্রন্দন ও সরল আবেদনে দয়ার্দ্রচিত্ত না হইয়া প্রজার অহিত সাধন ব্রতে ব্রতী হইতে পারেন কি? সত্য বটে বর্ত্তমানে রাজনীতি পর্য্যালোচনার উপযুক্ত পূর্ণ অধিকার আমাদের হস্তে ন্যস্ত নহে। তত্রাপি প্রজা-রঞ্জক ইংরাজরাজ কেবল উচ্চ শাসন ও সৈনিক বিভাগ ভিন্ন অন্যত্র, বড়লাট ও ছোট লাটের মন্ত্রি-সভাতে এবং বিচারালয়ে আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়া সদাশয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কি ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরী সভায় কি বড় লাটের সভায় যখন যেরূপ প্রকৃতির মন্ত্রিসংখ্যার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তদ্রূপ আইন কানুন বিধিবদ্ধ হয়। ফলতঃ তজ্জন্য ভারত-সাম্রাজ্ঞীর উপর কোনও দোষারোপ করা সতত সর্ব্বতোভাবে অন্যায়। প্রকৃত পক্ষে ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভারতের প্রজাপুঞ্জকে অপত্যস্নেহে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন। বিগত জুবিলী অভিনন্দনের উত্তরগুলি পাঠ করিলে ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। মন্ত্রিসমাজের কোন্ ভ্রান্তসিদ্ধান্ত নিরসন উদ্দেশে সরল ও বিনীতভাবে অভাব অভিযোগ ইংরাজ রাজসমীপে প্রার্থনা দ্বারা বিদিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই বটে, তথাপি সকল দুঃখ স্পষ্টাক্ষরে জানান যায় এবং তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টাও করা যায়। বর্ত্তমানে ইংরাজরাজত্বে যেমন কংগ্রেস মঞ্চ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অনেকেই যশস্বী ও দেশহিতৈষী হইতে প্রয়াস পান, মুসলমান রাজত্বে তদ্রূপ করিবার কল্পনা করিলেও শিরশ্ছেদ পুরস্কার হইত। উপসংহারে সঙ্গীতামৃত লহরীর একটী গীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করা গেল।

"ধন্য বৃটিষ" অশেষ গুণ তোমার।
করি কোটী কোটী নমস্কার।
দেখি সব বাড়ি বাড়ি বিজ্ঞানের ছড়া-ছড়ি, সভ্যতার বাড়াবাড়ি, অতি চমৎকার। বৈদ্যুতিক গ্যাসের জ্যোতি নাশে আন্ধার দিয়া দীপ্তি, টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনে বহে বার্ত্তা নিরন্তর। বাষ্পযান চলে জলে, বাষ্পরথ রেলে চলে, দূরবীণ অণুবীক্ষণ বলে লভি কত উপকার। বিবিধ কারখানা কলে, করে কার্য্য কল কৌশলে, ডাকঘর আদি অবহেলে করে হিতসাধন অপার॥

ত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী।

চিনির বলদ।

কলিকাতার অনতিদূরে কাশীপুব বলিয়া একটী গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে গঙ্গারাম চৌধুরী নামক একটী ভদ্রলোক বাস করিতেন। গঙ্গারামের বয়ঃক্রম এইক্ষণে সত্তর বৎসর হইবে। বাল্যকালে, তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় কষামাজার কাজ উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া বিদ্যানুশীলন পরিত্যাগ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের কিছুদিন পরে তিনি একটী সওদাগরী আফিসে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে একটী চাকরি পাইলেন। স্বীয় অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে কার্য্য করিতে করিতে সাহেবদিগের নজরে পড়িলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার বেতন ৫০৲ টাকা হইল। 'উপরিও' কিছু লাভ হইতে লাগিল।

গঙ্গারাম এতাবৎকাল 'মেসে' (ছাত্রবাসায়) থাকিয়া দিনাতিপাত করিতেন। মধ্যে মধ্যে মাসে ২।১ বার বাটী যাইতেন। বাটীতে এক স্ত্রী, এক পুত্র, এক ভাই ও এক বিধবা ভগ্নী ছিলেন। বেতন বৃদ্ধি শুনিয়া স্ত্রী কলিকাতায় আসিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। গঙ্গারামের ইচ্ছা নয় যে স্ত্রী কলিকাতায় আইসেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে টাকা জমাইতে হইবে। স্ত্রীর উপর্য্যুপরি আক্ষেপ-সূচক পত্র বর্ষণে তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া কলিকাতায় স্ত্রী পুত্র আনিলেন।

গঙ্গারামের পত্নী রূপে ভগবতী ও গৃহকার্য্যে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপা। তাঁহার পদার্পণে গঙ্গারামের বেশ দশ টাকা হাতে আসিতে লাগিল। স্বামীর ব্যয়বাহুল্য ভয়ে অনিচ্ছা সত্বেও তিনি একজন ঝি রাখিলেন। দিন দিন গঙ্গারামের সংসারের উন্নতি হইতে লাগিল—তিনি মাটি মুঠা ধরিলে সোণা মুঠা হয়। গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা যে একটী পাকা ইমারত করা হয়। গঙ্গারাম অত্যন্ত চাপা ও সাবধান। তিনি কোন মতে সম্মত হয়েন না। পত্নীর পীড়াপীড়িতে কহেন, "ক্ষেপি ! বুঝ্‌তে পারিস্ না, এখন কোটা করিলে লোকের চোক টাটাইবে।" এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন অন্ধকার রাত্রে গঙ্গারামের ঘরে সিঁদ কাটিয়া চোরে কিছু টাকা চুরি করিল। গঙ্গারামের আহার নিদ্রা এক প্রকার বন্ধ হইল—ভাবনায় শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। রাত্রে নিদ্রা নাই—হুঁকা মুখে দিয়া বসিয়া অর্থ চৌকি দিতে লাগিলেন। স্ত্রী কোটা করিবাব জন্য যত অনুরোধ করেন, গঙ্গারাম তাহা কিছুই কাণে স্থান দেন না। আর রাত্রি জাগিতে না পারিয়া, ক্লান্ত হইলে গঙ্গারাম

পরিশেষে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "কেমন, এখন হয়েছে ত, কাঙ্গালের কথা বাসি হইলে মিষ্ট লাগে।"

রাজমিস্ত্রি আসা যাওয়া করিতে লাগিল। কলিকাতায় বাদুড়বাগানে মায় পুষ্করিণী ও বাগান একটী জমি খরিদ করা হইল। ঐ জমিতে ইট সুর্কি মালমসলা সব আসিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ২।১ বৎসরের মধ্যে গঙ্গারামের সুন্দর একটী চক্‌মিলান বাটী প্রস্তুত হইল। গঙ্গারাম-গৃহিণী অন্নপূর্ণার একান্ত বাসনা যে গৃহ-প্রবেশের দিন দশ জন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভোজন করান; কিন্তু স্বামীর মত-বিরোধিনী হইবার আশঙ্কায় তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন। তিনি নিজ ব্যয়ে কেবল মাত্র দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুভ দিনে আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্নপূর্ণার আবির্ভাবে গৃহে অন্নের অভাব রহিল না। দীন দুঃখী কেহ বাটীতে আসিলে তিনি পরিতৃপ্ত করিয়া আহার করান এবং কাহার ছিন্ন বস্ত্র দেখিলে ভাল বস্ত্র দিয়া পরিধেয়ের কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপে অন্নপূর্ণা দেবী-স্বরূপা হইয়া চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

গঙ্গারাম বাবুর পুত্রের নাম সুধীর। সুধীর বিদ্যালয়ে পড়ে। বয়ঃক্রম ১৩।১৪ বৎসর হইবে। সুধীর ধীর ও শান্তস্বভাব, অনেকটা মায়ের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। গরীব কাঙ্গাল দেখিলে মায়ের অন্তঃকরণ যেমন আর্দ্র হয়, পুত্রেরও তেমনি। পুত্রও মায়ের সঙ্গে এক যোগে দরিদ্র-দিগকে ভরণপোষণ করিতে আনন্দিত হয়। সে রাস্তায় ক্ষুধার্ত্ত, অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তি দেখিলে বাটীতে ডাকিয়া আনে, এবং তাহাকে মনের সাধে ভোজন করাইয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করে। স্ত্রী ও পুত্রের এইরূপ করুণ ব্যবহারে গঙ্গারাম বাবু মনে মনে যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতেন। স্ত্রী স্বামীকে বিরক্ত করিতে অনিচ্ছু হইয়া তাঁহার অগোচরে সুধীরের সহিত এক পরামর্শে পূর্ব্ববৎ দরিদ্র-সেবা করিতে লাগিলেন।

গঙ্গারামের কনিষ্ঠ সহোদর শম্ভুচন্দ্র দেশের বাটীতে থাকেন। তাঁহার স্ত্রী, একটী পুত্র, ও একটী কন্যা আছে। দেশের বাগানের ফলপাকড় বিক্রয় করিয়া তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না—বড়ই কষ্ট! তিনি দুঃখ জানাইয়া মাসে ২।৪ খানি করিয়া চিঠি দাদামহাশয়কে লিখেন। দাদা মহাশয় তাঁহার দুর্দ্দশার প্রতি একবারে বধির ও অন্ধ—কিছুই শুনিতে বা দেখিতে চাহেন না। অন্নপূর্ণা সুধীরকে দিয়া যাহা পারেন লুকাইয়া পাঠাইয়া দেন, তদ্দ্বারা শম্ভুচন্দ্রের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইয়া থাকে।

গঙ্গারামের বাটীতে ২।১টী আইরণচেষ্ট—আইরণচেষ্টে টাকায় ছেঁতলা ধরিতে লাগিল। আফিসের উপার্জ্জন ছাড়া সুদি

কারবারে গঙ্গারামের বেশ দশ টাকা আসিতে লাগিল। তিনি স্থদ লইবার সময় কাহাকে এক কপর্দ্দকও ছাড়িয়া দিতেন না—এমন কি পিতাঠাকুর উঠিয়া আসিলেও তাঁহার সম্মুখে স্থদ লইবার সময় চক্ষু মুদিতে লজ্জিত হইতেন না। আইরণ চেষ্টের চাবি পরিবারের নিকট বিশ্বাস করিয়া রাখিতেন না। তাঁহার একটী হাত বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিতেন, স্থধীর তাহার সন্ধান রাখিত। কর্ত্তার গতিক দেখিয়া কর্ত্তা বাহিরে যাইলে স্থধীর মায়ের খরচের জন্য আইরণচেষ্ট খুলিয়া মধ্যে মধ্যে টাকা বাহির করিয়া দিত। কর্ত্তার সংসার খরচের যাহা বরাদ্দ, তাহাতে অতি ক্লেশে এক প্রকার জীবন ধারণ ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না! স্থধীর বা অন্নপূর্ণা পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিলে, বাটীতে কোন দিন উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইলে, কাহাকে এক পয়সা দান করিলে, কর্ত্তা রোষ-কষায়িত-লোচনে পুত্র ও পরিবারের প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিতেন। অন্নপূর্ণা রাগিবার লোক নহেন—তিনি সর্ব্বদা হাস্যমুখী। কর্ত্তার তীব্র উক্তি সকল হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন।

গঙ্গারাম বাবু অর্থের মায়ায় এত মুগ্ধ যে, শরীর ও প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য সামান্য ব্যয়েও কাতর হইতেন। আফিস হইতে আসিবার সময় প্রাণান্তে গাড়ীর ভিতর উঠিতেন না। কখন কখন কোচ বাক্সে বসিয়া আসিতেন। ধোপা নাপিতে সহজে তাঁহার কাছে কিছু আদায় করিতে পারিত না। বাটীতে দুটীর বেশী তিনটী প্রদীপ জ্বলিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। বৈকালে জলখাবারের আশা রাখিতেন না—এমন কি কখন কখন দুইখানি বাতাসা মুখে ফেলিয়া দিয়া একটু জল খাইয়া রাত্রি কাটাইতেন। ভাত খাই-বার সময় অন্নপূর্ণা স্বামীর পাতে ঘি দিলে তিনি রাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন এবং বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে কহিতেন "এই পয়সা থাকিলে আমার কত স্থদ আসিত!" থাকিবার মধ্যে মুহুর্মুহু তামাক খাইবার অভ্যাসটা ছিল, তাও অনেক সময় ফুরাইলে গুল সাজিয়া খাইতেন।

অন্নপূর্ণা ও স্থধীরের তত্ত্বাবধানে বাটীর পুষ্করিণীতে যথেষ্ট মৎস্য হইয়াছে, বাগানে যে কালের যা তরি তরকারি সমস্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত মালীর পরিশ্রমে ও যত্নে ভাল ভাল আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি বৃক্ষ সকল ফলকর হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তার অসাক্ষাতে অন্নপূর্ণা পাড়া প্রতিবাসীদিগের বাটীতে ঐ সকল ফল, তরিতরকারি ও পুষ্করিণীর মৎস্য সময়ে সময়ে বিলাইয়া থাকেন। বাটীতে পাঁচ-খানি ভাল ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে গিন্নী কর্ত্তাকে দিতে ভয় পাইতেন, যেহেতু কর্ত্তা তাহা হইলে গিন্নীর নিকট কৈফিয়ত চাহিবেন, এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিবেন। বাটীর ঝি চাকরকে একখানির উপর দুইখানি ব্যঞ্জন দিতে

দেখিলে কর্ত্তা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেন এবং গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করিতেন,—এমন কি ২।১ দিন উপবাসও করিতেন, বাহির বাটীতে থাকিতেন, ভিতরে আসিতেন না। একদিন ভাল অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া কর্ত্তাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, কর্ত্তা ব্যঞ্জনাদি দেখিয়া একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং গিন্নীর পিতৃকুলের সমস্ত ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা তখন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ-মনে ও বিষণ্ণবদনে কহিলেন—

"কপালে না থাক্‌লে সুখ কি কভু মিলে।
থাক্‌তে ঘরে এত সুখ—তবু বঞ্চিত হলে॥"

সেই অবধি অন্নপূর্ণা স্বামীকে আর কখন ভাল দ্রব্য খাইতে দিতে সাহস করিতেন না এবং তৎসঙ্গে আপনিও ভাল দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৃহে সুধীরের জন্য ভাল মন্দ দ্রব্য প্রস্তুত হইত। আত্মীয় স্বজন যাহারা উপস্থিত হইতেন, খাইতেন,—ঝি চাকরে খাইত—কিন্তু হা অদৃষ্ট! কর্ত্তার ভাগ্যে একটু ঘটিত না। অর্থ সংগ্রহ যাহাদিগের ব্যাধি বা ব্যামোহ, তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে। শ্রীভুঃ।—

কৃষক-বালা।

বর্ষার প্রারম্ভে প্রশস্ত জনার্দ্ধ ক্ষেত্রের উচ্চ মঞ্চোপরি বসিয়া জনৈক কৃষক-কন্যা শস্য রক্ষণ করিতেছিল, মধ্যে মধ্যে পক্ষিগণ কৃষককুমারীর সতর্কতা সত্ত্বেও অলক্ষিতভাবে ক্ষুদ্র চঞ্চুপুট দ্বারা মুক্তাদাম সদৃশ গ্রথিত জনারগুলি কাটিয়া ফেলিতেছে। আকাশে আর মেঘ নাই, নির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণ তুল্য, রজতস্তর সদৃশ মেঘরাশি একটি আর একটির গাত্রে ঢলিয়া ঢলিয়া সোহাগে গড়াইয়া পড়িতেছে। কৃষকবালা প্রকৃতির মধুর সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া গুন্ গুন্ স্বরে আপন মনে মল্লার রাগিণীতে গাহিয়া গাহিয়া নবীন তরুলতা দলকে মুগ্ধ করিতেছে। বর্ষার স্নিগ্ধ সমীরণে সে মধুর তানের কল্লোল ছুটিয়া ছুটিয়া দূর-অতিদূরে বিস্তৃত হইতেছে। মহারাজ অরিসিংহ সেই অবসরে কতিপয় সর্দ্দার সহিত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন। এমন বর্ষা বাদলের মাঝে একটি বন্যবরাহ লাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কতিপয় অশ্বারোহী সেনা তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছেন। মহারাজ বনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে একটি বরাহ তাঁহার নয়নগোচর হইল। অরিসিংহ সোৎসুকচিত্তে শিকারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বরাহটি কৃষকবালার মঞ্চের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। রাজাকে নিকটস্থ দেখিয়া কৃষককন্যা ব্যস্তভাবে মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া কহিল, "মহারাজ! ক্ষান্ত

হউন আপনি, আমি বরাহ ধরিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া কৃষককুমারী একগাছি জনারের চারা গাছ লইয়া তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিয়া বর্ষার মত ধারাল করিল। তাহা দ্বারা বরাহটাকে আক্রমণ করিল, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিকারটি লইয়া মহারাজ অরিসিংহের সম্মুখীন হইল। অরিসিংহ রমণীর এতাদৃশ সাহস ও বলের পরিচয় পাইয়া মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সামান্য কৃষকতনয়াতে কি এরূপ গুণ সম্ভবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বীয় সৈন্য সামন্তগণ সহিত তটিনীর নির্ম্মল তটপ্রান্তে সুবিশাল বৃক্ষ-চ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। অশ্বগুলি বৃক্ষশাখায় বদ্ধ রহিয়াছে। সকলেই একবাক্যে সেই ক্ষেত্র-পাল-কন্যার গুণ আলোচনায় মুগ্ধ, ইত্যব-সরে হঠাৎ একটি মৃৎপিণ্ড ক্ষিপ্রগতিতে মহারাজের অশ্বের গায়ে পড়িল। অশ্ব সেই দারুণ আঘাতে ভূমিতে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিল ও কিয়ৎক্ষণের মধ্যে তাহার চরম দশা উপস্থিত হইল। সকলে মৃৎপিণ্ডের গতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই কৃষকবালা মঞ্চোপরি দাঁড়াইয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করত ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে। সর্দ্দারগণ উহার বল-বত্তার পরিচয়ে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু নীরব। স্বয়ং মহারাজ অবাক্ হইয়া আছেন, তখন অপরে কি বলিতে পারে? অরিসিংহ অশ্বের মৃত্যুতে তাদৃশ দুঃখিত না হইয়া সেই রমণীর অসীম সাহসিকতার বিষয় ভাবিতেছিলেন। এ কিরূপ স্ত্রী-বাহুবল।। কৃষকবালা অশ্বের পতন ও মৃত্যু অবলোকন করিয়া অতি ভয়ার্ত্তচিত্তে গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে কহিল “মহারাজ আমিই অপরাধিনী, মহারাজ এই অশ্বের হঠাৎ মৃত্যুর কারণ আমি, অতএব অপরাধের সমুচিত দণ্ড বিধান করুন্।” অরিসিংহ বালার ভয়ার্ত্ত কম্পিত মুখমণ্ডল ও ছল ছল নয়ন-যুগল দেখিয়া, একদৃষ্টে বিস্ময়করুণ-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। মহারাজ নিজেই আত্মস্থ নহেন, যেন ভাবিলেন একি, বরাহ বধ করিতে আসিয়া কি করিয়া যাইতেছি? অবশেষে আপনার আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, “কুমারী, তুমি নিরুদ্বেগ হও, তোমার দোষ কি? কে কাহাকে মারিতে পারে? কেই বা কাহাকে রক্ষা করিতে পারে? জন্ম মৃত্যু মানবীয় শক্তির অতীত। অশ্বের পরমায়ু শূন্য হইয়া-ছিল, তাই সে গতাসু হইয়াছে।” কৃষক-কন্যা অরিসিংহের আশ্বস্ত বাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রস্থান করিল, ভাবিল আজ ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, কি বিপদ নিজেই ঘটাইয়া-ছিলাম। যাহাহউক এখন নিরাপদে ঘরে গিয়া পিতা মাতাকে নিজের হঠকারিতা ও অসাবধানতার কথা বলি গিয়া।

বালিকা মঞ্চের নিকট দুটি মহিষী-শাবক বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া লইল। তাহাদের রজ্জু দুইটি দুই হস্তে ধরিয়া দুগ্ধভাণ্ড মস্তকে লইয়া

বেগভরে চলিয়া যাইতেছে এবং মনে মনে রাজার ক্ষমা গুণের পরাকাষ্ঠা স্মরণ করিয়া উল্লসিত হইয়া পড়িতেছে। সে আপনার কথায় এতদূর মগ্ন যে অন্য কোন দিকে চাহিবার আর তাহার অবসর নাই। এদিকে অরিসিংহ নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন শ্রেয়ঃ বোধ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন। বেলাও অবসানপ্রায়, দিবসের আলো এখন সূর্য্যের অবসানে বিদায় মাগিতেছে, সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় ধরণীর কোমল গাত্র আবরিত। তরু, লতা, পশু, পক্ষী সকলেই স্থির। কিয়ৎক্ষণের জন্য আবার পরিবর্ত্তন। এই সৃষ্টির আদি অন্ত সকলই পরিবর্ত্তনময়, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, আলো আঁধার—একের পর আসে আর যায়; কিন্তু যে যায়, সেই আবার আসে কিনা ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? দেহান্তর, লোকান্তর, রূপান্তর, সকলি ঘটে, তথাপি সেই স্বরূপ আর চক্ষে চক্ষে প্রতিভাসিত হয় না, তাই সংসারে এত অভাব, এত হাহাকার!!

অরিসিংহ সৈন্যসামন্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া যাইতে যাইতে পুনরায় সেই কৃষক-বালা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাঁহার জনৈক অশ্বারোহী কৌতূহল-পরবশ হইয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিল এবং ইচ্ছা-মত বল্গা সংরক্ষণ না করাতে একেবারে অশ্ব বালিকার গাত্রে প্রতিহত হইয়া পড়িল। কৃষক-বালিকা পূর্ব্ববৎ অচল অটল ভাবেই নীরবে রহিল, কেবল মস্তকের দুগ্ধভাণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই সোৎসুক হইয়া উহার পানে চাহিয়া কষ্ট প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। কৃষক-বালা কাহারও মিষ্ট বচনে কর্ণপাত না করিয়া সেই দীর্ঘ আয়তলোচন দুটি ফিরাইয়া দেখে রাজা অরিসিংহের সৈনিকের এই ধৃষ্টতা। বালিকা নীরবে রহিল, কিন্তু প্রতিফল লইতে ছাড়িল না—তৎক্ষণাৎ সেই মহিষী-শাবক দুটির রজ্জু শ্লথ করিয়া অশ্বের পদদ্বয় এমত জড়াইয়া দিল যে সৈনিক সহিত ঘোড়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল, কিন্তু কাহারও প্রাণহানি হইল না।

ক্রমে ক্রমে তিনবার কৃষক-বালার বলবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া অরিসিংহের চিত্ত আরও চঞ্চল হইয়া পড়িল। এরূপ অসাধারণ কৌশলময়ী বালিকা যে সামান্য কৃষিজীবিনী রমণীর গর্ভে জন্মে, ইহা যেন আর কোন মতেই বিশ্বাস হইতেছে না। অবশেষে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, যাহাই হউক ঐ কৃষক-বালাই আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে, ইহাতে আর কোন বাধাই গ্রাহ্য নহে। রাজ্যে পৌঁছিয়াও তাঁহার সে উদ্বিগ্নতা দূর হইল না। অবশেষে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সেই ক্ষেত্রপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি রাজাজ্ঞা পাইয়া জনার-ক্ষেত্র-মধ্যস্থিত কুটীরে উপনীত। ক্ষেত্রপাল রাজসৈন্য সমাগত দেখিয়া বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। কৃষক-পত্নী দর দর ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল ও কন্যাকে কহিল "মা! তুই সেই দিনে শস্য রক্ষা

করিতে গিয়া কি বিবাদ ঘটাইলি, আজ সপরিবারে রাজদ্বারে দণ্ডিত হই বুঝি।" কিন্তু বালিকা পিতা মাতার ঈদৃশ আশঙ্কা দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইল না, বরং পিতার নিকটে গিয়া কহিল, "বাবা! তুমি কেন এরূপ ভীতচিত্ত হইয়াছ, আজ কেন বালকের মত রোদন করিতেছ? মহারাজের কাছে যাও, তিনি পরম দয়ালু, তাঁহার দ্বারা আমাদের কোন অনিষ্টের শঙ্কা নাই।" সৈনিক পুরুষ কৃষক পরিবারের অমঙ্গল আশঙ্কা ও উদ্বেগময় ভাব দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্বাস প্রদান করিল না, বরং মনে মনে কৃষক-বালার লাবণ্য-পূর্ণ নব-প্রস্ফুটিত গোলাপ কুসুমবৎ বদন খানির উজ্জ্বলতা দেখিয়া কহিল, "তুমিই ধন্য, তোমার এই একাধারে রূপগুণের পক্ষপাতী হইয়া আজ বীর অরিসিংহ মুগ্ধ। মা। তুমিই এই সকল ইষ্টানিষ্টের মূলস্বরূপিণী"।

বৃদ্ধ ক্ষেত্রপাল পত্নীর নিকট বিষণ্ণ-বদনে বিদায় লইয়া চিতোরে রাজা অরিসিংহের নিকট সৈনিক সমভিব্যাহারে উপনীত হইলেন। নগরে মহা আন্দোলন। সকলেই একবাক্যে কৃষক-বালার ক্ষমতার প্রশংসায় প্রবৃত্ত, বিশেষতঃ মহারাজ নিজে বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছেন, না জানি সে কিরূপ ভাগ্যবতী! যদি এই বিবাহ রাজ-বংশে ঘটিত, তাহা হইলে কোনও বিস্ময়ের কথা থাকিত না। বৃদ্ধ কৃষক রাজ-সদনে উপস্থিত হইয়া অবনতশিরে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজের জয় হউক! আপনি সাক্ষাৎ দয়াধর্ম্মের অবতার, আমরা দরিদ্র নিরীহ কৃষক জাতি, সকল অপরাধ ক্ষমা হউক, এই ভিক্ষা করি।" সভাস্থ সকলেই নির্ব্বাক্ নিঃস্পন্দ, সকলেই সোৎসুকচিত্তে মহারাজের আদেশ শুনিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। অরিসিংহ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া স্বয়ং হস্তধারণপূর্ব্বক বৃদ্ধ কৃষককে উচ্চাসনে বসাইলেন ও বলিলেন "রাজপুত জাতি ধন অপেক্ষা মান ও রূপ অপেক্ষা বলবীর্য্যের সমধিক অনুরাগী। তোমার তনয়ার অলৌকিক বলবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাকে আনিয়া এই চিতোর নগরীর অধিষ্ঠাত্রী করিতে আমি অভিলাষী হইয়াছি।" রাজার এই বাক্যে বৃদ্ধের নয়নযুগল হইতে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তখন আপন পূর্ব্ব বিবরণ সকল রাজসন্নিধানে নিবেদন করিল, এবং বলিল মহারাজ! এই কৃষকবালা চন্দানেয়ত কুলোদ্ভবা রাজপুতকন্যা, ভগবান্ উহার অনুরূপ পাত্রেই উহাকে অর্পণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ কৃষক রাজাজ্ঞা অনুসারে কন্যাকে আনিয়া যথাবিধানে সমারোহে শুভ বিবাহ কার্য্য সমাধা করিল। এই কৃষকবালা পরে বীরপুত্র হামিরের মাতা হইয়াছিলেন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

উপদেশমালা।

১। এক সময়ে জনৈক উদাসীন কোন এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপনীত হন। উদাসীনের পরিধান ছিন্ন বস্ত্র, মাথার কেশগুলি তৈলাভাবে রুক্ষ। উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে শরীর জীর্ণ শীর্ণ, তাহাও আবার ভস্মাচ্ছাদিত। হস্তে ত্রিশূল ও ভিক্ষাপাত্র দেখিয়াই বোধ হয় সংসারবিরাগী ত্যাগী পুরুষ। গৃহস্থ উদাসীনকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং আগন্তুক সাধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন। উদাসীন উপবেশন করিলে পর উভয়ের কথোপকথন হইতে লাগিল। নানা বিষয়ক প্রসঙ্গ হইতেছে এমন সময় গৃহস্থ বলিলেন "আপনারা ত্যাগী পুরুষ, তাই আঁপনারা ভোগী গৃহস্থদিগের নমস্য, আপনারা সংসারের নিকট ত্যাগের দৃষ্টান্ত কহিয়া সংসারকে ধন্য করিতেছেন।" উদাসীন বলিলেন "তুমি মিছামিছি আমাকে ত্যাগী বলিতেছ! উদাসীনগণ ত্যাগী নহেন, ঈশ্বর-বিরাগী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণই প্রকৃত পক্ষে ত্যাগী। ত্যাগী কাহাকে বলি? কোন ব্যক্তির নিকট পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা ও পাঁচ শত রৌপ্য মুদ্রার দুইটি ব্যাগ ধরিয়া যদি বলা যায় তোমার এই উভয়ের মধ্যে যে ব্যাগটি লইতে ইচ্ছা হয় লও। তখন যদি সে স্বর্ণ মুদ্রার ব্যাগটি পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্য মুদ্রার ব্যাগটি লয়, তাহা হইলে তাহাকেই ত্যাগী বলিব; কারণ সে বহুমূল্য জিনিশকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইল। যদি ত্যাগীর ইহাই লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ স্বর্ণ ফেলিয়া রৌপ্য লইতেছেন কিনা এবং তাহারা প্রকৃত পক্ষে ত্যাগী শব্দের বাচ্য কিনা? ঈশ্বর সকল ধনাপেক্ষা মূল্যবান্, গোলকুণ্ডার হীরকমণিও তাঁহার সমতুল্য নহে। পৃথিবীর সমস্ত সম্রাটের ঐশ্বর্য্য একত্রিত করিলেও তাঁহার সমীপে যৎকিঞ্চিৎ, অথচ তোমরা এই ধনকে উপেক্ষা করিয়া সামান্য ধনের জন্য লালায়িত হইতেছ। তোমরা ত্যাগী না হইলে কাহাকে ত্যাগী বলিব?" ধনী দেখিলেন সাধু ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনিও সেই অমূল্যনিধি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উদাসীনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, কে কি মহামূল্য নিধি ত্যাগ করিয়া উপল খণ্ড কুড়াইয়া বেড়াইতেছে।

২। একদা কোন ফকির বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক বাদশাহ হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। দূর হইতে ফকিরকে

দেখিয়া মাহুতকে হস্তীর গতিরোধ করিতে আদেশ করিলেন। হস্তী থামিলে পর বাদশাহ অবতরণ করিয়া ফকিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন "ফকির সাহেব! আপনার কি অভাব আছে বলুন, এখনই তাহা পূর্ণ করিব।" ফকির বলিলেন, "আমিত ফকির নই, ফকির তুমি। আমি ত ভিখারী নই, ভিখারী তুমি। আমার কিসের অভাব? তোমার অভাবের অন্ত নাই।" বাদশাহ এই উত্তর শুনিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বলিলেন "আমি ভিখারী কিসে? আমার অভাবই বা কি? যাহা চাই তাহা পাই—এমন কি, ইচ্ছা হইলে বাঘের চোক মিলাইতে পারি।" ফকির সাহেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "বটে! তুমি যাহা চাও, তাহা পাও! তোমার কি অর্থপিপাসা ও রাজ্যকামনা মিটিয়া গিয়াছে? সমস্ত সংসারের অর্থ আনিয়া তোমার ভাণ্ডারে পূরিলেও তোমার তৃষ্ণা থামিবে না, মন আরও অর্থ চাহিবে। সমস্ত মহাদেশ তোমার রাজ্যভুক্ত হইলেও তোমার রাজ্যবৃদ্ধির কামনা পূর্ণ হইবে না, মন আরও রাজ্য চাহিবে। তবে তুমি যাহা চাও, তাহা পাইলে কোথায়? প্রকৃত পক্ষে চাওয়া না থামিলে লোককে অভাবগ্রস্তই বলিব। সে ক্রোরপতি হউক না কেন, সে সমস্ত পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ হউক না কেন, সে যখন আকাঙ্ক্ষার লয় করিতে পারিতেছে না, তখন ভিখারী হইয়া জগতের দ্বারে ফিরিবেই ফিরিবে। অথচ চীরজটাধারী বৃক্ষতলবাসী ফকির যদি বাসনা বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সকল ধনীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অভাবশূন্য নিরুদ্বেগ-চিত্ত ব্যক্তিই সুখী পুরুষ। তুমি সর্ব্বাগ্রে নিজের অভাব পূর্ণ করিয়া এস, তৎপরে আমায় ভিক্ষা দিবে।" ফকিরের এই কথায় তাঁহার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল।

৩। দুই সাধক কোন এক পর্ব্বতোপরি বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। বহুদিন চলিয়া যাইতেছে, তথাপি তাঁহারা গন্তব্য স্থলে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। সময় সময় নিরাশা আসিয়া তাঁহাদিগকে তপোভ্রষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে। এই ভাবে দিন চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন একদিন এক জীবন্মুক্ত ঈশ্বরভক্ত পুরুষ ঐ পথ দিয়া যাইতেছেন। সাধকদ্বয় তাঁহাকে জানিতেন, এবং তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে সক্ষম, ইহা বিশ্বাস করিতেন। তাই তাঁহাকে দেখিয়া উভয়েই তাঁহাদের নিষ্ফল সাধনার বিষয় জানাইলেন এবং কত দিনে তাঁহারা পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারিবেন, তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিবার জন্য ভক্ত মহাজনকে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাহাদের প্রার্থনা মত ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্থ থাকিয়া বলিলেন "আমি তোমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা জানিয়াছি,

কিন্তু আমি তাহা তোমাদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করি না। কারণ তাহা বড়ই নিরাশাজনক।” তাহা শুনিয়া উভয়ের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল এবং তাহারা বলিল “মহাশয়! আপনার কথা যত নিরাশাজনক হউক না কেন, আপনি বলুন, উহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। প্রত্যুত না বলিলে অনিষ্ট হইতে পারে।” তাহাদের মুখ হইতে এতাদৃশ আশ্বাস-বাণী শুনিয়া ভক্ত বলিলেন, “কোটি জন্ম পরে তোমাদের উদ্ধার সাধন হইবে। একাল পর্য্যন্ত যদি তোমরা ধৈর্য্য সহকারে সাধন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সিদ্ধকাম হইতে পারিবে।” এ কথা শুনিয়া সত্য সত্য একজন সাধকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে ভাবিল কোটি জন্মত বহুদূরে, এতকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা অসম্ভব।” তাই সে বিমর্ষান্তঃকরণে উপবেশন করিয়া রহিল। অপর সাধক এই কথা শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, এবং বলিল “আর কি? আমার মুক্তিত ধ্রুবনিশ্চয়। ঈশ্বর যখন জানাইয়াছেন যে, আমার মুক্তি হইবে, তাহাই যথেষ্ট। এখন কোটি জন্মই বা কি? আর শত কোটি জন্মই বা কি? যত দিন ফল অনিশ্চিত ছিল, ততদিন কখন আশার জ্যোতিঃ, কখন নিরাশার অন্ধকার আসিয়া মনকে আন্দোলিত করিত। এখন ফল সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছি, ফল নিশ্চয় পাইব, কেবল তাহা কাল-সাপেক্ষ। ধৈর্য্যের সহিত সাধন আরম্ভ করি, কোটি জন্মত চোখের নিমেষে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।” কথিত আছে এই শেষোক্ত বিশ্বাসীর অচিরে মুক্তিলাভ হইল। প্রকৃত পক্ষে ধৈর্য্যই সাধন-পথে অগ্রসর করিয়া থাকে। অধীর চঞ্চলমতি লোকেরা নিষ্ঠার সহিত কোনও বিষয়ে সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আবার ফল সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি না জন্মিলে ধৈর্য্য থাকিতে পারে না। কোনও ক্রিয়ার ফল পাইবই পাইব, এতাদৃশ বুদ্ধি যাহার, তাহার ধৈর্য্য জন্মিবে। যাহার তাহা নাই, তাহার মন চিরদিন চঞ্চল ও সংশয়াকুল থাকিবে।

রসায়ন।

অম্লজান (অক্সিজেন)।

[সাঙ্কেতিক চিহ্ন O; পারমাণবিক গুরুত্ব ১৬; ঘনতা ১৬; আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·১০৫৬৩।]

ইতিহাস—১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে পৃষ্টলী সাহেব রেড অক্সাইড অফ মার্করি (লোহিত রসভস্ম বা রসকর্পূর) উত্তপ্ত

করিয়া সর্ব্বপ্রথম অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। কিন্তু ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে ডাক্তার ল্যাবোসিয়র অক্সিজেন ভিন্ন কোন অম্ল উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহার নাম অম্লজান দেন। এক্ষণে এমন অনেক অম্ল উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে অক্সিজেনের লেশমাত্র নাই, যথা হাইড্রক্লোরিক এসিড। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া জনসমাজের যেরূপ উপকার করিয়াছেন, পৃষ্টলী সাহেবের O (অক্সিজেন) বাষ্প আবিষ্কার দ্বারা তদপেক্ষা অধিক উপকার সাধিত হইতেছে। সুইডেনে সীল সাহেবও এই সময়ে অক্সিজেনের বিষয় আবিষ্কার করেন। যে দিন পৃষ্টলী সাহেব অক্সিজেন বাষ্প আবিষ্কার করেন, সেই দিনকে পণ্ডিতেরা বর্ত্তমান রসায়নশাস্ত্রের জন্মদিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

O শতাংশিক উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটর চাপে ১১,১৯ লিটর অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের ভার যথাক্রমে ১৬ ও ১ গ্রাম। অতএব অক্সিজেন হাইড্রোজেন অপেক্ষা ১৬ গুণ ভারী।

অবস্থা—অসংযুক্ত অবস্থায় আয়তনে বায়ু রাশির একপঞ্চমাংশ; সংযুক্ত অবস্থায় জলের গুরুত্বের ৯ ভাগের ৮ ভাগ; ভূভাগের প্রায় অর্দ্ধেক, এবং জীব ও উদ্ভিদ শরীরের অর্দ্ধেকেরও অধিক ভাগ অক্সিজেন। অক্সিজেন সংযুক্ত ও অসংযুক্ত অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে।

ধর্ম্ম—অক্সিজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ, অদৃশ্য, বায়বীয় পদার্থ। ইহা সম-আয়তন বায়ু অপেক্ষা ১.১০৫৭ গুণ ভারী অর্থাৎ বায়ুর ভার ১ ধরিলে ইহার ভার ১.১০৫৭ ধরা যাইতে পারে। ইহাকে চাপ ও শৈত্য সহযোগে তরল ও কঠিন আকারে আনা যাইতে পারে না। কিন্তু ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে ফরাসীদেশীয় কোন কোন পণ্ডিত চাপ ও শৈত্য সহযোগে অম্লজানকে তরল আকারে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহা দাহক, ইহার মধ্যে জ্বলন্ত দীপশলাকার অগ্রভাগ লাল থাকিতে থাকিতে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইহা ১০০ ভাগ জলে প্রায় ৩ ভাগ দ্রব হয়।

ব্যবহার—বায়ুরাশিতে যে এক-পঞ্চম অংশ অক্সিজেন আছে, তাহা অসংযুক্ত অবস্থায় সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে বিদ্যমান আছে। প্রাণিগণ নিশ্বাস সহকারে উহা গ্রহণ করিলে অক্সিজেন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কার্ব্বণিক এসিড বাষ্প উৎপাদন করতঃ প্রশ্বাস সহকারে বহির্গত হয়, তাহাতেই আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা ও রক্ত সংস্কার হয়। O (অক্সিজেন) বাষ্প অভাবে যেমন কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ উহার আধিক্য হইলেও অনিষ্ট হইয়া থাকে। উহা সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে বিদ্যমান থাকাতে উহার অল্পতা বা আধিক্য নিবন্ধন কোন অনিষ্ট হয় না।

জলরাশিতে কিয়ৎ পরিমাণে O বাষ্প দ্রবীভূত থাকে, জলচর জীবগণ উহা

গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। এ বিষয় পরীক্ষা করিতে হইলে থানিক জল অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া উহার উপর তৈল ঢালিয়া দাও, তাহা হইলে আর ইহাতে অক্সিজেন দ্রব হইতে পারিবে না। পরে ঐ জল শীতল হইলে উহাতে মৎস্য ছাড়িয়া দাও, তখনি মৎস্য মরিয়া যাইবে।

জ্বলন ও অক্সাইড—ফ্লুরাইন ব্যতীত প্রায় তাবৎ রূঢ় পদার্থের সহিত অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে; এইরূপ সংযোগকালে তাপ ও আলোকের উৎপত্তি হয়, উহাকে জ্বলন বলে। অক্সিজেন-ঘটিত যৌগিক পদার্থকে অক্সাইড বলে। অক্সাইড তিন প্রকার, যথা এসিড অক্সাইড, বেসিক অক্সাইড ও নিউট্রাল অক্সাইড।

এসিড অক্সাইড-নাইট্রজেন পেণ্টক্সাইড
বেসিক „ সোডিয়ম অক্সাইড।
নিউট্রাল „ জল।

প্রস্তুত প্রণালী—(১) রেড্ অক্সাইড অব মার্করি (লোহিতবর্ণ মার্করি অক্সাইড বা রসকর্পূর) লোহিতোত্তপ্ত করিলে প্রবল তাপে মার্করি অক্সাইড ব্যাক্ত হইয়া সমুদায় অক্সিজেন বহির্গত হয়; পারদ থাকিয়া যায়, যথা—$2HgO = Hg_2 + O_2$.

(২) সচরাচর পটাশিয়ম ক্লোরেট উত্তপ্ত করিয়া অক্সিজেন প্রস্তুত করিয়া থাকে; কিন্তু যতখানি পটাশিয়ম ক্লোরেট, তাহার এক-পঞ্চমাংশ মেঙ্গেনিস্ মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে শীঘ্র শীঘ্র নিরাপদে সংগৃহীত হয়; কিন্তু ম্যাঙ্গেনিক ডায়ক্সাইডের (MNO_2) কোন রূপান্তর হয় না।

(৩) অধিক পরিমাণে অক্সিজেন সংগ্রহ করিতে হইলে লৌহ পাত্রে করিয়া মেঙ্গেনিস ডায়ক্সাইড উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন বহির্গত হয়, যথা—$3MNO_2 = MN_3O_4 + O_2$.

(৪) জলে বিদ্যুৎ পরিচালিত করিলে দস্তা-সংলগ্ন তার দিয়া যে পরিমাণে হাইড্রজেন বহির্গত হয়, প্লাটিনম-সংযুক্ত তার দিয়া তাহার অর্দ্ধেক O বাষ্প বহির্গত হয়।

(৫) সলফিউরিক এসিড ও ম্যাঙ্গেনিক ডায়ক্সাইড একত্র উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন বিমুক্ত হয়।

পরীক্ষা—(১) অক্সিজেন-পূর্ণ বোতলমধ্যে জ্বলিত দীপ-শলাকার অগ্রভাগ লাল থাকিতে থাকিতে প্রবিষ্ট করিলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এইরূপ পুনর্ব্বার বাহির করিয়া নিবাইয়া ফেল, এবং লাল থাকিতে থাকিতে পুনঃ প্রবিষ্ট করিয়া দাও, জ্বলিয়া উঠিবে। এইরূপে যতক্ষণ উহাতে অক্সিজেন থাকিবে, ততক্ষণ উহা জ্বলিবে; অক্সিজেন নিঃশেষিত হইয়া গেলে জ্বলনও নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, এবং বোতলমধ্যে কার্ব্বণিক ডায়ক্সাইড্ উৎপন্ন হইবে।

(২) এক খণ্ড লোহিতোত্তপ্ত অঙ্গার উক্ত বোতলমধ্যে নিক্ষেপ করিলে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, এবং বোতলমধ্যে পূর্ব্বোক্ত পদার্থ অর্থাৎ CO_2 কার্ব্বণিক আসিড বাষ্প উৎপন্ন হইবে।

(৩) হীরক লোহিতোত্তপ্ত করিয়া ইহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, হীরকের কোন চিহ্ন থাকে না এবং বোতলমধ্যে কার্ব্বণিক এসিড (দ্ব্যম্ল অঙ্গারক) উৎপন্ন হয়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, হীরক বিশুদ্ধ অঙ্গারের রূপান্তরমাত্র।

উক্ত বোতল কয়েকটীর মধ্যে CO_2 কার্ব্বণিক এসিড উৎপন্ন হয়, উহাতে চূণের জল দিলে দুধ ঘোলা হইবে এবং নীল কাগজ (লিডমস্) দিলে লাল হইবে।

(৪) জ্বলন্ত লৌহ তার তরল গন্ধকে নিমগ্ন করিয়া অক্‌সিজেন-পূর্ণ বোতল-মধ্যে নিমগ্ন করিলে তুবড়ি বাজীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিক্ষিপ্ত হইবে। উক্ত বোতলমধ্যে ফেরিক অক্‌সাইড বা ম্যাগনেটিক অক্‌সাইড অব আয়ুরন উৎপন্ন হইবে।

(৫) দুই আয়তন হাইড্রজেন ও এক আয়তন অক্‌সিজেন একত্র করিয়া দীপস্পর্শ করিলে প্রবল শব্দ সহকারে জল উৎপন্ন হইবে।

(৬) গন্ধক বায়ুমধ্যে অনুজ্জ্বল নীল-বর্ণ শিখায় জ্বলিয়া থাকে। কিন্তু জ্বলন্ত গন্ধক অক্‌সিজেন-পূর্ণ বোতলমধ্যে নিক্ষেপ করিলে সুন্দররূপে জ্বলিতে থাকে এবং উহার মধ্যে সলফর ডায়ক্‌সাইড (SO_2) উৎপন্ন হয়।

(৭) একখণ্ড ফস্‌ফরস জ্বালিয়া অকসিজেন-পূর্ণ বোতলমধ্যে নিমগ্ন করিলে অতি দৃষ্টি-সন্তাপক আলোক হয় এবং উক্ত বোতলমধ্যে ফস্ফরিক পেণ্টক্‌-সাইড P_2O_4 উৎপন্ন হইবে।

ডাঃ শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

একটি শুভ প্রস্তাব।

১২ বৎসর হইল বামাবোধিনী জুবিলী উৎসবের সময় যে সকল 'পারিতোষিক রচনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি এই—"ভারতের দুঃখিনী ও অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।" এ সম্বন্ধে আমরা অনেকগুলি প্রবন্ধ পাই, তন্মধ্যে পারিতোষিকপ্রাপ্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধে স্ত্রীলোকদিগের জীবিকার জন্য কতকগুলি শিল্পকার্য্যের উল্লেখ ছিল, এবং একটি কার্যালয় স্থাপন করিয়া এ বিষয়ে স্ত্রীলোক-দিগের সহায়তা বিধানেরও পরামর্শ দেওয়া হয়। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, সম্প্রতি কলিকাতা অনাথ-বন্ধু-সমিতি এই শুভ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ঈশ্বরের নিকট এ শুভকার্য্যের সিদ্ধি প্রার্থনা করি। সমিতির অনুষ্ঠানপত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল, আশা করি

সহৃদয়া মহিলাগণ এ কার্য্যে সহানুভূতি ও সাহায্য দান করিয়া গরিব স্ত্রীলোকদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিবেন।

শ্রমজীবিনী-সাহায্য-ফণ্ড

অনাথবন্ধু-সমিতি হইতে দুঃখিনী শ্রমজীবিনী নারীদিগের সাহায্য বিধানার্থ একটী নূতন বিভাগ খুলিতেছে। অন্নবস্ত্রাভাবে এই বঙ্গদেশের ভদ্র পরিবারের কত অনাথা, অসহায়া, নিঃস্ব রমণী কত ক্লেশে দিনাপাত করিতেছেন, অনাথবন্ধু-সমিতি কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন। ৩,৪ বৎসর মধ্যে এরূপ প্রায় ৫০টী পরিবারে ইহার সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, আরও দেখিতে দেখিতে প্রার্থি সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিতেছে যে, ইহার সামান্য আয়ে তাহাদিগের অভাব পূরণের সাময়িক সাহায্য করাও অসম্ভব। এইজন্য সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, "শ্রমজীবিনী-সাহায্য ফণ্ড" নামে একটী স্বতন্ত্র ফণ্ড স্থাপন করিয়া তাহার আয়ে যাহাতে তাহার ব্যয় সংকুলান হয় এরূপ উপায় বিধান করিবেন, অর্থাৎ কার্য্যক্ষম অনাথা দরিদ্রা রমণীদিগকে ফণ্ড হইতে মাল মসলা কিনিয়া দেওয়া হইবে। তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া যে সকল জিনিষ প্রস্তুত করিবেন, ফণ্ডের খরচ বাদে তাহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। এইরূপ উপায়ে ফণ্ডের টাকা ফণ্ডে থাকিবে, অথচ তাহার উদ্বৃত্ত অর্থে দরিদ্রা রমণীদিগের ভরণপোষণের সাহায্য হইবে। ভদ্র গৃহের দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে ও ইতর জাতীয় সচ্চরিত্র নারীদিগকেও এই ফণ্ড হইতে কার্য্য করান যাইতে পারে, এবং তাহাদিগের শ্রমলব্ধ অর্থে তাহাদিগের ও ফণ্ডের উভয়ের সাহায্য হইতে পারে

সেলাইয়ের কাজ, রেশম ও পশমের কাজ, জরীর কাজ, পাট কাটা, পৈতা তৈয়ার করা, কাগজের ঠোঙা, খেজুর পাতা বা বাখারীর চেটিতে ঝুড়া, চুপড়ী প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা, ইত্যাদি কার্য্য সকল স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারে। দরিদ্রা ভদ্র মহিলারা গৃহে বসিয়া কাজ করিবেন, ইতর স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী কার্য্যালয় থাকিবে। ফণ্ড হইতে কাজ সংগ্রহের ও প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের উপায় হইবে, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের যথাযোগ্য বিতরণেরও ব্যবস্থা করা যাইবে।

আপাততঃ ৪০০ টাকায় এই ফণ্ডের কার্য্য আরম্ভ করা প্রয়োজন। আশা করি দরিদ্র-হিতৈষী মহোদয়গণের সাহায্যে এ অর্থ সহজে সংগৃহীত হইবে। এই শুভানুষ্ঠানে যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত এবং সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে।

বিজ্ঞান-রহস্য।

১। গতি।

আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৯৬,০০০ এক লক্ষ ছেয়ানব্বুই হাজার মাইল পথ গমন করিয়া থাকে; তাড়িতের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২,৮৮০০০ দুই লক্ষ অষ্টাশী হাজার মাইল। ভূমিকম্পের সময়ে ভূস্তরের গতি প্রতি সেকেণ্ডে দুই মাইল অর্থাৎ সাড়ে তিন ঘণ্টায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ কবিতে সমর্থ। শব্দ প্রতি সেকণ্ডে জলে ৪৯০০ পাদ এবং স্থলে ১০৯০ পাদ গমন করে। কামানের গোলার গতি ৩৩০০ পাদ, চটক ও বাজপক্ষী ঘণ্টায় ১৫০ মাইল গমন করিতে সমর্থ। কোন কোন অতি দ্রুতগামী পক্ষী (ফ্রিগেট) ঘণ্টায় ২০০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইতে পারে; কপোত ঘণ্টায় ৪৫ মাইল গমন করে, শিক্ষার গুণে আরও অধিক যাইতে পারে; কাক ঘণ্টায় ২৫ মাইল গিয়া থাকে। রেলওয়ে শকট প্রতি ঘণ্টায় ৪০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত গিয়া থাকে, কখন কখন কার্য্যোপলক্ষে ১১২ মাইল পথও ঘণ্টায় ধাবিত হইয়াছে। তাড়িত-রেলওয়ে ঘণ্টায় ৫৯ মাইল গমন করে। টরপেডো ঘণ্টায় ৩৪ মাইল এবং টানডাম বাইসিকেল সরল সুপথে ঘণ্টায় ৩০ মাইল পর্য্যন্ত চলিতে পারে। লৌহদণ্ড বা তার যোগে শব্দ প্রতি সেকণ্ডে ১১,০৪০ পাদ গমন করিয়া থাকে।

২। মনুষ্যের হৃৎপিণ্ড।

দৈর্ঘ্য ছয় ইঞ্চ ও ব্যাস চারি ইঞ্চ পরিমিত নলে যত বেগ ও শক্তি আরোপিত হইতেপারে, মনুষ্যের হৃৎ-নালী সেইরূপ প্রবলবেগে প্রতিনিয়ত রক্ত প্রবাহিত করিতেছে। ইহা প্রতি মিনিটে ৭০ বার আঘাত করে; অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয় মিনিটে ৭০ বার নড়ে; প্রতি ঘণ্টায় ৪২০০ চারি হাজার দুই শত বার, প্রতি দিবসে ১,০০,৮০০ এক লক্ষ আট হাজার বার এবং প্রতি বৎসরে ৩,৬৭,৯২০০০ তিন কোটি সাতষট্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার বার আঘাত করে। মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ গড়ে সপ্ততি বর্ষ ধরিলে এই কাল মধ্যে হৃদয় প্রায় ২৫৭,৫৪, ৪০,০০০ দুই অর্ব্বুদ সাতান্ন কোটি চুয়ান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার বার আঘাত করে। যখন হৃদয় এইরূপ একবার নড়ে বা বুক ধুক্ ধুক্ করে, তখন প্রায় আড়াই

আউন্স (এক ছটাকের অধিক) রুধির সমস্ত শরীরে বেগে সঞ্চারিত হয়। এই গণনানুসারে প্রত্যেক মিনিটে ১৭৫ আউন্স, প্রতি ঘণ্টায় ৬৫৬১ পাউণ্ড এবং প্রতিদিন ৭·০৩ টন অর্থাৎ প্রায় ১৯৭ মণ রুধির হৃৎ-নালীর দ্বারা বেগে সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়। পাঠিকারা মনে করিবেন না যে, আমাদিগের শরীরে এত রুধির আছে, কিন্তু যদি এত রুধির থাকিত, তাহা হইলে হৃৎ-নালীর দ্বারা প্রতিদিন সঞ্চালিত ও প্রবাহিত হইতে পারিত। মানব-দেহের রক্তের পরিমাণ প্রায় ৩০ পাউণ্ড অর্থাৎ পনর সের, এই রক্ত প্রত্যেক তিন মিনিটে হৃৎপিণ্ড হইয়া হৃৎ-নালীর দ্বারা সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হইতেছে। এই শোণিতপ্রবাহ বেগে প্রধাবিত করিবার জন্য যত শক্তির আবশ্যক, তদ্দ্বারা ১২২ টন অর্থাৎ প্রায় ৩৪১৬ মণ ওজনের ভারী দ্রব্য ১ পাদ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করা যাইতে পারে, অথবা ২৮ মণ ভারী দ্রব্য ১২২ পাদ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে। এই প্রকারে সপ্ততি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ১৭৮৮৫০ টন অর্থাৎ ৫০,০৭৮০০ পঞ্চাশ লক্ষ সাত হাজার আট শত মণ মানব-রক্ত শরীরময় প্রবাহিত হইতেছে!

৩। দীর্ঘ জীবনের লক্ষণ।

করকোষ্ঠী, পদ-রেখা, ললাট-রেখা প্রভৃতি দর্শন ও গণনা দ্বারা মনুষ্যের আয়ু নির্ণয় করিবার প্রথা আছে, কিন্তু তাহা সামুদ্রিক ও ফলিত জ্যোতিষ-সাপেক্ষ। শারীরিক অবয়ব সকলের লক্ষণ দৃষ্টে দীর্ঘ জীবন নির্ণয় করা বহুদর্শনের কার্য্য। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে অল্পায়াসেই ইহার পরীক্ষা হইতে পারে। যাহাদিগের যকৃৎ, ফুস্ফুস, পাকস্থলী ও মস্তিষ্ক আয়ত বা বৃহৎ, দেহ দীর্ঘ কিন্তু দৈহিক উচ্চতা অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব অর্থাৎ যাহাদিগকে বসিলে দীর্ঘাকৃতি বোধ হয় কিন্তু দণ্ডায়মান হইলে খর্ব্ব দেখায়; যাহাদিগের হস্ত দীর্ঘ কিন্তু হস্ততল গুরু অর্থাৎ ভারী এবং অঙ্গুলি সকল স্থূল, তাহারা প্রায় দীর্ঘজিবী হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক গভীরভাবে নিমগ্ন, কর্ণকুহর নিম্ন, নেত্র নীলবর্ণ, কটা বা ঈষৎ কটাবর্ণ এই সকলও দীর্ঘ জীবনের লক্ষণ। নাসারন্ধ্র বৃহৎ বা আয়ত হইলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সৌকর্য্য হেতু ফুস্ফুস বা হৃৎ-নালীও আয়ত হইয়া থাকে এবং রন্ধ্র সঙ্কুচিত ও কুঞ্চিত হইলে হৃৎ-নালীও ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল হয়। অতএব হৃৎ-স্থলী বৃহৎ ও আয়ত হইলে মনুষ্যও প্রায় দীর্ঘজিবী হয়। প্রত্যুতঃ উল্লিখিত লক্ষণসকলের এক একটী লক্ষণ দীর্ঘজীবন-জ্ঞাপক নহে, কিন্তু সমস্ত লক্ষণের সমষ্টিই দীর্ঘজীবন পরিজ্ঞাপক।

তাহার চক্ষে জগৎ ভ্রমরময় হইয়া উঠিল। ভ্রমরের প্রেমামৃত তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। অনন্তর সমীরণকে বিদায় দিয়া প্রেম-পাগলিনী লজ্জাবতী পত্রখানি কত-বার মস্তকে ও হৃদয়ে ধারণ করিল, কতবার চুম্বন করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার অভাবে তাহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব ভ্রমর কতই ক্লেশ পাইতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জাবতী বেদনায় মরমে মরিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ভ্রমর আসিয়া লজ্জাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্যে গমন করিল। সরলা লজ্জাবতী দিন দিন অধিক হইতে অধিকতর ভ্রমরের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ভগবান্ জানেন এ অনুরাগের পরিণাম কি!!

২

ভ্রমর স্বীয় কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রে থাকিয়া প্রত্যহ সমীরণ দ্বারা লজ্জাবতীকে পত্র দিত। লজ্জাবতী ভ্রমরকে সংবাদ দিবে বলিয়া ভ্রমরের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। দুই তিন দিন অন্তর সেও এখন সমীরণের দ্বারা প্রত্যুত্তর পাঠায়। কিন্তু তাহাতে ভ্রমরের মন উঠে না, সে চায় প্রত্যহ পত্র পাইতে। তাই এক দিন ভ্রমর রাগ করিয়া পত্র লিখিল,—

পাষাণি!

তোমার হৃদয় কি স্নেহশূন্য!! প্রত্যহ এক এক খানি পত্র লিখিতে তোমার কি হয়? যদি এত নিষ্ঠুরতা করিবে এই তোমার মনে ছিল, তবে কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাইতে কে তোমাকে সাধিয়াছিল! পথিক পিপাসায় কাতর হইয়া জল অন্বেষণ করিয়া কোথাও না পাইয়া পিপাসায় পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, পিপাসা প্রায় আপনা আপনি শান্তি হইয়া আসিতে-ছিল, এমন সময় শীতল পানীয় লইয়া তাহার মুখে ধরিলে কেন? ধরিলে ত তাহার আশ মিটিতে না মিটিতে সে পাত্র কাড়িয়া লইলে কেন? না বৃথা হাহাকার, তোমাকে আর প্রাণের কথা বলিয়া কি করিব! তুমি তাহা বুঝিবে না।

"ভ্রমর।"

ভ্রমরের ক্রোধ দর্শনে লজ্জাবতী রাগ করিল না, বরং ব্যথিত হইল। সেই দিন হইতে সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ ভ্রমরকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল।

লজ্জাবতীর বাসস্থানের অনতিদূরে একটি সরোবর ছিল। সেই সরোবরে অগণ্য নলিনীদল প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা বিকীর্ণ করিতেছিল। সেই সময় একদা ভ্রমর লজ্জাবতীর নিকট আসিতেছিল। নলিনীকুল মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া ইঙ্গিতে ভ্রমরকে কতই ডাকিল, কিন্তু ভ্রমর দৃক্‌পাত করিল না—সে তাহার প্রাণময়ী লজ্জাবতীর নিকট গমন করিয়া আত্ম-কৃতার্থতা লাভ করিল। আর সেই দিন হইতে লজ্জাবতী নিজকে পরম সৌভাগ্য-বতী মনে করিল—ভাবিল ভ্রমর তাহারই নিজস্ব ধন, আর ভাবিল ভ্রমরের ন্যায় ভালবাসিতে এ জগতে কেহই জানে না। আনন্দে লজ্জাবতীর হৃদয় উথলিয়া উঠিল!

কিন্তু হায়! এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। জগৎ স্বতঃই পরীবর্ত্তনশীল। সংসার কেবল ভাঙা গড়ায় পূর্ণ। লজ্জাবতীর ভ্রমর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, তাহার মোহ ভাঙিল, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের উদয় হইল, সুতরাং আমরা বলিতে পারি লজ্জাবতীর কপাল ভাঙিল। ভালবাসা এ জগতে নাই; ভালবাসার ন্যায় এ জগতে যাহা আছে, তাহা মোহ মাত্র। জগৎ সেই মোহকে ভালবাসা জ্ঞানে পূজা করিতেছে, সুতরাং সেই মোহ ফুরাইলেই সাধারণের ধারণায় ভালবাসা ফুরায়। ভালবাসার নির্দ্দয়তা হৃদয়-বিদারক, ভুক্ত-ভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, সুতরাং লজ্জাবতীর কপাল ভাঙিল বই আর কি বলিব?

তখন এক দিন পত্র না পাইলে ভ্রমর আকুল হইত, কিন্তু এখন লজ্জাবতী দশখান পত্র লিখিয়া একখানারও উত্তর পায় না। আবার দুই একখান যাহা পায়, তাহা সেরূপ প্রণয়-সূচক নহে, কেবল ধর্ম্মোপদেশে ভরা। এই অবস্থার একখানি পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"তুমি আমাকে ভালবাস তাহা জানি। তোমার ভালবাসা লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি কতদূর অধঃপতিত হইতেছ, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! একমাত্র ভগবান্‌কে ভালবাসাই সকলের কর্ত্তব্য, ভগবচ্চরণ ব্যতীত অন্যত্র যে ভালবাসা তাহাই মোহ। মোহে বদ্ধ থাকিও না। বিল্বমঙ্গল প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রেম যদি চিন্তামণিকে ছাড়াইয়া শ্রীভগবানে অর্পিত না হইত, তবে কি আজ বিল্বমঙ্গল জগতে চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। তুমি আর আমাকে এরূপ পত্র দিও না, দিলেও আর উত্তর পাইবে না।"

ভ্রমর যে ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত হইয়া পত্রখানি লিখিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু লজ্জাবতীর কাণে এ ধর্ম্মকাহিনী সহিল না। যে এক দিন লিখিয়াছিল চিত্ত খুলিয়া দাও, ফল্গুর মত বহিয়া যাক্, প্রবঞ্চিত হইবার ভয় নাই নিশ্চয়। তার আজ এ কি আচরণ? ইহা ভ্রমরময় লজ্জাবতীর প্রাণ সহিবে কেন? হোক্ ভ্রমরের ধর্ম্মপ্রাণতা, মুগ্ধা লজ্জাবতীর প্রাণে একেবারে এত কাঠিন্য সহিবে কেন? ইহা যে প্রবঞ্চনারই রূপান্তর। নিষ্ঠুর ভ্রমর! যদি তোমার মোহ ভাঙিয়াছে, তুমি যদি বাস্তবিকই লজ্জাবতীকে ধর্ম্মরাজ্যের পথিক করিতে চাও, সে বেশ কথা। মোহ সকলেরই ঘটে, কিন্তু যে মোহ ভাঙিয়া কর্ত্তব্যপথে গমন করিতে পারে, সেই মহৎ; সুতরাং তোমার চিত্তকে প্রশংসা করি। কিন্তু ভ্রমর! নিশ্চয় জানিও লজ্জাবতীর প্রতি তোমার এ কাঠিন্য ভাল হয় নাই। তুমি তাহার হৃদয় বুঝিলে না— তাহার ব্যথা বুঝিলে না। তুমি তাহার মনঃপ্রাণ হরণ করিয়া সে একটু শান্ত হইতে না হইতেই তাহাকে জগতের রীতি নীতি বুঝাইয়া একেবারে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতে বসিয়াছ। এ গুরু-গিরিতে তোমার শ্রমের বৃথা অপব্যয় হইতেছে মাত্র। সকল

লজ্জাবতীর ভালবাসা।

লজ্জাবতী সখের উদ্যানের সৌরভময়ী মনোমুগ্ধকরী কুসুমিকা নহে। লজ্জাবতী ক্ষুদ্র বন-ফুল। ক্ষুদ্র লজ্জাবতীকে কেহ বিলাস-প্রিয় ধনীর ন্যায় প্রস্তর-নির্ম্মিত টেবলের উপর শোভাবর্দ্ধন করিতে যত্ন করে না। সে বনফুল, বনেই থাকে! দেবপূজার জন্য যত্ন করিয়া কেহ ক্ষুদ্র লজ্জাবতীকে বড় একটা আহরণ করে না, সে বনরাশির শোভাবর্দ্ধন করিয়া আপনি ফুটিয়া আপনি ঝরিয়া যায়। সে বুঝি নিষ্ঠুর জগৎকে ভালবাসে না, তাই নিরালায় নিজ শোভা বিকিরণ করিয়া আপনি খেলিয়া আপনি নিরস্ত হয়। আবার সে বড় অভিমানিনী, দৈবাৎ কেহ স্পর্শ করিলে তখনি কোমল কলেবর পরিত্যাগ করে।

গোলাপ মল্লিকা কমল প্রভৃতি চিত্তোন্মাদক কুসুমে মধুপান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভপূর্ব্বক ষট্‌পদ দলও বড় একটা ক্ষুদ্র লজ্জাবতীর খবর রাখে না।

সরলা বালিকা লজ্জাবতীর কেহ প্রাণের সঙ্গী নাই। তাহাকে আপনার বলিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইতে জগতে কেহই নাই। জগতে তাহার প্রাণের ব্যথা কেহই বুঝিল না। ব্যথিতের বেদনা বুঝিতে পারে, এমন প্রাণ এখানে কয় জনের আছে?

একদা এক মধুপায়ী ভ্রমর আসিয়া লজ্জাবতীর সন্ধান লইল। তাহাকে কত সমব্যথিতা ও স্নেহ প্রণয় দেখাইল, "গুন্ গুন্ গুন্" রবে কত প্রেমের কথা শুনাইল —"তুমি আমার জীবনাধিক জীবনসর্ব্বস্ব, আমাকে দয়া কর, দীনের প্রতি নিষ্ঠুর হইও না, আমি তোমার চিরদাস। আমাকে এক বিন্দু কৃপা দান করিয়া এ মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত কর, ভয় নাই প্রবঞ্চিত হইবে না"। তাহার সেই আশাপূর্ণ বাণী শ্রবণে ক্ষুদ্র লজ্জাবতী আত্মহারা হইল—ডুবিল—মরিল। লজ্জাবতীর ন্যায় সংসারের তীব্র ছলনায় কত নারী ডুবিতেছে—মরিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কোথায়!!

ভ্রমরের মধুর কাহিনী ক্ষুদ্র লজ্জাবতীকে স্বর্গে উঠাইল। সরলা বালিকা লজ্জাবতী হিতাহিত-জ্ঞান-রহিত হইয়া শঠ ভ্রমরকে ভালবাসিয়া ফেলিল। সরলা বালিকা যথাবিহিতরূপে ভ্রমরের আতিথ্য পালন করিল। লুব্ধ ভ্রমর আশাতীত ফল লাভ করিল। লজ্জাবতী ভাবিতেছে আমার কি সুখের দিন! জগতে এমন করুণা মমতা স্নেহ আছে জানিলে এতদিন বনে বাস করিতাম না। হায়! বালিকা এখনও সংসারের কুটিল চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই ভালবাসার পরিণামে কি আছে, বালিকা তাহা এখনও বুঝে নাই।

ভ্রমর যথাবিহিত আতিথ্য গ্রহণ করিয়া

"কালি আসিব" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। ক্ষুদ্র লজ্জাবতী ভ্রমরের বিরহে ব্যাকুল হইয়া আকুলহৃদয়ে কালিকার প্রত্যাশায় রহিল। দিন আর ফুরায় না, কালি আর আসে না, বিরহীদিগের নিকট দিনের যে কত দৈর্ঘ্য, তাহা বিরহিণী ব্যতীত অন্যে কি বুঝিবে?

বহু কষ্টে দিন কাটিল। প্রায় সন্ধ্যা সমাগত, এমন সময় মৃদু সমীরণ আসিয়া শন শন্ রবে ডাকিল "লজ্জাবতী"। লজ্জাবতী ভাবিল বুঝি বা তাহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব ভ্রমর আসিল। তাই সচকিত প্রাণে উত্তর দিল "কে গা"—।

সমীর। আমি ভ্রমরের দূত।

"ভ্রমরের দূত" কথাটি মধুর হইতে মধুর, লজ্জাবতীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাহার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। আজ লজ্জাবতীর নিকট "ভ্রমর" নামটি সুমধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতেও অতি সুমধুর"। বুঝি এমন মিষ্ট নাম জগতে আর কিছু নাই। যদি শত প্রাণ বলি দিলে লজ্জাবতী আজ একবার ভ্রমরের নাম শুনিতে পায়, তবে তাহাও দিতে পারে। নবানুরাগিণী বালার নিকট তাহার প্রাণকান্তের নামটি যেমন মধুর, এমন আর কিছুই নহে!।

আজ সমীরণ ভ্রমরের দূত হইয়া আসিয়াছে, তাই আজ তাহাকে দেখিয়া লজ্জাবতীর প্রাণে আনন্দ ধরিতেছে না। নবানুরাগিণী বালা তাহার প্রাণকান্তের পত্র পাইলে যেমন আনন্দিত হয়, লজ্জাবতীও ঠিক্ সেইরূপ হইয়াছে। কান্তের পত্র আনিয়া দেয় বলিয়া আধুনিক প্রেমময়ীদিগের নিকট ডাক পিয়ন যেমন প্রিয় বস্তু—আজ লজ্জাবতীর নিকট সমীরণ সেইরূপ।

কিয়ৎক্ষণ পরে স্বীয় হৃদয়কে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া লাজময়ী লজ্জাবতী লজ্জায় জড়সড় হইয়া ধীরে ধীরে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কিছু খবর আছে কি?" সমীরণ কিছু না বলিয়া ভ্রমরের লিখিত একখানি পত্র প্রদান করিল। লজ্জাবতী বন্য বালিকা, সে কখনও লেখা পড়া শিখে নাই, সুতরাং পত্র খানি লইয়া মহা বিভ্রাটে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর সমীরণকেই তাহা পাঠ করিবার আদেশ করিল। সমীরণ পড়িতেছে;—

"প্রাণময়ী!

তোমাকে না দেখিয়া আর তিলমাত্র তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, এক তিল এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে। তবে যে ইচ্ছামত তোমার নিকট যাইতে পারিতেছি না, তাহার কারণ দুর্দ্দৈব। নানা কর্ত্তব্য শৃঙ্খল আমাকে পাকে পাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আমার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। আমি যদি স্বাধীন হইতাম, এখনি ছুটিয়া গিয়া একবার ঐ মুখখানি দেখিয়া প্রাণ শীতল করিতাম। হে জীবনাধিক জীবন-সর্ব্বস্ব! তোমার অভাবে প্রাণে যে কি যন্ত্রণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা তোমাকে কি বলিয়া জানাইব! ভাষায় যে সে ভাষা নাই! ইতি তোমার ভ্রমর।"

লজ্জাবতী পত্র শ্রবণে বিহ্বল হইল।

ভাষায় কথা কহিতে পারেন? ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে, না হইবে?" উত্তরে বলা হইল "মেম বাঙ্গালা শিখিতেছেন, শীঘ্র বাঙ্গালায় কথা বলিতে পারিবেন। ইনি বিলাতে পিতা মাতা ভাই বন্ধুদের মধ্যে বেশ সুখে ছিলেন, কিন্তু এ দেশের স্ত্রীলোকদের অজ্ঞানতার কথা শুনিয়া দয়ার্দ্র হইয়া সব ছাড়িয়া এদেশে আসিয়াছেন। ইনি এ দেশের স্ত্রীলোকদিগকে বড়ই ভালবাসেন, এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিবেন।" এই কথা শুনিয়া রমণীগণ আনন্দে বুক চাপড়াইয়া একবাক্যে বলিলেন "কি রমণীরত্ন, কি রমণীরত্ন!"

কুকের বন্ধু আরও বলিলেন "ইনি স্বদেশে থাকিলে অনেক সুখভোগ করিতেন। কিন্তু সব আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া আপনাদের কন্যাদের হিতসাধনের জন্য আসিয়াছেন, এবং এই কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি এ পৃথিবীর কোনও ধনসম্পদ চান না।" তখন কয়েকটী মাতা বলিলেন "আমাদের কন্যারা আপনার কন্যা। ইহাদিগকে আপনার হাতে সঁপিয়া দিলাম।" আরও কিছু প্রশ্নোত্তরের পর যে যাহার স্থানে প্রস্থান করিলেন।

২৮এ জানুয়ারি কুমারী কুক বন্ধুর সহিত পুনরায় আসিয়া দেখিলেন, ৭টী বালিকা জুটিয়াছে, তন্মধ্যে ২টী নূতন। মাতারা পূর্ব্ববৎ চিকের মধ্যে উপবিষ্ট। একজন জিজ্ঞাসিলেন "আমাদের মেয়েরা লেখা পড়া শিখিয়া কি করিবে?" উত্তরে বলা হইল "তাহারা পরিবারের অধিক উপকারে আসিবে, জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে, এবং শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী হইবে।" আর এক মাতা বলিলেন "সত্য, আমরা লেখা পড়া জানি না, তাই আমাদের স্বামীরা আমাদিগকে পশুর মত ভাবেন। কিন্তু এ কাজ করিয়া তোমার কি লাভ?" কুক বলিলেন "আপনাদের সুখ ও মঙ্গলবর্দ্ধনেই আমার লাভ।" স্ত্রীলোকটী বলিলেন "তবে এ কাজটাকে বোধ হয় ধর্ম্মের কাজ মনে কর, এবং ইহাতে তোমাদের দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন?" মেম বলিলেন "আমাদের বিশ্বাস মানবের সেবা করিলেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।"

কুমারী কুকের এই প্রথম বালিকা-বিদ্যালয়। ইহা স্কুল সোসাইটীর স্কুলের সংস্রবে স্থাপিত হয়। এক মাসের মধ্যে নগরের আর দুই স্থানে দুইটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের প্রচার-গৃহেও একটী বালিকা-বিদ্যালয় বসিল। বালিকা-সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৫০।৬০টী হইল।

লর্ড হেষ্টিংস এ সময় গবর্ণর-জেনারল। তিনি স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। চাঁদার বই বাহির হইল, তাহাতে তিনি ও তাঁহার পত্নী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দান স্বাক্ষর করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে ৪০০০ টাকা সংগৃহীত হইল। এক বৎসর যাইতে না যাইতে দুইটী বিদ্যালয়ের স্থানে ১০টী বিদ্যালয় হইল, এবং ছাত্রীসংখ্যা ২০০ হইল। বালিকাদিগকে

শিক্ষাদান বিষয়ে লোকের যে ঘোর কুসংস্কার ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে লাগিল। বালিকাদিগের এক প্রকাশ্য পরীক্ষা গৃহীত হইল, তাহাতে দেখা গেল তাহারা সহজসহজ বই পড়িতে পারে ও সেলাইয়ের কাজ করিতে পারে। তখনকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। ১৮২৪ সালে ২২টী বিদ্যালয় ও তাহাতে তিন চারি শত ছাত্রী হইল। তখন ইউরোপীয় মহিলাগণকে লইয়া "Ladies, Society for Female Education in Calcutta & its Vicinity" অর্থাৎ কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য মহিলা-সভা নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহারই যত্নে ১৮২৫ সালে ৩০টী বালিকা-বিদ্যালয় ও ৫০০ ছাত্রী হইল, এবং তাহাদিগের শিক্ষা ও পরীক্ষাদিরও ব্যবস্থা হইল।

রাজা বৈদ্যনাথ রায় একজন স্ত্রীশিক্ষার বন্ধু ছিলেন। তিনি সহরের মধ্যস্থলে একটী বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেন। গৃহনির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। ১৮২৬ সালের ২৬এ মে তারিখে লেডী আমহার্ষ্ট বহু গণ্য মান্য লোকের সমক্ষে এই বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই সময় কলিকাতায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের দৃষ্টান্তে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে খৃষ্টীয় মিসনের রমণীরা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। বোম্বাইয়ে বিবী ষ্টিবেন্‌সন ও বিবী মার্গারেট উইলসন স্ত্রীশিক্ষার পথ প্রথম উন্মুক্ত করেন।

(ক্রমশঃ)

সক্রেটিসের গল্প।

গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত বিখ্যাত সক্রেটিসের নাম অনেকেরই শ্রবণবিবর তৃপ্ত করিয়াছে। তিনি কেবল নিজেই জ্ঞান ধন অর্জন করিয়া জগতের সমক্ষে পূজ্য হইয়াছেন এমন নহে, অপরকেও সেই ধনে ধনী করিয়াছিলেন। খৃষ্টের জন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে এথেন্স নগরে পণ্ডিতবর সক্রেটিসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভাস্কর-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং পুত্রকেও প্রথমে সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মাতা ধাত্রীর ব্যবসায় করিতেন। সক্রেটিস অতি সুস্থদেহ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্য এথিনিয়নগণের ন্যায় তিনিও প্রয়োজনমত যুদ্ধ করিতেন। একদা কোন সংগ্রামে বীরত্বের পুরস্কার তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। কিন্তু তিনি নিজের গৌরবের জন্য তত প্রয়াসী ছিলেন না, ভাবিলেন এ সম্মান অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিলে আরও গৌরবের হইত। এলকিবিডিস নামক একজন সাহসী যুবককে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত স্বীয় বীরত্বলব্ধ পুরস্কার পরম সন্তোষ সহকারে
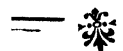
কার্য্যেরই একটা সময় অসময় আছে। লজ্জাবতী এখন তোমাময়, এখনও তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময় আসে নাই। ইহাতে তোমার আচরণে সে কেবল প্রতারিত হইল মাত্র।

ঐ পত্রখানি দৃষ্টে লজ্জাবতী ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইল—অভিমানে হৃদয় জ্বলিতে লাগিল—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিল "ওঃ—কি প্রবঞ্চনা!! না বুঝিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। জগৎ' অনেক শিখাইলে, অনেক দেখাইলে, আর এ বঞ্চনা করিও না। তোমার মোহপাশ খুলিয়া লও; দূর হইতে তোমার চরণে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাই।" অনন্তর প্রেমবিধুরা লজ্জাবতী জগতের নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "সকলে সাবধান হইও, জগৎ বড় ভীষণ ঠাঁই, কাহারও কথায় ভুলিও না, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। জগতে ভালবাসা নাই। জগতে কেহ ভালবাসিতে জানে না। যদি কাহারও দেবপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া কাহাকেও ভালবাসিয়া ফেল, তিনি যতই উন্নতহৃদয় হউন না কেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তুমি নিশ্চয় প্রবঞ্চিত হইবে। তাই বলি কাহাকেও ভালবাসিও না, জগৎকে ভাল বাসিতে নাই। এ জগতের ভালবাসা বিষাক্ত, প্রতি চুমুকে হৃদয় জ্বলিয়া যায়।" লজ্জাবতীর কথায় আমরাও বলি জগৎ সাবধান! ভালবাসার ছলনায় পড়িয়া জগতে প্রতিনিয়ত কত নরনারীর হৃদয় জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে, কে তাহার খবর রাখে? তাই আবার বলি জগৎ সাবধান!!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী।

আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার ইতিবৃত্ত

বামাবোধিনীর জন্মমাসে আমরা বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার আদিম ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এ দেশ খৃষ্টীয় মিসনরীদিগের নিকট অনেক বিষয়ে ঋণী। ইহাঁরাই সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গলা মুদ্রা-যন্ত্রের সৃষ্টি করেন, এবং সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার করেন; ইহাঁরাই আবার বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম পথ-প্রদর্শক। শ্রীরামপুরের বিবী হানা মার্সম্যান এ বিষয়ে অগ্রণী। তিনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁরই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণে ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের বিবী লসন ও পিয়ার্স কলিকাতা মহানগরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮১৯ সালে এই মহিলাদ্বয়ের উৎসাহ ও সাহায্যে কতকগুলি যুবক দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা বিধান জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বৎসরে তাহার অধীনে

৮টী মাত্র ছাত্রী হয়। তাহাতে ইহাঁরা নিরুৎসাহিত না হইয়া অধিকতর উদ্যমের সহিত কার্য্য করেন। তাহারই ফলে ২য় বর্ষে ছাত্রীসংখ্যা ৩২টী হয় এবং ৩ বৎসর পরে বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয়টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ১৬০টী হইয়া উঠে। ইহা ৮০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা।

১৮২১ সাল স্ত্রীশিক্ষার একটী নবযুগ বলিয়া চিরস্মরণীয়। পূর্ব্বে যে সভার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার অধ্যক্ষগণ "London British and Foreign School Society" নামক বিলাতী সভার নিকট লিখিয়া পাঠান যে "বঙ্গদেশে হিন্দু-নারীর সংখ্যা ৪ কোটিরও অধিক, কিন্তু লক্ষের মধ্যে একজনও লিখিতে পড়িতে জানে না। বঙ্গদেশে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপনার্থ বিলাত হইতে একজন উপযুক্ত মহিলাকে প্রেরণ করা আবশ্যক।" শ্রীরামপুরের মিশনরী ওয়ার্ড সাহেব তৎকালে বিলাতে ছিলেন, তিনিও উপরি-উক্ত প্রার্থনার সহকারিতা করেন। এই আন্দোলনের ফলে কুমারী কুক্ ইংলণ্ডীয় সভা কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া বঙ্গদেশবাসিনীদিগের মধ্যে শিক্ষা প্রচার জন্য শুভাগমন করেন।

স্কুল সোসাইটী দেশীয়দিগের সহায়তায় বিদ্যালয়স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন। এ সময় কলিকাতায় ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের মধ্যে ১২০টী মাত্র পাঠশালা ছিল, এবং তাহাতে ৪৫০টী মাত্র বালক অধ্যয়ন করিত। তাঁহারা বালিকা-দিগের জন্যও পাঠশালা স্থাপনের মানস করিলেন। বিবী কুক আপনাকে কার্য্যের উপযুক্ত করিবার জন্য প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮২২ সালের ২৫এ জানুয়ারী তিনি স্কুল সোসাইটীর এক বালক-বিদ্যালয় দেখিতে যান। বিবীর স্কুল দেখিতে আসা, তখন-কার সময়ের নূতন ব্যাপার। তাঁহাকে দেখিতে অনেক লোক জমে, একটী সুন্দর ছোট বালিকাও আকৃষ্ট হইয়া আইসে। মেয়ে ছেলে সেখানে কেন? এই বলিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হন। মিস কুক তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে ডাকিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি লেখা পড়া শিখিতে চাও?" তদুত্তরে শুনিলেন বালিকাটী তিন মাস ধরিয়া লেখাপড়া করিতে চাহিতেছে, কিন্তু ভরতি হইতে পারে নাই। সে ভরতি হইলে আরও ২০টী বালিকা আসিতে পারে। কুমারী কুক পরদিন আসিবেন বলিয়া যান। পরদিন বাঙ্গলা-ভাল-জানা একটী স্ত্রীবন্ধুর সহিত সেখানে উপনীত হইয়া দেখিলেন ১৩টী বালিকা মিলিত হইয়াছে। স্কুলের পার্শ্বস্থ স্থান চিক্ দিয়া ঘেরা, তাহার মধ্যে বালিকাদের মাতারা ঘোমটা দিয়া বসিয়াছেন। কুকের সঙ্গিনী বিবী মহিলাদিগকে বলিলেন "আপনাদের মেয়েরা লেখা পড়া শিখিলে বোধ হয় আপনারা সুখী হইবেন। এই মেম এ দেশের মেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিলাত হইতে আসিয়াছেন।" একটী মা জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বিবী কি আমাদের

তাহাকে দিলেন। কেবল যে নিজের সম্মান ত্যাগ করিয়া স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা শিখাইলেন তাহা নহে, এক যুদ্ধে উক্ত যুবকের প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন।

সক্রেটিস প্রৌঢ়াবস্থায় পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষা প্রচার করিবার মানস করিলেন। তৎকালের শিক্ষকগণকে "সোফিষ্ট" বলিত। তাঁহারা কেবল যুবকগণকে সুবক্তৃতা ও তর্ক-বিতর্কের উপযোগী শিক্ষা দিতেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কোনরূপ জ্ঞানলাভ হইত না, সক্রেটিস এই অভাব দূরীকরণার্থ চেষ্টিত হইলেন। তিনি কোন প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত করেন নাই। প্রতিদিন প্রাতঃকালে বাজারের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইতেন এবং ধনী দরিদ্র আবাল বৃদ্ধ সকলেই ইচ্ছামত সমভাবে তাঁহার নিকট সেই সুন্দর উপদেশ বাক্য শুনিতে পাইত। স্বল্প কালের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই তাঁহার শিক্ষানীতি অবলম্বন করিল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কৌশলে প্রায় অনেক বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। একাল পর্য্যন্ত উক্তরূপ হেতু জিজ্ঞাস্য শিক্ষা প্রণালীকে সক্রেটিসের শিক্ষা প্রণালী বলা যায়।

ডেলফি নগরে এক ব্যক্তি সক্রেটিসের জ্ঞানবত্তায় অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তত্রত্য প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কোন ব্যক্তি ইহার তুল্য জ্ঞানী আছে কি না?" পণ্ডিতপ্রবর উত্তর পাইলেন "না, সক্রেটিসই জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ।" সক্রেটিস এই কথায় মহা বিরক্ত হইলেন, এবং উক্ত কথার ভিতর কোনও সত্য আছে কিনা জানিতে ব্যস্ত হইলেন। বড় বড় পণ্ডিতদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা যাহা বুঝেন না, তাহা বুঝি বলিয়া মনে করেন। সকলেই বৃথা জ্ঞানাভিমানী। সক্রেটিস আপনাকে অজ্ঞ বলিয়া বুঝেন এবং আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করেন। তিনি লোকের প্রশংসায় স্ফীত না হইয়া অবশেষে এই স্থির-সিদ্ধান্ত করিলেন যে "আমি জ্ঞানেতে শ্রেষ্ঠ নহি, অজ্ঞানতায় শ্রেষ্ঠ। যে আপনাকে বড় অজ্ঞান বলিয়া জানে, সেই তবে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।"

শ্রী নিঃ দেবী।

স্বাবলম্বন।

স্বাবলম্বন বহু দিনের বহু পুরাতন কথা। ইহার শুভ ফল মানুষে অতীত কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও

অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্বাবলম্বনের উপকারিতা অধিক সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিতেছে। ইহা মানব-জীবনের *উন্নতির প্রশস্ত সোপান, নিঃসন্দেহে* প্রমাণিত হইয়াছে। স্বাবলম্বন ছাড়িয়া কোনও জাতি বা কোনও ব্যক্তি কোনও কালেই উন্নতিলাভে সমর্থ হন নাই।

ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর যত কিছু কাজ রহিয়াছে, সমস্তটার মধ্যেই স্বাবলম্বন প্রয়োজন। কি শিল্প সাহিত্য, কি ব্যবসা বাণিজ্য, যে বিষয়েই আমরা উচ্চতা লাভ করিতে চাই, স্বাবলম্বন ব্যতিরেকে সফলকাম হওয়া অসম্ভব,—এমন কি সুখে দুঃখে সম্পদে, বিপদে, সংশয়ে, নৈরাশ্যে মানবজীবনের সকল অবস্থাতেই স্বাবলম্বন শুভফল-প্রসূ।

প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন চিন্তা, উদ্যমশীলতা, এবং আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষাই সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির মূল; ইহার মধ্যে আত্মনির্ভর মনুষ্যত্বলাভের এক প্রধান উপকরণ। প্রত্যেক নরনারী যদি আত্মনির্ভরশীল হন, যত্নের সহিত অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করেন, তবে জাতীয় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কারণ ব্যক্তি সকল লইয়াই জাতি সংগঠিত। মহোপকারী স্বানুবর্ত্তিতার অভাবই আমাদের বর্ত্তমান জীবনের দরিদ্রতা ও হীনতার এক প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। প্রবাদ আছে "যিনি নিজে নিজকে সাহায্য করেন, ঈশ্বর তাঁহার কার্য্যের সহায় হয়েন।" বিধাতা প্রত্যেক মানুষকেই অল্পাধিক পরিমাণে শক্তি দিয়াছেন—হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল কার্য্যোপযোগী করিয়া দিয়াছেন। *এই সমস্ত শক্তিকে যদি আমরা নিয়মিত*-রূপে পরিচালিত করি, তাহা হইলে সেই সেই শক্তিগুলি ক্রমেই বিকাশপ্রাপ্ত হয়। তখন মনে হয় আমাদের কার্য্যগুলির সফলতা লাভের নিমিত্ত স্বয়ং বিধাতাই যেন বৃত্তিগুলি ক্রমশঃ কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতেছেন। অনেক সময় এমন হয়, আমরা শক্তির পরিমাণ করিতে না পারিয়া উৎসাহে বিভোর হইয়া এক অতীব কঠিন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেই। প্রথমতঃ হয় ত পাঁচ জনে মিলিয়া সেই কাজটী আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু কার্য্যের কঠোরতা ও শক্তির ক্ষুদ্রতা দর্শনে নিরাশ হইয়া, পরে অনেকেই হতোদ্যম হইয়া যাই। কিন্তু তখন সেই অবশিষ্ট নিঃসহায় ব্যক্তিদের নিকটেই এক স্বর্গীয় আলোক প্রকাশিত হয়, এবং কোন্ এক অভয় হস্তের ইঙ্গিতে তাহারা অটল সাহস পাইয়া স্বাবলম্বন প্রভাবে কার্য্যসাধনে সমর্থ হয়। বহু পরিবারে দেখা গিয়া থাকে স্বাবলম্বন অভাবে কত লোক ভ্রাতা বা অন্য কোন আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া আজীবন কাটাইতেছেন। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নহে, যে পিতার অতুল সম্পত্তির ভরসায়—ভ্রাতার উচ্চ পদের আশায় কত যুবক অলস হইয়া সংসারপ্রান্তে জড় পদার্থের মত বসিয়া থাকে; তাহাদের কিছুরই অভাব বা আবশ্যকতা আছে,

এমন বোধ হয় না। ক্রমে তাহাদের জীবন অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া হতাদরে অতিবাহিত হইয়া যায়। মানবের দুর্জ্জয় *শক্তির এমন অপব্যবহার—এমন ঘৃণিত* জীবন যাপন কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। বিশ্ব বীণা হইতে নিরন্তর যে মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত উত্থিত হইয়া মানবকুলকে আকুল করিতেছে—

"হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান,
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।"

সে গভীর স্বর তাঁহাদের কাণের পর্য্যন্ত পৌঁছে না। ইংরেজ সমাজে এই পর-নির্ভরের ভাব নাই বলিয়া, ছেলে বেলা হইতে তাহাদের স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিটী বলবতী হইয়া উঠে। তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব শক্তি অনুশীলন দ্বারা নিজকে নিজে বড় করিয়া তুলিতে প্রয়াস পায়, এবং কালে যথাসম্ভব বড় হইয়া দাঁড়ায়।

এই সকল বড় বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমাদের গৃহ কোণের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম কার্য্যাবলী পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, স্বাবলম্বন অভাবে গৃহস্থালী খানি কোন মতেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে না। এমন অনেক মহিলা আছেন, আলস্যই তাঁহাদের জীবনের চির সঙ্গী, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা—আকিঞ্চন—উচ্চাভিলাষ আজন্ম যেন ইহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছেন। কত ক্ষুদ্র কার্য্য আছে যাহা কটাক্ষে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, তাহার জন্য চাকর ঝিকে ডাকিয়া ডাকিয়া, তাহাতে যতটুকু সময় লাগিবার কথা ছিল, তাহার চতুর্গুণ সময় অতিবাহিত করিয়া বসেন। আবার তাহাতে কাজটীরও তেমন শৃঙ্খলা হয় না, *আপনার অক্ষমতাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া* উঠে। তাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা সংসারে খাটিবার জন্য আসেন নাই। সুধু খাটাইবার জন্য—দুগ্ধ-ফেননিভ কোমল শয্যায় গা ঢালিয়া, সুধু হাসিয়া খেলিয়া আমোদ করিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। ইহাঁরা কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি গৃহকর্ম্ম কোনও কার্য্যেই প্রাণ দিয়া খাটিয়া যে অপূর্ব্ব সুখ লাভ হয়, তাহার আস্বাদন করিতে পারেন না।

এতদ্দেশে অনেক উচ্চপদস্থ লোক ও জমীদার-বংশধরদিগকে দেখা যায়, ভৃত্যগণ তাহাদের গায়ে তেল মাখাইয়া দিবে —জুতা পরাইবে—মাথায় ছাতা ধরিবে—বাতাস করিবে—তাম্রকুট সেবনের পরে রজতনির্ম্মিত হুঁকাটী হাত হইতে লইয়া নামাইয়া রাখিবে—মূলকথা অপরের সহায়তা ব্যতীত মুহূর্ত্তকালও তাঁহাদের চলে না। নিজেদের কোন ক্ষমতার অস্তিত্ব আছে, তাহাদিগকে দেখিলে এমন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাঁরা সতত জড়পদার্থবৎ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন, ইহাঁদের ঈশ্বর-দত্ত শক্তি সামর্থ্য ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হইতে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। তাঁহারা আপনার কাছে আপনি পরাধীন, এ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় কে না স্বীকার করিবেন?

যেখানে প্রকৃত স্বাবলম্বনের অভাব

সেখান হইতে লক্ষ্মীশ্রী অন্তর্হিত হইয়া যায়। প্রত্যেকে অপরের উপরে নিরন্তর একটা নির্ভরের ভাব স্থাপন করাতে, আপন আপন প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে কাহারও আগ্রহ থাকে না। চেষ্টাহীন ভাবে জীবন যাপন করিতে করিতে প্রচ্ছন্ন ভাবে চরিত্রের মধ্যে একটা অলস উদাসীন ভাব সঞ্চারিত হইতে থাকে। সংসারের মধুরতা ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই আত্মনির্ভরশীলতার অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব, পুরুষের পৌরুষ, স্ত্রীলোকের জীবনের সৌন্দর্য্য সমস্তই ম্লান হইয়া যায়।

আমরা চারি দিক্ হইতে যত খানি উপদেশ পাইতেছি, যে সমস্ত পুস্তক পড়িতেছি, আমাদের প্রতিদিনের এই কার্য্যাবলীর মধ্যে যত কিছু জানিবার বিষয় আছে, সবটাই যদি আমরা শুনিবামাত্র ঠিক্ বলিয়া ধরিয়া বসি, নিজে কিছু না বুঝিয়া কেবল অন্ধের মত পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া, ছুটিয়া চলি, তাহা হইলে জীবনী শক্তির বিকাশ হইতে পারে না। যাহা শুনিব, যাহা পড়িব, নিজের জ্ঞান ও বিচার শক্তির সহিত তাহা ঐক্য করিয়া লওয়া চাই। যত দিন না আমরা তাহার প্রকৃত মঙ্গলভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তত-দিন তদনুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ফলতঃ যাঁহারা বড় লোক, তাঁহারা বাহিরের শিক্ষা, উপদেশ, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা আপন আপন শক্তির বিকাশ কল্পে সহায়তা করেন। কিন্তু আত্মচিন্তা বিসর্জন করেন না।

রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি যে যে মহাত্মাগণ আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের মুখ উজ্জল ও আপনাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বাবলম্বনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা কত বিঘ্ন বিপত্তি পদে দলিত করিয়া, কেমন আত্মনির্ভর ও আত্মগৌরবের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে, বোধ হয় যেন তাঁহাদের এমন অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভর না থাকিলে, তাঁহারা কখনই সংসারে এত উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন না।

কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক যাহাতেই উন্নতি বা খ্যাতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না কেন, সুদৃঢ় আত্ম-নির্ভর অভ্যাস করিতে হইবে। কেবল অপরের দিকে চাহিয়া থাকিলে কিছুই হইবার নয়। যাহা কিছু মানুষের পাইবার এবং করিবার আছে, এই আত্মনির্ভর ছাড়িয়া তাহাতে সফলকাম হওয়া অসম্ভব। ইহার অলৌকিক মহিমা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, ইহার অতুলনীয় প্রভাব কেহ অবিশ্বাস করিতে পারেন না। নিতান্ত অপদার্থ লোকও প্রতিজ্ঞা ও স্বাবলম্বনের প্রভাবে কত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

যখন ক্লাইবের পিতা মাতা পুত্রের

উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিতে রুষ্ট ও তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর রঙ্গভূমিস্বরূপ ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আপন জীবিকা নির্ব্বাহের পথ খুঁজিতে হইয়াছিল ; সেই সময়ে আপনার হীনাবস্থা সহসা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। যখন তাঁহার গ্লানি অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইয়াছিল, তখন তিনি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার সেই উদ্যম বিফল হয়, তখন কি জানি কেন তাঁহার মনে হইয়াছিল "আমার দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।" ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে যখন ক্লাইব অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আরকটের দুর্গ অধিকার করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন এত অল্প সৈন্য লইয়া কেমন করিয়া অগণিত শত্রুবাহিনী ক্ষয় করিবেন, এই চিন্তাভারে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—এই চিন্তার বিরাম বা মীমাংসা হইয়া উঠিতেছিল না। তখন না জানি কোন্ এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি কেবল স্বীয় সাহস, উদ্যম ও বীরত্বের উপরে দৃঢ়নির্ভর করিয়া চলিয়াছিলেন। তখন ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি, মুহুর্মুহু বজ্রনিনাদ এবং অজস্র শিলাবৃষ্টি হইতেছিল, ওদিকে দুর্গবাসী সৈন্যগণ ক্লাইবের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া এবং এই দুর্য্যোগ অমঙ্গলের পূর্ব্ব লক্ষণ মনে করিয়া, বিজয়লক্ষ্মী নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ অঙ্কে স্থাপিত হইবে ভাবিয়া, আপনাদের সাহস ও স্বাবলম্বন ছাড়িয়া পলায়নপর হইয়াছিল। তখন ক্লাইব নির্ব্বিঘ্নে দুর্গ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে এবং পলাশী-প্রাঙ্গণে যে অসাধারণ তেজ, সাহস ও বিক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহার অদম্য আত্মনির্ভরের ফল। সেই প্রথম উদ্যমেই যদি তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন, কে বলিতে পারে, তবে আজ ব্রিটিশ পতাকা ভারত-সাম্রাজ্যে উড্ডীন হইত ?

জাপানের অধিবাসিগণ বিশ বৎসরের মধ্যে যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করিয়াছেন, অন্য কোন জাতি শত বৎসরেও উন্নতির এত উর্দ্ধতন শিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছে এমন জানা যায় নাই। ইহাঁরা এখন চীনের সহিতও প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং নানা দেশীয় কারুকার্য্য, নূতন আবিষ্কৃত কল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া, আপনাদের জাতীয় উন্নতি সাধন করিতেছেন। ইহাও তাঁহাদের অসাধারণ আত্মনির্ভরের ফল সন্দেহ নাই।

যখন সংসারে অগণিত কার্য্য-ব্যস্ততায় দেহ মন শ্রান্ত হইয়া পড়ে, শিশুগুলির অসহ্য উৎপাত, রোগীর দীর্ঘ সেবা, অভ্যাগতের অভ্যর্থনা এক সাথে উপস্থিত হয়, সহিষ্ণুতার সীমা শেষ হইয়া পড়ে—অকস্মাৎ সংসারটা বড় তিক্ত বোধ হয়, তখনই আমাদের প্রকৃত আত্মনির্ভরের সঞ্জীবনী শক্তি চাই, নহিলে সে ধাক্কাটা

বুঝিবা একান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। হয়ত বা কর্ত্তব্যগুলি অসম্পন্ন থাকিয়া যায়।

যখন কোন প্রিয় জনের অভাবে আমাদের জীবন শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হয়, যখন প্রাণ সংসারের যাবতীয় পদার্থ নিষ্ফল ও শোভাহীন মনে করে, জীবনভার দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হয়, প্রাণখানি অসহ্য উত্তাপে গলিয়া যাইতে চায়, তখন কাজ করিবার ইচ্ছা বা শক্তি লোপ হইয়া আসে—তখনই আমাদের আত্ম-নির্ভরের দুর্জ্জয় শক্তি অবলম্বন আবশ্যক। নহিলে দেখিয়াছি বাহিরের সহস্র সান্ত্বনায় প্রাণে শান্তি আসে না, প্রবোধ মিলে না, ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে হয়।

যখন মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে নির্নিমেষে বসিয়া থাকি, রজনী গভীরা হইয়া উঠে—শুষ্ক বৃক্ষপত্র ঝর্ ঝর্ করিয়া খসিয়া পড়ে, বাতাসে কখন বা দুয়ারের লৌহ শিকল খানি নড়িয়া উঠে, রজনীর গভীরতায় ক্ষুদ্র শব্দটী পর্য্যন্ত কাণে আসিয়া পৌঁছে, সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহ ঝিম ঝিম করিতে থাকে, বিনিদ্রনয়ন দুটী আলস্যে মুদিত হইয়া আইসে, তখন ধৈর্য্য প্রেমের সীমা ছাড়িয়া যাইতে চায়! তখনো সেই পীড়িত আত্মীয় জনের প্রাণপণে সেবার জন্য ঐকান্তিক আত্মনির্ভর চাই।

মহাত্মা বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশা, কবির, হরিদাস প্রভৃতির ঈশ্বরলাভের জন্য ঐকান্তিক স্বানুবর্ত্তিতা, মাট্‌সিনি গ্যারিবল্ডী প্রভৃতির আত্মোন্নতির জন্য সুদৃঢ় স্বাবলম্বন, কলম্বসের সুদৃঢ় ভয়াবহ সমুদ্রের পর পার আবিষ্কার-স্পৃহা পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ আত্মনির্ভর—কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রভৃতির অবিচলিত পরসেবা—নেপোলিয়ানের অদ্ভুত কার্য্যশক্তি—ডারউইনের বিজ্ঞান আবিষ্কার এই সকলের মধ্যে আত্ম নির্ভরের অতুল ম[illegible] জাজ্বল্যমান দেখা যাইতেছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ আপন ই[illegible], আপন শা[illegible] [illegible]ন [illegible]রিয়া [illegible]প্রভাবী হইয়া যত [illegible] থাকা যায়, একটু লক্ষ্য করিলেই অনুভব করা যায়, তত দিন অবসাদের এক ভীষণ ছায়া জীবন ব্যাপিয়া রহিয়াছে! স্বীয় প্রবৃত্তির চালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠিলে, মানব-হৃদয়ের নির্জীব অসাড় ভাবই সুধু প্রতিপন্ন হয়—তখন মনে হয় জীবন ও মৃত্যুতে বড় বেশী প্রভেদ নাই।

যখন সুন্দর প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াই, পূর্ব্ব আকাশে নিরুপমা রাঙ্গা ঊষা ধীরে ধীরে দেখা দেয়; বহু দূর পর্য্যন্ত শিশির-স্নাত শ্যামল সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী দণ্ডায়মান দেখা যায়, ছোট ছোট পাখীগুলি উড়িয়া উড়িয়া শস্য সংগ্রহ করিতে থাকে,—তখন সেই মনোরম প্রাতঃসৌন্দর্য্যে সমস্ত খানি প্রাণ সিক্ত হইয়া যায়, আর সহসা মনে পড়ে "জীবনপথে এত খানি অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু হায়! শিক্ষা কত টুকু করিয়াছি? সংসারের সার প্রকৃত ঐশ্বর্য্য কতটুকু লুঠিয়া লইতে পারিয়াছি?" হায়! অনুধাবন করিলে জানা

যায়, আজও ভাণ্ডারগৃহ সম্পূর্ণই শূন্য! এতগুলি দিন বিফলে গিয়াছে। তখনই কি জানি কেমন এক দুঃসহ তৃষ্ণা—অগণ্য আকাঙ্ক্ষারাশি সুপ্তোত্থিতের মত প্রাণে জাগিয়া উঠে, ইচ্ছা হয় এই জগতের অগণ্য কর্ম্ম-সাগরে ঝম্প দিয়া আত্মবিসর্জন করি।

জীবনলীলার মধ্যে এই সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, *স্নেহের বন্ধন—এই বিরাগ, বিসম্বাদ—* হাসি অশ্রু,—সমস্ত ভেদ করিয়া অকস্মাৎ মনে পড়ে "জীবনে কিছুই তো কাজ করিতে পারি নাই; যত কিছু ভাবিয়াছি, হায়! কল্পনাতেই তাহা অবসান হইয়াছে।" সেই গ্লানির তীব্র অনুশোচনা ভেদ করিয়া, বীণা-ঝঙ্কারের মত প্রাণের মধ্যে কে বলিয়া উঠে, "আপনার জন্য আপনি কতটুকু শক্তি উৎসর্গ করিয়াছ"? সেই ম্লান অথচ সত্য, কঠোর অথচ বাৎসল্য-পূর্ণ করুণ স্বর মর্ম্মভেদ করিয়া থাকে। তখন সমস্ত আত্মাভিমান একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়, ক্ষোভে লজ্জায় হৃদয় বিনম্র হইয়া আইসে।

পরিমাণ করিয়া বলা কঠিন, গত জীবনের কার্য্যাবলীর মধ্যে কত খানি সম্পন্ন হইয়াছে। ভ্রম ও ত্রুটি কত অলঙ্ঘনীয়! তখন অতীত জীবন ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা করে—কিন্তু অতীত কাল-সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে মানুষের ক্ষমতা কোথায়?

ক্রমে অবসাদের মেঘ সরিয়া যায়, আবার আশায় বাসনায় উদ্যমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, নব বল সঞ্জাত হয়—আবার সংকল্প করি আপনার উপর আপনি নির্ভর করিয়া সংসারক্ষেত্রে দাঁড়াইব—আপনার জন্য অপরের জন্য খাটিব, আবার তখন উল্লসিত হৃদয় গাহিতে থাকে—

"ক্ষুদ্র শান্তি করিয়া তুচ্ছ
পড়িয়া নিম্নে চড়িব উচ্চ
ধরিব ধূমকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।
নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট
কখনো ইষ্ট কভু অনিষ্ট
কখনো তিক্ত কখনো মিষ্ট
যখন যা দেয় তুলিয়া।
হাতে তুলে লব বিজয় বাদ্য
আমি অশান্ত আমি অবাধ্য
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে।
নব নব ক্ষুধা নূতন তৃষ্ণা
নিত্য নূতন কর্ম্মনিষ্ঠা
জীবন গ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা
উল্টিয়া যাব ত্বরিতে।"

আমরা যদি কিছু কাজ করিতে চাই—শিক্ষা, জ্ঞানশক্তি ও সামর্থ্য লাভের প্রত্যাশায় প্রাণপণ পরিশ্রম—অক্লান্ত অধ্যবসায় আগ্রহ যত্ন ও সর্ব্বোপরি একান্ত আত্ম-নির্ভর শিক্ষা করা চাই। কেবলি পর-প্রত্যাশা, কেবলি অন্যের কৃপার দিকে চাহিয়া থাকা ছাড়িতে চেষ্টা করিব। এস ভগিনী আজি আমরা সংকল্প করি "আপনার পায়ের উপরে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব।" আমরা মনে

করিয়া রাখিব, আমাদের সংসার রূপ খেলাঘরের এই প্রতি নিমেষের কার্য্য— খুঁটী নাটী যত কিছু আছে, সমস্তটার মধ্যে চাই আত্মাবলম্বন, চাই আত্মবৃত্তির সম্মোহন গৌরব—তাহা না হইলে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে ঘরকন্নার প্রাচীরের আড়াল হইতে ঠিক্ তেমনি মাধুর্য্য তেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিবে না।

এস আজ আমরা এই শুভ দিনে শুভ সুযোগে একবার সেই দেবদেব মহাদেবের নিকটে প্রার্থনা করি। শুধু তাঁহারই কৃপায় মানবের দুঃসাধ্য কার্য্য সহজ, সরল ও সুসাধ্য হইয়া উঠে। করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তার অসীম দয়ায় আমাদের অলসতা চলিয়া যাউক, তাঁহারই করুণার আশ্বাসে আমরা আশা করি আংশিক পরিমাণেও আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হইবে। এ জগতে তাঁহারই ইচ্ছার জয় হউক—তাঁহারি মহিমা ধন্য হউক, মানব-জীবন কৃতার্থ হউক।*

ইলিয়ড় ১ম সর্গ।

(৩৯৮ সংখ্যা, ৪১১ পৃষ্ঠার পর)

শুনি আকিলিস-বাণী নৃপতি তখন
এইরূপে ক্রোধভরে করিলা উত্তর :—
"যাও বীর বলগর্ব্বী, যাও হেথা হতে,
তব সহায়তা জেনো ট্রোজান সমরে
নাহি প্রয়োজন আর। তুচ্ছ মানি আমি
ভয় প্রদর্শন তব, ন্যায় যুদ্ধে হেন
যুঝিতে বীরের হেথা হবে না অভাব।
দেবরাজ নিজে রক্ষিবে নৃপতি-পক্ষ
রাজকুলপতিগণ নহে হীনবল,
বিশেষতঃ দেবগণ রক্ষক তাঁদের।
এ অবজ্ঞা মূঢ় তব কে সহিতে পারে ?
অশান্ত হৃদয় লয়ে তব হও রত
বিসম্বাদ বিবাদের স্থান পাও যথা।
রে পাষণ্ড, শুধু ঘোর সমর-বিপ্লব
ঘটাইতে চিরসুখ উল্লাস তোমার।
যদ্যপি বীরত্ব কিছু থাকয়ে তোমার
জেনো তাহা দেবদত্ত। ত্যজি ট্রয়ভূমি,
উজানি জলধি ত্বরা, যাও হেথা হতে,
শাসগে স্বরাজ্য তব স্বেচ্ছাচারমতে।
হে দুর্বৃত্ত জানিও তোমারে তুচ্ছ গণি।
কিন্তু এ অস্থায়ী খল-মিত্রতার তব
আর অকারণ এই ঘৃণা অবজ্ঞার
দিব পুরস্কার সমুচিত যথাকালে।
এবে যাও দেখাওগে ভয় তব ভীরু,
নিজ প্রজাগণে ; কিন্তু হেথা জেনো শুধু
মোর অধিকার—করিতে তোমারে মূঢ়
ভয় প্রদর্শন, তব অধিকার মাত্র
হইতে শঙ্কিত। দেব-আজ্ঞামতে

* ১৩০৬ সালের ২রা আষাঢ় শিলঙ্ ভগিনী-সমিতির অধিবেশনে শ্রীমতীসুরধুনী সেন কর্ত্তৃক পঠিত।

লয়ে যাবে ক্রুসিসারে, * উজানি জলধি
তরণী হে মম, কিন্তু অবিলম্বে তুমি
হে গর্ব্বিত অর্পিবারে বন্দিনীরে তব
হও হে প্রস্তুত, নচেৎ বিলম্বে তব
শিবিরে প্রবেশি বলে অধিকার আমি
করিব নিশ্চিত, তব প্রিয় দীপ্তনেত্রা
বৃসিসা † বালারে। ইহা হ'তে মূঢ় তুমি
পাইবে প্রমাণ রাজক্ষমতার মম,
খেদে শত ধিক্ দিবে সে অশুভ ক্ষণে,
যে মুহূর্ত্তে দাঁড়াইলে গর্ব্বে হয়ে স্ফীত
সম্রাটের ক্ষমতাব প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে।
আর ইথে সমবেত গ্রীক যোদ্ধৃগণ
জানিবে নিশ্চয় রাজগণ নহে কারো,
চিরদিন হন তাঁরা, দেবের অধীন।"
ক্ষোভে রোষে আকিলিস হয়ে সন্তাপিত
শুনিলেন নৃপতির মহা স্পর্দ্ধাকর
বাক্যাবলী—শেলসম সুতীব্র শাণিত।
আলোড়িত সিন্ধুসম হৃদয় তাঁহার
হইতে লাগিল নানা ভাবে আন্দোলিত।
প্রচণ্ড দারুণ ক্রোধে কভু বীরবর
অগ্নিসম রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলা ভীষণ।
কভু জ্ঞানবলে বলী দমিলা সে ক্রোধ।
নৃপতিরে সমুচিত দিতে প্রতিশোধ
কভু বীর হইলা উদ্যত, কাল সম
ভীম অসি দৃঢ়-মুষ্টে করি নিষ্কোষিত
ভেদি গ্রীক বীরদলে হানিতে নরেশে।
কভু মৃদু স্বর্গীয় অস্পষ্ট বাণী শুনি
প্রশমিলা তার সেই প্রতিহিংসানল।
এইরূপ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া

* সম্রাট্ আগামেমননের বন্দিনী।
† আকিলিসের বন্দিনী।

হ'তেছিল আন্দোলিত রথীন্দ্র-মানস,
তেজোময় ভীম অসি হয়েছিল যবে
অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত; নির্ব্বাপিতে তার সেই
দীপ্ত রোষানল দেবরাজ যোভ-পত্নী
জুনোর আদেশে তথা মিনার্ভা * সুন্দরী
ত্রিদিব হইতে ত্বরা উত্তরিলা আসি।
আকিলিস আট্রিডিস উভয়ে সতত
সমান স্নেহের পাত্র আছিল তাঁদের
দাঁড়ায়ে পশ্চাৎদেশে আকর্ষিয়ে ধীরে
উজ্জ্বল কনককান্তি কেশজাল তার,
একা আকিলিস্ কাছে আত্ম-পরিচয়
করিলা প্রকাশ; ঘন কৃষ্ণ মেঘজালে
আবরি চৌদিক্ অদৃশ্য রাখিল তারে
সবার নিকটে। হেরি নয়নাগ্নি বীর
চিনিলা দেবীরে। মহা অভিমানে শূর
সহসা তখন এইরূপে সম্বোধিয়া
বলিলা তাঁহারে—"আট্রিয়াস পুত্র হতে
যেই অবিচার সহিতেছি আমি দেবী
সাক্ষী হও তার। যেই আঁখি তব এবে
হেরিতেছে তার এই নিদারুণ স্পর্দ্ধাকর
নীচ ব্যবহার, দেখুক আবার তবে
মোর হস্তে সমুচিত প্রতিফল তার।
বলিয়া এতেক বীর হইলা উদ্যত
মহা রোষ ভরে হায় কাঁপি থর থরি
হানিতে সুতীক্ষ্ণ অসি নৃপতির শিরে।
সুধীর কোমল বাক্যে এরূপে তখন
উত্তরিলা যোভ-কন্যা মিনার্ভা সুন্দরীঃ—
সম্বরহ বীরবর! ত্রিদিব ত্যজিয়া
নির্ব্বাপিতে ক্রোধ তব এসেছি হেথায়।

* মিনার্ভা—বিদ্যা ও রণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দেবরাজের ললাট হইতে সম্ভূতা।

জ্ঞানবলে ক্রোধ তব করহ দমন,
হে বীরেন্দ্র! জেনো ইহা জুনোর আদেশ।
জানিও তোমরা বীর দেবাশ্রিত দোঁহে,
ভর্ৎসহ নৃপে তার কঠোর ভর্ৎসনে।
পালিতে দেবতাদেশ শান্ত মনে এবে
কোষবদ্ধ কর বলী কৃতান্ত সদৃশ
জিঘাংসা-সাধনোদ্যত তীক্ষ্ণ অসি তব,
কারণ হে বীর আমি বলিতেছি স্থির
দেববাণী সত্য বলি করিও প্রত্যয়—
আজি হতমান তুমি, শীঘ্র পুনরায়
অগণিত ধনদানে নৃপতি আপনি
প্রার্থিয়া সাহায্য আর মিত্রত্ব তোমার
করিবে দ্বিগুণরূপে সম্মানিত তোমা।
পালিতে দেবতাদেশ হে বীরেন্দ্র! তবে
দম দীপ্ত ক্রোধ আর প্রতিহিংসানল।
শুনি মিনার্ভার বাণী পিলিডাস তবে
ধরি মৃদু শান্ত ভাব করিলা উত্তর,
"হে দেবী! বচন তব সত্য বলে মানি।
তব উপদেশ-বাণী পালিব সতত,
যদিও কঠিন ইহা তথাপি হে দেবী!
করিব দমন মোর প্রতিহিংসা-তৃষা।
জানি আমি নম্রমনে যেই জন সদা
পালে দেব-আজ্ঞা, আশীষ করেন দেবী
দেবগণ তারে।" বলিয়া এতেক বীর
তেজোময় ভীম অসি স্থাপিল পিধানে,
এদিকে মিনার্ভা দেবী সত্বর গমনে
মহোচ্চ অলিম্পি শৈলে হয়ে উপনীত
মিলিত হইলা পুনঃ দেবগণ সাথে।
কিন্তু তথাপিও আকিলিস-চিত্ত হতে
হইল না বিদূরিত ক্রোধের অনল।
আট্রিডিস পরে ভীম বজ্রস্বরে তবে
গর্জিয়া দ্বিগুণ ক্রোধ করিলা বর্ষণ।

(ক্রমশঃ)

রথ বা মহাবোধি মহোৎসব

(৪১৩ সংখ্যা—৩৯ পৃষ্ঠার পর।)

জনশ্রুতি আছে, জরা শবর (অঙ্গদ) কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ নিহত হইলে পাণ্ডবেরা ঐ চিতা-ভস্মাবশেষ অস্থি নীলাচলে লইয়া গিয়া তাঁহার শব দাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ভিন্নরূপে কথিত হইয়াছে। যথা,—

"ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতিরাত্মনো বিভুঃ।
সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ।
লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলং।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকং।"

ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ৩১ অধ্যায়, ৫, ৬, শ্লোক।

যোগাগ্নি দ্বারা কৃষ্ণের শব দাহ হইয়াছিল, এ কথা ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার অস্থি নীলাচলে ব্যাধ কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। এই হেতু অনুমান হইতেছে যে কৃষ্ণদাস নারদ-সংবাদে বুদ্ধের অস্থিকে কৃষ্ণের অস্থি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। চীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, দেসৌতি রাসৈ লিখিয়াছেন যোগাগ্নিতেই বুদ্ধের শব দাহ হইয়াছিল, সামান্য অনলে তাহা দগ্ধ হয় নাই।

লঙ্কার পালী গ্রন্থে ঐরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

ফা-হেয়র তীর্থযাত্রা পুস্তকের ২১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ত্রিলোকের অগ্নি বুদ্ধ শবদেহকে দাহন করিতে সমর্থ নয়। তাঁহার বক্ষ হইতে যোগাগ্নি সমুত্থিত হইয়া চিতা প্রজ্বলিত করিল এবং সেই অগ্নি সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত জ্বলিয়া দেহ ভস্মাবশেষ করিল।

শ্রীকৃষ্ণের উৎকলে রথযাত্রার কোনও প্রমাণ আছে কি? উৎকল খণ্ডেতে নাই, মাদল পঞ্জিতে তাহা নাই। তবে রথ যে ভগবান্ বুদ্ধেরই শরীর, ইহার কোনও সন্দেহ নাই। বহু পূর্ব্বে উড়িষ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, ধৌলি অনুশাসন লিপি দৃষ্টে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। যে যে স্থানে ভগবান্ বুদ্ধদেবের শরীর নীত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে বৌদ্ধেরা উক্ত শরীরের সম্মানার্থ এক একটী উৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সেই উৎসব অদ্যাপি হইয়া থাকে। *

তাতার দেশের ও শিশিলি দ্বীপের রথের বৃত্তান্ত অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। সিংহলে বুদ্ধের অস্থির উপলক্ষে রথযাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুপণ্ডিত হণ্টার সাহেবও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। †

এ দেশে রথযাত্রা যেরূপ, লঙ্কায় বুদ্ধের দন্ত বা শরীরোৎসব অবিকল তাহাই। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের নির্ব্বাণ হয়। এ দেশে দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা আরম্ভ হয়, লঙ্কাতেও দ্বিতীয়া হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়া থাকে। বঙ্গের ও উড়িষ্যার রথে জগন্নাথকে স্থাপিত করা হয়, লঙ্কায় জগন্নাথের পরিবর্ত্তে বুদ্ধের দন্ত স্থাপিত করা হয়। লঙ্কার অধিবাসিগণ ঐ দন্তকে "দালাদাবহংসি" বলিয়া অভিহিত করেন। আমরা এদেশে রথযাত্রা বলি, লঙ্কার লোকেরা এই উৎসবকে 'দালাদাপেক্কামা' অর্থাৎ দন্তোৎসব বা শরীরোৎসব বলে। প্রায় সর্ব্ব দেশের রথযাত্রার প্রকৃত অর্থ শরীরোৎসব, রথের অর্থ শরীর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রথের বিবরণ পাঠ করিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। হণ্টার সাহেবও এই কথা বলেন। ‡

কোন্ সময়ে বুদ্ধের শরীর লঙ্কায় নীত হইয়াছিল, পুরাতত্ত্বে তাহা প্রকাশিত

---

* "Matsyendra's car festival is as celebrated in Nepal as that of Jagannath."
Journal of Royal Asiatic Society. Vol., XVIII. 394.

† "The Chinese traveller Fa Heau gives a curious account of the yearly procession of the sacred tooth from his regular chapel to a shrine some way off and of its return after a stay there; this was in the fifth century A. D. But the account applies so exactly to the car festival of the present day that one of the most accurate of Indian observers pronounces the latter to be merely a copy. Certain it is that in its leading doctrines the worship of Jagannath bears the impress of the ancient Buddhistic faith.
Hunter's Orissa. I., 132.

‡ "We have seen how Vaisnavism at Puri is but the successor of the older Buddhistic creed."

আছে। লঙ্কা দ্বীপের দন্তবংশ গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। দন্তবংশ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার অনুবাদ ভিন্ন মূল গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য। উক্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে পুরাকালে কলিঙ্গ দেশের নৃপতিগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তৎকালে উৎকল দেশ কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল এবং কলিঙ্গরাজের নিকট হইতে বুদ্ধ দেবের দেহাবশেষ সিংহলে আনীত হইয়াছিল। লঙ্কায় দন্তোৎসবের পুরাবৃত্ত অতি বিস্তীর্ণ। তাহার এ স্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। রথের প্রকৃত পুরাবৃত্ত কি, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। রথটা চক্রবিশিষ্ট বৃহৎ কাষ্ঠময় মন্দির। ইহা কি শকট? শকটের আবার উৎসব কি? ইহার আবার উত্তর ও দক্ষিণে টানিবার মতভেদ কেন? অবশ্যই ইহার কি কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য নাই? তাহা কি? হয় ত আমরা জ্ঞাত নহি। বাহ্য-আড়ম্বরে আসল মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছি। কালে প্রকৃত ঘটনার উপর উপপ্রসঙ্গ আসিয়া জমিয়াছে—সত্যের উপর দৃঢ় আবরণ নিপতিত হইয়াছে। সেই হেতু আসল কথার মর্ম্ম গ্রহ করিতে পারি না। কিন্তু সূর্য্য মেঘাবৃত হইলেও দীপ্তিহীন হন না। এ দেশের বৌদ্ধধর্ম্ম অপসারিত হইলেও প্রাচীনবিবরণ প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। *

আশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত আছে, শববহনার্থ শ্বেত বলিবর্দ্দ-সংযোজিত রথের প্রয়োজন। ঐ রথে শব তুলিয়া সমারোহে দাহস্থানে লইয়া যাইবেক। ঐ রীতি বুদ্ধদেবের সময়েও প্রচলিত ছিল। তাঁহার শব রথে তুলিয়া মহা সমারোহে মুকুটবন্ধন মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ঐ স্থানে শবদাহ হইয়াছিল।

পাঠকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে রথযাত্রা শববহন ব্যাপার। রথে করিয়া শব লইয়া যাওয়া এ দেশের অতি প্রাচীন প্রথা ছিল। বেদেই ইহার প্রমাণ রহিয়াছে, এবং পুরাকালে রথোপরি শব লইয়া যাইবার জন্য মহা সমারোহ হইত। সূত্রপেটকের দীর্ঘ নিকায়ান্তর্গত মহাবর্গ পরিনির্ব্বাণ সূত্রে ভগবান্ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের বিষয় প্রকীর্ত্তিত আছে। তাহাতে জানা যায়; কুশি নগরের উত্তরে সুবর্ণবতী নদীর তীরে উপবর্ত্তন নামে এক শালবন ছিল। তথায় ভগবান্ বুদ্ধের নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। মল্ল ভূপতিগণ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবানের সৎকার কিরূপ হইবে? আনন্দ বলিলেন, চক্রবর্ত্তী রাজার ন্যায়। সেই দণ্ডেই তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। প্রথম দিনে কুসিনগরবাসিগণ নৃত্য গীত ও বাদ্যভাণ্ড সহ সুগন্ধি পুষ্প সকল বর্ষণ করিতে করিতে ভগবানের শবের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরে শবের

* "The corpse is carried on a wheel cart drawn by an animal either a cow or a kid of one colour or a black kid is led behind by a rope tied to its left leg."

Royal As. S. Journal Vol. XVI. 207.

উপর সুন্দর চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া ও তাহার জন্য পটমণ্ডপ সকল নির্ম্মাণ করিয়া উৎসব করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন এইরূপে গেল। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনও এইরূপে অতিবাহিত হইল।

সপ্তম দিনে ৮ জন মল্ল ভূপতি উত্তমরূপে স্নাত ও নূতন বস্ত্র পরিহিত হইয়া মহোল্লাসে ও বিবিধ বাদ্যোদ্যম সহ শব রথে তুলিবার সময় দেখিলেন, শব রথে তোলা অসাধ্য। দুর্ব্বলতা জন্য সকলেই অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া মহামান্য অনিরুদ্ধকে কহিলেন "প্রভো! আমরা দুর্ব্বল নহি। আমাদের দেহে প্রচুর বল আছে, তথাপি ভগবানের শব উত্থিত করিতে পারিলাম না, ইহার কারণ কি?" সুবিজ্ঞ অনিরুদ্ধ বলিলেন, "তোমাদের সঙ্কল্প একরূপ, দেবগণের অন্যরূপ। দক্ষিণ দ্বারে শব নিষ্ক্রমণ তোমাদের ইচ্ছা, উত্তর তোরণ দিয়া নিষ্ক্রমণ দেবগণের ইচ্ছা।" নৃপতিগণ কহিলেন, "দেবের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" ইহা বলিয়া উত্তর দ্বার দিয়া মল্ল ভূপতিগণ মুকুটবন্ধন গৃহে শব লইয়া চলিলেন। উৎকলে রথযাত্রা উত্তরমুখে এবং অন্যান্য স্থানে দক্ষিণাভিমুখে হয়, ইহাই বৈচিত্র্যের মুখ্য কারণ। আর এক কথা, রথে জগন্নাথকে তুলিবার সময় পাণ্ডারা এরূপ ভাণ করেন, যেন জগন্নাথদেব রথে উঠিবার সময় দুষ্টতা করিয়া রথে উঠিতে চাহেন না। পূজকগণ কুপিত হইয়া যথেচ্ছাক্রমে তাঁহাকে প্রহার ও তাঁহার প্রতি গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন, পরে জগন্নাথ রথে চড়েন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লৌকিক ব্যবহারে বুদ্ধদেবের শবদাহ হইলে অষ্টজন ক্ষত্রিয় নৃপতি ভগবানের ভস্মাবশেষ বিভাগ করিয়া লইয়া স্ব স্ব রাজ্যে স্তূপের উৎসব স্থাপিত করেন।

এইরূপে দশটী স্তূপ নির্ম্মিত হয়, এবং তদুপলক্ষে দশটী মহোৎসব করা হইয়াছিল। অধুনা আমরা দেখিতেছি বঙ্গদেশ, নেপাল, তিব্বত, উড়িষ্যা এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে বুদ্ধের ঐ শরীরোৎসব অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তাহা রথ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই রথযাত্রা অথবা শরীরোৎসবের সমস্ত লক্ষণ মহরমে প্রকাশিত আছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে মহরমের কাণ্ড রথেরই ব্যাপার মনে হয়। মহরমের সময় ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ একটা দরগা নির্ম্মাণ করেন, উহা ধাতুগর্ত্ত অর্থাৎ বৌদ্ধ স্তূপ সদৃশ। ইহাও শববহন ব্যাপার। অধিক আশ্চর্য্য যে, রথ দ্বিতীয়া হইতে সর্ব্বত্র আরব্ধ হইয়া দশমীতে শেষ হয়, মহরমে অবিকল তাহাই ঘটিয়াছে। রথের পরিবর্ত্তে তাজিয়া ব্যবহৃত হয়। হিন্দু পর্ব্বের সহিত মহরমের এইরূপ সাদৃশ্য ঘটিবার কারণ কি? চিন্তাশীল লোকের চিন্তনীয়। তাজিয়া যখন রাস্তায় বাহির হয়, তখন বোধ হয় কোন চক্রবর্ত্তী রাজার বিলাস-যান বাহির হইয়াছে। বস্তুতঃ রথও চক্রবর্ত্তী রাজার সর্ব্বলক্ষণে সুভূষিত হয়। আধুনিক লোকে তাহার অর্থ জানে না, তামসিক ব্যাপার মনে করে।

"চতুর্দ্দশরথাঙ্গৈস্তু রথং কুর্য্যাত্তু শীরিণম্।"

উৎকলখণ্ড, ৩০ অধ্যায়।

রথের সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছি, মহাবেদির কথা বলা হয় নাই। ইহা রথেরই নামান্তর। বেদির অর্থ মঞ্চ, অথবা খাট। রথে যে বেদির উপর জগন্নাথদেবকে স্থাপিত করা হয়, ইহাই মহাবেদি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।

"মধ্যে-বেদি সমুচ্ছায়ি চারুমণ্ডপরাজিতম্।"
চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুর্দ্বারং সুশোভিতম্।
নানা বিচিত্রবহুলং হেমপট্টবিরাজিতম্।"

ইত্যাদি।

বৌদ্ধেরা মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন, তাহার আকৃতি জগন্নাথের ন্যায়। শরীরের প্রধান চারি উপাদান জল, মৃত্তিকা, তেজ ও বায়ু। ইহাদের প্রতিরূপ উল্লিখিত স্তম্ভে সূচিত হয়। *

ভগবান্ বুদ্ধদেবের শব মহাসমারোহে মুকুট-বন্ধন মণ্ডপে লইয়া গিয়া দাহকার্য্য সমাপ্ত করা হইলে চিতা ভস্মাবশেষ মহাসমারোহে সমাজগৃহে আনয়ন করা হইয়াছিল। ইহাই পুনর্যাত্রা সন্দেহ নাই।

* Pilgrimage of Fa Heau P. 91.

আত্মার সতীত্ব।

জগতে আদর্শসতী রমণীর যে চিত্র আছে, তাহাতে ৩টী ভাব দেখা যায়—(১) পতিকে একমাত্র আপনার বলিয়া জানা, (২) পতির সহিত প্রেমে এক হওয়া, (৩) পতিকে সুখী করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করা। বিশ্বাস, প্রেম ও সেবা এই তিনটীর সাধন পতিব্রতার জীবনে সম্পন্ন হইয়া তাঁহাকে পবিত্র ও স্বর্গীয়ভাবে বিভূষিত করে। সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী প্রভৃতির চরিত্রে ইহার আশ্চর্য্য বিকাশ দেখা যায়। ঈশ্বর-প্রেমিকেরও লক্ষণ তাহাই। (১) ঈশ্বরকে আপনার বলিয়া জানা, (২) প্রেমে তদ্গত ও তন্ময় হওয়া, (৩) তাঁহার সেবাতে জীবন উৎসর্গ করা।

১। সতীর বিশ্বাস পবিত্র—তিনি স্বামীকে যে চক্ষে দেখেন, আর কাহাকেও সে চক্ষে দেখিতে পারেন না। সতী কোন প্রলোভনে বা ভয়প্রদর্শনে অবিশ্বাসিনী হইতে পারেন না। অশোকবনে সীতা কি ভয়ঙ্কর পরীক্ষাতেই পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এক পলকের জন্যও কি তাঁহার মন রাম হইতে টলিয়াছিল? ঈশ্বর-বিশ্বাসীর মন সেইরূপ ঈশ্বর হইতে টলিতে পারে না। তিনি যে চক্ষে ঈশ্বরকে দেখেন সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রভু বলিয়া, সে চক্ষে সংসারকে কখনও দেখিতে পারেন না। সতীর এই বিশ্বাসেরই বল, ইহাতে তাঁহার জীবন এত গৌরবান্বিত!

২। সতীর প্রেম—সতী পবিত্র-হৃদয়ের ষোল আনা প্রেম স্বামীতে অর্পণ করেন পতিজ্ঞান, পতিধ্যান, পতিতেই আনন্দ। সীতা রামময়, সাবিত্রী সত্যবান্‌ময় এবং দাক্ষায়ণী সতী শিবময় হইয়াছিলেন। শিবের নিন্দাতে সতীর প্রাণত্যাগ কি সম্ভব হইত, যদি শিব তাঁহার মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া না থাকিতেন? শিবনিন্দায় মর্ম্মাহত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। ঈশা আপনার নিন্দা সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু পবিত্রাত্মার নিন্দা অমার্জনীয় বলিয়াছেন। পতিনিন্দা যেরূপ অসহ্য পতির প্রশংসা সেইরূপ উপাদেয়। ঈশ্বরের গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনে ভক্তের চির আনন্দ। ভক্তের নিকট তাঁর নাম প্রাণের প্রিয়তম পদার্থ; নামে ও তাঁতে অভিন্ন; তাঁর সম্পর্কীয় যে কেহ, সকলেই পরমাত্মীয়।

৩। পতির সেবাও পবিত্র সেবা—সামান্য কার্য্য যেরূপ হেলায় শ্রদ্ধায় করা যায়, এ কার্য্য সেরূপ নহে। সতী নারী প্রেমের আগুনে আপনার প্রাণ গলাইয়া পতির চরণে অর্পণ করিয়াছেন, ঈশ্বরপ্রেমিকও আপনার প্রাণ গলাইয়া তাঁর চরণে মাথাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁর নিজস্ব কিছু নাই, তিনি আপনাকে হারাইয়া পতির সুখের জন্যই ব্যস্ত। আপনার সুখ কি?—পতির সুখ সাধন। দুঃখ কি?—পতির সুখের হানি। তিনি আপনার এমন কিছু রাখেন না, যাহাতে পতির কিছুমাত্র ক্লেশ হইতে পারে। পতির প্রতি এই যে দরদ, ইহাই প্রেমিকের-হৃদয়কে পবিত্র রাখিবার প্রধান প্রবর্ত্তক। পতিকে সুখী করিবার জন্য তিনি আপনার সকল সুখে জলাঞ্জলি দেন এবং দুঃখের গুরুভার মস্তকে আনন্দে বহন করেন। সে ভারে নিষ্পেষিত হইয়া যদি তাঁহার প্রাণ যায়, তাহাতেই তাঁহার পরমানন্দ। পতিকে সুখী করিবার জন্য সাধ্বী সতী কি না করেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তের অসাধ্য কিছুই নাই। বিশ্বাস, প্রেম এবং সেবার পূর্ণতা সাধনেই সতীত্ব ধর্ম্ম পালন হয়, ইহাতেই ব্রহ্মসাধনাব্রতেরও উদ্‌যাপন হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের নামাবলী।

(৪১৩ সংখ্যা—৪৯ পৃষ্ঠার পর)

আ—আকর, আকারহীন বা আকৃতিহীন, আকাঙ্ক্ষাবিহীন, আকাশ, আকাশাতীত, আকিঞ্চনধন, আকুল-প্রাণ-সান্ত্বন, আগমনিগমাতীত, আচণ্ডাল-বন্ধু, আচার্য্য-প্রবর, আচ্ছাদক, আঢ্য, আতুরশরণ, আত্মজ্ঞ, আত্মভূ, আত্মস্থ, আত্মা, আত্মারাম, আত্মীয় হ'তে পরমাত্মীয়, আর্ত্ত-বন্ধু, আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক, আদরের ধন, আদি, আদিকারণ,

আদর্শ, আদিত্যবর্ণ, আদিনাথ, আদিগুরু, আদিপিতা, আদিপ্রভু, আদিমাতা, আদ্যে-শ্বরী, আদ্যমহেশ, আদেষ্টা, আধার-আধেয়, আধ্যাত্মিক-যোগলভ্য, আনন্দ, আনন্দ-ঘন, আনন্দজ্যোতিঃ, আনন্দ-নিকেতন, আনন্দময়, আনন্দময়ী মা, আনন্দরূপ, আনন্দসাগর, আনন্দার্ণব, আনন্দপ্রস্রবণ, আনন্দনন্দনন্দ, আপদুদ্ধারণ, আপৎখণ্ডন, আপন্নশরণ, আপূরণ, আপ্ত, আপ্তকাম, আবা, আবরণ, আভরণ, আব্রহ্মস্তম্বাবলম্বন, আমরণবন্ধু, আমিত্ব-নাশন, আমার আপ-নার, আয়ুঃ, আয়ুষ্কর, আয়ুষ্মান্, আয়ুর্দ্দাতা, আয়াসলভ্য, আরম্ভ, আরম্ভক, আরাধ্য, আরাধ্যতম, আরাধিতপদ, আর্য্য, আরাম-স্থান, আলোকময়, আল্লা, আশাপূরণ, আশুতোষ, আশীর্ব্বাদক, আশ্চর্য্যরূপ, আশ্চর্য্য-কীর্ত্তি, আশ্চর্য্যশক্তি, আশ্রমসখা, আশ্রয়, আশ্রয়দাতা, আশ্রিতপালক, আশ্রিতবৎসল, আশ্বাসদাতা, আসন্ন-কালৈকশরণ, আসেচনক, আহ্লাদন।

ই—ইচ্ছাময়, ইতি, ইতরেতরজন-নিস্তারণ, ইন্দ্রপতি, ইন্দ্রিয়াতীত, ইন্দ্রিয়া-গ্রাহ্য, ইষ্ট, ইষ্টদেব, ইহপরলোকগতি, ইহামুত্রফলবিধাতা।

ঈ—ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর, ঈশ্বরদিগের পরমমহেশ্বর, ঈশ্বরী, ঈপ্সিতধন, ঈর্ষ্যা-দ্বেষবিহীন।

উ—উচ্চতম, উজ্জীবক, উৎকণ্ঠাহারী, উৎপাতনাশন, উৎসবেশ, উত্তরসাধক, উত্তাপহরণ, উদগ্র, উদার, উদ্দেশ্য, উদ্দী-পক, উদ্বোধক, উদ্ভাবক, উদ্ধারক, উদ্ধার-কর্ত্তা, উদ্দাম-রিপুকুলদলন, উত্তম, উত্তম-তম, উৎকৃষ্টতম, উপায়, উপাদেয়, উন্মাদক, উপজীব্য, উপদেষ্টা, উপকারী, উপাধিহীন, উপভোগ্য, উপমারহিত, উপাস্য, উন্নতি-সোপান, উরশ্ছদ, উল্লাসক।

ঊ—ঊর্দ্ধতম, ঊর্দ্ধদেব।

ঋ—ঋজুতম, ঋতধামা, ঋদ্ধ, ঋদ্ধিদাতা, ঋত্বিগ্‌বর, ঋতুপতি, ঋষিবন্দন।

এ—এক, একতম, একসত্য, এক-মেবাদ্বিতীয়ং, একশক্তি, একগুরু, একদৃক্, একাগ্রসাধনলভ্য, একায়ন, একাধিপ, একযন্ত্রী, একনিয়ন্তৃ, একযোগ-বন্ধন।

ঐ—ঐকান্তিকীভক্তিলভ্য, ঐক্যবন্ধন, ঐশ্বর্য্যদাতা, ঐশ্বর্য্যবান্, ঐহিকপারত্রিক শুভবিধাতা।

ও—ওঁ, ওঙ্কারসাধনধন, ওঙ্কার প্রতি-পাদ্য, ওজস্বী, ওষধীশাধীশ।

ঔ—ঔপনিষদ, ঔদার্য্যময়, ঔপম্যহীন, ঔষধোত্তম, ঔৎসুক্যকারণ।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার মিউনিসিপাল বিল লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘোরতর তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। এ দিকে গবর্ণ-মেণ্ট কমিসনারদিগের উপর দোষারোপ করাতে ২৮ জন মনোনীত কমিসনর এক-কালে পদত্যাগ করিয়াছেন।

২। ২৪ পরগণার জেলা বোর্ড মগরা হাট হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত বাষ্পীয় ট্রাম গাড়ী চালান মঞ্জুর করিয়াছেন। বরণ কোম্পানী কার্য্য ভার লইতেছেন।

৩। ফিলিভিন নামক সাহেব এক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে বিনা কালীতে ছাপার কাজ চলিবে।

৪। পাণ্ডুয়া নগরের ভগ্নাবশেষ সংরক্ষণ জন্য ছোট লাট ৩০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৫। ভারতের অন্যতম সু-সন্তান বাবু রাজনারায়ণ বসু গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বৈদ্যনাথে ৭৩ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি দেশের ধর্ম্ম, নীতি, বিদ্যা ও সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতির পরম সহায় ছিলেন। এরূপ ব্যক্তির বিয়োগে ভারত যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।

৬। পৃথিবীতে য়িহুদী সংখ্যা ১ কোটী ১০ লক্ষ, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক রুসিয়াবাসী।

৭। ইংলণ্ডেশ্বরীর সর্ব্বপ্রাচীন সামরিক কর্ম্মচারী সার আর্থার কট্ ৯৬ বৎসর বয়সে পরলোক-গত হইয়াছেন। তিনি ভারতে প্রায় ৪৫ বৎসর ছিলেন, ১৫ বৎসর বয়সে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে গমন করেন।

৮। লণ্ডনে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা দুগ্ধ হইতে বোতাম প্রস্তুত হইতেছে, ইহা সাদা হাড়ের বোতামের মত, কখনও বিবর্ণ হয় না; দর সস্তা!

৯। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। তুরুস্কের সুলতান গাঢ় লাল, জর্ম্মণ সম্রাট্ নীল ও লাল, অষ্ট্রীয় সম্রাট ধূসর বর্ণ, রুস সম্রাট্ গাঢ় হরিৎ বর্ণ এবং ইটালীর রাজা কৃষ্ণবর্ণ ভাল বাসেন। গ্রীসের রাজা কোনওরূপ গাঢ় বর্ণ দেখিতে পারেন না।

১০। জাপানে ২০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতী দেশালাই প্রস্তুত হইত না। ১৭৭৮ সালে ৫ হাজার টাকার দেশালাই প্রস্তুত হয়। গত বর্ষে ৫৫ হাজার টাকার দেশালাই প্রস্তুত হইয়াছে। এজন্য এখন ২০০টী কলে ৬ হাজার লোক খাটিতেছে।

১১। ইংরাজগণ নৌ-সমরের জন্য প্রায় এক সহস্র সংবাদবাহী কপোত শিক্ষিত করিয়াছেন। ইহারা প্রায় ৫০ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত দৌত্যকার্য্য করিতে সমর্থ।

১২। গত ৩১এ শ্রাবণ ডাক্তার কানাই-লাল দে রায়বাহাদুর পরলোক-গত হইয়াছেন। ইনি রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য দেশবিদেশে বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন।

১৩। কাশীর স্বর্গগত ভাস্করানন্দ স্বামীর গদীতে প্রকাশানন্দ স্বামী এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর গদীতে গঙ্গারাম স্বামী অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

১৪। ডায়মণ্ড হারবরে "রেজোলিউট" ও "সিন্ধিয়া" নামক দুই জাহাজের পরস্পর সংঘর্ষণে প্রথমোক্ত জাহাজের অনেকগুলি লোক জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছে।

১৫। বাবু রজনীনাথ রায় কিছুকালের জন্য কণ্ট্রোলার জেনারল পদে উন্নত

হইয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে এ ক্ষেত্রে এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

১৬। কুচবিহারের মহারাজা বাবু প্রশান্তকুমার সেন এম এ কে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ ৮ হাজার টাকার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭। লক্ষ্ণৌ নগরে কংগ্রেসের আয়োজন উৎসাহ-সহকারে হইতেছে। সরকারী এক বৃহৎ ভূমিখণ্ডে ২৫০ ফিট দীর্ঘ ও ১২৫ ফিট প্রশস্ত পাণ্ডাল নির্ম্মিত হইবে। বেরেলীতে ২ হাজার চেয়ার ও লক্ষ্ণৌয়ে ১২০০ খাট প্রস্তুত হইতেছে।

১৮। বনগাঁর টিকেট কলেক্টর কোনও রমণীর প্রতি অত্যাচার করণ অভিযোগে দোষী সপ্রমাণ হওয়াতে ৩ মাস কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

১৯। আসামের রাজধানী শিলং শৈলে কোন লেডী ডাক্তার বা শিক্ষিত ধাত্রী নাই। এই সম্বন্ধে সম্প্রতি সেখানে দেশীয় মহিলাগণের একটী সভা হইয়াছিল। এই অভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা তত্রত্য চিফ কমিশনরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। সহৃদয় কটন সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

২০। কটকের লবণ বিভাগের আসিষ্টেণ্ট কমিশনরের পত্নী এককালে তিন সন্তান প্রসব করিয়াছেন, ২টী পুত্র ও ১টী কন্যা; তিনটীই জীবিত আছে।

২১। কম্বারল্যাণ্ডনিবাসী জোসেফ ওয়েবের সন্তান সন্ততি ১৯টী, পৌত্র ও দৌহিত্র ১৭৫ এবং প্রপৌত্র ও প্রদৌহিত্র প্রায় ১০০ একশত। এরূপ পরিবার দুর্লভ।

২২। দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভাল-বাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের এক মহা যুদ্ধ অবশম্ভাবী হইতেছে। কুচবেহারের মহারাজা এই যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

২৩। কলিকাতা তালতলাবাসী ডাক্তার শীতল চন্দ্র পাল যক্ষ্মাদি রোগের এক অব্যর্থ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছেন। ৫-৬ টাকা মূল্যের এক বোতল ঔষধ দ্রাণ দ্বারা রোগ আরোগ্য হয়, অনেক কৃতবিদ্য লোক এরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন। ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ ডাক্তার, ২৫ বৎসর চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন।

২৪। আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের মৎস্যে সূতার ন্যায় এক প্রকার পোকা পাওয়া গিয়াছে। ডিব্রুগড়ের ডাক্তার সাহেব মৎস্যে ঐ পোকা দেখিয়া উহা বিড়ালকে খাওয়ান, তাহাতে বিড়ালটী রোগাক্রান্ত হয়। মানুষের পেটে যে ক্রিমি হয়, ঐ পোকা সেই জাতীয়। অপক্ব অবস্থায় ঐ সমস্ত মৎস্য খাইলে পেটে ক্রিমি হয়। আসামের অধিকাংশ লোকের পেটে ক্রিমি আছে, তাহাতে তাহাদিগকে সর্ব্বদা কষ্ট পাইতে দেখা যায়। জীব-হিংসায় অনেক কুফল।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সাবিত্রী-চরিত্র — শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম, এ, প্রণীত, মূল্য ৶০ মাত্র। মহাভারতে বর্ণিত সাবিত্রী উপাখ্যান বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ ও প্রচার করিয়া সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অনুবাদ অতি সরল ও সুমিষ্ট হইয়াছে। আদর্শ সতী সাবিত্রীর চরিত্র প্রত্যেক বঙ্গরমণীর পাঠ্য বলা বাহুল্য।

২। পরিমল-পাঠ — শ্রীপরেশলাল মহলানবিস প্রণীত, মূল্য ।/০ আনা। এই পুস্তকের বিষয় গুলি যেমন সুনির্ব্বাচিত, ইহার রচনা সেইরূপ সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে লেখকের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

৩। মহাপুরুষ—শ্রীপরেশলাল মহলানবিস-প্রণীত, মূল্য ।৶০ আনা। মহাপুরুষ ভীষ্মের জীবনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা বালকদিগের নীতি-শিক্ষার উপযোগী

৪। সুশীলা বালা—শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত, মূল্য ।৶০ আনা। উপন্যাসচ্ছলে একটী আদর্শ বালিকার ছবি চিত্রিত হইয়াছে। লেখা সরল ও হৃদয়গ্র ইহা স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে গণনীয়।

৫। প্রেম-গাথা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তৌফি প্রণীত, মূল্য ১।০। লেখিকা আমাদের পাঠিকাগণের বিশেষ পরিচিতা এবং মর্ম্মগাথা কাব্য প্রচার করিয়া সাহিত্য-সংসারে যশস্বিনী হইয়াছেন। প্রেমগাথায় তাঁহার হৃদয়ের বিচিত্র ভাব কবির তূলি-কায় চিত্রিত করিয়া আপনার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। লেখিকা উৎসাহ-লাভের যোগ্যা।

বামারচনা।

শারদ-গীতি।

বিগত প্রাবৃট ! শরতের আবির্ভাব !
নবীনা দামিনী-ছটা গিয়াছে ফুরায়ে
জেগেছে জগতে এক ভাব অভিনব !
বারিদ সুনীলাকাশে গিয়াছে মিলায়ে
মধুরে শারদ-গীতি গাইছে অবনী,
ঝুলিছে কৌমুদী-লেখা নিথর গগনে ;
ধৌত করি মানবের পঙ্কিল পরাণী,
জ্বালিছে স্নিগধ আলো আঁধার জীবনে !
সংসার-সন্তাপ-দগ্ধ মানব-পরাণ
এ বিশ্বে কোথাও যদি চাহে শান্তি-নীর,
শারদ-চন্দ্রিমা সনে মিশাইয়ে প্রাণ,
চঞ্চল মানস কেন করে না সে স্থির ?
সুধার শরদাগমে মাতিছে জগৎ ;
গাহিছে অনন্ত বিশ্ব আনন্দ সঙ্গীত !

বহিছে অমৃত-ধারা নদী-স্রোতবৎ ;
সে আনন্দে—সুধাসারে ভুবন প্লাবিত !
প্রশস্ত—সুদৃশ্য নীল চন্দ্রাতপ-তলে
সাজিয়ে বিমল বেশে মানব-মণ্ডলী,
মোহিয়ে পবিত্র ভাবে, শরতের কোলে,
গাও বিশ্ব-নিয়ন্তায় 'জয় জয়' বলি !

শ্রীঅন্নদা সুন্দরী ঘোষ।

জন্মদিন।

(১৩ই কার্ত্তিক—১৩০৫ সাল)

ছুটায়ে স্নেহের নদী, স্নেহের তরঙ্গ রাশি,
হাসায়ে নিখিল ধরা, বিমল জোছনা হাসি ;
মরমের প্রতি বৃন্তে ফুটায়ে গোলাপ দল,
পরাগে পরাগে ঢালি স্বরগ-শিশির-জল ;—
এসেছ সাধের গেহে, একটি বরষ সবে,
সুখের নন্দন ছাড়ি, সুখ দুঃখ ভরা ভবে।
যদিও আঁধার হৃদে জ্বেলেছ আলোক মালা,
করেছ কুটীর খানি প্রীতির পীযূষ ঢালা ;
অবশ বিবশ মনে ঊষার জীবন্ত ছবি,
ফুটায়েছ যতনে প্রভাতের নব রবি ;
বিধাতার বররূপে আলস্য ক'রেছ দূর,
ভুলায়েছ স্বার্থরাশি বিলাস করেছ চুর ;
স্বরগ-পাপিয়া সম মধুর কাকলী স্বরে,
উঠাতে ঊষার কালে শিখায়েছ ভাল করে ;
যদিও খেলার সাথী, বিষাদে অমিয়া রাশি,
শান্তির কমল তোর ও সরল চারু হাসি ;
তথাপি মানস পটে একটি বিষাদ রেখা,
ক্ষীণালোক ভাতিসম রয়েছে অফুটে লেখা ;
দিতে না পারিব তোমা ত্রিদশের চিরসুখ,
হেথা না হেরিতে পাবে দেব অকলঙ্ক মুখ !
এত যাদুমণি তোর অমর আলয় নয়,
পুষ্পে কীটসম হেথা হরষে বিষাদ রয় !
মায়ের কোমল প্রাণ তাই সদা আকুলয়,
স্বরগের মণি পাছে মরতে মলিন হয় !

আজি এ বিশেষ দিনে দেবতার পদতলে,
মাগে বর মাতা তোর তিতিয়া প্রীতির জলে ;—
সংসারের অনাহত, অনাঘ্রাত আজীবন,
রাখুন করুণাময়, তোমারে—স্নেহের ধন !
জননী আশীষে বাছা ! বিপদ অরাতি রাশি,
সংসারের ভীমরণে অরিন্দম সম হাসি,
আনন্দে বিজয় কর, দেবাশীষে অনায়াসে,
মাতুক ধরণীতল পুণ্যের বিমল বাসে !
সুবিদ্বান্, কৃতিমান্, পরমেশ-ভক্ত হও,
স্বদেশ-মঙ্গলব্রতে চির তরে রত রও।
যাক্ এ বরষ তোর বালাই কুড়ায়ে নিয়ে,
শত শত শুভ শিব পলে পলে ঢেলে দিয়ে !
কি আর বলিব বাছা ! একটি বরষ ধরে
যাঁহার করুণা রাশি রক্ষিল এ গেহে তোরে,
শীতল অমৃত কণা তুই রে প্রসাদ যাঁর,
সঁপিনু আকুল প্রাণে তাঁরি হাতে তোর ভার !
জীবন-আলোকে মম উজলুন বিশ্বনাথ,
করুণ অমল হৃদে দেবভাব প্রতিভাত।
প্রণমি ভকতি ভরে সে অতুল শ্রীচরণ,
যুড়ি দুটি কচি কর, লয়ে ক্ষুদে শুভ্র মন,
মার সাথে প্রণিপাত কর সে অনন্ত পায়,
আশীষ করুন তিনি মাতা সুত দুজনায়।

প্রার্থনা।

কি আর চাহিব নাথ
সকলি দিয়াছ তুমি,
দিয়াছ এ ধরাধামে
নামায়ে স্বরগ ভূমি।
যে দিকে নেহারি আমি,
তব প্রেম দেয় দেখা,
অণুতে অণুতে জাগে,
তোমারি হস্তের লেখা।
প্রাণময় প্রাণরূপে
জীবিত করিছ কায়া,
তব প্রেমে পাই হেথা
জনক জননী জায়া।
আকাশের গায়ে দেখি
উজ্জ্বল কাঞ্চন রবি,
নয়ন সার্থক করি
নেহারিয়া বিশ্ব ছবি।
ঢেলেছ সৌন্দর্য্য তব,
ফুটন্ত কুসুম পরে,
সুধা ঘ্রাণ দিয়া তায়,
রেখেছ অমিয়া ভরে।
ঢেলেছ বিহগ কণ্ঠে,
মধুর ললিত তান,
গাহিছে বসিয়া শাখে
তোমারি সুযশ গান।
অভ্রভেদী হিমালয়
তুষারে আবৃত থাকি,
প্রকাশে মহিমা তব,
আপনা জাগায়ে রাখি।
সুনীল সাগর ওই,
অনন্তে প্রসারি কায়,
অবিরত ওহে নাথ,
তোমারি মহিমা গায়।
কুপুত্র সুপুত্র যত,
লও তব স্নেহ কোলে;
অধম পতিতে তার,
তুমি দয়াময় বলে।
দীন হীন ক্ষুদ্র আমি,
কি আছে শকতি মম,
গাহিতে মহিমা তব,
সুকণ্ঠে, সুকবি সম।
সকলি পেয়েছি নাথ
তোমার করুণা ব'লে,
অধমে রাখিও সদা
পবিত্র চরণ তলে।
সুখ দুঃখ সম্পদেতে
যখন যে ভাবে থাকি,
নিয়ত তোমারে যেন,
হৃদয় মাঝারে রাখি।
মুহূর্ত্তের তরে প্রভো
তোমায় না ভুলে যাই;
জীবন ভরিয়া যেন
তোমার মহিমা গাই।

"রমেশ বিয়োগে।"

আজি যে তমসাচ্ছন্ন ভারত আনন,
মায়ের অঞ্চল ছাড়ি,
ভব মায়া পরিহরি
চলি গেলা স্বর্গ-ধামে রমেশ রতন!

(হায়!) আজি যে আঁধারে মাথা
ভারত-আনন।
জিনিয়া জীবন রণে
মহাপ্রাণ নিজগুণে
পাইলা স্বদেশ মাঝে স্বর্ণ সিংহাসন।
(হায়!) আজি যে তমসাচ্ছন্ন ভারত
আনন।
নিজগুণে সুবিচারি
গৌরব মুকুট পরি
ন্যায় তুলাদণ্ড যবে করেছ ধারণ—
রাজারে চাহিয়া প্রজা দলনি কখন!
একে একে একে হায়!
সব ধন চলে যায়,
কি সুখে মা জন্মভূমি ধরিবে জীবন?
কে আর ঢালিবে দীপ্তি আননে এমন?
কত লোক আসে যায়,
কেহত না ফিরে চায়
কে আছে পরার্থপর তোমার মতন?
অযুত ধূলির মাঝে কৌস্তুভ রতন।
হিংসা দ্বেষে পরস্পরে
খণ্ড খণ্ড যবে করে,
অভেদ অপক্ষপাত বিচারে-তখন
করিয়াছ অলঙ্কৃত বিচার আসন!
কাম ক্রোধ মোহ লোভ
মুক্ত সর্ব্ব বিধ ক্ষোভ
শান্ত সৌম্য স্নিগ্ধ যেন ন্যায় মূর্ত্তিমান্!
ভারতে নাহিক কেহ তোমার সমান!
" জলধির তল চির আঁধারে মগন,
বৈজ্ঞানিক দীপ যথা
আলোকিত করি তথা
অত্যল্প আয়াসে নিম্নে করিছে গমন,
অদ্ভুত প্রতিভা তব তাহারি মতন!
অতি সূক্ষ্ম জ্ঞান লয়ে
জটিল সমস্যা চয়ে,
নিঃশঙ্কে হেলায় করিয়াছ উদ্ঘাটন।
কে পাইবে জ্ঞানপূর্ণ মস্তিষ্ক এমন?
ধবল গিরির মত
শুভ্র যশে বিমণ্ডিত
হিমালয় সম উচ্চ প্রশস্ত জীবন!
হায়! সে গিরির চূড়া ভাঙ্গিল শমন।
(তাই,) আজি যে আঁধার মাথা ভারত
আনন!
সর্ব্বস্ব করিয়া ত্যাগ
চলিছেন মহাভাগ
যথায় অমরাবতী নন্দন কানন,
জুড়াইতে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ প্রাণ মন!
কাঁদ তোরা বঙ্গবাসী
কি কাজ বলনা হাসি,
কি সাধে হইবি আর হরষে মগন?
ডুবিল তোদের চির গৌরব তপন!
শ্রীকুসুম কুমারী রায়।

বৈতরণী-নদী।

বৈতরণী তব নাম শুনেছি মা কত!
আজি তব রূপ হেরি,
চক্ষু পালটিতে নারি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে নেহারি সতত।

বৈতরণী বৈতরণী! মহাতীর্থ তুমি,
তোমারে যে হয় পার,
যম ভয় নাহি তার,
গঙ্গা-মৃত্তিকার সম পূত তট-ভূমি!
মৃদু স্রোত ভরে কর মৃদু কুল্ কুল্,
ম্লান-সন্ন্যাসিনী বেশে
ফিরিতেছ দেশে দেশে,
স্বর্গের অপ্সরা তুমি মরতেতে ভুল্।
বৈতরণী মা আমার মহা-পুণ্যবতী,
শরীরে সামান্য সাজ,
সর্ব্বদা মহৎ কাজ,
ধীরা স্থিরা সুগম্ভীরা শুদ্ধশান্তমতি!
তব তীরে যেই জন ধান্য দান করে,
গোদান প্রভৃতি দান,
করে যেই ভাগ্যবান্,
অনায়াসে স্বর্গধামে পশে সে অচিরে।
বৈতরণী * তীরে আর যাইতে না হয়,
না থাকে তাহারে আর
শমনের অধিকার,
ভুগিতে না হয় আর দুস্তর নিরয়।
পরহিতে বৈতরণী দিয়েছ শরীর,
তব নীরে করি স্নান,
হয় সবে পুণ্যবান্,
আগ্রহে সকলে তাই স্পর্শে তব নীর।
ধবল-বরণা নদী ধীরে প্রবাহিত
হও তুমি নিশি দিন,
তরঙ্গ ভ্রূকুটিহীন,
বুকভরা বীচিমালা করিছে সজ্জিত!
ধীর-সমীরণ যেন সম্ভ্রমে সম্ভ্রমে,
রাকা-শশী হাসি হাসি,
সারা নিশি যায় ভাসি,
জ্বলন্ত নক্ষত্র জ্যোতি জ্বলয় সরমে।
কে গো দেবী বৈতরণী জননী সমান
শ্রান্তিহীন অহরহ,
যাচিয়া দিতেছ স্নেহ,
করিছ দুর্ব্বল-প্রাণে মহা-শক্তি দান?

শ্রীঅম্বুজা।

* কথিত আছে যমরাজ জীবাত্মাকে পৃথিবী হইতে আপন ভবনে লইয়া যাইবার সময় বৈতরণী নদী পার করাইয়া লইয়া যান। উড়িষ্যার বৈতরণী পার হইলে আর সে বৈতরণী পার হইতে হয় না।

"রাখিবন্ধন"

(মাননীয়া ভগিনী শ্রীমতী নিকুঞ্জকামিনী
দেবী মহাশয়াকে প্রীতি উপহার)।

বরষার ধোয়া চাঁদ উঠেছে গগনে,
ডুবেছে ধরণীতল ও শুভ্র কিরণে;
ফুটেছে চামেলী বেলী, কেতকী চাঁপার কলি,
সেফালি মালতী কত, ফুটিতেছে অবিরত,
টগর রজনীগন্ধা শুভ্রবেশ ধরি,
আরো-কত-শত-ফুল ফুটেছে আ মরি।
বহিছে দখিনা বায় ফুলরেণু মাখি,
ছড়াতেছে দিগন্তেতে সুবাস তাহারি;
নাচাতেছে ফুলদলে, মৃদু মন্দ তালে তালে,
পড়িতেছে ঢলে ঢলে ফুলদল শাখা'পরে,

সোহাগ-আবেশে হাসে গালভরা হাসি,
গগনে দেখিয়ে তারা পূর্ণকলা শশী।
কানায় কানায় নদী উঠেছে ভরিয়া
(যেন) ধরিবারে শশধরে যেতেছে ছুটিয়া;
খাল বিল যে যেথানে, ছিল সবে শুষ্ক প্রাণে,
ছুটেছে এখন তারা, হইয়া আপন হারা,
পাইয়া নূতন জল নূতন জীবন,
নবীন উৎসাহে ধায় নীরব পরাণ।

ফুটিয়াছে সরোজিনী হ্রদ আলো করি,
কুমুদ কহ্লার কত ফুটে চারি ধারে;
কত মধুকর এসে, ধাইছে মধুর আশে,
গুন্ গুন্ গুন্ রবে, ঘোষিছে জগতে সবে,
পবিত্র মঙ্গল আজি "রাখি-বন্ধন্"
পাপিয়াও কুহু স্বরে করিছে ঘোষণ।

"রাখি পূরণিমা" আজ তাই কি এ ঘটা?
প্রকৃতি-ভাণ্ডারে এত সৌন্দর্য্যের ছটা?
তাই কি কুসুমদল, হাসিতেছে ঢল্ ঢল্,
কোকিল পাপিয়া তারা ঢালিছে সুধার ধারা,
কুল্ কুল্ তানে নদী ধায় অবিরত,
প্রকৃতি উৎসবময়ী তাই কিগো এত?

প্রকৃতির আজি এই মহোৎসব সনে,
বাঁধিতে এসেছি "রাখি" সুদৃঢ় বন্ধনে,
আয় বোন্ প্রাণে প্রাণে,মিশে যাই একসনে,
কঠিন সংসারাঘাতে, ভাঙ্গেনা কখন যা'তে
করিব এমন পণ জীবনে মরণে,
মরণেরও পরপারে রব প্রাণে প্রাণে।
ভক্তি প্রীতি স্নেহ ডোরে বাঁধিব যতনে,
কি ছার পার্থিব বস্তু নশ্বর ভুবনে।
ভক্তি প্রীতি, প্রেম দিলে, স্নেহ ভালবাসা মিলে,
এ মন্ত্র সাধন করে, যেন যেতে পারি চলে,
(যেন) পার্থিব দেহের সনে ভুলি না কখন,
আয় বোন্ প্রাণে প্রাণে করিব বন্ধন।
চির দিন বেঁধে রেখো তব স্নেহ পাশে,
ভুল না কখন, দিদি জীবনেরও শেষে;
ছোট এ বোনের পরে, দিও দিদি স্নেহ ঢেলে,
সবার উপরে যিনি, আছেন অন্তরযামী,
শুভাশীষ আজ তিনি করুন্ বিধান,
চির-স্নেহে বাঁধা থাক্ আমাদের প্রাণ।

৫ই ভাদ্র ১৩০৬ — আপনার স্নেহের ভগিনী বিরাজমোহিনী বসু। মেদিনীপুর।

গ্রাহকদিগের প্রতি।

শারদীয় পূজা সমাগত। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ এ সময় স্মরণপূর্ব্বক বামাবোধিনীর দেয় মূল্য প্রেরণ করিলে আমরা নিতান্ত উপকৃত হইব বলা বাহুল্য। বামাবোধিনীর জীবন রক্ষা ও উন্নতির জন্য ইহার শুভাকাঙ্ক্ষী সকল মহোদয় ও মহোদয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন, ইহা অবশ্যই আশা করিতে পারি।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়, ১৩০৬, ১লা আশ্বিন। — শ্রীপ্রিয়নাথ সরকার, প্রঃ কার্য্যাধ্যক্ষ।

No. 418-19. December, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৩৭ বর্ষ। ৪১৮-১৯ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩০৬। | ৬ষ্ঠ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ উৎসব—গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ গৃহে ৬৬ সাংবৎসরিক স্মরণার্থ উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। রেবরেণ্ড ফ্লেচার উইলিয়মস্ সভাপতির কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করেন এবং রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, বাবু মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু আনন্দমোহন বসু, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, মৌলবী কাসিম ও বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। সভার আরম্ভে ও শেষে রাজার রচিত দুইটী সংগীত গীত হয়। ভারতের অন্যান্য স্থানে এবং বিলাতেও এই উপলক্ষে উপাসনা বক্তৃতাদি হইয়াছে।

বাঙ্গালী সিবিলিয়ান—জজ্ কে, এন্ রায়ের ২য় পুত্র যতীন্দ্রনাথ রায় এবং আরও কয়েকটী বাঙ্গালী সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মধ্যভারতে নূতন আয়োপায়—এ প্রদেশে অসংখ্য খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে, এতকাল তাহা হইতে তাড়ী প্রস্তুত হইত। বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম এর উদ্যোগে এই সকল খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে উত্তম গুড় প্রস্তুত হইতেছে। ৫০,০০০ টাকা মূলধন লইয়া এই গুড়ের একটী কারবার খুলিবার সূচনা হইয়াছে।

শান্তি সমাচার—ইউরোপের শান্তিসমিতির ম্যাডাম সেলেস্কা জগতে শান্তি স্থাপনের সহায়তার জন্য ইউরোপীয় মহিলাদিগের সহিত যোগদানার্থ ভারত-

মহিলাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। বঙ্গ রমণীরা আর কিছু না পারুন, ভগবানের নিকট এই মহৎ উদ্দেশে প্রার্থনা করুন্।

ট্রান্সভাল যুদ্ধ—ইংরাজদিগের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারদিগের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এ জন্য অকালে পার্লেমেণ্টের বোধন হইয়াছে।

খণ্ডপ্রলয়—(১) গত ২৪এ সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিঙে অতিবৃষ্টি হেতু পাহাড়ের কতক অংশ ধসিয়া যায়, তাহাতে প্রায় ৫০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। (২) এই সময়ে জলস্রোতে ভাগলপুর অঞ্চলের ৩০টীর অধিক গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রায় দুই হাজার মনুষ্য ও অসংখ্য গো মহিষাদি বিনষ্ট হইয়াছে। (৩) প্রশান্ত মহাসাগরে ভূমিকম্পে এক দ্বীপ জলমগ্ন হওয়াতে প্রায় ৪০০০ লোক মারা গিয়াছে।

মৃত্যু—মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গুণবতী ভার্য্যা পরলোকগতা হইয়াছেন। ইনি রাজপ্রাসাদের রাজলক্ষ্মী ছিলেন।

কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন—নগরবাসীদিগের ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন ইংরাজরাজ অনুগ্রহপূর্ব্বক ভারতবাসীদিগকে যে আত্মশাসনের অধিকার দিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাহার বিলোপ হইল।

ড্রেফোঁর মুক্তি—ফরাসীদিগের বিচারে কাপ্তেন ড্রেফোঁ কারারুদ্ধ হওয়াতে সভ্যজগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল এবং পারিসে বিংশ শতাব্দীর সমাগম স্মরণার্থ যে মহোদ্যোগ হইতেছিল, তাহা ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। ড্রেফোঁর মুক্তিতে সে আশঙ্কা ঘুচিয়াছে।

অনাথাশ্রমের উন্নতি—কলিকাতা অনাথাশ্রম সার্কুলার রোডের পার্শ্বে গৃহনির্ম্মাণার্থ ২ বিঘা জমী ক্রয় করিয়াছেন, এ সংবাদে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

পারসিক দাতব্য—১৪ই সেপ্টেম্বর পারসিদিগের বর্ষশেষ দিনে তাঁহারা দাতব্য কার্য্যে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের সমাজের জে, এন, টাট্টা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একাই ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

রাজহত্যা—সেণ্ট ডোমিঙ্গ দ্বীপের প্রেসিডেণ্ট হেনরোজ গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন।

অদ্ভুত বৃষ—মিহির ও সুধাকর লিখিয়াছেন—ত্রিপুরার এক কৈবর্ত্তের বাটীতে একটী বৃষ আছে, তাহার চক্ষু তিনটী, তিনটী চক্ষুতেই দৃষ্টি আছে। বৃষটীর গঠন বেশ সুন্দর।

ভূমিকম্প—গত ৯ই আশ্বিন মসুরি পাহাড়ে ভূমিকম্প হয়। কম্পন প্রায় দশ সেকেণ্ড ছিল।

লেডি উড্‌বরণের সদাশয়তা—দার্জ্জিলিং দুর্ঘটনায় একটী বালিকাবিদ্যালয় ভগ্ন হওয়াতে তাহার ৬০টী

ছাত্রীকে তিনি আপনার রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়াছেন।

লোকসংখ্যা গণনা—আগামী ১৯০১ সালে ভারতবর্ষে নূতন লোকসংখ্যা গণনা হইবে।

নিগ্রোশিশুর বর্ণ পরিবর্ত্তন—নিগ্রো শিশু জন্মের সময় ঈষৎ শুভ্রবর্ণ হয়, ১ মাস পরে পীতবর্ণ, এক বৎসর পরে ধূসরবর্ণ এবং ৬ বৎসর পরে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়।

প্রাচীন বৃক্ষ—ব্রহ্মদেশের "ভূ" নামক বৃক্ষটীর বয়ঃক্রম ২০০০ বৎসর। ইহার অপেক্ষা প্রাচীন বৃক্ষ দেখা যায় না।

ফল সংরক্ষণ—কাঁটাল ঘিয়ে ভাজিয়া রাখিলে এক বৎসর কাল অবিকৃত থাকে, ইহার স্বাভাবিক সুস্বাদেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। কাঁচা আম্র খাঁটি সরিষার তৈলে ডুবাইয়া রাখিলেও অনেক দিন অবিকৃত থাকে।

বালক অপরাধীর বিচার—আমেরিকার নিউইয়র্ক ব্যবস্থা সমাজ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন দ্বাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের অপরাধের বিচার করিবার জন্য একটী ভিন্ন আদালত হইবে। তাহাতে রমণীগণ বিচারকের পদে নিযুক্তা হইবেন। তদর্থে বিবাহিতা ও সন্তানবতী রমণীদিগেরই আবেদন গৃহীত হইবে। ছেলের মার মত আর কেহ ছোট ছোট ছেলেদিগের দোষগুণ বিচার ও শাসন করিতে পারে না।

সাবানের খনি—ব্রিটিস্ কলম্বিয়ার অন্তর্গত য়্যাসক্রেপ্টে একটী সাবানের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথায় একটী প্রাকৃত হ্রদ আছে, সোরা ও সোডায় (ক্ষারে) তাহার জল মিশ্রিত ও ঘনীভূত হইয়া হ্রদের তলদেশে ও পার্শ্বে জমাট বান্ধিয়া আছে। তাহা করাতের দ্বারা বরফের মত থান থান করিয়া চিরিয়া লওয়া হয় এবং পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা স্বাভাবিক সাবান।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়।

পালিভাষায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক একখানি গাথা পুস্তক আছে, তাহার নাম "থারিগাথা"। ইহাতে ধর্ম্মজীবনের সৌন্দর্য্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রচয়িত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর হইলেও রাজবংশীয় ও সম্ভ্রান্তবংশীয় অনেক মহিলারও নাম দৃষ্ট হয়। ইঁহারা সকলেই বুদ্ধদেবের শিষ্যা ছিলেন। ইঁহারাই ভারতের প্রথম সন্ন্যাসিনী বা ভিক্ষুকিণী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। পুরাণে বেদবতী, জটিলা, শবরী প্রভৃতি তপস্বিনীদিগের আখ্যায়িকা বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৎকালে যে দলবদ্ধ

সন্ন্যাসিনী বা সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় বলিয়া একটী স্বতন্ত্র সাধ্বী ও ধার্ম্মিকা সমাজ ছিল, এরূপ বোধ হয় না। মহাত্মা বুদ্ধদেবই প্রথম এরূপ ধার্ম্মিকাসমাজের প্রবর্ত্তক। যখন রাজা, রাজপুত্র ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা ঐহিকের সুখ ও সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের পত্নী ও কন্যাগণ তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে কেন না বিচরণ করিবেন? শাক্যবংশীয়া রাজকন্যা প্রজাবতী স্বয়ং উদ্‌যুক্ত হইয়া প্রথম আপনার মস্তক মুণ্ডন করেন, এবং পীত বসন পরিধান করিয়া বুদ্ধদেবের চরণতলে উপবিষ্টা হইয়া ভিক্ষুকিণী (বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী) সম্প্রদায় সৃজনের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনিই ভিক্ষুকিণী সম্প্রদায়ের অগ্রণী। তাঁহার দৃষ্টান্তে শীঘ্রই অনেক ধার্ম্মিকা রমণী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হন, তদ্দ্বারা সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি হয়। বলা বাহুল্য যে প্রস্তাবিত গাথা পুস্তকখানি এই সকল ধার্ম্মিকা রমণী কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহঁাদিগের কয়েকটীর নাম গাথায় ভণিত আছে। যথা, পূর্ণা, তিশ্যা, মিত্রা, ভদ্রা, উপশমা, ধর্ম্মদীনা, বিশাখা, সুমনা, জয়ন্তী, অর্দ্ধকাশী, চিত্রা, অভয় মাতা, পদ্মাবতী, শ্যামা, সমা, কপিতানী, নন্দা, মিত্রকালী, শকুলা, স্বর্ণ, চন্দ্রা, সুজাতা, ঈশীদাসী, সুন্দরী ও রোহিণী। ধর্ম্মদীনা সমা, ঈশীদাসী বা ঐশীদাসী নামগুলি দীক্ষা-নাম বলিয়া বোধ হয়।

কাশ্মীরি সাল

পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই কাশ্মীরি সাল ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু অতি অল্প লোকেই ইহার ইতিহাস ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবগত আছেন। কথিত আছে যে কাশ্মীরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা মনালাল উদ্দিন ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক হইতে বয়নকারীদিগকে আনিয়া প্রথম সাল প্রস্তুত করান। কাহারও মতে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইলে উত্তরদেশস্থ হেয়ার কুণ্ড জনপদ হইতে বয়নকারীরা আনীত হয়। বাস্তবিক মোগলদিগের অধীনেই সালের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। একদা ১৬০০০ ষোড়শ সহস্র তাঁত কেবল সাল বয়ন করিত, এক্ষণে ২০০০ সহস্রেরও ন্যূন দৃষ্ট হয়। দিন দিন সংখ্যা হ্রাসই হইতেছে, বিশেষতঃ অমৃতসরে অল্প মূল্যের সাল প্রস্তুত হওয়াতে কাশ্মীর সালের আদরও অনেক কমিয়া গিয়াছে। অমৃতসরের সাল কাশ্মীরের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযোগী। আবার পারিসে ও পেইজ্‌লিতে নকল সাল প্রস্তুত হওয়াতে প্রকৃত সাল ব্যবসায়িগণের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস কাশ্মীরের ছাগলের লম্বা লম্বা লোমে কাশ্মীরি সাল প্রস্তুত হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। তীব্বতদেশীয় ছাগল হইতেই সাল প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় ছাগলের শরীর লম্বা ও খর্ব্ব দুই প্রকার লোমে আবৃত। বিশ্বপিতা ইহাদিগকে তত্রত্য অতিশয় শীত ও তুষার হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্বিগুণ ঘন পরিচ্ছদ দিয়াছেন। লম্বা লম্বা লোমের নিম্নেই সূক্ষ্ম ও সুকোমল বস্ত্রের ন্যায় পশম উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সূক্ষ্ম ও কোমল পশমেই সাল প্রস্তুত হয়। একটা প্রমাণ ছাগল হইতে বর্ষে বর্ষে অনধিক দেড়ছটাক পরিমিত এইরূপ পশম পাওয়া যায়। তীব্বতের প্রধান প্রদেশ ল্যাডাক হইতে এই পশম আনীত হয় এবং তাহা কাটিয়া সূত্র প্রস্তুত ও নানা রঙে রঞ্জিত করা হয়। শুভ্র পশম কাশ্মীরে ৫-৬ টাকায় সের বিক্রয় হইয়া থাকে, রঞ্জিত পশমের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। পশম কাটিয়া সূত্র প্রস্তুত হইলে তাহা স্রোতের জলে ডুবাইয়া রাখা হয়, তদ্দ্বারা সূত্র দৃঢ় হয়, তাহাতে অনায়াসে বয়ন করা যায়। বয়নের পরও সালকে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিতে হয়। স্রোতের যে অংশ উলার হ্রদ ও দ্রাগুণফ্লড গেটের মধ্যে প্রবাহিত, তাহার জল অতি নির্ম্মল, সুতরাং তাহাতেই সাল ধৌত হইয়া থাকে। ধুইয়া হাওয়ায় শুষ্ক করা হয়, নতুবা রৌদ্রে বিবর্ণ হইয়া যায়। দ্বিতীয় বার ধৌত করিয়াও এই প্রকারে শুষ্ক করিতে হয়। তৃতীয় বা শেষ বারে কাচিয়া তাহার উপর মুদ্রাঙ্কন চিহ্ন দিয়া তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করা হয়। সাল সচরাচর তিন প্রকারের হয়। ১ম বিধ অত্যন্ত লঘু ও কোমল অরঞ্জিত পশমে বয়ন করে। ২য় বিধ সাদা ও কাল স্বাভাবিক বর্ণের পশমে বয়ন করা হয় এবং তৃতীয় বিধ দীর্ঘাকারে কার্পেটের ন্যায় বৈঠকখানায় পাতিবার জন্য নির্ম্মিত প্রায় যোড়া যোড়া প্রস্তুত হয়। একটু একটু করিয়া বুনিয়া শেষে যোড় দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা এমন কৌশলে প্রস্তুত হয় যে যোড় অনুভূত হয় না। কাষ্ঠের মাকুতে বয়ন হয় এবং প্রত্যেক রঙের পৃথক্ পৃথক্ মাকু প্রস্তুত থাকে। এক যোড়া উৎকৃষ্ট প্রমাণ সাল প্রস্তুত করিতে প্রায় এক বৎসর লাগে এবং তিন চারি জন তাঁতির সাহায্য আবশ্যক করে। এই প্রকারে প্রস্তুত হইলে পুনঃ পুনঃ ধৌত করা আবশ্যক, কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য আরও দুইমাস কাল বিলম্ব হয়। শেষে রাজা বা রাজপুরুষদিগকে পরিদর্শনের জন্য অর্পিত হয়। সাল প্রস্তুত রাজার কর্ত্তৃত্বাধীন, প্রত্যেক যোড়ার উপর উপযুক্ত কর অবধারিত হয়, কিন্তু উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্যও বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে।

পুণ্যাশ্রম।

"শান্তি সুখ চাহ যদি সেই আনন্দ ধামে চল"।

১

প্রিয়ঙ্গুলতা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা। বালিকার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, চক্ষু সুদীর্ঘ, দৃষ্টি শান্ত ও করুণ। বালিকার অ-বেণীবদ্ধ আলুলায়িত চুলের মধ্যে গোলাপ কলিকা সদৃশ মুখখানির সৌন্দর্য্য অতি মধুর। সে মুখখানি শৈশবের প্রফুল্ল-ভাবশূন্য, তাহা কেমন যেন একটু বিমর্ষ ভাবে ম্লান। বালিকার চেহারাটি যেমন সুন্দর, চরিত্রটি আবার ততোধিক সুন্দর; কিন্তু অদৃষ্টটি বড় মন্দ। সে দেড় বৎসরের সময় মাতৃহীনা হয়। পঞ্চম বৎসরের সময় তার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। পিতা তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছেন, সে তখন তাহা ভাল বুঝিত না। কিন্তু এখন সে বুঝিতে পারে পিতা মরিয়াছেন, যে মরে সে আর ফিরে আসে না। একটি খুল্লতাত ব্যতীত সংসারের মধ্যে অভা-গিনীকে ভাল বাসিবার আর কেহ নাই।

২

প্রিয়ঙ্গুলতার পিতা হরগোপাল কোন কাজ কর্ম্ম করিতেন না। প্রিয়ঙ্গুলতার খুল্লতাত হরিগোপাল সামান্য বেতনের একটি চাকরী করিতেন, তাহাতেই পরি-বার প্রতিপালন হইত।

কদম্বকালী হরিগোপালের পত্নী। সে হরগোপালের স্ত্রী কন্যাকে দেখিতে পারিত না। হরগোপাল সপরিবারে হরিগোপালের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিত, এই কদম্ব-কালীর ক্রোধের প্রধান কারণ।

পিতা মাতা বর্ত্তমানেই প্রিয়ঙ্গুলতাকে কদম্বকালী ভাল বাসিত না, পিতা মাতার অভাবে সে তাহার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইল। যখন কদম্বকালীর অনাদর উপেক্ষায় সরলা বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িত, বিষাদময়ী সন্ধ্যাদেবীর শিশির বর্ষণের ন্যায় বালিকার নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িত, তখন হরি-গোপালের অকৃত্রিম স্নেহই তাহার এক মাত্র সান্ত্বনার স্থল হইত।

পক্ষী যেমন রৌদ্র বৃষ্টি হইতে পাখার ভিতর লুকাইয়া শাবকটিকে রক্ষা করে, হরি গোপাল সেইরূপেই নির্দ্দয়হৃদয়া স্ত্রীর গর্জন প্রহার হইতে সেই পিতৃমাতৃহীনা বালিকাটিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু হায়! "অভাগীর চিরদুঃখ লিখেছে বিধাতা"! দেখিতে দেখিতে হরি গোপা-লেরও কাল পূর্ণ হইল, এক অজানা রাজ্য হইতে তলপের উপর তলপ আসিতে লাগিল, তিনি সংসারের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। প্রিয়ঙ্গুলতার সব ফুরাইল। খুড়ো মহাশয়ের অভাবে তাঁহার সংসারটা যেন বসন্তান্তে কুসুমোদ্যানের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

৩

হরিগোপালের মৃত্যুর পর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার বিধবা পত্নী কদম্বকালী ঘড়াটা, ঘটিটা, বাটীটা সব নিয়ে থুয়ে পিত্রালয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প করিল। একটা আপদ আছে বটে, কিন্তু কিছুতেই সে সেটাকে সঙ্গে নিবে না, পরের জন্য অত টাকা ব্যয় করা কি তার মত গরিব লোকের কাজ? এক দিন সে কণ্ঠ পঞ্চমে তুলিয়া হাঁকিল, "পিরি, ও পিরি"!

প্রিয়ঙ্গুলতা বেগুন ভাতে ভাত রাঁধিতেছিল। বজ্রনিনাদ তুল্য স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বালিকা বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে কাকীমার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। জজের নিকট খুনি আসামী যেমন ভাবে দাঁড়ায়, প্রিয়ঙ্গুলতা তেমনি ভাবে ভয়ে ভয়ে আসিয়া কাকীমার নিকট দাঁড়াইল।

কদম্বকালী কহিল "তোর খুড়ো মরে গেছেন, এখন তোকে কে খেতে দিবে?"

প্রিয়। কেন তুমি।

কদম্বকালী। তোরে আমি চিরদিন কোথা থেকে খেতে দিব?

প্রিয়ঙ্গুলতা। কেন ঐ ঘর থেকে। (সে প্রবালোপম হস্ত উত্তোলন করিয়া পাকশালা দেখাইয়া দিল)।

কদম্বকালী। নেকী আর কি, আমি কাল বাপের বাড়ী চলে যাব, তুই পড়ে থাকিস্।

প্রিয়ঙ্গুলতা। কাকী মা, আমি একা কেমন করিয়া থাকিব?

কদম্বকালী। কেন, পারিবি না কেন?

প্রিয়ঙ্গুলতা। আমার ভয় করবে যে।

কদম্বকালী। যার খেতে দিতে দুনিয়ায় কেউ নেই, তার আবার একা থাকতে ভয় কি লা?

প্রিয়ঙ্গুলতা। কেন তুমি বলেছ ঐ তাল গাছটাতে ভূত আছে, তা আমার কি ভয় হয় না?

কদম্বকালী দেখিলেন যে, সে হাবা মেয়েটাকে মনোগত অভিপ্রায় বুঝান অসাধ্য। তখন সে সংহারকালীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল "যা অধঃপাতে যা, চুলোয় যা। আমি কাল এখানে কিছুতেই থাক্‌ছি না, তোর এই বাড়ীর শুনো ভিটের উপর পড়ে মরতে হবে।"

দুই তিন দিন পরে কদম্বকালী বাপের বাড়ী রওনা হইল। ঘরে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সব আত্মসাৎ করিল। ঘর দুখানা বিক্রয় করিয়া ফেলিল। প্রিয়ঙ্গুলতাকে সঙ্গে না লওয়ারই তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা ছিল, কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীদিগের কোঁদলে এবং অনুরোধে এ যাত্রা প্রিয়ঙ্গুলতাকে সঙ্গে লইতেই হইল। বলা বাহুল্য যে প্রিয়ঙ্গুলতা কদম্বকালীর পিত্রালয়ে গিয়া আশ্রয় লইল।

শ্রীমঙ্গলপুর গ্রামে কদম্বকালীর বাপের বাড়ী। দুঃখের বিষয় কদম্বকালীর সেই সৃষ্টি-সংহারিণী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিবার ও তাহার লোল-রসনা-নির্গত মধুর বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য তাহার পিতামাতা কেহই জীবিত ছিলেন না। কদম্বকালীর

দুই ভ্রাতা আছে, তাহাদের নাম ধড়াচূড়া ও ননীচোরা। সুনন্দা ও পদ্মগন্ধা নামে দুজনার দুটি বধূ রত্ন ঘর অগ্নিময়, সুতরাং আলোময় করিত। শুধু ঘর আলো করিয়াই তাহারা ছাড়িত না, মধ্যে মধ্যে আবা। গ্রাম শুদ্ধ আলোময় করিয়া তুলিত। ফল কথা তাহারা যে উপযুক্ত ননদিনীর উপযুক্ত ভ্রাতৃবধূ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত কদম্বকালীর একটি বালিকা ভগ্নী আছে, তাহার নাম কৃষ্ণকালী। প্রদীপ নামে একটি বালক সে গৃহে অবস্থান করে, সম্বন্ধে সে কদম্বকালীর বোনপোয়া। প্রিয়ঙ্গুলতা এ গৃহে আসিয়া আর কিছু পাউক আর না পাউক, পাইল এই দুটি সমবয়সী, কিন্তু কৃষ্ণকালীর স্বভাবে সে সময় সময় বড় জ্বালাতন হইত।

প্রিয়ঙ্গুলতা রাত্রে প্রদীপের কাছে লেখা পড়া করে, প্রদীপের স্থির চরিত্রে সে বড় সন্তুষ্ট। প্রিয়ঙ্গুলতা ভাবিয়াছিল এ জগতে তাহাকে ভাল বাসিবার আর কেহ নাই, কিন্তু প্রদীপকে পাইয়া তাহার সে বিশ্বাস কিছু দূর হইল। সে বুঝিল প্রদীপ তাহাকে ভাল বাসে। যদিও প্রদীপ তাহার আপনার পড়া শুনা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, প্রিয়ঙ্গুলতার সঙ্গে খেলিতে বা মিলিতে বড় একটা আসে না, তথাপি প্রিয়ঙ্গুলতা বুঝিতে পারিল প্রদীপ তাহাকে বড় স্নেহ করে।

কৃষ্ণকালী শৈশব হইতেই জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর অপার গুণাবলীতে ভূষিত হইতেছে। বাল্যকাল হইতেই নানারূপ কলঙ্ক-কালিমায় তাহার চরিত্রটি কুৎসিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সে অতি সরল ভাবে প্রিয়ঙ্গুলতার সঙ্গে আসিয়া মেশে, পরে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করে। চুল বাঁধিবার ফিতেটি, পরিধেয় ধুতি খানা চুরি করিয়া লয়। কদম্বকালী প্রিয়ঙ্গুলতাকে অসাবধান মনে করিয়া অযথা তিরস্কার করিয়া থাকে ও আর ফিতে বা ধুতি তাকে কিনিয়া দেয় না। কৃষ্ণকালী অন্য কোনও কাজ বড় করে না, কিন্তু দিদির কাছে নির্দ্দোষ প্রিয়ঙ্গু-লতার নিন্দা করিতে সে বড় তৎপর। সত্যেতে মিথ্যাতে মিশাইয়া তিলকে তালে পরিণত করিয়া সে প্রিয়ঙ্গুলতার নামে দিদির কাছে লাগায়। আর দিদিরত কথাই নাই, সেত তাহাই চায়—বৌদিগকে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না, সে প্রিয়ঙ্গুলতার উপর সকল রাগ ঝাড়িয়া হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচে। যখন কদম্বকালী "চুলোমুখী, পোড়ামুখী, ছারকপালী" ইত্যাদি মধুর বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে, তখন প্রিয়ঙ্গুলতা কোন কথাই বলে না—অশ্রু-ভারাক্রান্ত নেত্রে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র।

দুই এক বৎসরের মধ্যে প্রিয়ঙ্গুলতা বেশ বুঝিল যে কৃষ্ণকালী তাহাকে ভাল বাসে না, বরং সে তাহার প্রধান শত্রু। প্রিয়ঙ্গুলতা অতি সরলস্বভাবা ও ধীর চরিত্রের বালিকা, সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গুরুজনের আজ্ঞা প্রতিপালন করে। প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা কহে না। ময়লা কাপড় খানি সাবান দিয়া পরিষ্কার

করিয়া লয়। তাহার গুণে সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতে লাগিল। কৃষ্ণকালীর এ সব গুণ কিছুই ছিল না, বরঞ্চ সে সুযোগ পাইলে সকলেরই দ্রব্য চুরি করিত। মিথ্যা কথা বলিতে তাহার মুখে বাধিত না। গুরুজনের অবাধ্যাচরণ তাহার স্বভাব, অকারণে সকলের সঙ্গে কলহ এবং দাস দাসীকে তিরস্কার করা তাহার চির অভ্যাস। এই সব কারণে গ্রামের লোক কেহ তাহাকে দেখিতে পারিত না। সকলেই পিরিকে ভালবাসে, ভাল বলে, আর কৃষ্ণকালীকে নিন্দা করে, কি আপদ! কদম্বকালীর দুঃখের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। কেন সে এমন দুষমনটাকে ঘরে আনিয়াছিল, তখন সেই চিন্তা তার পরিতাপের কারণ হইল। পূর্ব্বেই প্রিয়ঙ্গুলতা কদম্বকালীর দুই চক্ষের বিষ ছিল, এই সব কারণে বিষটা আবার ভাল রকম পাকিয়া উঠিল। ইহারই প্রভাবে প্রিয়ঙ্গুলতার যে কত দূর কষ্ট যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত—ভোজনে অর্দ্ধপেট, পিধনে শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন, শয়নে ভূমিশয্যা, তৈল বিহনে ঘনকৃষ্ণকেশ জটাবদ্ধ, অল্পাহারে কোমলাঙ্গ কৃশ হইতে লাগিল। কিন্তু প্রিয়ঙ্গুলতার তাহাতে কোনও ক্ষোভের কারণ নাই। সে ঈশ্বরের নিকট নির্দ্দোষ থাকিয়া মনের শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিল। প্রদীপ তাহাকে গান শিখাইয়াছিল, মনের কষ্ট নিবারণের জন্য সে সময় সময় গুণ গুণ করিয়া গাইত।

(ক্রমশঃ)

নর-দেবতা।

(ঋষিপ্রতিম পুণ্যাত্মা, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পরলোক গমনে লিখিত)

১

আমি দেখিয়াছি এক মানব-দেবতা,
বিশুভ্র ঋষির মূর্ত্তি,
হৃদয়ে যুবার স্ফূর্ত্তি,
ঢেকেছে উদ্যম কর্ম্মে স্থবির-জড়তা!
আমি দেখিয়াছি সেই মানব-দেবতা।

২

আমি দেখিয়াছি এক মানব-দেবতা,
দেখিয়াছি নিরজনে
শান্তিময় তপোবনে,
যোগে নিমগন তিনি, যোগেশ্বর যথা!
আমি দেখিয়াছি সেই মানব-দেবতা।

৩

দেখিয়াছি দেবপুরে, সে নর-দেবতা—
অপরূপ দেবপুর
শান্তি রসে ভরপূর,
প্রকৃতিরো প্রাণভরা ভক্তি-মধুরতা!
দেখিয়াছি সেথা এক মানব-দেবতা।

৪

দেখিয়াছি দেবপুরে সে নর-দেবতা—
জগতের মাটী ধূলা,
আপদ জঞ্জাল গুলা,

নাহি সেথা, আছে শুধু শান্তি পবিত্রতা।
দেখিয়াছি সেই খানে সে নর-দেবতা।

৫

শুনেছি সে ইতিহাস—স্বর্গীয় বারতা,
দ্বাপর কলির কাল,
হয়ে গেছে অন্তরাল,
পুনঃ পুণ্য সত্যযুগ বিরাজিছে তথা,
(মানবত্ব ঘুচি তাই হয়েছে দেবতা) !

৬

আমি দেখিয়াছি সেই মানব-দেবতা,
মূর্ত্তিমান জ্ঞান ধর্ম্ম,
দিবা নিশা "দশকর্ম্ম"
অথচ মাখানো মুখে শিশু-সরলতা !
দেখিয়াছি সত্যযুগ, মানব-দেবতা !

৭

আমি দেখিয়াছি তিনি মানব-দেবতা,
ধর্ম্মশীল জিতেন্দ্রিয়,
জিত-আত্মা, সত্য-প্রিয়,
মর্ম্মতল পরিপূর্ণ পরার্থ-পরতা !
মহাসাধনায় সিদ্ধ, লভি অমরতা !

৮

দেখিয়াছি দেবপুরে সে নর-দেবতা—
স্বরগ-বাতাস তাঁর
পরশিলে একবার
মানব ভুলিয়া যায় হীনতা নীচতা !
দেখিয়াছি পুণ্যময় সে নর-দেবতা।

৯

দেখিয়াছি একদিন—আজো আছে মনে,
(দেখিলে সে পুণ্যময়,
থাকে না সঙ্কোচ ভয়,
ক্ষুদ্রতা থাকে না লুকি মরমের কোণে)
সে স্নেহ, আদর আহা !—
মানুষে কি পারে তাহা
অনা'সে বিলায়ে দিতে পাত্মজনগণে ?
দেখিয়াছি সেই ঋষি রাজনারায়ণে !

১০

আজি শুনিলাম, তিনি ত্যজি ধরাতল—
আঁধারি সে দেবপুর
সবে করি শোকাতুর,
বঙ্গের সে রত্নমণি সতত উজ্জ্বল,
পরিহরি দেবঘর,
উন্নতির শেষ স্তর
গেছেন বৈকুণ্ঠধামে, দেব-লীলা-স্থল !
পবিত্র পদাঙ্ক তাঁর
বক্ষে আছে বসুধার,
আর আছে যশঃ কীর্ত্তি পূত নিরমল।
দেবতা স্বরগে যাবে
নরে কেন শোক পাবে,
ভিজাবে নয়ন জলে কেন ধরাতল ?
তিনি যা গেছেন রেখে,
সেই সব দেখে দেখে
আপনা গড়িবে বঙ্গ, বুকে করে বল !
তাঁহারি আদর্শে সবে
উন্নত মহত হবে,
তা হলে আশীষ তাঁর হইবে সফল !
আজিকার শোক রাশি,
আনন্দে মিশিবে ভাসি,
জগত পূজিবে তাঁর চরণ কমল !—
আমরা শিখিব—বিশ্বে সকলি মঙ্গল !

লেখিকা শ্রী মা—

শ্বাস প্রশ্বাস।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কর। বায়ুমণ্ডলে যথোপযুক্ত প্রাণবায়ুর * (Oxygen) ভাগ থাকিলে তাহাতেই নিদ্রা যাইবে ও সর্ব্বদা বিচরণ করিবে। বায়ুমণ্ডল ভারী ও অবিশুদ্ধ হইলে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু শুদ্ধ করিয়া লইবে। সচরাচর শ্বাস ঘ্রাণের সময় ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রতি মিনিটে চৌদ্দ পাইণ্ট বায়ু প্রবাহিত হয়, ইহার মধ্যে তিন পাইণ্ট পরিমাণে প্রাণবায়ু থাকে। কিন্তু সাতসহস্র পদ উচ্চ পাহাড়ে উঠিলে তথায় এই চৌদ্দ পাইণ্ট বায়ুর মধ্যে কেবল দেড় পাইণ্ট প্রাণবায়ু থাকে। তিন পাইণ্ট প্রাণবায়ু না থাকিলে শরীরস্থ রক্ত বিশোধিত হয় না ; প্রত্যুত: শীঘ্র শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আইসে, বুক ধড়ফড় করে, এবং জীবনও সঙ্কটাপন্ন হইয়া আইসে। সেই জন্য এখানে শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস গ্রহণ আবশ্যক। নিম্ন দেশে যে সময়ে একবার শ্বাস গ্রহণ করিলে চলে, এইরূপ উচ্চ দেশে সেই সময়ের জন্য দুইবার শ্বাস লইতে হয়। তাহা হইলেই তিন পাইণ্ট প্রাণবায়ু সঞ্চয় হয়। বাড়ীতে বসিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে পরিমিত ব্যায়ামেরও আবশ্যক হয় না। এই কারণেই আমরা কখন কখন ক্রমাগত দ্বাদশ ঘণ্টার অধিক কালও মানসিক পরিশ্রম করিয়া ক্ষণকাল বিশুদ্ধ বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করিলেই পরিতৃপ্ত হইতে পারি—অধিক পরিশ্রম-জনিত অবসাদও অনুভব করি না।

শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস গ্রহণ দ্বারা সর্দ্দী, কাশী, গলায় ঘা, শিরঃপীড়া, দন্তশূল প্রভৃতি অনেক পীড়া আরোগ্য হয়। রাত্রিতে অনিদ্রা হইলে এবং শয্যা-কণ্টকের ন্যায় অস্থিরতা ও যন্ত্রণা হইলে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘরে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিবে, গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিবে, এবং শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস গ্রহণ করিবে। দুই তিন মিনিট কাল এইরূপ শ্বাস গ্রহণ দ্বারা শীঘ্র নিদ্রা আসিয়া থাকে, এবং সমস্ত গ্লানি দূর হয়।

* বায়ুর মধ্যে প্রায় সিকি ভাগ প্রাণবায়ু বা অম্লজান, অবশিষ্ট প্রায় বারো আনা নাইট্রোজন বা যবক্ষারজান, আবার অঙ্গারজান সামান্য পরিমাণে থাকে, তাহা যত অধিক হয়, বায়ু তত অস্বাস্থ্যকর ও প্রাণনাশক হয়।

পৃথিবীর ক্ষয়।

'কলি অবসানে এককালে দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হইয়া পৃথিবী ধ্বংস করিবে অথবা কোটি কোটি প্রস্রবণ উন্মুক্ত মুখে ভূভাগ কবলিত করিবে' আমরা এরূপ ভবিষ্য

সূচনা করিয়া ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে চাহি না। যাঁহারা সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাহারা হয় ত গত দুই বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর আশু ধ্বংসের কথা বা প্রলয়োপপত্তির পূর্ব্ব লক্ষণের কথা অনেক বার পাঠ করিয়াছেন। আজি একজন মহা পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিলেন যে পৃথিবী ক্রমশঃ সূর্য্যের নিকটতর হইতেছে, তজ্জন্যই এত উত্তাপ, পৃথিবীর নিজের আকর্ষণী শক্তি শিথিল হইয়া আসিতেছে, সুতরাং শীঘ্রই সৌরাকর্ষণে উদ্ধৃত হইয়া প্রজ্বলিত সূর্য্যকুণ্ডে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইবে। কল্য আবার একজন মহা-মহোপাধ্যায় বলিলেন যে পৃথিবী ক্রমশঃই মগ্ন হইতেছে। যে সকল স্থল পূর্ব্বে জল হইতে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল, এখন তাহা সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়াছে। আমরা শেষোক্ত মতের সপক্ষে অনেক প্রমাণও দেখিতে পাই; কিন্তু স্থল কমিতেছে ও জল বাড়িতেছে, ইহাতে পৃথিবী কিরূপে হ্রাস হইতেছে তাহাত বুঝিতে পারি না। পৃথিবী কি জলস্থলময়ী নহে? এক স্থানে জলবৃদ্ধি হইয়া ভূমি জলমগ্ন হইলে অপর স্থানে ভূমি বৃদ্ধি হইয়া কি জল হ্রাস হয় না? ইউরোপীয় ভূবেত্তারা বলেন যে বল্‌টিক ও নিকটস্থ সমুদ্র ও তাহাদের উপকূলস্থ স্থান সকল এককালে অতলান্তিক মহাসমুদ্রের অংশ বা গর্ভস্থিত ছিল, কিন্তু এখন তাহা ভূ-ভাগে পরিণত হইয়াছে; এবং অতলান্তিক নামে একটী মহাদেশও ছিল; তাহা সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে। আরিস্‌টটল, প্লিনি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই মগ্ন ভূ-খণ্ডের শেষ অংশ দর্শন করিয়াছেন লিখিয়া গিয়াছেন। অধুনা অনেকে অনুমান করেন যে ইউরোপ খণ্ড ক্রমশঃ মগ্ন হইতেছে। বিখ্যাত নাবিকেরা সমুদ্র পথে ভূ-বেষ্টন করিয়া গণিতের সহায়তায় প্রকাশ করিতেছেন যে গত ৪০০ চারিশত বর্ষের মধ্যে পৃথিবী প্রায় একবিংশতি গুণ সঙ্কুচিত হইয়াছে অর্থাৎ ভূভাগের বিস্তৃতি এখন যত আছে, ১৫০০ খৃষ্টাব্দে তাহার একুশ গুণ অধিক ছিল। সিংহলের প্রাচীন ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে, যে রাবণের মৃত্যুর পর লঙ্কার অর্দ্ধভাগ জলমগ্ন হয়। বঙ্গের রাজপুত্র বিজয় যখন সিংহল অধিকার করেন, তখনও লঙ্কার বিস্তার ৫৮ যোজন ছিল; সে আজি চতুর্ব্বিংশতি শতাবর্ষের কথা। আজি সিংহল কত ক্ষুদ্র! কিন্তু মহাসাগরের গর্ভে কোথাও কি বৃহৎ অজ্ঞাত ভূখণ্ড নাই? একজন ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে দক্ষিণ মহাসমুদ্রে বরফরাশি জমাট হইয়া এত উচ্চ হইয়াছে যে তাহা গলিলে আর একটী জলপ্লাবন হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই বরফ না গলিয়া কোন অলক্ষিত নিয়মে কি ভূমিভাগে পরিণত হইতে পারে না? আমরা ভূতত্ত্ব ও বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগের নিকট ইহার সদুত্তর প্রার্থনা করি।

সুন্দরীর মেলা।

উন্নতি সভ্যতার পরিচায়ক। যে জাতি যত উন্নত, সে জাতি তত সভ্য। কিন্তু মানব ভ্রম-প্রবণ, সে বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানে যত কেন উন্নত হউক না, তাহার যে সকল কার্য্যই অভ্রান্ত বা সুনীতি-অনুমোদিত হইবে এমন আশা করা যায় না। অধুনা আমেরিকা ও ইউরোপ নব সভ্যতার বিশালক্ষেত্র। তত্রত্য উন্নতচেতা জনগণ শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যেরূপ যত্নবান্, সামাজিক উৎকর্ষ সাধনে ও সংস্কারকার্য্যেও সেইরূপ উদ্যমশীল। মনুষ্য স্বাধীন, ইহা সর্ব্বজনীন সভ্যতানুমোদিত একটী পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত। স্ত্রীলোকেরাও মনুষ্য, ইহা উত্তরপক্ষ। সুতরাং স্ত্রীলোকেরাও স্বাধীন সহজেই এই মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য যে দুইটী পৃথক্ বস্তু, ইহা সর্ব্বদা অনুভূত হয় না স্বাধীন অর্থে আপনার অধীন। জগতের কয়জন লোক আপনাকে অধীনে রাখিতে সমর্থ? নীচ প্রবৃত্তি, ইতর কামনা ও ইন্দ্রিয় সকলকে দমন করিয়া স্বীয় অধীনে আনয়নপূর্ব্বক স্বাধীন হওয়া সহজ কথা নহে। যখন মহা মহা মহর্ষি, তত্ত্বদর্শী, পরমহংস ও যোগীদিগেরও পদস্খলন হইয়া থাকে, তখন অন্য পরের কথা কি? সুতরাং "স্বাধীনতা" কথাটী শাব্দিক মাত্র; এক্ষণে ইহা স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচারিতা অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রকৃতির বেগে ও স্বেচ্ছাচারের তরঙ্গে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া যদি স্বাধীন শব্দে অভিহিত হইতে চাও, তাহা হইলে তুমি স্বাধীন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় স্ত্রী-স্বাধীনতাও অনেকটা এই প্রকার। প্রাচীন ভারতললনাগণ স্বাধীন কি অস্বাধীন ছিলেন, পুরাণে তাহার ভূরি বিবরণ বিবৃত আছে। কিন্তু তাঁহারা যে কখনও স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ ছিলেন না, ইহা এক প্রকার প্রবচন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীরত্ন সকল সতীত্ববলে দস্যু ও পাষণ্ডগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু কখনও সাধারণের কুটিল কটাক্ষ সহ্য করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক তাঁহাদিগের এমনি চরিত্র-তেজ ছিল যে অসৎলোকের কুদৃষ্টি সহ্য করিতে পারিতেন না; তাঁহাদিগের পবিত্র মুখজ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে পাপাচারীরও সাহস হইত না তাঁহারা সতীত্ববলে ও চরিত্র তেজে অসঙ্কুচিত মনে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে বিচরণ করিতেন। তাঁহারা "স্বাধীন" ছিলেন। কিন্তু আধুনিক সভ্য জগতের অবস্থা কিরূপ? সংবাদ পত্রের পাঠক ও পাঠিকা অবগত আছেন যে সভ্য লোকদিগের মধ্যে বিবাহচ্ছেদের বিবরণ যত দৃষ্ট হয়, বিবাহ সম্বন্ধ বা ঘটনার বিবরণ তত দৃষ্ট হয় না। রমণীরা সংবাদ পত্রে

বিজ্ঞাপন দিয়া বর মনোনয়ন করেন, ইহাও এক প্রকার স্বয়ংবর। কিন্তু যে সংবাদ পত্রে এইরূপ বিবাহের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সেই সংবাদ পত্রে সেই মনোনীত বরের সহিত বিবাহ ভঙ্গের অভিযোগের বিষয় কি প্রকাশিত হয় না? স্বীকার করি, স্বয়ংবরে অনেক স্থলে বাহ্য সৌন্দর্য্য বিচার করিয়াই বর মনোনীত হইত। কিন্তু যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করা হইত, ভারতললনা আজীবন তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী ও সহচরী হইয়া থাকিতেন, এবং তাঁহার মৃত্যুতেও অনুমৃতা বা সহমৃতা হইতেন। ভারতের বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে জগৎ আশ্চর্য্য। সভ্যতাভিমানী ইউরোপ ও আমেরিকা কি তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝেন? মহারাণী ভিক্টোরিয়া পত্যন্তর গ্রহণ না করাতে প্রশংসার্হ হইয়াছেন (বিশেষতঃ ভারতবাসীদিগের নিকটে) সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার মাতা পত্যন্তর গ্রহণ করাতে (ডিউক অব কেণ্টকে বিবাহ করাতে) কি নিন্দনীয় হইয়াছিলেন? সম্রাট্ নেপোলিয়নের পত্নী, অষ্ট্রিয়া রাজপুত্রী ও "অর্দ্ধ জগতের" সাম্রাজ্ঞী হইয়াও ইন্দ্র-তুল্য পতির মৃত্যুর পর একজন সামান্য ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দেশ ভেদে আচারভেদ বলিয়া আমরা এরূপ আচরণকে উপেক্ষা করিতে পারি; কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি যে কর্ত্তব্য ও পবিত্র দাম্পত্য ভাব, তাহা স্বর্গীয় ও পরম পবিত্র বলিয়া আমরা চিরদিন মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিব।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব মোগল সম্রাটেরা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাদিগের আচরিত রীতির প্রতিরোধক নয়, সুতরাং তাঁহারা যে পঞ্চদশ শত বা দুই সহস্র পত্নী ও উপপত্নী পোষণ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরন্তু তাঁহারা যে ক্রীতদাসী ও ইতর রমণী-দিগকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া "সুন্দরীর বাজার" বসাইয়া সুন্দরী নারী মনোনীত করিবেন, তাহাও বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতাভিমানী উদারচেতা ও উন্নতমনা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ (যাঁহারা আপনাদিগকে জগতের সংস্কারক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন) যে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দিয়া "সুন্দরীর হাট" বসাইয়া থাকেন, ইহা সামান্য কৌতুকাবহ নহে। কেবল কৌতুকাবহ কেন? ইহা বাস্তবিক ক্ষোভজনক। প্রাচীন গ্রীসেতিহাসে এইরূপ সুন্দরীর মেলার কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা বীরপুরুষদিগের উৎসাহ দানের জন্য—দেশের হিতের জন্য অনুষ্ঠিত হইত। অবিবাহিতা সুন্দরীদিগের মধ্য হইতে সুন্দরী ও বীর্য্যবতী রমণী-রত্ন মনোনীত করিয়া বীরত্বের পুরস্কার প্রদান করা হইত। কিন্তু এখনকার এই সুন্দরীর মেলার উদ্দেশ্য কি?

পাঠিকারা হয়তো অবগত আছেন ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরে বর্ষে বর্ষে এক একটী সুন্দরীর মেলা হইয়া থাকে। স্বীয় স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য কেবল ইউরোপের সকল

প্রদেশ হইতে নহে—দূরস্থ সাগর পার আমেরিকা হইতেও প্রসিদ্ধ সুন্দরী ললনা-গণ তথায় আগমন করিয়া থাকেন। বিচার করিবার জন্য কয়েকজন সুদক্ষ পুরুষ ও বিচক্ষণা রমণীও নিযুক্ত হন। এতদর্থে কয়েকটী পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত বিচারকেরা যাহাদিগকে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারাই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পশু প্রদর্শনীতে অশ্ব ও গো প্রভৃতি পশু সকল মেলা স্থলে আনীত হইলে তাহাদিগের পুষ্টি ও সামর্থ্য দৃষ্টে তৎতৎ স্বামীদিগকে উৎসাহ দানার্থ পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, এবং কোন কোন পশুকে উচিত মুল্যে ক্রয় করাও হয়। সুন্দরীর প্রদর্শনও কি তদনুরূপ নহে? স্বীয় স্বীয় রূপলাবণ্যের প্রতি বিশেষ যত্নের নিমিত্ত অধিকারিণীকে পুরস্কার দেওয়া হয় এবং দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক কোন কোন সুন্দরী তাহার পত্নীত্বেও গৃহীত হইয়া থাকে! এ বৎসরের মেলায় ইতালি, স্পেন, বেল্‌জিয়ম্‌ প্রভৃতি ইউরোপের অনেক প্রদেশ হইতে প্রসিদ্ধ সুন্দরীগণ আগমন করিয়াছিলেন। আমেরিকার স্ত্রী-সমিতিরও অনেকগুলি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনী-দিগের মধ্যে ধনী মানী ও অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীও ছিলেন। বলা বাহুল্য যে ইহাঁরা সকলেই বিচারক ও দর্শকদিগের তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিয়াছিলেন। পারিসের একটী নাট্যালয়ের অভিনেত্রী উপস্থিত সুন্দরীদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ-সুন্দরী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সুতরাং সেই প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা জানি না মেলায় অবিবাহিতা কি বিবাহিতা কিম্বা উভয়বিধ স্ত্রীলোকের প্রদর্শন হইয়া থাকে! ধন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা!!

আমাদিগের বামা-রচনা স্তম্ভ।

বামারচনাস্তম্ভ প্রায়ই পদ্য প্রবন্ধ সকলে শোভিত থাকে। ইহার মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যে সকল কবিতা আমাদের হস্তগত হয়, তাহার অনেকগুলি এরূপ অসাবধানতা ও অযত্ন পূর্ব্বক লিখিত হয়, যে আমরা কেবল রচয়িত্রীদিগের উৎসাহ প্রবর্দ্ধনার্থই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকি। আবার অনেক রচনা বাধ্য হইয়া উপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তজ্জন্য আমরা সময়ে সময়ে লেখিকাদের বিরক্তিভাজনও হইয়া থাকি।

কবিতারচনা অতি দুরূহ ব্যাপার। স্বাভাবিক কাব্য শক্তি না থাকিলে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া দুষ্কর। ভাষা জ্ঞান, অলঙ্কার শাস্ত্র বোধ এবং ছন্দ জ্ঞান কাব্য শক্তির পরিবর্দ্ধক ও সংমার্জ্জক। ইহা-দিগের অভাবে কাব্যরচনা অপ্রযত্ন-

সুলভ স্বাভাবিক কাননের অনুরূপ। স্থানে স্থানে সুগন্ধি পুষ্পলতার প্রাচুর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলই অকর্ম্মণ্য কণ্টকী বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু গুণালঙ্কার-সমন্বিত কবিতা প্রযত্নসেবিত পরিপাটী উদ্যান স্বরূপ। যথা স্থানে সৌন্দর্য্য সকল সজ্জীভূত থাকাতে বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়া থাকে—এমন কি শৃঙ্খলাবিশিষ্ট বলিয়া কণ্টকীবৃক্ষ ও অকর্ম্মণ্য গুল্ম সকলও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভাষার অনেক পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিলে এক প্রকার ভাষা জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র-বোধ সহজে হয় না। বঙ্গ-ভাষায় ব্যাকরণ আছে বটে. কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্র নাই বলিলেই হয়, যা দু একখানি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসম্পূর্ণ, তথাপি তাহার দ্বারা কতকটা কার্য্য চলিতে পারে। আমরা এই অভাব মোচনার্থ বিশেষতঃ আমাদিগের কাব্যরচয়িত্রীদিগের সাহায্যার্থ একখানি অলঙ্কার শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, আশা করি পাঠিকারা তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না।

ছন্দ অলঙ্কারের অন্তর্গত। প্রকৃত ছন্দ জ্ঞানাভাবে যে সকল লেখিকা মনঃকল্পিত ছন্দ উদ্ভাবন করিয়া গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য নষ্ট করিতেছেন, তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ ছন্দ প্রকরণও প্রকটিত হইল। আশা করি রচয়িত্রীগণ ইহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বীয় স্বীয় রচনার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবতী হইবেন।

ছন্দ প্রকরণ।

ছন্দই কাব্যের প্রধান অঙ্গ। ছন্দ না থাকিলে কবিতা হয় না। ইহার ভাষাও স্বতন্ত্র। নিয়মিত বর্ণনিবদ্ধ ভাষার নাম ছন্দ। ছন্দ নানা স্বরে (সুরে) প্রবন্ধিত। কবিগণই ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা। রস, গুণ অলঙ্কার-সমন্বিত উদাত্ত ও অনুদাত্তাদি স্বর দেশ, কাল ও পাত্রবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া চমৎকারজনক হইয়া থাকে। যে কবি যে উপায় দ্বারা সেই স্বর ও ভাব সহজে প্রকাশ করিতে পারেন, সেই উপায়ই তাঁহার প্রিয় ছন্দ। কাব্য রসের সহিত স্বর জ্ঞান না থাকিলে রচনার বৈচিত্র হয় না। কিন্তু কোন রচনা-বৈচিত্রই কবির লক্ষ্য নহে। স্বভাবতঃ কবি শুদ্ধ স্বর দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকেন। আদি কবিগণের প্রণীত মহা কাব্য সকল তাহার প্রমাণ। বিশুদ্ধ তানলয় ও সুর যোগে মহাকাব্য সকল উদ্‌গীত হইত। বাল্মীকির রামায়ণ, হোমরের ইলিয়দ এইরূপ মহাগীতি—মহাকাব্য।

প্রত্যেক মহা কবির স্বতন্ত্র স্বর আছে। এমন কি একজাতীয় ছন্দেও ভিন্ন স্বর * স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলে এক পয়ার ছন্দ কত প্রকার স্বরে গঠিত বা গীত হইয়া থাকে। স্বর

* স্বর তিন প্রকার—উদাত্ত বা উচ্চ স্বর, অনুদাত্ত বা নীচৈঃস্বর এবং সরিত বা মধ্যম স্বর।

ও রচনার সামঞ্জস্য রাখিয়া যিনি বিশুদ্ধ নিয়মানুসারে কবিতা রচনা করিতে পারেন, তিনিই উচ্চ শ্রেণীর কবি। ভারতচন্দ্রের অসাধারণ কবিত্বশক্তি ভূয়িষ্ঠ পাণ্ডিত্য দ্বারা সংস্কৃত হইয়া বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে। তিনি অনেক প্রকার নূতন ছন্দও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং কয়েকটী সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারেও কবিতা রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত "জাতি" অর্থাৎ অত্রেয় প্রণালী ক্রমে বাঙ্গলা রচনা অতীব দুরূহ ব্যাপার; "বৃত্তছন্দ"ও সহজ নহে। ভারতচন্দ্র ব্যতীত কেহই এ পর্য্যন্ত ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এমন কি তাঁহারও প্রবন্ধিত ছন্দেরও দুই এক স্থলে নিয়মের ব্যতিরেক দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে প্রকাশকদিগের অনবধানতা ভিন্ন তাঁহার শক্তির ত্রুটি বলিতে সাহস হয় না।

সংস্কৃত ছন্দ নির্ণয় এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, কেবল বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়েকটী ছন্দ প্রচলিত আছে বা হইতে পারে, ইহাতে তাহারই বিষয় বিবৃত হইবে।

বাঙ্গালা ছন্দ সমস্তই "বৃত্ত" অর্থাৎ অক্ষর গণনা ক্রমে প্রবন্ধিত। ছন্দ অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষরভেদে দুই প্রকার।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ। অমিলন। * এই ছন্দের পদান্তে পরস্পর মিল নাই। যথা

নাহি জানি ভজন, পূজন, ধ্যান, জ্ঞান।
কিরূপে যাইব আমি ভবনদী পারে॥
যদি নিজগুণে দীনে তরান তারিণী।
দীন দয়াময়ী নাম, তবে জানি সত্য॥"

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য-কৌমুদী হইতে এই উদাহরণটী গৃহীত হইল। ইহাতে যতি ভঙ্গ দোষ না থাকিলেও ইহা তাদৃশ সুশ্রাব্য হয় নাই, সুতরাং পূর্ব্বে এইরূপ অমিত্রাক্ষর-রচনার আদর ছিল না। কাজে কাজে ইহার ব্যবহারও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত পূর্ব্ব প্রচলিত যতির পরিবর্ত্তে রোমীয় (যতি) চিহ্ন ব্যবহার করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। যথা,—

"নবলতিকায় সতি! দিতাম বিবাহ
তরুসনে, চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে
দম্পতী মঞ্জরী বৃন্দে আনন্দ সম্ভাষে
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।"

পূর্ব্বতন যতি সংযোগে পাঠ করিলে এই কবিতার কোন অর্থই অনুভূত হয় না এবং সৌন্দর্য্যও উপলব্ধি হয় না। উল্লিখিত উদাহরণ দুইটিই অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দ প্রবন্ধিত। অন্যান্য ছন্দেও অমিত্রাক্ষর রচনা হইয়া থাকে ও হইতে পারে।

যতি।

যতি—পাঠ বিচ্ছেদ বা জিহ্বার ইষ্ট বিচ্ছেদ স্থান। কবিগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক ছন্দানুরোধে যথায় পদান্ত করিয়া থাকেন, সেই খানেই যতি হইয়া থাকে। ছন্দের ন্যায় যতি ব্যবহারও স্বাভাবিক কবির আয়ত্তাধীন। তজ্জন্য পদান্তে যতি "(,)" ও অর্দ্ধ শ্লোকান্তে অর্দ্ধচ্ছেদ বা বিরাম "(।)" এবং শ্লোকান্তে পূর্ণচ্ছেদ "(॥)"

প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গদ্য রচনায় পদ্যের অর্দ্ধচ্ছেদ "(।)" পূর্ণচ্ছেদরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাব্য প্রচলিত যতি বা চিহ্ন। যথা—

যতি (,)

অর্দ্ধচ্ছেদ বা বিরাম (।)

পূর্ণচ্ছেদ (॥)

অধুনা পাশ্চাত্য সাহিত্যানুকরণে রোমীয় চিহ্ন সকল ব্যবহৃত হইতেছে। যথা—

কমা বা যতি (,) বিরাম সময়ের বিশেষ নিয়ম নাই। সচরাচর 'এক' শব্দ উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু বিরাম করিতে হয়। ইহা পাঠকের ইচ্ছাধীন।

সেমিকোলন (;) কমাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া বিরাম। ইহাই পূর্ণচ্ছেদের অর্দ্ধ অঙ্গ।

কোলন (:) পূর্ণচ্ছেদের অঙ্গ। পূর্ব্বপদান্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পিরিয়ড পূর্ণচ্ছেদ (.) বঙ্গ ভাষায় (।) সম্পূর্ণ পদান্তে ব্যবহৃত হয়।

হাইপেন বা ছেদ (-)—ইহা উভয় বাক্যের বা পদের সন্ধিস্থলে বা সমাসযুক্ত হইলে ব্যবহৃত হয়। কখন কখন —ড্যাস আকারে পদের অর্থ ব্যাখ্যার্থেও ব্যবহৃত হয়।

নোট-অব-ইণ্টারোগেসন (?) প্রশ্ন চিহ্ন। প্রশ্নস্থলে ব্যবহৃত হয়।

নোট-অব-এক্সক্লামেসন (!) বিস্ময় চিহ্ন। আশ্চর্য্য, ভয় বিস্ময় ও আহ্লাদসূচক বা অবজ্ঞাব্যঞ্জক পদান্তে ব্যবহৃত হয়।

ইহা ব্যতীত হ্রস্ব স্বর ব্যঞ্জক চিহ্ন (।) কিম্বা দীর্ঘ স্বর ব্যঞ্জক (´) (—) উহ্য (,)।

পেরেন্থিসিস্ কটিবন্ধ () অর্থ-ব্যঞ্জক বা মন্তব্য প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোটেসন (উদ্ধৃত চিহ্ন) ('') বক্তার বাক্য ও অন্যস্থল হইতে উদ্ধৃত পদ প্রকাশক, টীকায় ষ্টার বা নক্ষত্র চিহ্ন (*), ওবিলিস্ক বা স্তম্ভ (†), ডবল ড্যাগার (‡) প্যারালাল বা সমচিহ্ন (॥) ও ক, খ, প্রভৃতি বর্ণ বা ১, ২, ইত্যাদি সংখ্যাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উহ্য স্থলে দুই তিন বা চারি নক্ষত্র চিহ্নও ব্যবহার হয়, যথা (* * * *)

প্রাচীন কাব্যে পদাংশে বা পদান্তে যতি (,), শব্দ শ্লোকান্তে (।) বিরাম ও শ্লোকান্তে (॥) পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হইত। ইহার অন্যথা হইলেই যতিভঙ্গ ইত্যাদি দোষে কবিতা দুষ্ট হইত। কিন্তু এক্ষণে রোমীয় চিহ্ন ব্যবহার দ্বারা সে অসুবিধা অনেকটা নিরাকৃত হইয়াছে। এখন দুই পদের স্থলে চারি বা তদধিক পদে কবিতা সম্পূর্ণ করিয়া পূর্ণচ্ছেদ করিলেও কোন দোষ হয় না, বরঞ্চ আরও চমৎকার হইয়া থাকে। যথা,

"সংসারে যতেক নারী, মোর অংশ তারা।
শিব অংশ সংসারে, পুরুষ আছে যারা ॥১।
প্রকৃতি পুরুষ মোরা, তুই কি জানিবি।
আর কত দিন পড়, তবে সে বুঝিবি ॥২।"

এই দুই শ্লোক পদাংশে যতি (,)

ও শ্লোকার্দ্ধে বিরাম (।) এবং শ্লোকান্তে পূর্ণচ্ছেদ (॥) দ্বারা সমাপ্তি হইয়াছে। ইহা পয়ার ছন্দে প্রবন্ধিত দ্বিপদবিশিষ্ট নির্দ্দোষ কবিতা, প্রাচীন যতি নিয়মে সংরচিত।

আধুনিক রোমীয় চিহ্ন দ্বারা প্রবন্ধিত পয়ার ছন্দের উদাহরণ। যথা:—

"নীরবিলা সুবদনী, বীণাধ্বনি যথা
নীরব ছিঁড়িলে তন্ত্রী; স্ফুরিল না কথা
শোকাবেগে মুখে আর! চির কুহুরিয়া
থামিল বিশ্রাম হেতু কলকণ্ঠপ্রিয়া ॥১।
মৃদু:মন্দ ওষ্ঠাধর কাঁপিল চঞ্চল,—
কাঁপে যথা গোলাপের সুকোমল দল
সুমন্দ বাসন্তানিলে; অথবা কাঁপিয়া
নাচি নাচি বীচি মাঝে হেলিয়া দুলিয়া
চমকে চারু * *! সজল নয়ন
প্রকাশিলা মনোভাব করি বরিষণ ॥২॥

প্রাচীন কাব্যে পয়ার দুই চরণে শ্লোক সম্পূর্ণ করিতে হইত, নতুবা যতিভঙ্গ আদি দোষে কবিতা দুষ্ট হইত; কিন্তু অধুনা চারি চরণে ও তদধিক চরণে এক একটী শ্লোক সম্পূর্ণ হইলেও সুশ্রাব্যতা ও সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হয় না। উদাহৃত শ্লোক দুইটীর একটী চারি চরণে ও অপরটী ছয় চরণে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

'কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।'

প্রিয় বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগিনীগণ সমীপে নিবেদন,

বামাবোধিনী পাঠিকা ভগিনীগণ, আজ একটী নিতান্তই দুঃখজনক বিষয় লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি, জানিনা গুছাইয়া বলিতে পারিব কি না, এবং হৃদয়ের ভাব ভাষায় ব্যক্ত হইবে কিনা! যাহা হউক, আশা করি আপনাদের কোমল হৃদয়ের সহানুভূতি দ্বারা আমার আশা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

আপনাদের মধ্যে সকলেই নিশ্চয় বঙ্গের অমর কবি হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠে বিমুগ্ধ হইয়াছেন ও তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় অবগত আছেন! তাঁহার সুমধুর বীণাঝঙ্কারে কাহার প্রাণ না সুধারসে আপ্লুত হইয়াছে, কেই বা সেই শ্রেষ্ঠ কবিকে হৃদয়ের উচ্চাসন প্রদান না করিয়াছেন?

আমাদের সেই প্রিয় কবি আজ অন্ধ, শুধু অন্ধ নন, পুত্র-শোকাতুর ও জীবিকা-ভ্রষ্ট! যিনি একদিন গবর্ণমেণ্ট উকীলরূপে সকলের বরণীয় ছিলেন, যাঁহার এক একটী বাক্‌চাতুর্য্যে কত শত বিপন্ন পরিবার সহায় সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি সর্ব্ব-লোকপূজ্য এবং সকলের প্রিয় ছিলেন, আজ বিধির বিপাকে তাঁহার এই দশা!!

শুধু উপরোক্ত গুণের জন্যও নয়, এ

গুণ ত কত লোকেই থাকে, কিন্তু মানব-হৃদয়ের উপর কয়জন এরূপ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন ?

যাঁহার স্বদেশ-প্রিয়তা, স্বজাতি-বৎসলতা সর্ব্বজনবিদিত, যাঁহার ভারত-সঙ্গীত ভারতবাসীর প্রাণে প্রাণে শিরা উপশিরায় স্বদেশ-হিতৈষণা, অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগরিত করিয়াছে, আজ সেই কবিবরের এই দশা! যাঁহার কবিতাবলী মানব-জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! ও যিনি বৃত্র সংহারে অদ্ভুত কল্পনাবলে অমর কিন্নর-সেবিত সুখৈশ্বর্য্যময় ত্রিদিবাধিপতি বৃত্রের অভাবিত পরিণাম মানবচক্ষের সম্মুখে মানবের ভাগ্য-চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল দেখাইয়াছেন, সেই অতুল্য কবিশ্রেষ্ঠের ভাগ্যেরও আজ সেইরূপ পরিবর্ত্তন!

যিনি আমাদের মাতৃভাষার কণ্ঠ মহামূল্য রত্ন হারে বিভূষিত করিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এবং এই অত্যধিক স্বদেশপ্রিয়তার জন্য যুবরাজের ভারতাগমনে আনন্দ প্রকাশ করিতে গিয়া স্বদেশের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণে কাঁদিয়া, যুবরাজের নিকট অনাদৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু অপরে তাঁহার নিকট স্তোক বাক্য প্রকাশে পুরস্কৃত হইয়াছে! সেই অনাদৃত কবিই আমাদের শিরোভূষণ চির-আদরণীয়! আমরা কি তাঁহাকে এরূপ ভাবে জীবনের অপরাহ্ণ অতিবাহিত করিতে দিব ? কখনই না!

যিনি প্রতি বৎসর গড়ে ৪৪,০০০।৫০,০০০, টাকা উপার্জ্জন করিয়াও অত্যধিক দীনে দয়া, বিপন্নে সহায়তা, আর্ত্তে অজস্র অর্থ দান করিয়া আজি এই দশায় উপনীত, যিনি জীবনে কখন স্বীয় অমূল্য গ্রন্থনিচয়ের উপস্বত্ব নিজে গ্রহণ করেন নাই, পুস্তক-প্রকাশকেরা যাঁহার গ্রন্থ বিক্রয়ে এই সুদীর্ঘ ৩০।৩৫ বৎসর কাল প্রচুর অর্থ লাভ করিতেছেন! সেই গ্রন্থরাশি-প্রণেতার আজি এই দশা!

সর্ব্বশেষে বলি যিনি ভারত রমণীর চিরবন্ধু, বালবিধবা ও কুলীন কুমারীদিগের দুঃখে যাঁর চক্ষুর শতধারা কবিতালহরীতে প্রবাহিত হইয়াছে, নারী-বৈরীদিগের উপর যাঁহার ওজস্বিনী ভাষা বজ্রনাদে অভিসম্পাৎ করিয়াছে, সেই কবির আজি এই দুর্দ্দশা ভারত নারীগণ কি উদাসীন নেত্রে দর্শন করিবেন ?

এই অন্ধ কবি পুত্র-শোকাতুরা, আজীবন সুখৈশ্বর্য্য-সেবিতা, উন্মাদিনী সহধর্ম্মিণীকে লইয়া এই অসহায় নিঃস্ব অবস্থাতেও হতভাগ্য দেশের বিষয় ভাবিতেছেন ও দেশের দশা দেখিয়া আকুল হৃদয়ে দেশের জন্য হৃদয়-মুগ্ধকারী কবিতামৃত দানে বিপথগামীকে সুপথ দেখাইতেছেন, বিশেষতঃ নিজের দুরদৃষ্টের জন্য দয়াময় ভগবান্‌কে দোষ না দিয়া, যাহাতে সর্ব্ববিধ অবস্থার পরিবর্ত্তনে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না হইয়া তাঁহার পদে মতি স্থির থাকে, তাহার জন্য কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন, এমন যে সুমহান্ উদারচেতা আমাদের চিরপ্রিয় কবি, আমরা কি শুধু বাক্যে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ

করিয়াই নীরব থাকিব? কার্য্যে কিছুই কি করিতে পারিব না?

যে দেশে অমর কবি মধুসূদন এতগুলি ধনী বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়াও বিনা শুশ্রূষায় সাধারণ হাঁসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়া আমাদিগকে চিরকলঙ্কে ডুবাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের কবি হেমচন্দ্রকেও কি সেই ভাবে বিদায় দিয়া আমাদের পাপের ভরা পূর্ণ করিব? না প্রাণপণে সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সেই অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব?

পাঠিকা ভগিনীগণ! দুইটী পথ আমাদের সম্মুখে আছে; কোন্ পথে আমরা যাইব? সহৃদয় গুণগ্রাহী অর্থশালী কোন কোন মহাত্মা কবির জন্য বৃত্তি স্থাপন করিয়া আপনাদের অর্থের সার্থকতা করিতেছেন। উদার-স্বভাব দেবপ্রকৃতি কেহ কেহ কবিবরের জন্য খাটিতেছেন। আমরা বঙ্গ রমণীগণ—আমরা কি কিছুই করিব না? আপনাদের দয়া দাক্ষিণ্য জগৎবিখ্যাত। ভগিনীগণ আপনাদের সেই কোমল করুণ হৃদয়ের একবিন্দু স্নেহবারি হতভাগ্য কবির জন্য কি বর্ষণ করিবেন না? আপনাদের এক কণিকা দয়াও কি সেই বিশ্বপূজ্য অমর কবি পাইবেন না? যিনি কেবল পরকে দিতেই জানিতেন, পরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আজ ভিখারী হইয়াছেন, নিজের জন্য কপর্দ্দকও সঞ্চয় করেন নাই, আজ এই দারুণ অবস্থার পেষণে পড়িয়াও মানিশ্রেষ্ঠ কাহারও করুণার ভিখারী হন নাই, সেই জীবন প্রান্তে সমাসীন কবিকে অবশ্যই আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আনুকূল্য দান করিবেন। আশা করি আমার এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বৃথা যাইবে না।

বামাবোধিনীর অসংখ্য গ্রাহিকাগণের মধ্যে প্রত্যেকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞতার ঋণ কি কিয়ৎ পরিমাণেও শোধ হইবে না? যে বামাবোধিনীর গ্রাহিকা ও পাঠিকাদের মধ্যে মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, সরোজকুমারী, রাণী মৃণালিনী-প্রমুখ মহিলাগণ আছেন, তাঁহারা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তিতে এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে যদি আপনাদের কোমল করুণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্রও উচ্ছ্বাস তুলিয়া আমার চিরারাধ্য কবির প্রতি কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক করিতে পারিয়া থাকি, তবে এ জীবন সার্থক মনে করিব।

প্রিয় ভগিনীগণ, আমি কি ভাবে কি লিখিলাম জানি না। হৃদয়ের প্রবল আবেগ ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আমি যাহা নিবেদন করিতে আসিয়াছিলাম, তাহা যদি কিঞ্চিন্মাত্রায়ও আপনাদিগকে বুঝাইতে পারিয়া থাকি, তবেই আমার সহস্র লাভ। বিনীত প্রার্থনা এই, দোষ গ্রহণ না করিয়া ভগিনীর করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া কৃতার্থ করিবেন। কর্ণপাত করিলেন কিনা দয়া করিয়া জানাইবেন কি? অদ্যকার মত ইতি।

আপনাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনী
কুসুম কুমারী রায়।

পোঃ নবগ্রাম পূর্ব্বভাগ মাণিক গঞ্জ,
ঢাকা।

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ।

ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ যে কি মধুর তাহা বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদ্‌গত করিয়া দেওয়া অসম্ভব। ভ্রাতা ভগিনীর পরস্পর স্নেহ সংযুক্ত প্রেম যে কি বস্তু, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে, পরম শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র জনক জননী যে প্রকার সুখ লাভ করেন, অসদ্ব্যবহার করিলে তদ্রূপ অসন্তোষে কালযাপন করেন। সুতরাং ভাই ভগিনীর প্রতি ন্যায়ানুগত ব্যবহার না করিলে, জনক জননীর প্রতিও সর্ব্বাঙ্গীন কর্ত্তব্য সাধিত হয় না। যাঁহাদের সঙ্গে শৈশবাবধি একত্র বাস হেতু পরস্পরের আনন্দে আনন্দিত, দুঃখে দুঃখিত এবং বিপদে বিপন্ন বোধ করিয়া আসিতেছি, তাহাদিগের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। উহা শিক্ষাসাপেক্ষ নহে। ভাই ভগিনীগণের পরস্পর স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশ পূর্ব্বক সতত মঙ্গলানুষ্ঠান করা অতীব কর্ত্তব্য এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলেও অধুনা প্রায় সকল পরিবারেই ভ্রাতৃবিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কিরূপ আক্ষেপের বিষয়, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। পরিবারের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধরূপ মহাবিষ প্রবিষ্ট হইলে, পরিবারস্থ সকলকে দুঃখে ও অশান্তিতে জর্জ্জরিত করে। এক্ষণকার মনুষ্যগণ যেরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট, তাহাতে স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী উপজীবিকা অবলম্বনপূর্ব্বক দার-পরিগ্রহ করাই বিধেয়। পরন্তু এ কথা স্বীকার্য্য বটে যে, যদি সহোদরবর্গ পরস্পর প্রণয় ও সদ্ভাবে বদ্ধ হইয়া, সপরিবারে একান্নে সুখ শান্তিতে কালযাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদিগের ন্যায় ভাগ্যবান্ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ অতিশয় প্রার্থনীয় সুখামৃত সঞ্চারিত হইবার অতি অল্পকাল পরেই বিদ্বেষ বিষ বাহির হইতে থাকে। ভ্রাতৃগণের প্রত্যেকেরই কৃতী ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, পরস্পরকে স্নেহ যত্ন সহকারে পরস্পরের হিতানুষ্ঠান করা বিধেয়। পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেক আত্মীয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া, সকলকে সুখী করিতে পারিলেই গৃহ শান্তিধামে পরিণত হয়।

প্রভু ও ভৃত্যের যে পবিত্র সম্পর্ক, তাহাও পরমেশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

ভৃত্যদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট সেবা প্রাপ্ত হইতে হইলে, তাহাদিগকে পরুষ বচন না বলিয়া, সদয় ভাবে সর্ব্বদা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভৃত্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার দ্বারা নিজের স্বভাবও কলঙ্কিত হয়। যদি দেখা যায় ভৃত্যের স্বভাব অতিশয় দূষিত ও শাসনের বহির্ভূত, তবে তৎক্ষণাৎ সেই ভৃত্যকে অন্যত্র যাইতে বলাই বিধেয়। কারণ, দুষ্ট লোককে পরিবারের আশ্রয় দিলে, বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। যদি তাহার দোষ ত্রুটি সামান্য হয়, তাহার প্রতি কোমল শাসন বা ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

অতিথি এবং গৃহপালিত জীবদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করাও পারিবারিক কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। অতএব এ দুইটী প্রধান কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিলে, সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তব্য সাধন হইল না জানিতে হইবে।

সাংসারিক সর্ব্ব কার্য্যে নিপুণতা লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। পুরুষ গৃহকার্য্য সম্পাদনোপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া দিবেন ও স্ত্রী সেই সকল দ্রব্য গুছাইয়া লইয়া পরিপাটীরূপে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সুগৃহস্থ হইতে হইলে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে অতি বৃহৎ কার্য্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক কাজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা প্রয়োজন। পরিবারের সকলে যাহাতে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হয়, স্ত্রীলোকের সে বিষয়ে গভীর মনোযোগ দান প্রয়োজন। এ জন্য উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করা ও নিয়মমত পরিশ্রমের বন্দোবস্ত করা বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বে এ দেশের লোকেরা অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ দেশবাসীরা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই রোগ ও জরায় আক্রান্ত হইয়া মানব-লীলা সম্বরণ করিতেছেন, কিন্তু ইহা ইচ্ছা করিলেই আমরা দূর করিতে পারি। ইংরেজ জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, ৫০।৬০ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিরাও রীতিমত ভ্রমণ, কূর্দ্দন প্রভৃতি অঙ্গ সঞ্চালন কার্য্যে সতত রত থাকেন। দীর্ঘজীবী মহাত্মাদিগের জীবনেও পরিদৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই রীতিমত অতি প্রত্যূষে, চারি কি সাড়ে চারিটার সময় শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, পক্ষীদিগের কলকণ্ঠের সহিত স্বীয় কণ্ঠস্বর ও বিধাতার গুণগান মিলিত করিতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থাতেও তাঁহারা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহারা খাদ্য বিষয়েও অতিশয় পরিমিতাচারী ছিলেন। বস্তুতঃ, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি মনোযোগী হইলেই কার্য্যপটুতা লাভ সহজ। আমরা অনেক সময়ে অভ্যাসের দোষে রোগ ভোগ করি ও কষ্ট পাই। আমাদিগের অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিলে, সেগুলি সমূলে বিনষ্ট হয়; অথচ তাহা না করিয়া আমরা কেবল ঔষধ প্রয়োগ করি। আবার

আমরা অনেক সময় অনাবশ্যক কষ্ট, যাতনা ও পীড়া ভোগ করি, এবং সেই রোগ সন্তানদিগকে উত্তরাধিকারসূত্রে দিয়া যাই। ঈশ্বরদত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি সমুদায়ের সুব্যবহার, মিতাচার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, ব্যায়াম, দেহ সম্মার্জ্জন প্রভৃতি দীর্ঘায়ু লাভের অব্যর্থ উপায়। বস্ত্র এবং শয্যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া নিতান্ত উচিত।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক যুবক যুবতী পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রথানুসারে কার্য্য করা, অজ্ঞানতা মনে করেন। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে কতিপয় সুপ্রথা পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সেগুলি অবজ্ঞা করিলে পীড়িত হইতে হয় সন্দেহ নাই। প্রাতঃকালে সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার করিয়া, গোময় প্রক্ষেপ ও সন্ধ্যাকালে পুনরায় চারিদিকের সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার করিয়া, ধূনা দেওয়া অতি আবশ্যক। এতদ্দ্বারা বাড়ীর বাতাস পরিষ্কার হয়, এবং স্বাস্থ্য উত্তম থাকে।

সেফালী।

আজ অদূরে কি মোহন গীতি শুনিতেছি! এই শান্তিরূপিণী গম্ভীরা মনোহারিণী প্রকৃতিদেবীর কণ্ঠ ফুটিয়া যে মঙ্গল-গাথা উত্থিত হইতেছে, তাহা কর্ণে প্রবেশ মাত্র নীরব হৃদয় জাগিয়া উঠিল, নিভৃত অন্তরতম প্রদেশে যে বীণাটী ছিন্নাবস্থায় এতকাল পতিত ছিল, আজি সেও এই মহান্ স্বভাবপূর্ণ সঙ্গীতের তান লয় বিশুদ্ধ স্বরে, সুর মিলিত করিয়া বাজিয়া উঠিল। চক্ষুর সম্মুখে সুর নরের, মানব ও দানবের বিসদৃশ ক্রীড়া প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইতেছি। ভূতলেই যে অমরার শোভা রীতি নীতি বিরাজ করিতেছে! প্রকৃতির এমন বিচিত্র ক্রীড়া-ভূমিতে বসিয়াও কি মন তুমি বলিবে সংসার কেবলি দুঃখের আগার? সখি সেফালি! তোমার শান্তিপূর্ণ ছায়াতে আশ্রয় লাভ করিয়া কতবার বিষম সংসার তাপ ভুলিয়া গিয়াছি। আজিও তোমার কোমল শাখা বাহুর অন্তরালে উপবেশন করিয়া স্বভাবের এত মহা গীতির মধ্যে বালুকণার ন্যায় এ ক্ষুদ্র হৃদয়টী মিশাইয়া দিতেছি। "গাহে যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি, একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।" গগন চন্দ্রাতপের নিম্নে বসিয়া অনেক দিন স্বভাব সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া গিয়াছি, কিন্তু এমন মোহন গীতি কোথাও কি শুনিয়াছি? হীনবুদ্ধি মানব হইয়া এই

মাধুর্য্যমাখা সঙ্গীতের মর্ম্ম কি বুঝিব? তবে এইটুকু বুঝিলাম একতা ভিন্ন বাহ্য ও অন্তর জগতের কোন কাজ সমাধা হয় না। একতাই ঐশিক নিয়ম। যেমন পাষাণ-দেহ হইতে এক একটা ক্ষীণ-নির্ঝর-ধারা কুলু কুলু ধ্বনিতে নীরব গিরিরাজ্য আন্দোলনপূর্ব্বক বেগবতী স্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়া সাগরের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে, তেমনি সুকণ্ঠ বিহগের মধুর কাকলি-ধ্বনি শ্রবণ মাত্র সুষুপ্ত জগৎ জাগিয়া উঠিতেছে। হীন ঝিল্লীও তাহার কর্কশ স্বর তাহাতে না মিশাইয়া নীরব থাকিতে পারিতেছে না। যে মহান্ গায়কের অঙ্গুলী নির্দ্দেশে এই ঘুমন্ত বিশাল জগৎ একতানে মাতিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে কি আমাদেরও হৃদয়-বীণা সমস্বরে মঙ্গলগাথা গাহিবে না? জড়তার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া চমকিয়া উঠিবে না? আমরা গুটীপোকার ন্যায় সংসারজালে অনন্ত উন্নতিশীল আত্মাকে জড়িত করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি, প্রজাপতির ন্যায় কবে মুক্তপক্ষে অনন্ত আকাশপথে ধাবিত হইব? সংসার-মায়া মোহ ধূলিরাশির ন্যায় পৃথিবীতলে পতিত থাকিবে, কিন্তু অমর আত্মা তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া সেই অনন্ত গায়কের সিংহাসনসমীপে মুক্তভাবে বিচরণ করিয়া কৃতার্থ হইবে?

এমন শ্যামলা প্রকৃতির শত শত মোহিনী ছবি জীবনের ভুল ভ্রান্তি ঘুচাইতেছে। শোভাময়ী প্রকৃতির গায়ে জ্বলন্ত অক্ষরে যে মহানাম অঙ্কিত রহিয়াছে, বিষয়জালে আবদ্ধ অন্ধ মানবনেত্র তাহা পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছে না। হীনবুদ্ধি জীব যত দুর্গতিতে ডুবুক না কেন, হৃদয়-বীণা সেই মহান্ গায়কের নির্দ্দিষ্ট তানের সহিত সুর না মিলাইয়া-সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। যে শৃঙ্খলা শক্তিতে আবদ্ধ হইয়া এ বিশাল জড় জগৎ এক অমোঘ নিয়মে চলিতেছে, মানবের দুর্দ্দমনীয় হৃদয় তৎসহ মহা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই চলিতেছে। ইহাই যে সেই অনন্ত শিল্পীর অকাট্য নিয়ম সখি সেফালি! আজি ছিন্ন হৃদয়-তন্ত্রীর আবেগ উপলব্ধি করিয়া তাহা বুঝিলাম। নীলাকাশ, গম্ভীরমূর্ত্তি গিরিমালা, তুষারের অমল শুভ্র ছবি, এই মর জগতেই স্বর্গের দৃশ্য প্রতিফলিত করিয়া হীন হৃদয় বিমুগ্ধ করিল।

মানবহৃদয় অতলস্পর্শ বারিধির ন্যায় চঞ্চল তরঙ্গপূর্ণ। এমন মনোহর স্বভাব-সঙ্গীতধ্বনির সহিত সুভাবের বীচিমালা এ হৃদয়সমুদ্রে তালে তালে নৃত্য করুক, এবং প্রার্থনা করিতে থাকুক, যে মহাস্রোত হইতে এ ক্ষীণ ধারা বাহির হইয়াছে, আবিলতাময় পঙ্কিল ভূমি বিধৌত করিতে করিতে শ্রান্ত জীবনস্রোত পুনঃ সেই পবিত্র প্রেম-সিন্ধুতে মিশিয়া কৃতার্থ ও পরিতৃপ্ত হউক। বোন শেফালি! আজি তোমার ছায়াতে বসিয়া এই কামনা করিতেছি।

শ্রীস্ব—

আর্য্যজাতি।

গোচারণ।

পঞ্চনদ প্রদেশের সরস ও উর্ব্বর ভূমি আর্য্যদিগের কৃষি ও গোচারণ কার্য্যের বড় অনুকূল হইয়াছিল। গো আর্য্যজাতির প্রধান সম্পত্তি ছিল। কোন ক্রিয়া উপলক্ষে পুরোহিতদিগকে গো দান করার প্রথা পৌরাণিক সময়েও দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে জনক রাজা একবার বহুদক্ষিণা যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র গো দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে ঐ দক্ষিণার সময় জনক রাজা সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি ঐ সহস্র গোর অধিকারী হইবেন। এক একটী গোর শৃঙ্গে শত শত পাদ স্বর্ণ সম্বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জনক রাজার বাক্য শ্রবণে কুরু পঞ্চাল দেশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই ঐ দক্ষিণাগ্রহণে অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার শিষ্যকে বলিলেন "এই সকল গো লইয়া যাও, আমিই ইহাদের অধিকারী দেখিতেছি, কারণ অন্য কেহ লইতে সাহসী হইতেছেন না।" এতদ্দর্শনে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যখন একে একে পরাস্ত হইলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য ঐ সহস্র গো লইয়া গৃহে গমন করিলেন। মহাভারতের স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, ঋষিরা শিষ্যদিগকে তাঁহাদের গো-রক্ষণ ও ক্ষেত্র-কর্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

অশ্ব দ্বারাও আর্য্যগণ ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন। বেদে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল প্রদেশে নদ নদী ছিল না, তথায় কূপ খনন করিয়া তাহার জলে কৃষিকার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য তাঁহারা এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। কাষ্ঠনির্ম্মিত একখানি চক্রের নেমিদেশে কতকগুলি কলস শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বাঁধা হইত। গো অথবা অশ্বকর্ত্তৃক চক্র যেমন ঘূর্ণিত হইত, ঐ কলসগুলি একে একে কূপমধ্যে পতিত ও উত্থিত হইত। উত্থিত হইবার সময় কলস গুলির মুখ ঊর্দ্ধদিকে থাকিত এবং পতিত হইবার সময় যেমন অধোমুখ হইত, অমনি জল ভূমিতে পতিত হইয়া ক্ষেত্রাভিমুখে প্রবাহিত হইত।

গোচারণ ও গোপালন ঋষিদিগের একটী পবিত্র কার্য্য ছিল। গো তাঁহাদের এরূপ প্রিয় হইয়াছিল এবং গো-সম্পত্তি এরূপ শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি হইয়াছিল যে, "গোপ", "গোত্র" শব্দ বহু সম্মানাস্পদ হইয়াছে। এখন যাহাকে আমরা "গোপ" বা গোয়ালা বলি, আর্য্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে—

লোকের রক্ষাকর্ত্তাদিগকে সেই "গোপ" নাম দিতেন। যে যে "গোত্র" এখন ঋষি-বংশের পরিচায়ক, সেই সেই গোত্র আর্য্য-দিগের গো-গৃহের নাম ছিল। আর্য্য ঋষি-কন্যারা গাভী দোহন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, সেই জন্য কন্যার নাম দুহিতৃ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

গৃহ-চিকিৎসা।

(হোমিওপ্যাথী)

হুপিং কফ—হুপ শব্দ যুক্ত কাশি।

(Whooping Cough).

নিদান—শ্বাসনালীতে সর্দ্দি লাগিয়া এক প্রকার প্রদাহ হইয়া, এই রোগের উৎপত্তি হয়। আবার কেহ কেহ বলেন ভেগস্ স্নায়ুর কোনপ্রকার পীড়া হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। হুপিং কাশি অতিশয় কঠিন এবং একটী আক্ষেপজনক (Spasmodic) পীড়া।

এই পীড়া সংক্রামক (Contagious), অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরা প্রায় এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। হুপিং কফ দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইয়া থাকে; যাহারা একবার আক্রান্ত হইয়া আরোগ্য লাভ করে, পুন-রায় তাহাদিগের আর আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না। এই পীড়ার স্থায়িত্বের স্থিরতা নাই। চারি হইতে আট সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত এই রোগের ভোগ হইতে পারে, ক্রমশঃ রোগের উপসর্গ বর্দ্ধিত হইয়া মৃত্যুও হইতে পারে।

কারণ।

এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রোগীর নিঃশ্বাস হইতে এই বিষ নির্গত হইয়া বায়ু সহযোগে বহু ব্যাপকরূপে অনেক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। রোগীর শ্লেষ্মা হইতে ও বস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা এই রোগ বিস্তৃত হইতে পারে। শৈত্য সেবন এই পীড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দন্তোদ্গম, দরিদ্রতা ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কারণেও পীড়া হইতে পারে, হামের পরেও এই পীড়া হইতে পারে।

লক্ষণ।

এই পীড়ার লক্ষণ তিন অবস্থায় বিভক্ত করা হইয়াছে :—

প্রথম—সর্দ্দির অবস্থা।

দ্বিতীয়—আক্ষেপিক অবস্থা।

তৃতীয়—হ্রাসাবস্থা।

(১) সর্দ্দির অবস্থা—হুপিং কাশির বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে ২।৪ দিবস গুপ্ত ভাবে থাকিয়া রোগ প্রকাশিত হয়। জ্বর,

মুখ ভার, নাসিকা হইতে সর্দ্দি স্রাব, পুনঃ পুনঃ হাঁচি, চক্ষু লাল ও সজল। প্রথমে কাশি শুষ্ক, পরে ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। মাথা ভার, শরীর অস্থির। এক হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকিয়া আক্ষেপিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(২) আক্ষেপিক অবস্থা—কাশির বৃদ্ধি হয়, হঠাৎ আক্ষেপজনক কাশি হয়, কাশির পূর্ব্বে গলার মধ্যে সুড় সুড় ও কুট কুট করে, ক্রমে ক্রমে অতিশয় ভয়ানক কষ্টদায়ক কাশি হয়, কাশি শীঘ্র শীঘ্র হয়, জোরে শ্বাস টানিতে গেলে হুপ্ শব্দ যুক্ত কাশি হয়, কাশি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, শ্লেষ্মা পরিমাণে অধিক ঘন চটচটে এবং পরিষ্কার, মুখ ও নাসিকা হইতে নির্গত হয়। বারম্বার আক্ষেপিক কাশি, কাশির আক্রমণ ২।৩ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। কাশিতে কাশিতে বমন হয়, কাশির সময় মুখমণ্ডল স্ফীত ও নীলবর্ণ, শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত, রোগী দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হয়। বক্ষঃস্থলের পেশীতে বেদনা; ক্রমে ক্রমে কাশি অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ ও সরলান্ত্র হইতে রক্তস্রাব; অনৈচ্ছিক মল মূত্র ত্যাগ ও আক্ষেপ হয়। পীড়া কঠিন হইলে দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর এবং কোন বিষয় ভাল লাগে না ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই সময়ে বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ফুসফুসে (Lungs) অল্প পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করায় শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ স্বাভাবিক শব্দ অপেক্ষা মৃদু এবং ঐ শব্দ যেন দূর হইতে আসিতেছে, এইরূপ অনুভব হয়। সচরাচর এই পীড়া ৩ হইতে ৫ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অধিক হইয়া ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। ডাঃ মর্টন বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে,এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির জিহ্বার নীচে অতি অল্প পরিমাণে ক্ষত হইয়া থাকে।

হ্রাসাবস্থা—উপরি-উক্ত লক্ষণ গুলি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে, কাশি ও আক্ষেপ ইত্যাদি কম হইয়া যায়। সহজে সাদা বর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয়, বমন নিবারণ হয়, শরীরে বল পাওয়া যায়, ক্রমে ক্রমে সমস্ত লক্ষণ হ্রাস হইয়া ৪।৫ সপ্তাহ পরে আরোগ্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা।

এই রোগের প্রথম অবস্থায় যখন সামান্য সর্দ্দি ও কাশি প্রকাশ পায়, তখন একোনাইট, বেলেডোনা ব্যবহারে উপকার হয়। ডাক্তার লিলিয়েন্থেল বলেন, পীড়ার প্রথম অবস্থায় জ্বর ও রক্তাধিক্য থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহারে আরোগ্য হয়। কাশির সহিত জ্বর থাকিলে একোনাইট ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমে যদি কাশি নরম থাকে, তবে পলসেটিলায় উপকার হয়। এককালে অনেকে এই রোগগ্রস্ত হইলে বেলেডোনা ব্যবহার করা যায়। ডাঃ গরেন্সি বলেন মুহুর্মুহু কাশি, নিশ্বাস লইতে ভয়ানক কষ্ট থাকিলে ইপিকাক ব্যবহারে আরোগ্য হয়। যে সকল শিশুর ক্রিমি আছে, তাহারা এই রোগগ্রস্ত হইলে সিনা প্রয়োগে উপকার

হয়। কাশি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে ইপিকাক, ভিরাট, ড্রসিরা, কুপ্রম, কার্ব্বভেজ লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিবে। কাশির সঙ্গে সঙ্গে নাক মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইলে ইপিকাকুয়ানা, ড্রসিরা দ্বারা উপকার হয়। ডাঃ হানিমান বলেন,তিনি ৩০ ক্রমের ড্রসিরা ব্যবহারে রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। শ্লেষ্মা বমন করিলে টার্ট এমি, ভেরাট, ইপিকা, ড্রসিরা দ্বারা উপকার হয়। ডাঃ বেয়ার বলেন অন্য কোন উপসর্গ না থাকিলে কুপ্রম মেট ব্যবহার করিবে, অনেক চিকিৎসক এই ঔষধের ৩ ক্রমের গুঁড়া ১ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিতে বলেন। কিন্তু ডাঃ বেয়ার বলেন, দিবসে ২ বার করিয়া ২।৩ সপ্তাহ এই ঔষধ ব্যবহারে রোগ আরোগ্য হয়। অন্ত্রে বেদনা থাকিলে নক্স ভমিকা; বক্ষে বেদনা থাকিলে ভিরাট্রাম, কুপ্রম; অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলে আর্স, ভিরাট। ডাঃ হার্টমান (Dr. Hartmann) যদি বুকে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ থাকে, তবে কুপ্রম-এসি, ও এণ্টি-টার পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চার হইলে বেল ও ব্রাই দিবে; সন্ধ্যায় ও রাত্রে কাশির বৃদ্ধি হইলে ড্রসিরা ক্যাল-কার্ব্ব ব্যবহার করিবে। প্রাতে ও বৈকালে অধিক কাশি হইলে নক্স; আহারান্তে রোগবৃদ্ধি হইলে ইপিকা, নক্স; আহারকালে পীড়ার বৃদ্ধি হইলে ক্যালকেরিয়া। ডাঃ হিউজ (Dr. Hugh) বলেন, বালকেরা কাশিবার পূর্ব্বে ক্রন্দন করিলে আর্ণিকা ব্যবস্থা করা যায়। যখন পীড়ার উপশম হইতেছে দেখিবে, তখন লক্ষণানুসারে পলস্, ইপিকা, ডলকা, সলফ ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

একোনাইট—রোগের প্রথমাবস্থায়, সাঁই সাঁই শব্দ, জ্বর থাকে, ১।৩ ক্রম ব্যবহার্য্য।

আর্ণিকা—বৈকালে জল পান করিলে কাশির বৃদ্ধি, কাশি হইবার পূর্ব্বে শিশু ক্রন্দন করে, বুকে বেদনা, রক্ত মিশ্রিত কাশি, ৩।৬ ক্রম।

এণ্টিমোনিয়ম-টার্টারিকম — ক্রমে রোগী দুর্ব্বল, ভুক্ত দ্রব্য বমন, শ্লেষ্মা বমন, আক্ষেপজনক কাশি, গলার মধ্যে সুড় সুড় করে, ৬।১২ ক্রম।

কোনায়ম—আরক্ত জ্বর, হাম অন্তে পীড়া। রাত্রে প্রচণ্ড কাশির বৃদ্ধি, রক্ত মিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা অতি কষ্টে নির্গত, গর্ভাবস্থায় এই পীড়া হইলে, ৬ ১২ ক্রম।

বেলেডোনা—রাত্রে ১৫ মিনিট অন্তর আক্ষেপিক কাশি; শ্লেষ্মার সহিত চাপ চাপ রক্ত উঠে, কথা কহিলে ও শ্বাস গ্রহণকালে কাশির বৃদ্ধি, খিট খিটে, পেটে বেদনা, আলো অসহ্য, অতিশয় শিরঃপীড়া, অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ, দুই প্রহর রাত্রে কাশির বৃদ্ধি, প্রথমে ভুক্ত দ্রব্য পরে পিত্ত বমন, রোগের আরম্ভে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী, ৩।৬।৩০ ক্রম।

ব্রাইওনিয়া—সন্ধ্যার সময় বা রাত্রে আহার অন্তে কাশির বৃদ্ধি, কাশিতে

কাশিতে বমন, কটাবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত, বুকে বেদনা, মল কঠিন, রোগী খিট খিটে, যকৃতে বেদনা, ৩।৬ ক্রম।

আর্সেনিক—নানা প্রকার শব্দ বিশিষ্ট কাশি, ফেনাযুক্ত রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মার উদ্গম, গলার মধ্যে জ্বালা ও সুড় সুড় করিয়া কাশি আরম্ভ হয়, নিদ্রাবস্থায় চম্‌কে উঠা, কাশির সময় মুখ স্ফীত ও নীলবর্ণ, বিবমিষা, পেটে বেদনা, ভয়, অস্থিরতা, দুর্ব্বলতা, উদ্বেগ, নৈরাশ্য, অসাড়ে মল মূত্র ত্যাগ, কাশির পর ঘর্ম্ম, অতিশয় পিপাসা কিন্তু রোগী এককালে অধিক জল পান করিতে পারে না, গরমে ভাল বোধ, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, কাশির পূর্ব্বে মুখ শীতল ও মলিন, ভুক্ত দ্রব্য বমন, ৬।১২।৩০ ক্রম।

নক্স ভমিকা—কাশির সময় পেটে বেদনা, শুষ্ক কাশি, প্রাতে কাশির বৃদ্ধি, শিশুরা কাশির সময় হস্ত দ্বারা মাথা ধরিয়া থাকে, হরিদ্রা বর্ণের শ্লেষ্মা, কোষ্ঠ বদ্ধ, সর্দ্দি থাকে, ৬।১২ ৩০ ক্রম।

ইপিকাকুয়েনা—ইহা এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাতে শ্লেষ্মার সহিত রক্ত উঠে, পাকাশয়ে অসুস্থতা, বমন, সর্দ্দি-জনিত কাশি, আহারকালে ও নিশ্বাস টানিতে গেলে কাশির বৃদ্ধি, ১।৩।৬ ক্রম ব্যবহার্য্য।

ড্রসিরা —অতিশয় প্রবল আক্ষেপিক কাশি, জ্বর, শীত, রাত্রি দুই প্রহরের পর কাশির বৃদ্ধি, শ্লেষ্মা বমন, নাক মুখ দিয়া রক্তস্রাব, পুনঃ পুনঃ কাশি, কণ্ঠ শুষ্ক, রক্ত আমাশয়, উদরাময়, হাত পায়ে বেদনা, হাসিলে কাঁদিলে কাশির বৃদ্ধি, ৩.৩০ ক্রম।

পলসেটিলা—হুপিং কাশির প্রথম অবস্থার, সন্ধ্যায় রোগের বৃদ্ধি, প্রত্যেক বার কাশির পর শ্লেষ্মা বমন, উদরাময়, অস্থিরতা, অনিদ্রা, হাত পা ঠাণ্ডা, ৩।৬ ক্রম।

কুপ্রম-মেট—রোগী কাশিতে কাশিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে. সন্ধ্যাকালে শুষ্ক কাশি, রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা উৎক্ষেপ, চক্ষু বসিয়া যায়, ওষ্ঠ নীলবর্ণ, পিত্ত বমন, সাঁই সাঁই রবে শ্বাস প্রশ্বাস, মুখে ফেনা, শীতল জল পানে আরাম বোধ, সার্ব্বাঙ্গিক আক্ষেপ, দেহ শক্ত, শিরঃপীড়া, শ্বাসকষ্ট, নিদ্রাবস্থায় চমকে উঠা, ৬ ৩০ ক্রম।

কার্ব্বভেজিটেবিলিস—খুস খুসে কাশি, প্রাতে হরিদ্রা বা সবুজ পূযবৎ চটচটে শ্লেষ্মা উৎক্ষেপ, স্বরভঙ্গ, বাগ্‌রোধ, কম্প, তৃষ্ণা, শরীর শীতল, ঘর্ম্ম, চক্ষু ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

ক্যামোমিলা—রাত্রে ও ঠাণ্ডা লাগায় রোগের বৃদ্ধি, শিশু সর্ব্বদা খিট খিটে ও কোলে থাকিতে ভালবাসে, গরম বিছানায় শান্তি বোধ, পচা ডিম্বের মত তরল ভেদ, ৬।১২ ক্রম।

সিনা—নির্দ্দিষ্ট সময়ে আক্ষেপিক কাশি, চাপ চাপ শ্লেষ্মা উঠে. শিশুর চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং অত্যন্ত রাগ, কাশি হইবার পূর্ব্বে ক্ষুধা, পেট-জ্বালা, উদরাময়, অনিদ্রা, ক্রন্দন, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, যাহাদিগের ক্রিমি আছে, তাহা-

দিগের এই ঔষধ উপকারী, ৬।৩০।২০০ ক্রম।

স্কুইলা—কাশিবার সময় হাঁচি হয়। প্রাতে অধিক পরিমাণে মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট রক্তবর্ণ শ্লেষ্মা অতি কষ্টে নির্গত হয়। ঠাণ্ডাজল পানে কাশির বৃদ্ধি, ১।৩ ক্রম ব্যবস্থা।

ফস্‌ফরাস—পীড়ার শেষাবস্থায়, কঠিন উপসর্গ, আক্ষেপিক কাশি, ক্লান্তি, স্বরভঙ্গ, বুকে জ্বালা, বেদনা ও কণ্ডূয়ন, রাত্রে ঘর্ম্ম।

রিউমেক্স—শুষ্ক ক্লান্তিজনক কাশি, স্বরভঙ্গ, ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, বক্ষের বাম দিকে খিল ধরা।

হাইওসিয়ামস—মাথা ধরে, ঠাণ্ডা বাতাসে শয়নে, আহারে আক্ষেপিক কাশির বৃদ্ধি, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও গরম, অতিশয় পিপাসা।

জিঙ্ক-মেট—যৌবনাবস্থায় কাশি, দিবসে পুঁয রক্তমিশ্রিত কাশি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—রোগীর পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আহার দ্রব্যাদি অত্যন্ত লঘু হওয়া উচিত। জ্বর থাকিলে সাগু, এরারুট দিলে যথেষ্ট হইবে। যদি জ্বর না থাকে, তবে পুষ্টিকর খাদ্য দিবে। আহার অন্তে রোগীকে স্থির-ভাবে রাখিবে, রোগীকে ঠাণ্ডা লাগাইতে দিবে না, রোগীর সন্তুষ্টচিত্তে থাকা আবশ্যক। স্থান পরিবর্ত্তন মন্দ নহে। জ্বর না থাকিলে অল্প গরম জলে রোগীকে স্নান করাইবে। মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জলে বক্ষে ও পৃষ্ঠে স্বেদ দিলে উপকার হইতে পারে।

ঔষধ ব্যবস্থা—এই রোগে নিম্ন ক্রম (Dilution) প্রায় ব্যবহৃত হয়। ভাল-রূপে লক্ষণাদি স্থির করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, ঘন ঘন ঔষধ খাওয়াইবে না, এবং শীঘ্র শীঘ্র ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবে না। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রতি দিন ৩।৪ বার, আক্ষেপিক অবস্থায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর, এবং শ্বাসাবস্থায় প্রতিদিন ১ ২।৩ বার ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ডাঃ উ, মু।

জন্তুদিগের ভোজনপ্রণালী।

১। ষ্টার্জিয়ন্ মৎস্যের দন্ত নাই, ইহা শোষণ করিয়া আহার করে।

২। মাকড়সাদের অস্থিময় চোয়াল, তাহা দ্বারা খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া থাকে।

৩। জেলী মৎস্য যে খাদ্য খায়, তাহার চারি দিকে জড়াইয়া তাহার কতক অংশ পোষণ ও শোষণ করিয়া আত্মসাৎ করে।

৪। কৃমীকীটদের মুখও নাই, পাক-স্থলীও নাই। ইহারা জন্তুদিগের উদরের

জীর্ণ খাদ্যের উপরে শয়ন করিয়া চর্ম্ম দ্বারা তাহার রস শুষিয়া খায়।

৫। প্রজাপতি নলের মত একটী শুণ্ড দ্বারা ফুলের মধু শুষিয়া লয়।

৬। মাছি ও মৌমাছিরা শুঁড় বা জিহ্বা দ্বারা তাহাদের খাদ্য শোষণ করে।

৭। কাটঠোকরার জিহ্বা ত্রিফলা অস্ত্রের ন্যায়,গাছ ঠোকরাইতে ঠোকরাইতে যে কীট বাহির হয়, তাহা ঐ জিবের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া টানিয়া লয় ও ভক্ষণ করে।

৮। তারা মৎস্য যে বস্তু আহার করে, তাহা সে আপনার শরীরসংলগ্ন করে, এবং পাকস্থলীর ভিতর দিক্ দিয়া উল্টাইয়া বাহির করিয়া তাহা দ্বারা শিকার জড়াইয়া আহার করে।

৯। মোচা চিংড়ীরা অস্থিময় চোয়াল দ্বারা খাদ্য কতকটা চর্ব্বণ করে, কিন্তু তাহাদের পাকস্থলীতে কয়েক পাটী দন্ত আছে, তাহা দ্বারা চর্ব্বণক্রিয়া সমাধা করে।

১০। তুঁতপোকার দুইটী চোয়াল করাতের ন্যায় আড়াআড়ি ভাবে কার্য্য করে, এবং তাহা দ্বারা আপনার শরীরের ওজনের ৩।৪ গুণ অধিক আহার প্রতিদিন ইহার উদরসাৎ হয়।

১১। রাজ-কর্কট দাড়া দ্বারা খাদ্য চর্ব্বণ করে। খাদ্য মুখে দিবার পূর্ব্বে জঙ্ঘার ভিতরে রাখিয়া চূর্ণ করিয়া লয়।

১২। কার্প-মৎস্যের দন্ত তাহার কণ্ঠ-নালীতে, সেই স্থানে তাহার ভোজন-ক্রিয়াও সম্পন্ন হয়।

১৩। সমুদ্র আর্চিনের পাকস্থলীর চারি দিকে ৫টী করিয়া দন্ত আছে। এক একটী চোয়ালের এক একটী দন্ত কেবল চর্ব্বণের কার্য্য করে না, আহার্য্য বস্তু ভিতর ও নিম্নদিকে টানিয়া হস্তের কার্য্যও করে।

১৪। কিরণ (রে) মৎস্যের মাথার উপর মুখটী আড়াআড়ি প্রসারিত, তাহার মধ্যে চোয়াল চক্রাকারে ঘোরে। চোয়ালে তিন সারি দন্ত। জাঁতিতে যেমন সুপারি কাটে, মোচা চিংড়ী প্রভৃতি ঐ চোয়ালে পড়িলে সেইরূপ কর্ত্তিত হইয়া যায়।

কর্ত্তব্যগিরি।

ঘুমায়ে স্বপন দেখি জীবন সুন্দর!
জাগিয়া আশ্চর্য্য হই—সে সুখজীবন কই?
কেবল কর্ত্তব্য-গিরি
হেরি স্তরে স্তর। ১॥
শৈশব* প্রথম স্তরে কোন জ্বালা নাই।
সুকাজ কুকাজ করি, ফলাফল নাহি ধরি,

* শৈশব বা কৌমারাবস্থা এক হইতে পঞ্চ ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম; বাল্যাবস্থা ছয় হইতে দশ বৎসর; কৈশোরাবস্থা একাদশ হইতে পঞ্চদশ; যৌবনাবস্থা ষোড়শ হইতে ত্রিংশ বৎসর; প্রৌঢ়াবস্থা একত্রিশ হইতে পঞ্চান্ন বৎসর এবং বার্দ্ধক্যাবস্থা ছাপ্পান্ন হইতে অশীতি বর্ষ বা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত।

অনাদরে কেঁদে মরি
স্নেহে গ'লে যাই। ২ ॥
বাল্যস্তরে উঠি ক্রমে বুদ্ধির বিকাশ।
ভাল মন্দ বুঝি যদি তবুও তো নিরবধি,
মন্দ কাজে যত্ন করি
ভাল তে উদাস। ৩ ॥
কৈশোর কঠিন স্তর বন্ধুর বিশেষ।
যতই বর্দ্ধিত জ্ঞান, ততই অস্থির প্রাণ,
প্রসারিত উপত্যকা
দুঃখ আর ক্লেশ। ৪ ॥
যৌবন বিষম স্তর, ভীষণদর্শন।
এক পদ অগ্রে চাড় দুই পদ পিছে পড়ি,
বিশেষ সৌভাগ্য বিনা
উঠে কোন্ জন ? । ৫ ॥
প্রৌঢ় দৃঢ়তর স্তরে উন্নত শিখর !
যতই উপরে যাই ততই দেখিতে পাই,
উঠিছে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ
উত্তর—উত্তর। ৬ ॥
বার্দ্ধক্যের ভগ্ন স্তর ক্ষয়িছে নিয়ত।
এক ধার হ'লে পার অপার অপর ধার,
আবার স্বপন কথা
মনে পড়ে কত ?

বঙ্গ-মহিলা—মানসিক।

(সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত।)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গ-মহিলা মানসিক উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হইলে আমরা কখনই এরূপ উন্নতি দেখিতে পাইতাম না। স্ত্রীশিক্ষার ভাগীরথী-ধারা অতি দ্রুতগতিতে এই অভিশপ্ত জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রবাহিত হইয়াছে; কোনও বারণ বাধা ইহার স্রোতোমুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই। ১৮০৭ সনে হানা মার্সমেন সামন এদেশে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি জানিতেন না, স্ত্রীশিক্ষার এরূপ দ্রুত উন্নতি হইবে। ১৮১৯ সনে ছাত্রীসংখ্যা ৮; ১৮২০ সনে ৩২; ১৮২১ সনে বিদ্যালয়-সংখ্যা ৬, ছাত্রী-সংখ্যা ১৬০; ১৮২৫ সনে বিদ্যালয়-সংখ্যা ৩০, ছাত্রী সংখ্যা ৫০০। আজি সমগ্র বঙ্গদেশে বালিকাদের জন্য প্রবেশিকা বিদ্যালয় ৭, মধ্য-বাঙ্গালা ২২, উচ্চ প্রাইমারী ১১০, নিম্ন প্রাইমারী ২৬১৮, ছাত্রী-সংখ্যা ৫৮,৮০৭। বাঙ্গালার স্ত্রীলোকের সংখ্যা (কুচবিহার, ছোটনাগপুর ও কুমিল্লা ব্যতীত) ৩,৬৭,৩০,৯৪৮। সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার গণনা করিলে বঙ্গদেশে ১,০৪,৮১৫ বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা-সম্মিলনী অল্প উপকার করিতেছে না। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ২৮,৬৯,০৫,৪৫৬, তন্মধ্যে বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্টের সংখ্যা ১,২০,৭১,২৪৯, ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা

৫,৪১,৬২৮। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে পুরুষশিক্ষার ন্যায় তেমন আয়োজন নাই, অথচ বঙ্গদেশে শিক্ষিতা অন্তঃপুরিকাগণের সংখ্যা ব্যতীত এক লক্ষ বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে, ইহা বাঙ্গালার পক্ষে অল্প আনন্দের বিষয় নহে। বঙ্গ-মহিলাগণের মধ্যে পাঁচটী এম, এ, ও আঠারটী বি, এ আছেন; ইহা গর্ব্বের বিষয় মনে করিলে ভরসা করি আমরা অপরাধী হইব না।

স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ ইহার উপকারিতায় অন্ধ ছিলেন না। আর্য্য বিদুষীগণের নাম স্মরণ করিলে এরূপ বর্ব্বর কে আছে যে, তাহার সর্ব্ব-শরীর ভক্তি বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত না হয়? এই বিদুষী রমণীসমাজের ক্রোড়ে এক অমিত-তেজা পুরুষপংক্তি প্রতিপালিত হইয়াছিল, ইহাঁরা একদিন স্বদেশসেবক ছিলেন। বঙ্গমহিলার মানসিক উন্নতি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের তদ্রূপ শৌর্য্য-সম্পদ্ প্রদান না করিলে স্ত্রীশিক্ষায় কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবে না। যাঁহারা মনে করেন, জননী অশিক্ষিতা হইয়াও রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় মহাপুরুষ গর্ভে ধারণ করিতে পারেন, আমরা তাঁহাদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। ঈশ্বরচন্দ্র শিশুবোধ পড়িয়া বিদ্যাসাগর হইয়াছিলেন, সুতরাং সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজন নাই, যাঁহারা এইরূপ যুক্তি অস্ত্র অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সহিত তর্কেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষায় এদেশে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের ভরসা কি, বলিয়া যাঁহারা প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রশ্ন শ্রোতব্য ও আলোচনাযোগ্য। মহিলা-সমাজের সুহৃদ্গণ এই প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীশিক্ষা পরিচালন না করিলে অতর্কিতে অনিষ্টপাত অসম্ভব নহে

আমরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের ভরসার জন্য আশান্বিত থাকিতে অনুরোধ করি। ইহার সুফল সুস্পষ্টরূপে দেখিবার এখনও সময় হয় নাই। অন্য উপকারের কথা আলোচনা করিতে চাই না; বঙ্গ-মহিলার মানসিক উন্নতিতে বাঙ্গালা সাহিত্য এক ললিত শ্রী ধারণ করিয়াছে। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী, শ্রীমতী কামিনী, শ্রীমতী মানকুমারী, শ্রীমতী গিরীন্দ্র-মোহিনীর লিপিকুশলতা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। ইহাঁদের ভাষায় আলঙ্কারিক গুণপনার সমালোচনার এ সময় নহে; ইহাঁরা সাহিত্যের যে শ্লীলতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহা তাঁহাদের মহিলাধর্ম্মের অনুরূপ—তাহা পুরুষসমাজের সাহিত্য-কর্ণধারগণেরও অনুকরণীয়। পরিতাপের বিষয়, আশ্বিনের ভারতী "তুমি বুঝি মনে ভাব" সঙ্গীতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভাবনার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, স্বয়ং ভারতীও এই সঙ্গীত বীণা-বদ্ধ করিতে সঙ্কুচিতা হইতেন।

বঙ্গমহিলার মানসিকতা সময়ের সৃষ্টি। সুশিক্ষিত পুরুষ-সমাজের পার্শ্বে অশিক্ষিতা

বঙ্গমহিলা শোভা পাইত না। আমরা কেবল শোভার কথা বলিতেছি না, বঙ্গমহিলার মানসিকতায় পুরুষসমাজে উন্নতির এক উগ্র মদিরা ঢালিয়া দিয়াছে। মহিলাসমাজের যোগ্য হইবার জন্য পুরুষ-সমাজের চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ। স্ত্রীজাতির গুণপনার প্রসার যত বিস্তৃত, পুরুষজাতির উদ্যমশীলতার প্রখরতাও তত তীক্ষ্ণ। প্রাচীন রোম ও গ্রীক ইতিহাসের উল্লেখের প্রয়োজন নাই, রাজপুতানার ইতিহাস এ বিষয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছে। মহিলাসমাজের মানসিক উৎকর্ষ ইউরোপের হৃদয়ে ভক্তি, বাহুতে বল, মনে স্ফূর্ত্তি, আত্মায় আরাম। আজি যে বোয়ার জাতি সাহস ও স্বাধীনতা-স্পৃহায় সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, স্ত্রীজাতির মনের উৎকর্ষ তাহার অন্যতম মূল। ইংরেজ মহিলাগণ মদ্যপান নিবারণে বীরের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। বেরনেস ভন সাটনারের "অস্ত্র বিসর্জ্জন" গ্রন্থ ইউরোপে শান্তি সংস্থাপনে কি তুমুল আন্দোলনই না উপস্থিত করিয়াছে! সেদিনের মহিলা মহাসমিতির সুশৃঙ্খলাবদ্ধ অধিবেশন এক স্মরণীয় ঘটনা। বঙ্গমহিলা-গণ যে দিন তাঁহাদের মানসিকতা কার্য্য-ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন, সে দিন এক শুভদিন। মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম সাহেব মুসলমান মহিলা শিক্ষার একটী সদুপায় করিয়া অশেষ ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের দুই হস্ত। আমরা হিন্দু ও মুসলমান বঙ্গমহিলার মানসিক উন্নতিতে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে অন্তঃপুরে বিলা-সিতা প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া সকলেই প্রমাদ গণিতেছেন। অনেকে মহিলা-সমাজে পুরুষানুকারের ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। পুরুষসমাজেই হউক, কিম্বা রমণীসমাজেই হউক, বিলাস-বাসনা বিনাশের পথ মুক্ত করে; সর্ব্বপ্রযত্নে বিনাশের সহস্র হস্ত দূরে থাকিতে হইবে। স্ত্রীলোকের পুরুষানুকারিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, উহা স্বভাবের নিয়মেই লয় পাইবে। শিক্ষায় মহিলাসমাজে যে একটী সৌন্দর্য্য-স্পৃহা ও শৃঙ্খলাপরতা জাগাইয়া তুলিতেছে, তাহা কখনই নিন্দনীয় নহে। উহার অন্তরালে একটী সুশোভন অঙ্কুর গুপ্ত রহিয়াছে। অনেকে "বীণারঞ্জিত পুস্তক-হস্তে" বাগ্‌দেবীর অতি উত্তম বন্দনা মনে করিলেও অন্তঃপুরে ঐরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহাদের আশঙ্কা এই, এইরূপ ভারতীর আবির্ভাবে দু'সন্ধ্যা অন্নদাত্রী অন্তর্হিতা হইলে উদরের উপায় কি? সাধ করিয়া কে লক্ষীছাড়া হইতে চায়? ভারতবাসী ভারতী চায়, কিন্তু তাই বলিয়া লক্ষ্মী বিসর্জ্জন করিতে পারে না। লক্ষ্মী সরস্বতীর সম্মিলনে বর্ত্তমানের উন্নত জাতি সকল গঠিত হইয়াছে। ভারতবাসীকেও সেই শুভ সম্মিলন করিতে হইবে। বিপত্তি ভাবিয়া কেহ যেন বঙ্গ-মহিলার মানসিক উন্নতির বিরোধী না

হন। কোন্ শ্রেয়ঃ কার্য্যে বিপত্তি নাই? বিপত্তি বারণেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

ভারতবর্ষে জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। স্ত্রীজাতির উন্নতি, আশা ও আদর্শানুরূপ হইলে ভারতবাসী শক্তি ও সম্পদের পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে। মাতৃস্তন্যে শিশুর শরীরে অজ্ঞাতসারে অমিত বল সঞ্চারিত হয়। জননীর নিকট শিক্ষা না পাইলে শিশু মানুষ হইতে পারে না। দেড় শত বৎসর ইংরেজী শিক্ষার সহায়তা পাইয়াও আমরা কত নিম্নস্তরে পড়িয়া আছি! কেবল জাতীয় মহাসমিতি, কেবল শ্রমশিক্ষা-সমিতি আমাদিগকে কার্য্য শক্তি প্রদান করিবে না। মানসিক শক্তিসম্পন্না মহিলাই মূর্ত্তিমতী সরস্বতী। তাঁহারা মাতৃরূপে এ জাতিকে গঠন করিয়া না তুলিলে এ মৃতজাতি "জাতি" নামের যোগ্য হইবে না। বঙ্গমহিলার শিক্ষার পথে এখনও সকল বাধা বিপত্তি দূর হয় নাই। গত শত বর্ষে যে মানসিক উন্নতি হইয়াছে, তাহা একটী জাতি গঠনের প্রয়োজন অনুসারে অতি অল্প। বিংশ শতাব্দীতে আমরা নারীজাতির বিশেষ উন্নতি দেখিব বলিয়া ভরসা করতে পারি। যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী, তাঁহাদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত। যে সকল মগ্ন শৈলে বালক শিক্ষার বিভ্রাট ঘটিতেছে, তাঁহারা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীজাতির মানসিক শিক্ষায় অধিক সাবধান ও যত্নবান্ হইলে এ দেশের অদৃষ্ট কখনই অপ্রসন্ন থাকিবে না।

ইলিয়ড।

(১১৬-১১৭ সংখ্যা—১৮৬ পৃষ্ঠার পর)।

মহাক্রোধে আকিলিস বর্ষে বাক্যবাণ
অগ্নিবাণ সম "হে দানব নৃপাধম!
ভীরুতা ঔদ্ধত্যে পূর্ণ হৃদয় তোমার,
সাহস বিক্রম তব সারমেয় সম।
ওরে মূর্খ কাপুরুষ! অজেয় অভেদ্য
গুপ্ত অরিব্যূহসহ করিতে সমর
কবে তুমি সেনানীর হয়েছ অগ্রণী?
কিম্বা হে দাম্ভিক! অতুল বীরত্ব ভরে
নির্ভীক অন্তরে ভীষণ সম্মুখ রণে
পশেছ কি কভু ঘোর শত্রুদল সহ
যুঝি প্রাণপণে লভিতে বিজয় কিম্বা
মরিতে সদলে? তুমি শুধু রণক্ষেত্রে
থাকি দূরে দূরে মরিতে সাহসী জনে
দাও হে আদেশ! হে দুর্ম্মদ পশ্বধম!
কর নিপীড়ন তব অধীন কিঙ্করে।
দাস জাতি পরে প্রচণ্ড ও কোপানল
করহ বর্ষণ –যারা হারায়েছে ভীরু!
অতীত কালের উচ্চ স্বাধীনতা জ্ঞান—
অবাধে সহিছে যারা অত্যাচার তব;
নহিলে জানিও গর্ব্বী এই অত্যাচার

নিশ্চয় প্রেরিত তোমা শমন সদনে।
পরশি এ রাজদণ্ড সুপবিত্র চির,
মম অলঙ্ঘ্য শপথ—নহে খণ্ডিবার
তব পক্ষ হ'তে আমি চিরদিন তরে
লইনু বিদায়। হে দুর্ম্মতি জেনো সার
প্রদীপ্ত লৌহমণ্ডিত ভীম রাজদণ্ড—
শোভে মম করে যথা যোভের অশনি-
রাজক্ষমতার নিদর্শন সুবিদিত।
পরশি সে রাজদণ্ড করিনু শপথ
ভীষণ অলঙ্ঘনীয়—যবে গ্রীস পুনঃ
হয়ে বিমর্দ্দিত ঘোর ট্রোজান আহবে
আহ্বানিবে আকিলিসে রক্ষিতে তাহারে,
জানিও হইবে তার বৃথা সে আহ্বান।
হে দুর্ম্মতি! মদমত্ত বীরেন্দ্র হেক্টর
আসিবে কৃতান্ত সম যুঝিতে যখন,
আচ্ছাদিত শব দেহে শোণিতরঞ্জিত
হবে সিন্ধুকূল, মোর প্রতি এই ঘৃণ্য
অপমান হেতু ঘোর অনুতাপানলে
হবে সন্তাপিত। ভীষণ বিগ্রহে হায়!
হইয়া অক্ষম রক্ষিতে বিপুল চমূ
গ্রীক দলবলে করিবে আক্ষেপ যবে,
তখন বুঝিবে মূঢ়! মহা ক্ষুব্ধ মনে
ঘোর অবিচার তব আকিলিস প্রতি—
বীর অরি তব।" বলিয়া এতেক শূর
সমুজ্জ্বল স্বর্ণময় নক্ষত্রে খচিত
রাজদণ্ড মহাবেগে নিক্ষেপি ভূতলে
বসিলা নীরবে যবে ঘৃণা রোষ ভরে,
তুল্য ঘৃণা রোষ ভরে নরেন্দ্র অমনি
ভীষণ ভ্রূকুটী ভঙ্গী করিলা সঘনে।

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা।

শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা একটী সুপ্রসিদ্ধ পুণ্য উৎসব। এই রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হয়—এমন কি কোন কোন বার এত যাত্রী হয় যে ১৯.২০ টা গবর্ণমেণ্ট হাউস পূর্ণ হইয়া যায়; পরিশেষে পথে, ঘাটে, মাঠে, সড়কে ও ট্রেণের ধারে যাত্রীরা গাদা হইতে থাকে। ইহাতেও যখন কুলান হয় না, তখন বালীতে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে যাত্রীরা যাইতে থাকে এবং সেই তরঙ্গ-ধৌত প্রস্তর কঙ্কর বিশিষ্ট বালীর উপরে অল্প ছায়াময় ঝাউ বৃক্ষের তলদেশে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে অথবা ঝমাঝম বৃষ্টিজলে সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। রথযাত্রার কিছু দিন অগ্রে স্নান-যাত্রা হয়। এই স্নানযাত্রার পূর্ব্ব হইতেই যাত্রীরা শ্রীক্ষেত্রে আসিতে আরম্ভ করে এবং জগন্নাথ দেব রথারোহণ করিলেই স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়। সেই জন্য একটা কথা আছে "এক পা রথে এক পা পথে' "ঠাকুর রথে, যাত্রী পথে।" অনেক যাত্রী তল্পি মাথায় করিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে

আগমন করে এবং রথে বামন মূর্ত্তি দর্শন করিয়াই ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হয়। অনেকের পক্ষেই জগন্নাথের উল্টারথ দর্শন ঘটিয়া উঠে না। কেহ ঠাকুর রথে উঠিলেই চলিয়া যায়, কেহ দুই দিন পর, কেহ তিন দিন পর কেহ পাঁচ দিন পরও দেশে ফেরে। কিন্তু যাই যাই করিয়াও অনেক লোক থাকিয়া যায়। অন্যসব লোক চলিয়া যাওয়ার পরও যে সব লোক থাকে, তাহাও গণনা করা অসাধ্য। যাহারা যায়, তাহারা অল্লায়াস সহ্য করিয়াই বাঁচে। আর যাহারা উল্টারথ দর্শনেচ্ছু হইয়া থাকে, তাহারা জীবিত অবস্থায় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। সে যন্ত্রণা বর্ণনাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরিশেষে ইহাদের কষ্ট কর্ত্তৃপক্ষেরও অনিবার্য্য হইয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে শবের উপর শব, মুমূর্ষুর উপর মুমূর্ষু! সড়কের উপর মৃত দেহ, ড্রেণের মধ্যে মৃত দেহ, বৃক্ষতলে ও যেখানে সেখানে মৃত দেহ। মৃত দেহ ব্যতীত সহরে অন্য কিছু দৃষ্টি-গোচর হয় না। * এই বিষম মহামারীর জন্য সহরের সমুদয় পুকুর ও কূপের জলই দূষিত হইয়া যায়। এ দিকে আবার বহু লোকের সমাগম জন্য আহারীয় খাদ্য সামগ্রী সকল দারুণ দুর্মূল্য হইয়া উঠে। অতএব অল্প মূল্যের অতি খারাপ খাদ্য আহার ও সেই দূষিত জলপান করিয়া লোক সকলের পীড়া দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন অগত্যা কর্ত্তৃপক্ষেরা সেই সব দূষিত জল ও সেই সব কদর্য্য খাদ্য কেহ স্পর্শ করিতে না পারে এমন বিধি ব্যবস্থা করেন। তখন পানীয় জল ও আহারীয় সামগ্রীর অভাবে সেই হতভাগ্য লোকদিগের 'হা হতোঽস্মি' বাড়িয়া উঠে। তখন দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত যাত্রীদল বড় সাধের তীর্থ শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র পলায়নের চেষ্টা দেখে। কেহ ভেদ বমনে কাতর হইয়া ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিতে থাকে। কেহ বা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কাতরাইতে কাতরাইতে ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হয়। কেহ স্ত্রীপুত্রকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যায়। কেহবা পরম আত্মীয়ের নিকট বিদায় লইয়া ঘোর আর্ত্তনাদের সহিত শিরে করাঘাত করিতে করিতে যায়। কিন্তু হায়! তখন আর সহজে শ্রীক্ষেত্র ছাড়ার উপায় থাকে না। সে সময় পুরীর ষ্টেশন যমালয় সদৃশ হইয়া উঠে। (ক্রমশঃ)

* এ বৎসর ওলাউঠার মহামারীতে এই দৃশ্য যার-পর-নাই ভয়ানক হইয়াছিল।

উপদেশমালা।

১। খৃষ্টের প্রিয় শিষ্য পিটারের সম্বন্ধে একটী অতি সারগর্ভ গল্প কথিত আছে। গল্পটি এই:—একদা ঈশ্বর বায়ু-সেবনার্থ স্বর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পিটার

স্বর্গের দ্বারে দ্বারবান্। ঈশ্বর বহির্গমন-কালে পিটারকে আদেশ দিয়া গেলেন "দেখিও আমার অনুপস্থিতিকালে যেন কেহ স্বর্গে প্রবেশ করিতে না পারে।" তাঁহার বহির্গমণের কিয়ৎকাল পরে এক ধোপা স্বর্গের দ্বারে উপনীত হইল। পিটার আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেম "তুমি কি চাও?" ধোপা বলিল "আমি স্বর্গে প্রবেশ করিতে চাই।" তখন পিটার বলিলেন "ঈশ্বরের হুকুম নাই, চলিয়া যাও।" ধোপা অনেক অনুনয় করিল, কিন্তু পিটার ক্রমশঃ উত্ত্যক্ত হইতে লাগিলেন, অবশেষে ধোবাকে "নাছোড়বন্দা" দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধান্বিত হইয়া ঈশ্বরের পদ রাখিবার আসন খানি ধোপার গায়ে নিক্ষেপ করিলেন। আসন গড়াইতে গড়াইতে ভূতলে পতিত হইল। ধোপা বিফল-মনোরথ হইয়া স্বর্গ-দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এ দিকে ঈশ্বর বায়ু সেবনানন্তর স্বর্গে ফিরিয়া আসিলেন। উপবেশন করিয়া পদ রাখিবার আসনখানি দেখিতে পাইলেন না। পিটারকে জিজ্ঞাসা করাতে পিটার আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। তখন ঈশ্বর বলিলেন "দেখ পিটার, আমি যদি তোমার মত উত্ত্যক্ত হইতাম, তাহা হইলে স্বর্গে একটী জিনিষও দেখিতে পাইতে না, তোমার ন্যায় একখানি দুইখানি করিয়া সকল জিনিশ ছুড়িয়া কাহাকে না কাহাকে মারিতে হইত। লোক সকল অহর্নিশ আমায় এত বিরক্ত করে যে পর্ব্বতপ্রমাণ ক্ষমা না থাকিলে তাহাদের রক্ষা থাকিত না! পিটার ক্ষমা শিক্ষা কর, কেহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিলে বিরক্ত হইও না। বিরক্তিতে চিত্তে অশান্তি আনয়ন করে, ক্ষমাই শান্তির কারণ।"

এইটী একটী গল্প মাত্র। কারণ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের বাসস্থানের জন্য স্বর্গ বলিয়া কোন স্থান নাই, ঈশ্বরের বায়ু সেবনের প্রয়োজন হয় না, কিম্বা তাঁহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরেও যাইতে হয় না। পিটারও স্বর্গের দ্বারবান্ নহেন। কিন্তু গল্পটি এইরূপ সুকৌশলে রচিত হইয়াছে যে ইহা হইতে একটী সারগর্ভ উপদেশ লাভ করা যাইতে পারে। কেহ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিলে আমরা তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হই, ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মে। অনেক সময় পিটারের ন্যায় বিরক্তি-উৎপাদককে আঘাত করিতেও উদ্যত হই। কেহ বা লগুড় ধারণ করে, কেহ বা বাক্য বাণ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা একবার যদি ঈশ্বরের ক্ষমা এবং ধৈর্য্যের বিষয় আলোচনা করি, তাহা হইলে কত না উপকৃত হই! তিনি নাস্তিক ভণ্ড পাষণ্ডদিগকেও আস্তিক বিশ্বাসীর ন্যায় রক্ষা করিতেছেন। নাস্তিক তাঁহাকে অস্বীকার করিল বলিয়া—পাপাচারী তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিল বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করেন না। "পরি-

ত্রাণায় চ সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং” এই শ্লোক মানবীয় ভাবে রচিত। ঈশ্বরের শত্রু মিত্র সমান, তিনি দুষ্কৃতদিগকে বিনাশ করিলে পৃথিবী একদিনে স্বর্গধাম হইয়া যাইত অর্থাৎ পৃথিবীতে আর পাপ থাকিত না। কিন্তু পৃথিবীতে বরঞ্চ বিপরীত দৃশ্য দেখিতে পাই। ইহাতে ঈশ্বরের অপরিসীম ক্ষমারই পরিচয় দিতেছে। ঈশ্বর যদি মানবের উপাস্য হন এবং উপাস্যের অনুকরণ যদি উপাসকের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক নর-নারীর তাঁহার অসীম ক্ষমার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

২। একদা কোন বৈষ্ণব পথিক সন্ধ্যা-সময়ে এক গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। অসময় হইয়াছে আর পথ চলিতে পারেন না, পথিমধ্যে একজনকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “মশাই! এই গ্রামে কোনও বৈষ্ণবের বাড়ী আছে কি না, থাকিলে আপনি আমায় দয়া ক'রে দেখিয়ে দিন, আমি রাত্রিকালে তাঁর বাড়ীতে অতিথি হব।” পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলিলেন “এই গ্রামে সকলেই বৈষ্ণব, ইহা বৈষ্ণবেরই গ্রাম, আপনি যাঁর বাড়ী যাবেন, তিনিই আপনাকে সাদরে গ্রহণ কর্ব্বেন, অতিথি সেবার জন্য এই গ্রামের লোক সকল প্রসিদ্ধ।” বৈষ্ণব পথিক এই আশ্বাসবাণী পাইয়া অগ্রসর হইলেন এবং প্রথমতঃ যে বাড়ী পাইলেন, সে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গৃহস্থ আগন্তুককে দেখিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিক বলিলেন “মশাই! অসময় হইয়াছে, আমি এক বৈষ্ণবের বাড়ীতে অতিথি হইতে চাই। পথিমধ্যে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে এই গ্রামে আপনারা সকলেই বৈষ্ণব, তাই আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছি।” কথা শুনিয়া গৃহস্থ বলিলেন “মশাই, অমন কথা বলবেন না। আমি নরাধম, আমি কি বৈষ্ণব হ'তে পেরেছি? এই গ্রামে আমা ছাড়া আর সকলেই বৈষ্ণব। আপনি অতিথি হইলে আমি কৃতার্থ মনে কোর্ব্ব, কিন্তু বৈষ্ণব বলিয়া যদি আপনি এখানে থাকিতে চান, তা হলে আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ কর্ত্তে পারি না।” পথিক এই উত্তর শুনিয়া দ্বিতীয় বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, তথায়ও ঠিক্ সেই উত্তর শুনিতে পাইলেন। এই-রূপে তিনি বাড়ীর পর বাড়ী ভ্রমণ করিয়া সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কেহই আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইল না, পক্ষান্তরে আর সকলকেই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিল। গ্রামবাসীদিগের ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া পথিকের আত্মদৃষ্টি খুলিল। এত দিন তাঁহার মনে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান ছিল, কিন্তু বৈষ্ণব হইতে হইলে যে সর্ব্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিতে হয় ‘‘তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” তৃণ হইতে সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানী হইয়া সকলকে যথোপযুক্ত সম্মানদানপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হয়, তাঁহার

এই বুদ্ধি ছিল না। বৈষ্ণব গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার আত্মভ্রম ঘুচিয়া গেল। তাঁহার প্রাণে দীনতার আবির্ভাব হইল, তিনি তৎপরে এক গৃহে আতিথ্য গ্রহণক রাত্রি যাপন করিলেন। এই বৈষ্ণব গ্রামের বৈষ্ণবদিগের চরিত্র অনুধ্যান করিলে দুইটি মহত্ব লক্ষিত হয়। প্রথম প্রত্যেকের অভিমান-রাহিত্য, দ্বিতীয় অন্যের গুণানুবাদ কীর্ত্তন। সংসারের লোকদিগের চরিত্র ইহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অপরের চরিত্রের যাদৃশী সমালোচনা হইয়া থাকে, আত্ম চরিত্রের তাদৃশী হয় না। কর্ণ পাতিয়া রাখিলে চতুর্দ্দিক্ হইতে পরনিন্দা ও আত্মপ্রশংসার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়—কিন্তু বৈষ্ণব গ্রামে আত্মনিন্দা ও পরপ্রশংসা হয় বলিয়া উহাকে বৈষ্ণব গ্রাম বলা যাইতে পারে। যদি কেহ জীবনপথে ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে এই নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। মনুসংহিতাতে আছে, "ব্রহ্মচারীর উভয় নিন্দা এবং পরিবাদ বর্জ্জনীয়।" ব্রহ্মচারী ধর্ম্মপথের প্রথম সোপানারোহী। প্রাচীন সময়ে ব্রাহ্মণগণই ধর্ম্মসাধনের অধিকার পাইয়াছিলেন, সুতরাং ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের জন্য ঐ উপদেশ রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সকল বর্ণের স্ত্রী-পুরুষগণই ধর্ম্মপথের যাত্রী হইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাই সকলের সম্বন্ধেই মনুর উপদেশ খাটে। প্রত্যেকের এই উপদেশের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীচণ্ডী কিশোর কুশারী।

শিব-রহস্য।

দেবাদিদেব মহাদেব কৈলাসশিখরে বাস করেন। কৈ শব্দে কৈবল্য মুক্তি, লাস শব্দে বিলাস এবং শিখর শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অর্থাৎ যেখানে নির্ব্বাণনামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি বিরাজমান, তাহাকে কৈলাস বলে। সুতরাং কৈলাসশিখর শব্দে কোন পর্ব্বতের চূড়া নহে। যিনি মহাদেব, আমাদিগের ন্যায় তাঁহার পর্ব্বতচূড়া প্রভৃতিতে বাসস্থান হইতে পারে না। এই জন্য কৈলাসশিখরকে সাক্ষাৎ শৈব পদ অর্থাৎ শিবলোক বলা যায়।

শিবলোক অত্যন্ত মনোহর। সংসারের যাবতীয় উৎকৃষ্ট পদার্থই তথায় বিরাজমান। কল্পবৃক্ষ ও কল্পলতা সকলে উহার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত। বৈষ্ণব, শাক্ত ও গাণপত্য প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায় তথায় বাস করেন। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ এবং কান্তি (দীপ্তি), পুষ্টি (ধনধান্য, পুত্রকন্যা, যশঃ প্রতিপত্তি, বিদ্যা বুদ্ধি, বলবীর্য্য ইত্যাদি পরম প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয় বিষয় সকলের কোন দিকে কোনরূপ অভাব না থাকা), ক্ষমা,

সত্য ও দয়া এই পঞ্চ সাত্ত্বিক ভাব সাক্ষাৎ বিরাজমান থাকাতে ঐ শিবলোক যারপর নাই শোভমান। তথায় সকল ঋতুতেই সকল ঋতুর কুসুম সমুদায় বিকশিত হইয়া যুগপৎ আমোদ ও সুষমা বিস্তার করে এবং শীতল সুগন্ধি গন্ধবহ মৃদুমন্দ সঞ্চরণপূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বদাই উপবীজিত করিয়া থাকে। অপ্সরাগণের সুমধুর গীতিধ্বনিতে উহার চতুর্দ্দিক্‌ প্রতিধ্বনিত। শিবলোকে ভদ্র নামে সুবিখ্যাত পাদপ সকল বিরাজ করিতেছে। তাহাদের ছায়া চিরস্থায়িনী এবং তাহারা কল্পবৃক্ষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই জন্য উহা যেরূপ স্নিগ্ধ, সেইরূপ নয়ন মনের প্রীতিজনক। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমুদায় লোক ও লোকপাল ঐ স্থানে লীন হয়। ঋতুরাজ বসন্ত মধুমত্ত মধুব্রত, কলকণ্ঠ কোকিলকুল প্রভৃতি সহচরগণের সহিত সর্ব্বদাই এই প্রদেশে বিরাজমান আছেন। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণ উহাকে আবৃত করিয়া সমধিষ্ঠান করিতেছেন। তথায় রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, এই জন্য উহার শোভা সমৃদ্ধি ও গৌরবেরও সীমা নাই।

এই শিবলোকে তেজঃপুঞ্জ-সমুদ্ভাসিত চরাচর-জগৎপিতা দেবাদিদেব মহাদেব মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মসমাধি (একমনে আত্মস্বরূপকে চিন্তা করা) সাধন করিতেছেন। তিনি সদাশিব (সৎ—আ, শিব; সৎ শব্দে নিত্য বর্ত্তমান, আ শব্দে সর্ব্বব্যাপী ও শিব শব্দে সর্ব্বমঙ্গলময়) ও সদানন্দ (সদা—আনন্দ, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বকাল পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি হয়)। তিনি অমৃতের সাগর অর্থাৎ তাঁহাকে ভজনা করিলে অজর ও অমর হওয়া যায়। তিনি কর্পূর (অর্থাৎ সকল লোকের পূর্ণানন্দ বিধান করেন) ও কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ অমঙ্গল বিনাশ করেন এবং ধবল অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বময়। তিনি রাগ দ্বেষ ও অহঙ্কারাদি সকল দোষ ও সকল কলুষ বিনির্ম্মুক্ত। তিনিই একমাত্র প্রকৃত বস্তু; সংসারের যাহা কিছু, তাহার সার তিনি। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিময়। তিনি মায়া ও অবিদ্যার অতীত এবং দেশ কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। যাহারা পাপে তাপে জর্জ্জরিত, রোগে শোকে অভিভূত, বিষাদে প্রমাদে বিকৃত এবং মোহে ব্যামোহে অন্ধীভূত হইয়া অতীব ব্যাকুল ও আকুল ভাবে, "ভগবান্! আমারে রক্ষা কর" বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করেন। তিনি আত্মধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের অধিনায়ক ও তাঁহাদের প্রতি পরম প্রীতিমান্। তাঁহার জটামণ্ডল গঙ্গাশীকরে সংসিক্ত থাকাতে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। এখানে গঙ্গা শব্দে প্রকৃতি, শীকর শব্দে অংশ ও সম্পর্ক, সংসিক্ত শব্দে গর্ভিত এবং জটামণ্ডল শব্দে বিশ্বব্যাপিনী শক্তি অর্থাৎ তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী মায়াশক্তি প্রকৃতির অংশে এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছে; তন্নিবন্ধন, তিনি নিরতিশয় বৃহৎ। তিনি

অনন্যসাধারণ আত্মশক্তি ও অসাধারণ মহিমা এই উভয়ে অলঙ্কৃত। তিনি রাগ দ্বেষাদি উপদ্রবের বহির্ভূত; এই জন্য সর্ব্বদাই শান্তিময়। তিনি বিভূতি দ্বারা বিভূষিত অর্থাৎ তিনি তমোগুণরূপ স্বীয় স্বাভাবিক শক্তিতে অলঙ্কৃত। তিনি নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম। তাঁহার ঠাঁই সর্ব্বত্র অর্থাৎ তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান। তিনি সিদ্ধিতে অত্যন্ত নিপুণ অর্থাৎ যোগসিদ্ধিতে বিচক্ষণ। তাঁহার মান অপমান জ্ঞান নাই অর্থাৎ তিনি নির্ব্বিকার ও ভেদজ্ঞানশূন্য। তিনি কোন ধর্ম্ম মানেন না অর্থাৎ ব্রহ্মকে বেদবিহিত কোনও কর্ম্ম স্পর্শ করে না, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে পরমেশ্বর কর্ম্মের বক্তা কিন্তু আচরণকর্ত্তা নহেন। ভস্ম চন্দনে তাঁহার সমান জ্ঞান অর্থাৎ তিনি আত্মপর ভেদ রহিত, সর্ব্বত্র সমদর্শী। তিনি দিগম্বর ও ব্যোমকেশ—অর্থাৎ দিক্ ও আকাশ তাঁহার বস্ত্র ও কেশ—তাঁহার আবরণ ও সীমা নাই। তিনি গরল খাইয়াছিলেন, অর্থাৎ যাহা মৃত্যুর কারণ, তাহা তিনি জীর্ণ করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তিনি কপালী অর্থাৎ লোকমাত্রেরই অদৃষ্টের নিয়ন্তা। তিনি ত্রিলোচন এবং ত্রিলোকনাথ, অর্থাৎ তিনি সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ লোচনসম্পন্ন এবং ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা এই ত্রিবিধ সৃষ্টির ঈশ্বর। তাঁহার এক হস্তে ত্রিশূল শোভা পাইতেছে এবং অন্য হস্ত বরপ্রদানে সমুদ্যত রহিয়াছে। এখানে ত্রিশূল শব্দে সৃজন, পালন ও সংহরণ, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট। তাঁহার ললাটে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু সর্ব্বদা বিকসিত আছে এবং তাঁহার নীচের দুই চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত অর্থাৎ ঊর্দ্ধ জ্ঞান-দৃষ্টিতেই তিনি সকলই দেখিতেছেন, তাঁহার দিদৃক্ষাবৃত্তি (দর্শনেচ্ছা) আর নিম্ন চক্ষে আইসে না; প্রত্যুত নিম্ন চক্ষুর সমুদায় শক্তি তাঁহার সেই ঊর্দ্ধ চক্ষেই যাইতেছে। সেই জন্যই তাঁহার নিম্ন চক্ষু নিষ্ক্রিয়ের ন্যায় অর্দ্ধ-নিমীলিত ও ঢুলু ঢুলু করিয়া থাকে। তিনি আশুতোষ, অল্পে সন্তুষ্ট হন; ভোলানাথ—জীবের অপরাধ ভুলিয়া যান; ভূতনাথ—সর্ব্ব ভূতের অধিপতি। তাঁহার সুখদুঃখাদি কোন প্রকার বিকার বা আত্মপরাদি কোন প্রকার ভেদ কল্পনা নাই এবং আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ের সম্পর্কজনিত কোনরূপ আশঙ্কা বা ব্যামোহ নাই। তিনি সকল কার্য্যের অতীত, এই জন্য তিনি সর্ব্বস্বরূপ। তাঁহাতে অবিদ্যা ও অজ্ঞানাদি রূপ কোন প্রকার কলঙ্ক-সম্পর্ক নাই; এই জন্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অবগত নহে। তিনি শিব শঙ্কর, তিনি সকল লোকের সকল মঙ্গলের কর্ত্তা এবং মহাদেব দেবগণেরও দেবতা। তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও সকলের অভীষ্টফলবিধাতা।

কুটীরবাসিনী।

(পাশ্চাত্য আখ্যায়িকার মর্ম্মাবলম্বনে লিখিত)।

অবিরাম কল কল নিনাদে পার্ব্বত্য উপকূল প্রতিধ্বনিত করিয়া নীলাম্বুরাশি প্রবাহিত হইতেছে। তটদেশে সহস্র-শীর্ষ নাগরাজের ন্যায় বিশাল শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া এক পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান। পর্ব্বতের কঠিন অঙ্গ ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে সাগরবারি কূলে প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ একটী সাগর-শাখার তটে, এক ক্ষুদ্র গণ্ডশৈলের উপর একখানি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কুটীর বর্ত্তমান। চতুর্দ্দিক্ বিজন, ক্কচিৎ কোন স্থলে মনুষ্যাবাস দৃষ্ট হয়। অধিবাসীর মধ্যে পর্ব্বতশৃঙ্গে মেষ চারণ করিতে আসিয়া মেষপালকগণ কখন কখন সেই কুটীরের সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালনের জন্য উপস্থিত হয়। কখন কোন পথভ্রান্ত পথিক শীত বায়ুতে অবসন্ন হইয়া কুটীরবাসিনী দয়াবতী বিধবার আশ্রয় গ্রহণ করে, তদ্ভিন্ন অপর কেহ কখনও সেই বিজন প্রদেশে পদার্পণ করে না। এক অনাথা বিধবা একাকিনী সেই কুটীরে বাস করেন জরা। তাঁহার মস্তকের কেশ ধবলিত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের তেজ খর্ব্ব করিতে পারে নাই।' তাঁহার মুখের প্রফুল্লতা পূর্ব্বেরই ন্যায় বর্ত্তমান ছিল। তাঁহার মধুর হাস্য দেখিলে কে বলিতে পারিত যে মৃত্যু তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে? এমন এক দিন ছিল যখন বৃদ্ধা ধন জনে পরিবেষ্টিতা হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন। বুভুক্ষু এক দিন তাঁহার কৃপায় তৃপ্ত হইয়া যাইত, শীতার্ত্ত তাঁহার অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া আরাম অনুভব করিত, অনাথ পীড়িত জন তাঁহার নিকট ঔষধ ও পথ্য লাভ করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিত। কিন্তু বহু বর্ষ অতীত হইল সে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন বৃদ্ধা নিজেই অন্যের কৃপার ভিখারিণী হইয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বৃদ্ধার কষ্টের অবধি ছিল না। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট এই ছিল যে, তিনি মানবের মুখ দেখিতে পাইতেন না। সেই নির্জন প্রদেশে কে তাঁহাকে দেখিতে আসিবে? আত্মীয়, স্বজন যাঁহারা ছিলেন, তাহারাও ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। নিকটস্থ নগরে গিয়া বাস করিতে পারিলে বৃদ্ধা মানবের মুখ দেখিতে পাইতেন, এবং হয় ত কোন দয়াবান্ ব্যক্তি তাঁহাকে সাহায্যও করিতে পারিতেন, কিন্তু বৃদ্ধা আপনার বহুদিনের প্রাচীন বাসভূমি কেমন করিয়া ত্যাগ করিবেন? যেখানে তাঁহার জীবনের সুখময় অংশ অতিবাহিত হইয়াছিল, যেখানে নিজের পরিবারের রাজ্ঞীরূপে তিনি এক দিন রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন, যেথানে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও প্রিয়তমাগণকে লইয়া তিনি অবনত-জানুতে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন, এবং যেথানে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র কন্যার ও প্রিয়তম স্বামীর সমাধির ভগ্নাবশেষ এথনও বর্ত্তমান আছে, নিজের সুখের জন্য সে স্থান তিনি কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? তাই অতীতের বিষাদময়ী স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া সেই পরিত্যক্ত জনশূন্য প্রাচীন বাসভূমির উপর একটী কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বৃদ্ধা সেথানে বাস করিতেছিলেন। প্রাচীনা তাঁহার ধর্ম্মপুস্তকে পড়িয়াছিলেন, ক্ষুদ্র বায়সশাবকগণ যথন ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া চীৎকার করে, তথন এক অদৃশ্য হস্ত তাহাদিগের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দেন। বৃদ্ধা ভাবিতেন মানব কি বায়স-শিশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়? তবে আমার চিন্তা কি? আমার প্রয়োজন বুঝিলে জগতের প্রতিপালক প্রভুই আমার অভাব মোচন করিবেন।

দুঃখিনী বলিয়া সমাজ তাঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি সমাজের কথা ভুলিতে পারেন নাই। বৃদ্ধা ভাবিতেন, আমি এথনও সমাজের একজন, পৃথিবীতে এথনও আমার কার্য্য আছে। আমার আহার্য্য আমার নিজের জন্যই প্রচুর নয়, আমার পরিচ্ছদ শীত হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারে না, আমার দুর্ব্বল দেহ আমার নিজের ভারই বহন করিতে পারে না, এ সকলই সত্য; তথাপি কি আমার কার্য্য নাই? কার্য্য আছে; আমি কার্য্য করিব। যিনি এথনও আমাকে এই অনন্ত সৌন্দর্য্যময় পৃথিবীতে রাথিয়াছেন, যাঁহার প্রদত্ত অন্ন জলে এ শরীর এথনও পুষ্ট হইতেছে, যাঁহার প্রদত্ত বায়ু, আলোক, তেজ এথনও আমার জীবনী শক্তি বিধান করিতেছে, তিনি যথন নিত্য ক্রিয়াশীল, তথন আমি কি নীরব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আমিও কার্য্য করিব। যাঁহার মনে এরূপ বাসনা থাকে, তাঁহার কার্য্য করিবার অবসরের অভাব হয় না। গ্রীষ্মাগমে সেই নির্জন পার্ব্বত্য দেশ তরু-লতায় সুশোভিত হইলে বৃদ্ধা স্বহস্তে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকারে কুটীরের পার্শ্বে রক্ষা করিতেন। তুষারপাতে অবসন্ন পথিক বৃদ্ধার কুটীরে সেই কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি-সেবন করিয়া কত সময় আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইত। পর্ব্বত-দেহে বসন্তাগমে যে শৈবালরাজি উৎপন্ন হইত, বৃদ্ধা তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া রাথিতেন। শীতাগমে যথন বৃক্ষ লতা পত্রশূন্য হইত, তথন কোন দরিদ্র কৃষকের ক্ষুধাতুর গাভী বা মেষকে তাহা প্রদান করিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেন। বৃদ্ধা ভাবিতেন আমা দ্বারা একটী জীবেরও যদি উপকার হয়, তবে ত আমার বাঁচিবার প্রয়োজন আছে। হউক দুঃথ, যত দিন বাঁচিয়া আছি, আমার প্রভুর কার্য্য যে করিতে পারিতেছি, ইহা ত সামান্য সৌভাগ্যের কথা নয়।

কিন্তু বৃদ্ধা বাঁচিতে চাহিলেও কাল তাহা শুনিবে কেন? তাঁহার জরাজীর্ণ শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল। শেষে কঠিন পক্ষাঘাত রোগ বৃদ্ধাকে আক্রমণ করিল। তিনি প্রায় চলৎশক্তিরহিত হইলেন। বৃদ্ধা অতি কষ্টে কেবল উপাসনার সময় জানু পাতিয়া বসিতে পারিতেন, কুটীরের বাহিরে আসিবার শক্তির লোপ হইল। নিজের শয্যার পার্শ্বে যে একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল, তাহা দিয়া বৃদ্ধা সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কত অর্ণবপোত কত স্থান হইতে কত দিকে যাতায়াত করিত, তাহা দেখিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেন। সুস্থশরীরে বৃদ্ধা সেই পার্ব্বত্য দেশের যে সকল ব্যক্তির উপকার করিয়াছিলেন, তাহাদিগেরই দয়ায় তিনি কোনরূপে অনাহার-জনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতেন। কিন্তু সে অবস্থাতেও বৃদ্ধা ভাবিতেন আমি কাজ করিব, যত দিন পারি আমার প্রভুর কাজ করিয়াই মরিব।

শীতকাল সমাগত। পক্ষিগণ নীরব, বৃক্ষলতা পত্রশূন্য, নদনদীগণ কল্লোলরহিত ও নিশ্চল হইল। বসুমতী অমল ধবল পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, প্রচণ্ড উত্তর বায়ু শন্ শন্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া সেই পার্ব্বত্য দেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। বৃদ্ধার রোগ আরও বর্দ্ধিত হইল, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় আপনার শয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতেন, প্রভো! আমার কার্য্য কি শেষ হইল? এইবার কি আমায় যাইতে হইবে? যদি এখনও আমার কোন কার্য্য থাকে দাও, তাহা করিয়া জীবন সার্থক করি। শীতের প্রাবল্যের সঙ্গে সেই নির্জন প্রদেশ আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইল। যুবক যুবতী, বালক বালিকা, ধনী দরিদ্র কত জন আনন্দধ্বনি করিতে করিতে বৃদ্ধার কুটীরের পার্শ্ব দিয়া মহোৎসাহে গমনাগমন আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধার কুটীরের সমীপস্থ একটী সাগর-শাখা শীতে ঘনীভূত হইয়া প্রস্তরের ন্যায় দারুণ কঠিন হইয়াছিল। তাই নিকটবর্ত্তী নগরের অধিবাসিগণ সেই প্রস্তরীভূত সমুদ্রের উপর ক্রীড়া করিবার জন্য সমাগত হইতেন। তাঁহাদিগের উৎসাহের ও আনন্দের সীমা থাকিত না। স্বামী পত্নীর বাহু ধারণ করিয়া, মাতা পুত্রকে পার্শ্বে লইয়া, ভ্রাতা ভগ্নীর হস্ত গ্রহণ করিয়া সেই তুষাররাশির উপর বিচরণ করিবার জন্য ধাবিত হইতেন। কত কূর্দ্দন, কত উল্লম্ফন, কত দ্রুত পদ সঞ্চালনে সেই তুষারস্তূপ স্পন্দিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা এক এক সময় গবাক্ষ দিয়া সেই দৃশ্য দেখিতেন, অতীতের কত মধুময় কথা তাঁহার মনে উঠিত। পতি পুত্রের সঙ্গে তিনি নিজেও একদিন সে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিন কোথায়? তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইত। নিজের অবস্থার সহিত সমাগত নরনারীগণের অবস্থা চিন্তা করিয়া তিনি বলিতেন "প্রভো! ইহাদিগকে চিরসুখী কর। যদি আমার দ্বারা ইহাদিগের কোন সেবা সম্ভব হয়, নির্দ্দেশ করিয়া দাও।"

শীত শেষ হইবার পূর্ব্বে হঠাৎ এক দিন বৃদ্ধার কুটীর অগ্নিময় হইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। ভগবান্! তুমি ধন্য যে বৃদ্ধা রক্ষা পাইলেন; অগ্নি তাঁহার দেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে তিনি অতি কষ্টে বাহিরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, হুতাশন তাঁহার পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ্ ভস্মশেষ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল।

"এ কি ঘটিল ভগবান্! এই মুমূর্ষু অবস্থায় অনাথা বৃদ্ধাকে হঠাৎ এমন নিরাশ্রয়া হইতে হইল কেন? তুমি ভিন্ন কে আর তাঁহাকে আশ্রয় দিবে?" পর্ব্বতচারী মেষপালকদিগের এই কাতর প্রার্থনা ভগবান্ শ্রবণ করিলেন, তাঁহার প্রেরিত মৃত্যু আসিয়া বৃদ্ধার সকল ক্লেশ—সকল অভাব দূর করিল। পুণ্যবান্ যেখানে আপনার সুকৃতের এবং পাপী যেখানে আপনার দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে, বৃদ্ধা মৃত্যুর পর সেই স্থানে গমন করিলেন। মানব-লেখনী কি সে দেশের অনির্ব্বচনীয়তা প্রকাশ করিতে পারে? অপূর্ব্ব সঙ্গীতে বৃদ্ধার কর্ণকুহর এবং মধুর গন্ধে তাঁহার নাসিকা পরিতৃপ্ত হইল। দেবদূতগণ বৃদ্ধাকে অভ্যর্থনা করিয়া এক জ্যোতির্ম্ময় পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দূরে মধুর বীণাধ্বনির সঙ্গে কে যেন তাঁহারই প্রশংসা-গীত গান করিতেছিল। বৃদ্ধা বিস্মিত হইলেন, দিব্যমূর্ত্তি দ্বাররক্ষকগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু একি! বৃদ্ধা যাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সেই অতুল প্রতাপবান্ কুবের-তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী তাঁহার ভূস্বামী দ্বারের এক পার্শ্বে ম্লানমুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন কেন? কেহ তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাতও করিতেছে না, তিনি দ্বাররক্ষকদিগকে অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য কতই অনুনয় বিনয় করিতেছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতেছে না। বৃদ্ধা দেখিবামাত্র ব্যগ্রতার সহিত দ্বাররক্ষকদিগকে বলিলেন; "আপনারা কি ইহাঁকে চিনেন না? ইনি যে আমাদের রাজাধিরাজ, ইঁহাকে এরূপ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন কেন?" দ্বাররক্ষকগণ বলিলেন "ভদ্রে! কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে তোমরা যেমন কার্য্য করিয়া আসিয়াছ, এখানে তেমনই ফল ভোগ করিবে। এখানে রাজা বা প্রজা বলিয়া তারতম্য নাই।" বৃদ্ধা বলিলেন, "তবে আপনাদিগের ভ্রম হইয়াছে, আমি ত জীবনে এমন কোন কার্য্য করি নাই যে স্বর্গরাজ্যের অধিকারিণী হইতে পারি। আমার প্রভুকে নিবারণ করিয়া আমাকে প্রবেশ করিতে দিতেছেন কেন?" দেবদূতগণ বলিলেন, তোমার কার্য্য স্বর্গলাভের উপযুক্ত কি না, জগতের মহিমাময় রাজাই তাহার বিচার করিয়াছেন। তুমি চল; এখানে বিলম্বের প্রয়োজন নাই; যেখানে চিরসুখ, চির-আনন্দ বিরাজিত, চল তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাই।" বৃদ্ধা ধীরে ধীরে

অগ্রসর হইলেন। গর্ব্বিত ভূস্বামী দেবদূতগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে এরূপ সৎকৃতা ও আপনাকে তিরস্কৃত দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিলেন, এক্ষণে অগ্রসর হইয়া একজন দ্বাররক্ষককে বলিলেন ;—"দেবদূত এই দরিদ্র রমণী এমন কি কার্য্য করিয়াছে যে, ইহাকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছ, আর আমাকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিতেছ না? আমি ত জীবনে কত অন্নছত্র, কত অনাথশালা, কত বিদ্যালয়, কত দেবমন্দির, কত পাঠাগার স্থাপিত করিয়াছি, তবে আমি স্বর্গলাভের অধিকারী হইলাম না কেন?" দ্বাররক্ষক বলিলেন, "মানব, তোমার যাহা পুরস্কার, তাহা তুমি যথেষ্টই পাইয়াছ। সম্মান, পদমর্য্যাদা, উপাধি, লোকের কৃতজ্ঞতা তুমি যাহা কিছু চাহিতে, সকলই পাইয়াছিলে; তবে আবার স্বর্গ চাও কেন? কিন্তু এই বৃদ্ধা কিছুই চাহেন নাই; ভগবানের নিকটে কেবল কার্য্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তাই তিনি আজ তাঁহার অপ্রাপ্ত পুরস্কার পাইতেছেন। কোন্ কার্য্যের জন্য ইনি স্বর্গ রাজ্যের অধিকারিণী হইয়াছেন, তাহা কি তুমি শুনিতে চাও? তবে শুন। বৃদ্ধার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বের কথা কি তোমার স্মরণ হয় না? সেই যে বহুসংখ্যক নরনারী তুষারস্তূপের উপর ক্রীড়া করিবার জন্য একত্র হইয়াছিলেন, এই বৃদ্ধা না থাকিলে তাঁহাদিগের একটী প্রাণীও রক্ষা পাইত না। বৃদ্ধা আপনার গবাক্ষদ্বার দিয়া তাঁহাদিগের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন যে আকাশের এক প্রান্তে সিন্দুররেখা-মণ্ডিত এক ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড উদিত হইল। সেরূপ মেঘ সচরাচর দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যে দিন হয়, সেই দিন এমনি উত্তপ্ত বায়ু সহসা উত্থিত হয় যে তাহা স্পর্শমাত্র প্রস্তরের ন্যায় কঠিন তুষারস্তূপও ভগ্ন ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। বৃদ্ধা তাহা জানিতেন বলিয়া তাঁহার হৃদয় সেই সকল ক্রীড়াশীল নরনারীগণের রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু তিনি চলৎশক্তিরহিতা ছিলেন, নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। দূর হইতে চীৎকার করিলেও কেহ তাহা শুনিতে পাইত না। তাই তিনি নিজের গৃহে নিজেই অগ্নিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার গৃহ প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া হতভাগিনী বৃদ্ধা পুড়িয়া মরিতেছে ভাবিয়া তুষারের উপর ক্রীড়াশীল নর-নারীগণ সেই দিকে ধাবমান হইবে, এবং আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে। তাঁহার চেষ্টাও সফল হইয়াছিল! তিনি গৃহে অগ্নি দিয়া বাহিরে আসিবামাত্র কাষ্ঠময় গৃহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং দেখিয়া ক্রীড়াশীল নরনারীগণ সেই দিকে ধাবিত হইলেন। সেই সময় এমন প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল যে, তাহার স্পর্শে সেই বিনাশী তুষারস্তূপ তৎক্ষণাৎ খণ্ডে খণ্ডে ভগ্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বৃদ্ধার কৌশল ব্যতীত ক্রীড়াশীল সেই

নরনারীর মধ্যে প্রত্যেকেই সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্য তাঁহার বড়ই সাধ ছিল, অপনার মস্তক রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাই আজ জগতের ন্যায়বান্ বিচারকর্ত্তা তাঁহাকে শ্রীচরণে স্থান দান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিয়াছেন।

দেব-দূত নীরব হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত ভূস্বামীকে বাহিরে রাখিয়া, বজ্র-নিনাদে স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হইল। পুণ্যবতী কুটীরবাসিনী আপনার সুকৃতির পুরস্কার লাভের জন্য চিরানন্দময় স্বর্গপুরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু,
বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম দর্শন।

গত পূজাবকাশে আমরা কোনও কার্য্যোপলক্ষে বৈদ্যনাথে যাই, তাহাতে কুষ্ঠাশ্রম দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। বৈদ্যনাথ দেব-মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে বৈদ্যনাথের এক প্রান্তে এই আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। চারি দিকে নির্জ্জন ও মনোহর পার্ব্বতীয় দৃশ্য, তন্মধ্যে এক উচ্চ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে কুষ্ঠাশ্রমের স্থান। একটী সুন্দর প্রশস্ত বর্ত্ম দ্বারা আশ্রমটী দেওঘর নগরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। রোগীদিগের জন্য ৪টী পাকা গৃহ ও রন্ধনশালা প্রভৃতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতে ২৫।৩০টী রোগীর স্থান সমাবেশ হইতে পারে। আপাততঃ ১৯টী রোগী আছে, তন্মধ্যে ১৮টী পুরুষ ও ১টী স্ত্রীলোক। আশ্রমের এক প্রান্তে একটী গভীর কূপ খনিত ও ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা সকল ঋতুতেই জলের অভাব মোচন হয়। আশ্রমের প্রাঙ্গণে কুঠিয়ারা নিজে পরিশ্রম করিয়া কতকগুলি ফুল ও তরকারীর গাছ রোপণ করিয়াছে, তাহাতে স্থানটী সুশোভিত হইয়াছে। প্রত্যেক রোগীকে পরিধেয় ও গাত্রবস্ত্র এবং শয্যা প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহারা অনেকটা স্বচ্ছন্দে আছে বোধ হইল। যাহারা এক সময় নিরাশ্রয় হইয়া অন্ন বস্ত্রাভাবে পথে ঘাটে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিত এবং কতজন সেই অবস্থায় মরিয়া যাইত, তাহাদিগের আজি ইষ্টকালয়ে বাস, যথাসময়ে অন্নবস্ত্র এবং সেবা শুশ্রূষা লাভ পরম ভাগ্য বলিতে হইবে এবং তাহারা তাহা অনুভব করিয়া দয়ালু পরমেশ্বর ও হিতৈষী জনগণের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমরা যখন দেখিতে গেলাম, তখন বেলা শেষ হইয়াছে। গিয়াই দেখি, কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে একজন কাশীরামদাসের মহাভারত উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে, আর অনেকে চারি দিক্ ঘেরিয়া তাহা

শ্রবণ করিতেছে। এ অপূর্ব্ব দৃশ্য! ইহাদের মধ্যে কতক বাঙ্গালী আছে, কিন্তু অন্যে, অন্য দেশবাসী হইয়াও পুথি পড়া শুনিতে ভালবাসে ও তাহার ভাব গ্রহণ করিয়া সুখী হয়। পাঠক নিজে বাঙ্গালী না হইয়াও বাঙ্গালা বেশ শিখিয়াছে, নিয়মিতরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং অপর সকলকে ধর্ম্ম ও নীতির উপদেশ দেয়। সে ব্যক্তি দুঃখ করিতে লাগিল যে, রোগে তাহার দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে এবং সে বোধ হয় কিছুদিন পরে আর পুথি পড়িতে পারিবে না।

আমাদিগকে দেখিয়া রোগী সকল অতি ভদ্রভাবে অভিবাদন করিল এবং তাহাদিগের সুখ দুঃখের কথা অনেক বলিল। পরে আমরা আশ্রমের এক প্রান্তে তাহাদিগের জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বসিলাম। দেখিলাম তাঁহাদিগের সকলে আমাদিগকে ঘেরিয়া বসিল, অনেকে কষ্ট করিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা প্রায় এক ঘণ্টাকাল ঈশ্বরের আরাধনা, গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিলাম, তাহারা শান্তভাবে আমাদের সহিত যোগদান করিল এবং মধ্যে মধ্যে "জয় জগদীশ্বর, জয় বিশ্বেশ্বর, জয় বৈদ্যনাথ" বলিয়া উৎসাহের সহিত আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। ঈশ্বরের নাম মহাব্যাধিগ্রস্তদিগের মহৌষধ ও পরম শান্তির কারণ, ইহা যেন তাহারা বুঝিয়াছে বোধ হইল। পরে সন্ধ্যার সহিত হিমাগম দেখিয়া আমরা তাহাদিগকে স্ব স্ব বাসস্থানে যাইতে বলিয়া বিদায় লইলাম।

এই আশ্রমটী বৈদ্যনাথের একটী পুণ্য-তীর্থ। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু এবং দেওঘর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু ইহার প্রধান উদ্‌যোগী। মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাজকুমারী প্রভৃত অর্থ-দানে ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্যের সহায়তা করিয়া ইহকালে মহাকীর্ত্তি এবং পরকালে পরম সুখলাভের অধিকারিণী হইয়াছেন। যাঁহারা এই শুভানুষ্ঠানে অর্থদান এবং পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের সে অর্থ ও পরিশ্রমের সার্থকতা হইয়াছে। এখন আশ্রমের অভাব একটী উপযুক্ত স্থায়ী ফণ্ড। অনূান ৫০ হাজার টাকা না হইলে তাহার কোম্পানীর কাগজের সুদে ২০।২৫টী রোগীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে না। ইহার চতুর্থাংশ মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এ দেশের সকল ধনাঢ্য নরনারী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য দান করিয়া স্থায়ী ফণ্ডকে পরিপুষ্ট করিবেন এবং তাঁহারা দীনহীন কুষ্ঠরোগী-দিগের ও দীনহীনেরবন্ধু পরমেশ্বরের চির-আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

অল্প বেলা আছে—সূর্য্য ডুবু ডুবু—ক্ষীণতেজ রৌদ্র তরুশিরে, সৌধশিখরে, নদীগর্ভে একটু একটু ঝিকিমিকি করিতেছে, এমন সময়ে কয়েকজন বেহারা একখানি পাল্কি স্কন্ধে করিয়া হুঁ হুঁ করিতে করিতে বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত কাঞ্চননগরের রায়েদের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। পাল্কির অগ্রে অগ্রে এক দীর্ঘকায় ভোজপুরী দরোয়ান—তাহার মস্তকে লাল পাগড়ী—গায়ে একটী হিন্দুস্থানী জামা—পায়ে নাগরা জুতা—ওষ্ঠের দুইধারে বিস্তৃত গুম্ফদ্বয় এবং মস্তকের দুই পার্শ্বে দুই সুদীর্ঘ জুল্‌পি। পাল্কির সমভিব্যাহারী ঝি পাল্কির দরজা খুলিয়া পাখা হস্তে তাহার ভিতর বাতাস করিতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে হেঁট হইয়া পাল্কির ভিতর মাথা প্রবেশ করতঃ ফুস্ ফাস্ করিয়া কথা কহিতে লাগিল।

বালকেরা বাহিরে খেলা করিতেছিল, দৌড়িয়া গিয়া বাটীর ভিতরে খবর দিল। একটী স্ত্রীলোক আসিয়া পাল্কির মধ্য হইতে একটী টুক্‌টুকে বৌকে হাত ধরিয়া তুলিল, বৌ তাঁহার সঙ্গে বাটীর ভিতর আসিল। একটী ৪।৫ বৎসরের বালক, "আঙা বৌ এসেছে—আমাদের আঙা বৌ এসেছে গো গো" এই বলিয়া দৌড়িতে লাগিল।

বধূ বাটীর ভিতর আসিল, শ্বাশুড়ী মাতা তাহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক "এস মা এস" বলিয়া হাত ধরিয়া একখানি পিড়ীর উপর বসাইলেন। নববধূর লজ্জা-নিবারণ ঘোমটা একহস্ত পরিমাণ—সে আনতমস্তকে তথায় বসিয়া রহিল। পাড়ার মেয়েরা রথদোলযাত্রীর ন্যায় দলে দলে রায়েদের কনে বৌ দেখিতে আসিল। কনে বউ বড়মানুষের মেয়ে, হীরা মুক্তায় জড়িত—ঘর আলো ক'রে বসিয়া আছে। যে প্রতিবেশিনী আসে, একবার করিয়া তাহার ঘোমটা উত্তোলন করিয়া মুখ দেখে, আর বলে, "বাঃ বেশ সুন্দর বউ হ'য়েছে, রায়গিন্নী ঠাকুরণের ঘর স্বর্ণ প্রতিমায় আলো ক'রেছে।" ঘোমটা খুলিলেই বউ চক্ষু মুদিয়া থাকে। কেহ ১ মিনিট, কেহ ২ মিনিট, কেহ ৩ মিনিট তাহার ঘোমটা তুলিয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া বউ দেখা চলিল। একে জ্যৈষ্ঠমাস—তাহাতে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা বউ, গ্রীষ্মাতিশয্যে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইল। তাহার বাপের বাড়ীর ঝি আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "মা ঠাকুরণরা ত বউ দেখিয়াছেন, এখন একটু সরিলে আমি উহাকে বাতাস করি—উনি একটু হাঁপ ছাড়িয়া সুস্থ হউন। বড়মানুষের মেয়ে, সুখের শরীর, উহার বড় কষ্ট হইতেছে।" এই বলাতে প্রতিবেশিনীরা চলিয়া গেল। ঝি তাহার

গায়ের কাপড় খুলিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা সমাগম—নরেন্দ্রনাথ বাটী আসিলেন। গ্রীষ্মাবকাশে তাঁহার কলেজ বন্ধ—তিনি এইক্ষণে দেশে আছেন। নরেন্দ্র নাথ কাঞ্চন নগরের রায়েদের বাটীর গোপীকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের পৌত্র—সত্যচরণ রায় মহাশয়ের পুত্র। তিনি এইক্ষণে কলিকাতার ফ্রিচার্চ ইন্‌ষ্টীটিউসনে বি, এ, ক্লাশে পাঠ করেন—এইবার বি, এ, পরীক্ষা দিবেন। নরেন্দ্রনাথ সুধীর, সভ্য, সত্যপ্রিয় ও সকলের প্রিয়দর্শন। তবে বনিয়াদি ঘরের ছেলে বলিয়া মনে একটু অভিমান আছে। তাঁহার পিতার অবস্থা এক্ষণে তাদৃশ সচ্ছল নহে—অনেক দিন সংসার ধারকর্জ্জের উপর চলিয়া থাকে। দুই একখানি করিয়া চক চাকড়া বন্ধক দিয়া এক্ষণে প্রায় এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। নরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রাইমোহন।—রাইমোহন একটু উদ্ধতস্বভাব, তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা। নরেন্দ্র ও রাই এই দুই পুত্র, পিতার বৃদ্ধাবস্থার অবলম্বন। রাইমোহনের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্ত্রী এক্ষণে পিত্রালয়ে। নবাগত বধূটী নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী—নাম সরোজবালা।

নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী গৃহের বড় বউ—আদরের সামগ্রী—শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসেন। সে বড়মানুষের মেয়ে ব'লে তাহাকে খাইতে পরিতে কোন কষ্ট দেন না। আপনারা কষ্ট পাইলেও তাহাকে রাজরাণীর মতন করিয়া রাখেন। বউ কাজের মধ্যে কার্পেট বুনেন, নভেল ও কবিতা পড়েন, আর স্বামীর জন্য পান সাজেন। এইরূপে সরোজবালা শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহ সরোবরে পরিবর্দ্ধিতা হইয়া স্বামীর সোহাগহিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া খেলিতে লাগিল। স্বামী তাহার আব্দার মত কলিকাতা হইতে ভাল জরি, ফিতা, সাবান, টোয়ালে এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য আনিয়া দিতে লাগিলেন। সে একে বড়মানুষের মেয়ে, তাহার উপর শ্বশুরবাটীতে সুখের অঙ্কে লালিত পালিত হইয়া বিলাসিতার চরম সীমায় উপস্থিত হইল। নরেন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যে তাহার বশীভূত হইয়া পড়িলেন—সে এক্ষণে নরেন্দ্রের হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী। তাহার মনোমুগ্ধকর মন্ত্র প্রভাবে নরেন্দ্রনাথ বি, এ, পাশের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছেন। কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথের একটী পুত্র-সন্তান হইল। বাটীতে আনন্দের আর সীমা রহিল না।

রাইমোহনের স্ত্রী সুশীলা শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছে। সুশীলা, সুধীরা, শান্তস্বভাবা ও সরলা। সে গৃহস্থ ঘরের বউএর ন্যায়, স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ীর বিশেষ পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সে গৃহের উন্‌কোটি চৌষট্টি কাজ আপনার হস্তে করিয়া থাকে, শ্বশুর শাশুড়ীকে নড়িতে দেয় না—সে গৃহস্থের মেয়ে, বড়মানুষের মেয়ে নহে, তাহার গৃহস্থালীর প্রতি অতিশয় যত্ন। আপনার সুখের জন্য পাগল নহে। শ্বশুর

শাশুড়ী তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ যত্নে ও সেবায় যৎপরোনাস্তি প্রীত এবং তাঁহারা দশ মুখে তাহার সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। পাড়া প্রতিবাসীরাও তাহার আচার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সুখ্যাতি ও প্রশংসা করে। এই সমস্ত আর সরোজবালার প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি গোপনে বারুদে আগুন লাগাইয়া লঙ্কাকাণ্ড করিবার চেষ্টায় রহিলেন।

সরোজবালা মুখরা, প্রখরা ও চতুরা। শ্বশুরবাড়ী বলিয়া অনেক সময়ে চাপিয়া চলিতেন। বড়মানুষের মেয়ে বলিয়া মনে বেশ একটু গরিমা ছিল—কাহাকেও তিনি আপনার সমান জ্ঞান করিতে পারিতেন না। কাহাকে তিনি ভাল খাইতে পরিতে দেখিলে কুণ্ঠিতা হইতেন এবং বলিতেন, "ইস্ এর আবার যে বড় বড়মানুষি, এ আবার টাকা পেলে কোথায়?" একটী পুত্রসন্তানের জননী হইয়া স্বামীর উপর তাহার প্রভুত্ব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দাম্ভিকা ও প্রচণ্ডা হইয়াছেন। কিন্তু এখনও শ্বশুর-বাড়ীতে আছেন, এটাও সময়ে সময়ে একটু একটু ভাবিতেন। তিনি স্বামীকে প্রত্যহ কহিতে লাগিলেন "আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দাও, আমি আর এখানে থাকিব না—আমার বড় কষ্ট হইতেছে—ছোট দিদি আমার হিংসেতে মরেন, পোড়া লোকে কেবল তাহাকে ভালবাসে, আমাকে দেখ্‌তে পারে না।" এ দিকে সরোজবালা কলিকাতায় স্বহস্তে পিত্রালয়ে চিঠি লিখিলেন, "বাবা আমাকে শীঘ্র লইয়া যাইবেন, আমার এখানে বড় কষ্ট হইতেছে।"

একদিন প্রাতে সরোজবালার ভ্রাতা ইন্দুভূষণ বসু তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাইকে দেখিয়া ভগ্নীর আহ্লাদের সীমা রহিল না — তিনি বুঝিলেন, তাঁহার শরসন্ধান অব্যর্থ হইয়াছে —এইবার তিনি নিশ্চয়ই বাপের বাড়ী যাইবেন। ইন্দুভূষণ সেই দিবস অবস্থিতি করিয়া পরদিবস বৈকালে ভগ্নীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। নরেন্দ্রও স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে শ্বশুরালয়ে আসিলেন। কিয়দ্দিবস তথায় থাকিয়া বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। বড়বউ শ্বশুরবাড়ীতে ২।১টী ভাবের লোকের নিকট শ্বশুর শাশুড়ীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল, "তাঁহারা চখের মাথা খাইয়া কেবল আমার দোষ দেখেন, আমি তাঁহাদের পাতে বিষ গুলিয়া দিয়াছি, আর ছোট বউ তাঁদের মিছরীর কুঁদো— যা বলে তা মিষ্টি, যা করে তা মিষ্টি, ছোট বৌএর সব ভাল—এখন আমি বাপের বাড়ী চলে যাব—আমার বাপের ভাত আছে,—ওঁরা ওঁদের প্রাণের ছোট বউকে নিয়ে ঘর করুন—আমি আর এখানে থাকিব না—অমন শ্বশুর শাশুড়ীর মুখ দেখ্‌তে চাই না—দেখি আমাকে কে আনে?" বড় বউ চলিয়া যাইলে সেই সকল ভাবের লোক রায় গিন্নীকে সমস্ত কথা বলিয়া দিল। রায় গিন্নী ক্ষোভে ও রাগে বড় বউকে যৎপরানাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন

—তাঁহার মন একেবারে তাহার প্রতি জ্বলিয়া গেল। তিনি নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! শুনিয়াছ, তোমার স্ত্রীর কথা—আমাদের নামে যা নয় তাই বলিয়া গিয়াছে—না জানি সেখানেও কত বলিতেছে।" নরেন্দ্রনাথ মায়ের নিকট স্বীয় পত্নীর জঘন্য ব্যবহারের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইলেন এবং তথা হইতে নতমস্তকে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই অবধি অনেক দিন শ্বশুরালয়ে গমন করেন নাই। পরে শ্বশুর শাশুড়ী, স্ত্রী ও শ্যালকদিগের উপর্য্যুপরি পত্রানুরোধে মধ্যে মধ্যে দুই একবার যাইতেন।

দুর্ব্বল মানুষের মন প্রাসাদচূড়াস্থিত বায়ু-নিরূপক কলের ন্যায়—প্রতি ঘটনা-বাতে ঘুরিয়া যায়। যে নরেন্দ্র শ্বশুরবাড়ী যাইতে ইচ্ছা করিতেন না—যাইলেও ত্রিরাত্রি যাপন করিতে চাহিতেন না, তিনি এক্ষণে স্থায়িভাবে শ্বশুরবাড়ী গিয়া উঠিলেন—তথায় শিকড় গাড়িলেন—আর নড়িতে চাহেন না। তথায় তাঁহার আর একটী পুত্রসন্তান জন্মিল। তাঁহার পরিবার-বৃদ্ধির সহিত খরচের সীমাও বাড়িল। শ্বশুর মহাশয়ও কিছুদিন যত্নের সহিত জামাতাকে বাটীতে রাখিয়া এক্ষণে আর অধিক ব্যয় করিতে চাহেন না—জামাতার প্রতি তাঁহার অসন্তোষভাব প্রায় পদে পদে লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি দশজনের নিকট বলিতে লাগিলেন, "ঐ একটা অকর্ম্মা বিধবা জামাই আমার কাঁধে চাপিয়া রহিয়াছে, উহার জন্য আমি খরচান্ত হইলাম—আমি আর পারি না।" এই সকল কথা নরেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হইল। তিনি লজ্জায় ও দুঃখে মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন, কিন্তু কি করেন, পড়িয়া পড়িয়া সকলি সহ্য করিতে লাগিলেন। স্ত্রী তাঁহার এখানে মুখ খুলিয়াছেন; সেও দশ কথা বলিতে ছাড়ে না। সে শ্বশুরবাড়ীতে আর যাইবে না। নরেন্দ্রনাথও আর তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না।

নরেন্দ্রনাথের শ্বশুর কালীপ্রসন্ন বাবু একজন বুনিয়াদী জমিদার বা ধনশালী ব্যক্তি নহেন। তিনি কণ্ট্রাক্টের কার্য্য করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। ইদানীন্তন কতিপয় উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মত তিনি আপনার নাম জাহির করিতে ও ধুমধাম দেখাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহার গাড়ী ঘোড়া আছে, সইস কোচম্যান আছে, ছেলের বাটীতে পড়াইবার মাষ্টার আছে, ঝি চাকর আছে, রাঁধুনী আছে, শ্বশুর মহাশয়ের পুত্রকন্যারা আছে, মেয়ে জামাই আছে, অতিথি অভ্যাগত ও কুটুম্ব স্বজন আছে এবং তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ ব্যয়াধিক্য—এই সমস্ত তিনি লোকের নিকট গল্প করিয়া আপনার গুরুত্ব বাড়াইতেন। লোকের প্রকৃত উপকার-চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইত কি না সন্দেহের বিষয়। যাহাদিগকে বাটীতে রাখিতেন, তাহাদিগের নিকট দ্বিগুণ কাজ আদায় করিয়া লইতেন, তাহাতে তাঁহার লাভ বই লোকসান ছিল না। কিছুদিন পরে কালীপ্রসন্ন বাবুর

মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সংসারের কর্ত্তা হইল—সে ভগ্নীপতিকে নিজ সংসারে না রাখিয়া পৃথক্ করিয়া দিল, কিন্তু বাটীতে থাকিবার জন্য একটী ঘর দিল। নরেন্দ্র-নাথ কি করেন, অগত্যা একটী চাকুরির অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন—কিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানেন, একটী বিদ্যালয়ে একটী মাষ্টারি কার্য্য জুটিল—বেতন ৪০৲ টাকা।

(ক্রমশঃ)

ট্রান্সভাল যুদ্ধ।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অধিপতি ইংরাজরাজ এখন ক্ষমতা ও আধিপত্যে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। সসাগরা ধরা যথার্থই ইহাঁর করতলস্থ এবং ইহাঁর বিক্রমে ও প্রতাপে পৃথিবীর সকল জাতি সংত্রস্ত। ইংরাজ সম্মুখ-সমরে কোন্ জাতিকে না পরাস্ত করিয়াছেন এবং রাজনৈতিক কৌশলে কোন্ শত্রুকুলকে না মিত্রতায় আবদ্ধ করিয়াছেন? বৎসরের পর বৎসর বহুদিন ইংলণ্ডেশ্বরী বিক্টোরিয়া মহাসভা উদ্‌ঘাটনকালে আনন্দ-সমাচার প্রচার করেন—"আমার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি এবং বৈদেশিকদিগের সহিত আমার বন্ধু-ভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" কিন্তু হঠাৎ সুদূর দক্ষিণ মহাসাগর-তীরে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত! যাহারা মিত্রজাতি ছিল, তাহারা ঘোর শত্রুরূপে দণ্ডায়মান, যাহারা দুর্ব্বল অধীনপ্রায় ছিল, তাহারা রণোন্মত্ত হইয়া ইংরাজরাজ্য গ্রাসে অগ্রসর। এই অভাব-নীয় ব্যাপারের জন্য অকালে পার্লেমেণ্টের উদ্বোধন হইয়াছে, পৃথিবীব্যাপী ইংরাজ-রাজ্য সকল হইতে সৈন্যসমাবেশ হইতেছে এবং ইংলণ্ডের ছোট বড় সকলে রণরঙ্গে মাতিবার জন্য অস্থির।

ট্রান্সভাল সাধারণতন্ত্রের বোয়ারগণ ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। ট্রান্সভাল ও বোয়ার শব্দ এতকাল এদেশে অশ্রুত ও অপরিচিত ছিল। বস্তুতঃ ট্রান্সভাল আফ্রিকার দক্ষিণাংশের যেরূপ একটী ক্ষুদ্র দেশ, তাহা আমাদের বঙ্গ দেশের একটী জেলা বলিলে হয়। কোথায় সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী ইংরাজ-সাম্রাজ্য, আর কোথায় এই ক্ষুদ্র দেশ! আর বোয়ার একটী সামান্য অর্দ্ধ-সভ্য জাতি, দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ উপনিবেশীদিগের বংশ হইতে উৎপন্ন, সুসভ্য ইংরাজদিগের সম্মুখে তাহারা নগণ্য। তথাপি এই ক্ষুদ্র দেশবাসী ক্ষুদ্র জাতির বিশ্বাস তাহারা জয়ী হইবে এবং ইংরাজদিগকে দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবে। তাহাদের এরূপ অসমসাহসিকতার একটু কারণ আছে, কয়েক বৎসর হইল একদল ইংরাজ সেনার সহিত তাহাদের সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে "মাজুবা" নামক রণক্ষেত্রে তাহারা জয়লাভ

করিয়া ইংরাজ সেনাদিগকে বন্দী করে এবং পরে ইংলণ্ড তাহাদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। তাহাদের আশা এবারেও তাহারা বিজয়ী হইবে এবং ইংলণ্ড তাহাদের ভয়ে ভীত হইবে। এই আশায় তাহাদের জাতীয় সমুদায় লোক—যুবক, বালক, বৃদ্ধ সকলে সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে—এমন কি স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহাদের সহিত প্রতিবেশী "অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট" নামক রাজ্যও যোগ দিয়াছে।

ট্রান্সভালের প্রধান অধিনায়ক প্রেসিডেন্ট ক্রুগার, তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর। ইনি একজন অতি অসাধারণ লোক, যেমন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী, সেইরূপ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ও ধর্ম্মপরায়ণ। সেনাপতি জুবার্ট ইহাঁর দক্ষিণ হস্ত, তিনিও সুশিক্ষিত ও রণবিদ্যায় ধুরন্ধর। অরেঞ্জ ষ্টেটের অধিনায়ক প্রেসিডেন্ট ষ্টিনও একজন মহৎ প্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি। ইংরাজপক্ষের সেনা-নায়ক ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাধ্যক্ষ সার জর্জ হোয়াইট ও সার রেডভাস বুলার। এখন বুলারেরই প্রধান কর্ত্তৃত্ব।

এই যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়, কিন্তু প্রধান ও নিগূঢ় কারণ ট্রান্সভালের স্বর্ণখনি বলিয়া বোধ হয়। ৭।৮ বৎসর হইল এই স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংরাজগণ এই স্বর্ণলাভের জন্য দলে দলে তথায় উপস্থিত হন। কয়েক বৎসরে তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ হাজার হইয়া দাঁড়ায়। বোয়ারগণ "উটল্যাণ্ডার" বা বিদেশী বলিয়া তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহারা দেশবাসীদিগের সমকক্ষ হইয়া তাহাদিগের সহিত সমাধিকার লাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। ইংলণ্ড যদিও ট্রান্সভালের স্বাধীনতন্ত্রতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার "Suzerainty" বা চক্রবর্ত্তিত্ব আছে বলিয়া বোয়ারদিগকে তাঁহার ইচ্ছানুসারী হইতে হইবে বলিলেন। বোয়ারগণ ইংলণ্ড ভিন্ন আর কোনও রাজ্যকে "সালিসী" মানিয়া এই বিষয়ের বিচার করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইংলণ্ড তাহাতে সম্মত না হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রমে অধিক সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বোয়ারগণ ইংলণ্ডের অভিসন্ধি ভাল নয় সন্দেহ করিয়া চরম পত্র (ultimatum) এই মর্ম্মে লিখিলেন "৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নবাগত ইংরাজ সৈন্য সকলকে সরাইতে হইবে, নতুবা যুদ্ধ অপরিহার্য্য।" ইংরাজগণ বোয়ারগণের এই দুঃসাহসিকতায় ক্রুদ্ধ হইয়া আর কোনও উত্তর দিবার পথ নাই জানাইলেন। ইহা হইতেই যুদ্ধের উৎপত্তি।

গত অক্টোবরের মাঝামাঝি (আশ্বিন মাসের শেষে) যুদ্ধ ঘোষণা হয়। বোয়ারগণ প্রথমতঃ দুইখানি ইংরাজ রেলগাড়ী দখল করে, তাহার একখানি সৈন্যে পূর্ণ ছিল, আর একখানিতে সংবাদদাতা সকল ও

কোন কোন সেনাপতি ছিলেন। ইহাঁরা বোয়ার-হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী হইয়াছেন। বোয়ারেরা ইংরাজদের রেল-পথ ও টেলিগ্রাফ যেখানে পাইয়াছে নষ্ট করিয়াছে এবং তাঁহাদের যাতায়াতের পথের অনেক সেতুও ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

প্রথম যুদ্ধ গ্লেঙ্কোতে হয়, তাহাতে ইংরাজ-দের সেনাপতি জেনারল সাইমন্স এবং বোয়ারদিগের সেনাপতি জুবার্ট। ইংরাজেরা সমতল ভূমিতে, আর বোয়ারেরা পর্ব্বত-শিখরে থাকিয়া যুদ্ধ করে। বোয়ারেরা প্রথমে হঠিয়া যায়, কিন্তু পরে প্রবল তেজে আক্রমণ করিয়া ইংরাজ সেনাদলকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে। এই যুদ্ধে প্রায় ৩০০ ইংরাজ হত হয়, তন্মধ্যে অনেক সৈনিক কর্ম্মচারী। স্বয়ং সেনাপতি সাইমন্স গুরুতররূপে আহত হইয়া শত্রু-হস্তে পতিত হন। শত্রুরা যথোচিত সেবাশুশ্রূষা করিয়াও তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিল না, পরে সসম্মানে তাঁহার শবদেহ সমাধিস্থ করিল। জেনারল হোয়াইট বহু সৈন্য লইয়া লেডীস্মিথ নামক ইংরাজ-নগরে আছেন। জেনারল ইউল একদল সৈন্য লইয়া শত্রুহস্ত এড়াইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু এই সম্মিলন-সাধনে অরেঞ্জ ষ্টেটের বোয়ারগণের সহিত জেনারল হোয়াইটের এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে ৩০ জন ইংরাজ হত ও ৯৩ জন আহত হয়। গত অক্টোবর মাসের শেষে ইংরাজ পক্ষে আর একটী মহাদুর্ঘটনা হয়। গ্লেঙ্কোর যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের গতিরোধের জন্য জেনারল হোয়াইট ৪০ জন সেনাধ্যক্ষের সহিত ২০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহারা শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছে। তাহারা অসমসাহসে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রসহ তাহাদের অনেকগুলি অশ্বতর শত্রুদলে মিশিয়া যাওয়াতে তাহারা নিরুপায় হইয়া শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণ করে। বোয়ারদিগের প্রশংসার বিষয় এই, যখন এই বন্দী সৈন্য তাহাদের রাজধানী প্রিটোরিয়াতে নীত হইল, তখন সকলে গম্ভীর ও নিস্তব্ধভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিল!

বোয়ারদিগের পক্ষে আরও কিছু সৌভাগ্য ঘটিল। তাহারা কোলেঞ্জো-নগর অধিকার করিল, নেটালের প্রায় সমুদায় উত্তর ভাগে আধিপত্য স্থাপন করিল এবং ইংরাজাধিকারবাসী অনেক বোয়ারকেও স্বদলভুক্ত করিতে সমর্থ হইল। এ দিকে বোয়ারগণ মেফকিং, কিম্বার্লী ও লেডীস্মিথ অবরোধ করিয়াছে। কিম্বার্লীতে বহুলক্ষ টাকার হীরক সংগৃহীত আছে। লেডীস্মিথে সেনাপতি হোয়াইট অধিকাংশ ইংরাজ সৈন্য লইয়া ছাউনী করিয়া রহিয়াছেন। এই সকল স্থান হইতে বার বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতেছে, বোয়ারেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না, বরং বার বার হঠিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ইংরাজ সেনাপতি জেনারল মাথুয়েন বেলমণ্ট ও গ্রাসপান যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ

সৈন্য কম থাকাতে বোয়ারদিগের বিক্রম ও সাহস বাড়িয়াছিল, কিন্তু এখন ইংলণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা স্থান হইতে দলে দলে সৈন্য সকল আসিয়া সমবেত হইতেছে। নৌ-সেনা সকলও রণতরীতে থাকিয়া স্থল সৈন্যের সহায়তা করিতেছে। মুষ্টিমেয় বোয়ার সৈন্য অসংখ্য ইংরাজবাহিনীর নিকট কতক্ষণ যুঝিবে? প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার গতিক দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইয়াছেন, এইরূপ জনরব। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এখনও অধিক কাণ্ড ঘটে নাই, উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়া সহস্র সহস্র লোকের প্রাণহানি নিবারিত হউক এবং নূতন বিংশ শতাব্দী ধরাতলে শান্তির সহিত অবতীর্ণ হউক।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৫ই অগ্রহায়ণ কুচবিহারের মহারাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী সুকৃতির সহিত বাবু জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারী দেবীর সিভিলিয়ান পুত্র শ্রীমান্ জ্যোৎস্না নাথ ঘোষালের শুভবিবাহ আলীপুরের উডল্যাণ্ড রাজোদ্যানে মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। জগদীশ্বর বরকন্যাকে চিরসুখী করুন্।

২। বোম্বাইয়ে লর্ড স্যাণ্ডহার্ষ্টের স্থানে সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোট গুবর্ণর হইয়া আসিয়াছেন।

৩। পারসী দানবীর টাটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

৪। এতদিন বিলাত হইতে ষ্টিম এন্‌জিন তৈয়ার হইয়া আসিত, সম্প্রতি জামালপুরে এ ডবলিউ রেণ্ডেল এক এঞ্জিন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা লেডী কুর্জন নামে অভিহিত হইয়াছে। রাজ-প্রতিনিধি সহধর্ম্মিণীসহ কাল্‌কা হইতে দিল্লীতে এই এঞ্জিনযুক্ত রেল-শকট চড়িয়া আসিয়াছেন।

৫। আমাদের যুবরাজ-পত্নীর বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তিনি দীর্ঘজীবিনী হইয়া আরও হিতব্রত সাধন করুন্।

৬। লর্ড মেয়রের ট্রান্সভাল যুদ্ধফণ্ডে কলিকাতা হইতে ৭৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

৭। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশের মধ্যে রাজপুতানা প্রথম এবং বোম্বাই দ্বিতীয় স্থানীয়। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। গত সপ্তাহে সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা ১০ লক্ষ ছিল, নবেম্বরে ডিসেম্বরে প্রায় ১৪ লক্ষ হইয়াছে।

৮। জর্ম্মণ সম্রাট্ উইলিয়ম সাম্রাজ্ঞীর সহিত ইংলণ্ড দর্শন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন। ইংরাজ সাধারণ তাঁহাকে বহু

প্রকারে সমাদর প্রদর্শনে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বোধ হয় বৃদ্ধা দিদিমা ইংলণ্ডেশ্বরীকেই দেখিতে গিয়াছিলেন।

৯। এ বৎসর সমুদায় পৃথিবীতে গমের চাষ কমিয়াছে, তাহাতে গম ৩০ কোটি বুসেল কম হইয়াছে।

১০। বেণ্ডের ছাতা উদ্ভিদের মধ্যে নগণ্য, কিন্তু ইহার চাষে অসম্ভব লাভ। কৃষিবিদ্যা বিষয়ক কোনও পত্রিকায় লিখিয়াছে, এক একর বা ৩ বিঘা জমিতে উৎপন্নের মূল্য ১৪৫২ পাউণ্ড বা প্রায় ২১,৭৮০ টাকা। খরচ বাদে লাভ বিঘা প্রতি প্রায় ৪০০০ টাকা

১১। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড সালিসবরীর পত্নী গতাসু হইয়াছেন, লর্ড স্বয়ং ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পীড়িত। ঈশ্বর এ দুঃসময়ে তাঁহাকে রক্ষা করুন্।

বামারচনা।

নীরবে।

নীরবে জনম মম—
　　গাইবে নিতি নিতি,—
নীরবে আমার প্রাণ
　　প্রাণের নীরব গীতি। ১।

নীরব আকাশে শশী,
　　নীরবে নীরবে ভাসি
প্রচারে মহিমা তাঁর
　　নীরবে নীরবে হাসি। ২

প্রভাতে তরুণ রবি
　　নীরবে নভে উঠিছে,
অযুত কিরণধারা
　　নীরব রবে ঢালিছে। ৩

নীরবে নীরদ উঠে
　　নীরবে আকাশে ধায়,
সুনীল গগনে তারা
　　নীরবে নীরবে চায়। ৪।

নীরব বরষ আসে
　　নীরবে বরষ যায়;
বিস্তীর্ণ জলধি পাশে
　　নীরবে তটিনী ধায়। ৫

নীরবে কুসুম ফুটে
　　নীরবে ঝরিয়া যায়;
প্রাণের বেদনা দুঃখী
　　নীরবে নীরবে গায়। ৬

নীরবে নলিনী ফুটে
　　প্রভাতে রবির আশে;
নীরবে আদর করে—
　　যায় না তাহার পাশে। ৭।

নীরবেতে আত্মা পক্ষী
　　বাস করে দেহনীড়ে,
নীরবেতে যায় উড়ে
　　সকল বন্ধন ছিঁড়ে। ৮।

নীরবে পরাণে মম
　　ফোটে নিত্য কত আশা;

নীরবেতে কহি কত
প্রাণের নীরব ভাষা। ৯।
নীরবে সে স্নেহ করে,
নীরবে আইসে পাশে
নীরবে সাধনা তার
সাধি আমি তারি আশে। ১০
তার সে অমৃত বাণী
নীরবে আমার প্রাণে,—
করি প্রাণ মধুময়
বাজিছে মধুর তানে। ১১।
নীরবে এ প্রাণ মন
সঁপেছি যাহার করে ;
নীরবে নীরবে সদা
সে যে অন্তরে বিহরে। ১২।
নীরবে মরণ মোরে
করিবেরে আলিঙ্গন ;
নীরবে চলিয়া যাব
ছাড়ি বন্ধু প্রিয়জন। ১৩।
নীরবে প্রাণেশে মম
দেখি আমি দিবা রাতি ;
নীরবে পালেন মোরে
হইয়ে পতির পতি। ১৪।

শান্তি

অনন্ত আকাশে অনন্ত সাগর,
অনন্ত এ সৃষ্টি যত চরাচর,
অনাদি অনন্ত যত মরামর,
এক লক্ষ্য প্রতি সকলেই ধায়।১॥
সকলেরি দৃষ্টি একই প্রদেশে,
সকলেরি যাত্রা সেই এক দেশে,
সকলেরি যত্ন অশেষ বিশেষে,
কবে কত দিনে যাইবে তথায় ? ২
চাহে সবে সুখ কিসে শান্তি পাবে,
সকলেই চায় কেমনে জুড়াবে,
লক্ষ্য সব এক কিন্তু পথাভাবে,
জ্বলিতেছে কেহ দ্বিগুণ জ্বালায়।৩॥
মরিছে বিহঙ্গ আহার আশায়,
পুড়িছে পতঙ্গ প্রদীপ-শিখায়,
পোড়ে সূর্য্যমুখী পূজি সবিতায়,
উচ্চশির গিরি ভাঙ্গে ঝটিকায়।৪॥
নির্ব্বোধ মানব উন্মত্তের প্রায়,
উন্নত মস্তক জ্ঞান-গরিমায়,
খুঁজে জল-তল দামিনী-প্রভায়,
জুড়াইতে চাহি—জ্বলে লালসায়।৫॥
উচ্চ রবে সবে ডাকে "শান্তি শান্তি"
প্রতিধ্বনি গায় "অশান্তি অশান্তি" !
"যত দিন রবে এই ঘোর ভ্রান্তি"
"সুখের চরম কামনা সেবায়"।৬॥
"কামনা যে বহ্নি জেনেও জাননা"
"কামনা যে বহ্নি জেনেও ছাড়না।"
"মোহের ছলনা দেখেও দেখ না"
"পুড়ে মর তাহে পতঙ্গের প্রায়"।৭॥
"দুদিনের তরে এই রঙ্গস্থল,"
"তোমরা তাহাতে অভিনেতৃ-দল।"
"পালা হলে শেষ কে রহিবে বল ?'
"ভোগাভোগ সার মাত্র এ ধরায়"।৮॥

"রঙ্গস্থল কভু ভেব না স্বদেশ"
"রঙ্গভূমি-বেশ ভেব না স্ববেশ!"
"করি কার্য্য শেষ যেতে নিজদেশ"
"কর সদা পুণ্য পাথেয় সঞ্চয়।" ৯॥
"মানব জীবন কর্ত্তব্যের তরে"
"কর্ত্তব্যপালন কর প্রেম-ভরে"
"কর্ত্তব্য লঙ্ঘনে অশান্তি সাগরে"
"ডুবিতে হইবে জানিও নিশ্চয়।" ১০॥
কর্ম্মে অধিকার আছয়ে তোমার,
"জয় পরাজয় লাভালাভ তার—
সে সকল জেন বিধি বিধাতার,
তার তরে দুঃখ শোক কিছু নয়।" ১১
"ইন্দ্রিয় নিগ্রহে কর প্রাণপণ,
ইন্দ্রিয়েরা তব নহে রে আপন,
নীচ ভৃত্য তারা হয়েছে এখন
সদা স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তা সর্ব্বময়।" ১২।
"কর্ত্তব্য তোমার নিষ্কাম করম,
সর্ব্বজীবে দয়া ধর্ম্মের পরম,
সদা আত্মনিষ্ঠা সাধনা চরম,
আত্মজ্ঞানে প্রাণ হবে শান্তিময়।" ১৩।
"পরমাত্মা ধ্যানে থেক সদা রত,
সেই পদে মতি রেখ রে নিয়ত,
বিরাজে সে পদে শান্তি অবিরত,
একমাত্র সেই আনন্দ-নিলয়।" ১৪॥

শ্রীমতী চমৎকার মোহিনী দাসী।
বিষ্ণুপুর।

দেবতা আমার।

টানিয়ে স্নেহের রাশি, অধীনীরে ভালবাসি,
কেন এত তৃপ্তি, নাথ, হৃদয়ে তোমার?
সর্ব্বগুণান্বিত তুমি, গুণ-বিবর্জ্জিতা আমি,
তবে কেন ভালবাস দেবতা আমার? ১
করুণা-নিঝর তুমি, তাই স্নেহ-বারি আমি,
পেয়ে অবিরত ধারে সুশীতল হই;
পূর্ণ স্নেহ মমতায়, কেবা হেন পতি পায়?
তোমার স্নেহেতে সদা মুগ্ধা হ'য়ে রই। ২
তব চক্ষুরন্তরালে, থাকি যদি কোন কালে,
কতই যাতনা দেব! পাও তব চিতে;
বুঝিতে পেরেছি আমি, তুমি দেবোপম স্বামী,
জ্ঞানহীনা, জানি না যে তোমারে পূজিতে। ৩
বিমল চরিত্র তব, এক মুখে কিবা কব,
এমন দেবতা পতি আছে বল কার্?
আমারে হেরিলে, নাথ, ভুলে যাও দুখ যত,
হৃদয়ের শান্তি-প্রদ তুমি যে আমার। ৪
যদি কিছু কষ্ট পাই, দূর করিবারে তাই,
সাধ্যমত চেষ্টা কত কর যে তখন;
আমার সুখের তরে, তুমি নাথ অকাতরে,
নিয়ত সহিছ দুঃখ করি প্রাণপণ। ৫
স্নেহ মায়া দয়া ধর্ম্ম, জগতের সার কর্ম্ম,
ওই দেব-মূর্ত্তিতেই বিরাজিত আছে;
হেন স্নেহ কার কাছে, প্রভু এসংসার মাঝে!
অনন্ত স্বর্গের সুখ পাই তব কাছে। ৬
সদা তব সঙ্গে থাকি, নয়নে নয়নে রাখি,

ইহাতে তোমার সুখ বুঝেছি অন্তরে;
বহুপুণ্য ফলে আমি, পাইনু তোমারে স্বামী,
কতই করুণা বিধি করিলেন মোরে। ৭
অমর দেবতা হেন, মর্ত্ত্যে আসিয়াছে যেন,
হেরি তব গুণ এই অনুভব হয়;
হৃদয় হইতে সত্য, প্রবাহিত হয় নিত্য,
নির্ম্মল প্রেমের ধারা মধুরতা-ময়। ৮
অকলঙ্ক পূর্ণ শশী, শারদ কৌমুদী রাশি,
বিরাজিত সদা নাথ, হৃদয় তোমার,
মধুর মলয় বায়, তব হৃদে শোভা পায়,
কোকিল কাকলী কিবা বীণা-ধ্বনি আর। ৯
তোমার অন্তরমাঝে, কোটী কোহিনুর লাজে,
নন্দনের পারিজাত হৃদে বিকশিত;
যা কিছু সুন্দর আছে, হারি মানে তব কাছে,
সুধার সুধারা হৃদে সদা প্রবাহিত। ১০॥

শ্রীমতী হরিদাসী দাসী।
কালিঘাট—ভবানীপুর।

কল্পনা।

নীরব শরত রেতে মনের উচ্ছ্বাসে,
বসেছিনু একাকিনী নির্ঝরের পাশে।
সোণার চাঁদিমা পানে
চেয়ে ছিনু আনমনে,
কাহার স্নেহের হস্ত পরশিল হিয়া,
সহস্র চিন্তার তার উঠিল বাজিয়া। ১
মধুর লাবণ্য মুখে অমিয় হাসিয়া
কে তুমি বালিকা-মুখ চুম্বিলে আসিয়া?
অযাচিত স্নেহ ভাব
সহিতে না পারি আর
প্রেমময়! কেড়ে লও বালিকা হৃদয়,
ভুলে যাই দুঃখভার স্মরিয়ে তোমায়। ২
কেন এসে বালা-প্রাণ জুড়িয়া বসিলে?
কেন এ কোমল প্রাণ আকুল করিলে?
কেন তুমি মধু স্বরে
ডাকিলে অমন করে,
কেনবা রাখিলে স্মৃতি হৃদয়ে আমার!
ভুলিতে পারি না তোমা হৃদয়-আধার। ৩
ঐ আলোময় মুখ হেরিয়া হেরিয়া
কত দিন গেল চলে আকাশে মিশিয়া;
সেই সে বিশাল আঁখি,
যার পানে চেয়ে থাকি,
কত সুখ পাইয়াছি বলিব কেমনে!
ভুলিতে পারি না দেব! ভুলিব কেমনে। ৪
বিষাদ পূরিত বুক আশায় বাঁধিয়া
ছেড়ে দাও চলে যাই আকাশ ভেদিয়া,
ভগন হৃদয়ে আর,
বহিবে না অশ্রুধার,
ছেড়ে দাও ছুটে যাই সুদূর গগনে,
ভুলিতে পারি না তোমা যাইব কেমনে? ৫
দয়াময়! দয়া কর অবোধ সন্তানে,
চুম্বন করো না আর বালিকা বয়ানে,
কেমনে স্নেহের ডোরে
বাঁধিলে এ বালিকারে,
বুঝি না বুঝি না লীলা অবোধ সন্তান;
চুম্বন করো না দেব! বালিকা-বয়ান। ৬

কুমারী সুকুমারী দাস,
বরিশাল।

জন্মদিনের উপহার।

আজি সে পীযূষ ঢালা
জন্মোৎসব মা তোমার,
বিধি-বরে ধরাতলে
উপনীত পুনর্ব্বার।
মাগিছে হৃদয় তাই
শুধু দেব-আশীর্ব্বাদ,
যাচিছে মা তব তরে
তাঁর (ই) প্রীতি পরসাদ।
বরষিছে প্রাণ মন
শুভাশীষ অনিবার;
খেলিছে মরম তলে
কত ভাব পারাবার!
অফুট কলিকা সম
তোর সে বালিকা-মুখ
জাগিছে অন্তরে আজি
ঢালিছে অমল সুখ।
স্মৃতি পুষ্পে গাঁথা তোর
শৈশব-কাহিনী গুলি
নাচিছে মানস নদে
পুলক লহর তুলি।
তোর সেই কচি হিয়া
শত মধুরিমা-ভরা,
সপ্রতিভ ছবি খানি
প্রীতিপূর্ণ মনোহরা,
সরল-সুষমা ময়
তরল লাবণ্য-রেখা,
কোমল সুহাসি টুকু
রবে হৃদে চির লেখা।
এখন যৌবনোদ্যানে
পবিত্র কুসুম তুই—
নীরব মাধুরী-মাখা
নব বিকশিতা যুঁই
বিভুর প্রসাদে কালে
শুভ্র শান্ত যুঁথী সম
ক'রো বাছা বিতরণ
পরিমল অনুপম।
ঢালিতে সৌরভ আগে
সোণার নন্দন বনে,
আকাঙ্ক্ষিত অর্ঘ্য হ'তে
অমরের শ্রীচরণে।
সপ্তদশ বর্ষাতীত
ত্যজি সে ত্রিদশভূমি,
আলো করে ছিলে ধরা
কুমারী রতন তুমি।
এড়ায়ে হিমাদ্রিসম
বিঘ্ন বাধা অগণন,
অষ্টাদশ বর্ষে আজি
করিলে মা পদার্পণ
লইয়ে বালাই যত
প্রাচীন বরষ যাক্;
নব বর্ষ পলে পলে
কল্যাণ কুড়াতে থাক্
থাক মা' শীতল করি
জনক জননী-ক্রোড়—
ধর্ম্মালোকে উদ্ভাসিত
স্নেহের ত্রিদিব তোর
তাঁহাদের আশালতা
কর বাছা কুসুমিত,

প্রিয় আচরণে কর
সতত তাঁদেরে প্রীত।
প্রেমের প্রতিমারূপে
বিরাজ কর মা' গেহে,
জুড়াও সবার হিয়া
মধুর ভকতিস্নেহে।
বিমল করুণা ধারা
বরষ' ব্যথিত পরে,
কামিনী কুলের মণি
হওমা বিধির বরে।
শৈশবের দেবভাব
পুণ্যের প্রভায় মিশি
অনুদিন ও আননে
খেলুক উজলি দিশি!
জ্ঞানে ধর্ম্মে প্রেমে কর্ম্মে
লভহ উন্নতি নিতি,
জগৎ তোমার শিরে
ঢালুক সোহাগ প্রীতি!
শুভ জন্ম দিতে তোরে
কি আশীষ দিব আর,
হও ঈশ-পাদমূলে
পবিত্র অরঘ্য ভার।

সাধের সে অমরার
কুসুম প্রকৃতিখানি,
মোহের কুহকে ভুলে
হারায়োনা হেথা রাণি!
চির নিরমল রোক্
তব ও নির্ম্মল মন,
সংসারের আনাঘ্রাত
থাক রে স্নেহের ধন!
দুঃখে অনাহত থাক
কুসুম কোমল কায়—
হও সুখী সর্ব্বসুখী
পরমেশ করুণায়!
স্নেহের শিশিরসিক্ত
কবিতা কুসুম-হার,—
ধর মা' ও চারু করে
আজিকার উপহার!
হ'ল না মালিকা গাছি
তব যোগ্য মা' আমার,
তবু নে' মা ভাবি শুধু
স্নেহ-দান মাসিমার!

আশীর্ব্বাদিকা
ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

মধুময়।

কিবা মধুময় হেরি আধ-মুকলিত ফুলে,
শিশির কি মধুময় চারু নব উষাকালে।
মধুময় হয় শশী শারদীয় নভঃস্থলে,
প্রভাতে মধুর শুনি বিহগিনী-কলরোলে।
নিশীথে বাঁশরীরব হৃদি নাচে তালে তালে,
নিদাঘে মধুর ছায়া ঘন বিটপীর তলে।
প্রাবৃটে মধুর রূপ বিজলি বারিদকোলে,
ধরিত্রী মাধুর্য্যে পূর্ণ বসন্ত ঋতু উদিলে।
শিশুর মধুর রব ডাকে যবে "মা" "মা" ব'লে,
প্রেমে মধুরিমা দেখি নবীন মিলনকালে।
সোহাগিনী মধু ঢালে মানের করুণ রোলে,
রূপরাশি হেরি মধু সাধুতা ছবিতে মিলে।
মধুর আধার হয় বিনয়ে সারল্য দিলে,
হৃদয় মাধুরীময় পরদুখে যবে গলে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী,—কানপুর।

No. 408-9. 5th February, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৬ বর্ষ। ৪০৮-৯ সংখ্যা। | পৌষ ও মাঘ—১৩০৫। | ৬ষ্ঠ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ৬৯ সাংবৎসরিক মাঘোৎসব মহোৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছে। একদিবস সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে সম্মিলিত উপাসনা করিয়া মহর্ষির শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়তর হউক।

নূতন ধর্ম্মাধ্যক্ষ—কলিকাতার নূতন লর্ড বিশপ রেবরেণ্ড ডাক্তার ওয়েল্‌ডনের অভিষেকক্রিয়া ১লা ফেব্রুয়ারি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ইনি একজন উদারহৃদয় ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক এবং ইহাঁ হইতে এ দেশের উপকারের আশা করা যায়।

প্লেগ—বোম্বাই সহরে পুনরায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। শতকরা ৭০।৮০ জন মরিতেছে। আফ্রিকাতে ইহা না কি চিরকাল আছে এবং এখন আরও বাড়িতেছে।

আফ্রিকায় ইংরাজ গবর্ণর—কেরো হইতে লর্ড কিচনার সুদানের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সসৈন্যে দেশ পরিদর্শন করিতেছেন।

মধ্য হিন্দু কলেজ—বিবী বেজাণ্ট কাশীতে হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষার সুবিধাবিধান জন্য Central Hindu College নামে একটী কলেজ স্থাপন করিতেছেন। অনেক ধনাঢ্য হিন্দু এজন্য অনেক টাকা দান করিয়াছেন। কাশীর মহারাজা ৫০ হাজার টাকা মূল্যের অট্টালিকাসহ ভূমি দান করিয়াছেন। অ্যানী বাসন্তীর অধ্যবসায় ও ভারতহিতোৎসাহকে সহস্র ধন্যবাদ।

বিধবাদিগের প্রতি সদয়তা—বিগত মান্দ্রাজ কন্‌গ্রেস উপলক্ষে মান্দ্রাজে যে

সামাজিক সভা হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

হিন্দু বিধবার ২১ বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে বিধবা-বেশে সাজান নিষ্ঠুরতা বলিয়া গণ্য হইবে। বিধবাগণ সামাজিক নির্যাতনের হাত এড়াইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হয়, তজ্জন্য এই সমিতি বরাহনগর, পুনা ও মান্দ্রাজের বিধবাশ্রমের আদর্শে বিধবাশ্রম সকল খুলিতে পরামর্শ দেন।

দাক্ষিণাত্যে ৫ বৎসরের বিধবাকেও নেড়ামাথা ও নিরাভরণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্যা করিতে হয়। রমণী-গণকে নব্য হিন্দুসমাজ মনুষ্য বলিয়া কবে মমতা করিতে শিখিবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ জন নূতন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দাস, এম এ, বি এল এবং বাবু হরিপদ ঘোষাল, বি, সি ই. গ্রাজুয়েট-দিগের দ্বারা মনোনীত।

স্ত্রী-বাগ্মী—কুমারী নোবিল স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া বিলাত হইতে আসিয়াছেন। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন, আরও বলিবেন।

ইংলণ্ডে শিক্ষোন্নতি—মহারাণী বিক্-টোরিয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইংলণ্ডে মূর্খ লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪০, এখন ৬৷৭ জন মাত্র।

নূতন ঘড়ী—মার্কিন বৈজ্ঞানিক এডি-সনের ফনোগ্রাফের অনুকরণে এক ফরাসী শিল্পকার এক ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে যটা বাজে, ভাষায় উচ্চারিত হয় এবং ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য "ওহে জাগ" এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হয়।

লেডি কুর্জ্জন—বর্ত্তমান বড় লাটের পত্নী মার্কিন রমণী ও বহুগুণে গুণবতী। ইনি ধনাঢ্যা ও পরিচ্ছদপ্রিয়া। শুনা যায় ২ লক্ষ টাকার পোসাক লইয়া আসিয়াছেন। ইহাঁদের দুইটীমাত্র কন্যা সন্তান। জগদীশ্বর সসন্তান ইহাঁদিগকে কুশলে রক্ষা করুন্।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষিকা—আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, কুমারী চন্দ্র-মুখী বসু, এম এ, এবং শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম, এম এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষিকা মনোনীত হইয়াছেন। এদেশে স্ত্রীলোক-দিগের এ প্রকার গৌরব এই প্রথম।

দেবলরাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা হয় হয়। নিদা-রুণ গ্রীষ্মে লোকের দেহ পচিয়া যাইতেছে। কাল কাল ঘন ঘন মেঘে আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। বাতাসের নাম গন্ধ নাই। দেখিতে দেখিতে এক পসলা

বৃষ্টি হইয়া গেল। মেঘের গাঢ়তা ও কৃষ্ণতা একটু বিরল হইল বটে, কিন্তু বৃষ্টি একেবারে ছাড়িল না, রহিয়া রহিয়া বর্ষণ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চপলা-চমক, পরক্ষণেই কড় কড় শব্দ। চৌবেড়িয়া হইতে হাঙ্গরীবাঁকের মধ্য দিয়া শ্রীনগর অভিমুখে যে শড়ক গিয়াছে, দেবনাথ পালের গৃহ এই পথের নিতান্ত পার্শ্ববর্ত্তী। কেহ টোকা, কেহ গোল-পাতার ছাতা, কেহ বেত কাপড়ের, কেহ বা মোমজামের ছাতা মাথায় দিয়া চৌবেড়িয়ার দিক্ হইতে ঐ পথ বাহিয়া যাইতেছে। দেবনাথের জননী একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন, "দেবল আমার আজ না জানি কতই কষ্ট পাইতেছে! আষাঢ় মাসের মেঘ হইতে প্রায়ই বাজ পড়ে। আজ যেরূপ কড়কড় শব্দ, চৌবেড়ের দিকে হয়ত বাজ পড়িয়াছে। জানি না, আমার কপালে কি আছে। যদিও দৈবজ্ঞ ঠাকুর বলিয়াছেন, দেবলের পরমায়ু আশী বছর, ইহার মধ্যে তার কোন ফাঁড়া নাই। এই সবে বাইশ বছরে পা দিয়েছে। তবুত মেয়েমানুষের প্রাণ বোঝে না। কোন্ সকালে দুটি পান্তা ভাত মুখে দিয়ে বাছা আমার বুড়োশিবের মেলায় বেচা বেচিতে গিয়াছে, সন্ধ্যা হইল, এখনো দেখা নাই।" দেবল-জননী পূর্ব্ব-দ্বারী গৃহের দাওয়ার এক প্রান্তে একা-কিনী বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, চৌবেড়িয়ার দিক্ হইতে সেই পথ দিয়া একখানি চৌপাল হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে। ক্রমে চৌপালখানি তাঁহারই উঠানে আসিয়া স্থাপিত হইল। দেবনাথ-জননী শশব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। চৌপাল হইতে দেবল বাহির হইয়া বেহারাদিগকে বিদায় দিলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। মেঘের ঘোরে সন্ধ্যাদেবী যত নিকটবর্ত্তিনী দেখাইতেছিলেন, দেখা গেল, বাস্তবিক তখন তত নিকটে আসেন নাই।

দেবনাথ পালের নাম ক্রমে "দেবলে" পরিণত হইয়াছিল। বাঙ্গালা শব্দের অপভ্রংশ-রীতি সময়ে সময়ে আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া থাকে। প্রথমে দেবনাথ পালের "নাথ" ভাগ লোপ পাইয়া দেব পাল দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমে "পালের" "পা" এই বর্ণটীও ধ্বংস পাইয়া "দেবল" মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তৎকালীন শিশু-গণ,—যাহারা দেবনাথ নাম কখনও শুনে নাই,—তাহারা আবার "দেবল পাল" বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চৌবেড়িয়ার বুড়োশিবের মেলায় দেবনাথ হাঁড়ী কুঁড়ী বেচিতে যাইতেন। গল্পের এই অধ্যায়ে আমরা যে দিনকার ঘটনা বলিতেছি, সে দিনটী একটী মেলার দিন। দেবল ঐ দিন প্রাতে পর্য্যুসিতান্ন ভোজন করিয়া ঐ মেলায় গমন করেন। হাঁড়ী কলসী বোঝাই করা পাঁচ খানা গাড়ী তাঁহার সঙ্গে যায় এবং আপনার মাথাতেও প্রকাণ্ড এক ঝাঁকা উৎকৃষ্ট পাতলি হাঁড়ী ছিল।

কিন্তু যে কুম্ভকার প্রাতঃকালে উপরি-উক্ত সজ্জায় মেলায় মৃৎশিল্প বিক্রয় করিতে গমন করিল, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সে রাজ-পুত্রের ন্যায় রিক্তহস্তে চৌপালে চড়িয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল; বিক্রয়াবশিষ্ট কিছুই ফিরিয়া আসিল না। ব্যাপার টা কি?

দেবল চৌপাল হইতে অবতরণপূর্ব্বক বাহকগণকে বিদায় দিয়া "মা মা" শব্দে জননীকে ডাকিতে ডাকিতে মাতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং জননীকে কহিলেন,

"মা, তুমি বাহিরে বসিয়াছিলে, চৌপাল দেখিয়া ঘরের মধ্যে পলাইলে কেন? আমি যে চৌপালে করিয়া আসিলাম।" জননী কহিলেন,—

"বুড়োশিবের কৃপায়, এক দিনের বেচা কেনায় রাজা হইলি নাকি?"

"তুমি একে রাজার মেয়ে, আবার রাজার মা হইতে তোমার বড় সাধ হইয়াছে, তাই আজ রাজা হইয়া চৌপালে চড়িয়া বাড়ী আসিলাম।"

"আজিকার ঘটনা ও তোর আনন্দভাব দেখিয়া, আর কথাবার্ত্তা শুনিয়া, আমি অবাক্ হইতেছি। তোর মুখে এমন হাঁসি খুসীর কথা কখনও শুনি নাই;— যখন তোর মুখের দিকে চাহিয়াছি, তখনই মুখখানি বিষণ্ণ বই প্রসন্ন দেখি নাই। ভাল! আজিকার অবিক্রী হাঁড়ী কুড়ী এখনো ফিরিল না কেন?"

"সেইত আজিকার আসল কথা। তার পর বুড়োশিবের কথা,—তারপর মামার বাড়ীর কথা।"

(৭)

চৌবেড়িয়ার বুড়োশিবের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণেই মাসে মাসে একদিন করিয়া মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় নানাস্থান হইতে বহুতর সামগ্রীর সমাবেশ হয়। বিশেষ হাঙ্গরীবাঁকের হাঁড়ী ক্রয়করণার্থ বহুসংখ্যক পাইকড়্ আসিয়া থাকে। আমরা ষষ্ঠাধ্যায়ে যে মেলার কথা পড়িয়াছি, সেই মেলার দিন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত না হইতেই, দেবলের সমস্ত হাঁড়ী, কলসী, পাত্‌লি ইত্যাদি যাহা যাহা ছিল, সমস্ত বিক্রয় হইয়া গেল। একজন পাইকড়, বিস্মৃতিক্রমে একটি টাকার পরিবর্ত্তে একটি মোহর দিয়া গেল। এরূপ খুঁটি ঝাড়া বিক্রয় এবং একগুণের স্থলে বিশগুণ প্রাপ্তি, এমন অসামান্য ঘটনা, বুড়োশিবের মেলায় কাহারও ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। দেবল সে দিন অন্যান্য সময়াপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হাঁড়ী কুঁড়ী লইয়া গিয়াছিলেন। অন্যান্য মেলায় কোন দিন সিকি, কোন দিন অর্দ্ধেক দ্রব্য ফিরিয়া আসিত, অদ্য একটী ভাঙ্গা হাঁড়ী, বা কলসীও ফিরিল না। এক টাকার স্থলে একটী মোহর প্রাপ্তি— কিয়ৎক্ষণ পরে জানিতে পারিয়া, আগামী মেলায় মোহরটী তৎস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবেন কিনা; ভাবিতেছেন, এমন সময়ে "তোমার পাওনা, তুমি পাইয়াছ," ইত্যাদি শব্দ তাঁহার শ্রুতি স্পর্শ করিল। এইরূপ নবাঙ্কিত ন্যায় দ্বারাই দৈব মানুষকে সাময়িক শিক্ষা দিয়া থাকেন।

আজিকার মেলায় খুঁটিঝাড়া সমস্ত বিক্রয় হইয়া গেল এবং বিক্রয়ের লাভ ব্যতীত বিশিষ্টরূপ দৈবদানে দেবলের দেবভক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইল। ললাটস্থ রাজদণ্ড সম্পর্কে দৈবজ্ঞ-বাক্য, শ্রীনগরের জঙ্গলে শিরে ধৃত ফণছত্র ইত্যাদি ঘটনা যেন আজ অস্ত আকার ধারণ করিয়া দেবলের মনোক্ষিসমীপে নৃত্য আরম্ভ করিল। আনন্দে অষ্টধা বিভক্তীভূত হইয়া বুড়োশিবের মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলেন। গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ আরম্ভ করিলেন। তখন প্রাঙ্গণস্থ পঞ্চ সহস্র লোকের মধ্যে আর এক জনেরও ক্রয় বিক্রয় শেষ হয় নাই। সুতরাং দেবদ্বারে তৎকালে দেবল ভিন্ন অন্য জন প্রাণী ছিল না। মন্দির-মধ্য হইতে মেঘগর্জ্জনবৎ হঠাৎ অব্যক্ত গম্ভীর নিনাদ নির্গত হইতে লাগিল। ধূপধূনা-গুগ্‌গুল-চন্দন-চর্চ্চিত কুসুমগন্ধে দেবলের নাসারন্ধ্র পূর্ণ হইয়া গেল। দেবল চকিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। ভয় ও ভক্তিভরে হৃদয় গম্ভীর হইল। দেহে রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্বর্গধাম হইতে যেন কিন্নরকণ্ঠ-সমুত্থিত 'সঙ্গীতলহরীসহ মধুর-মুরজ মুরলীধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অপাঙ্গে অশ্রু সঞ্চিত হইল। অল্পক্ষণ-মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত গম্ভীর নিনাদ হইতে দেবল একটি সুব্যক্ত বাণী শুনিতে পাইলেন ;—

"দেবল, তুমি রাজা হইবে।" তাঁহার নাম ধরিয়া কে কোথা হইতে এই বাক্য বলিল, দেবল তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল অপার আনন্দে তাঁহার হৃদয় বিহ্বল হইতে লাগিল। দুই একপদ করিয়া পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ। তন্মধ্যে 'দেব-দণ্ডবদনস্তর পশ্চাদ্গমন অন্যতম।' বালক দেবল, এ সকল কিছুই জানেন না। কিন্তু আজ স্বয়ং ভক্তি দেবী তাঁহাকে ভক্তাচার শিক্ষা দিলেন। ঐরূপে সাত আট হাত পশ্চাৎ গমন করিয়া তবে পরাঙ্মুখ হইতে সাহস হইল। পরাঙ্মুখ হইবামাত্র একটি পরমসুন্দর সমবয়স্ক যুবা দেবলের হস্ত ধারণ করিলেন। দেবলের হস্ত ধরিয়া গ্রামের অভ্যন্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সেই কথাবার্ত্তার কিয়দংশ পাঠক পাঠিকা-গণকে শ্রবণ করিতে হইবে। কারণ তাহার সহিত এই আখ্যায়িকার একটু সংশ্রব আছে, এবং এই গল্পের যে অংশের বিকাশ-চেষ্টা ষষ্ঠাধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ঐ কথোপকথন তাহারও সহিত সংসৃষ্ট।

আগন্তুক যুবা দেবলের হাত ধরিয়া গ্রামমধ্যে যাইতে যাইতে কহিলেন,—

"দেবল, তোমার ন্যায় একরোহ (এক-রোকা) ও তেজস্বী মানুষ আমি দেখি নাই। আমার একটা কথায় দোষে তুমি তিন বৎসর আমাদের বাড়ী যাও নাই। তিন চারি খানা গাঁয়ের কুমারে এখানকার মাটী

লইতে আসে, কেবল তুমি আস না। পাছে আমাদের বাড়ী যাইতে হয়, কি—আমাদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি হয়, এজন্য চৌবেড়ের তিনের হাট বন্ধ করিয়াছ। তুমি আস না বলিয়া পিতা মাতা কতই দুঃখ করেন। এই ঘটনার মূল আমি, এজন্য তাঁহাদের চক্ষের বিষ হইয়াছি। বাপ আমার,—আমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া আজ আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে দেবলের হস্তধারী যুবক অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আজ দেবভক্তিতে দেবলের হৃদয় দেবভাব ধারণ করিয়াছে, 'বজ্রাদপি' কঠোর দেবল 'কুসুমাদপি' মৃদু হইয়াছেন, পূর্ব্বের প্রবল আত্মাভিমান, ক্রোধ, জিদ প্রভৃতি সকলই দূরে গিয়াছে, হৃদয়ে সরলতার ঢেউ খেলিতেছে। কহিলেন,—

"ছোট মামা, দোষ তোমার নহে, দোষ আমার। তুমিত ঠিক্ কথাই বলিয়াছিলে। তুমি রাজপুত্র, আমি দুঃখিনীর ছেলে,—বিশেষ হাঁড়ীগড়া কুমার। আমার সঙ্গে একঘরে খাইলে কি তোমার মান থাকে? আমিই গণ্ডমূর্খ, তাই সেই কথায় রাগ করিয়া আজ তিন বছর তোমাদের মুখ দেখি নাই। বিশেষ দাদা দিদির কাছে আমার অপরাধের অন্ত নাই। চল, আজ তাঁদের চরণ দর্শন করিয়া আসি।" দেবল এই কথা কয়টী বলিয়া সত্বর কনিষ্ঠ মাতুলের হস্ত হইতে নিজ হস্ত আচ্ছিন্দনপূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি লইলেন এবং মাতুলালয়ের সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মাতুলালয়ে গমন করিলেন। মাতামহ, মাতামহী, মাতুলানীগণ আজ দেবলকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কত যত্ন ও কতই আদর করিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেবল আজ মাতুলালয়স্থ সমস্ত নরনারীর ভাব এবং তৎপ্রতি তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব স্নেহাদর দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন,—

"এককালে যে দেবল হাঁড়ীগড়া ছোট জাতি বলিয়া মাতুলালয়ে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত হইয়াছিল, আজ সেই দেবলের প্রতি মাতুলালয়ের একি ভাব? বোধ হয়, কোনরূপে দেবদ্বারের দৈববাণী ইহাঁরাও শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহাতে ইহাঁদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাসও জন্মিয়াছে। নতুবা আমার প্রতি ইহাঁদিগের এরূপ ভাব কখনই হইতে পারে না।" অনন্তর দেবল মাতামহ, মাতামহী ও অন্যান্য গুরু জনের চরণধূলি লইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। এই সকল ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই বারিবর্ষণ ও মেঘগর্জ্জন আরব্ধ হইয়াছিল। তজ্জন্য দেবল এই দুর্যোগে হাঙ্গরীবাঁক্ গমনে সকলের দ্বারাই সবিশেষ নির্ব্বন্ধ-সহকারে নিষিদ্ধ হইলেন। কিন্তু আজ যেরূপ দুর্যোগ, তাহাতে গৃহে গমন না করিলে মাতা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইবেন। তিনি মাতুলালয়ে আসিয়াছেন; পরম সুখে আছেন, মাতা কিছু সে সংবাদ পান নাই।

অতএব অবিলম্বে গৃহে প্রস্থান করা নিতান্ত আবশ্যক। সকলে এই যুক্তিটী সঙ্গত মনে করিয়া চৌপাল আনাইয়া দিলেন। সেই জন্যই আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে "হাঁড়ীগড়া ছোট জাতিকে" পাঠকগণ চৌপালারোহণে গৃহে সমাগত দেখিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় মহাত্মা হামারগ্রেণ।

ইউরোপের উত্তর প্রান্তে সুইডেন-নামক চির-তুহিনাবৃত প্রদেশে মহাত্মা হামারগ্রেণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। শিশুকাল হইতেই তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা বলবতী ছিল। তাঁহার স্বদেশে বিদ্যালয় ছিল না, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার জন্য নিজ গৃহ হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী ও বরফরাশি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। ইহাঁদের পরিবারিক দারিদ্র্য স্মরণ করিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়, কিন্তু এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য অনন্ত দুঃখরাশি বুক পাতিয়া লইতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন—এমন কি এত বিপদের ভিতরেও তিনি ৪ ৫ টী ভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁদের পরিবারস্থ সকলেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং ইহাঁর পিতা খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ছিলেন। নানা প্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক অধ্যয়ন করিবার পরে তাঁহার মনে বাইবেলের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। এই প্রকার সন্দেহের মধ্যে পতিত হইয়া তিনি নিরতিশয় মানসিক কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন, কারণ দেশবাসী এবং পরিবারস্থ সকলেই খৃষ্টান্—কেবল তিনিই স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্মের বিরোধী। এই সময়ে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও তিনি খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয়মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, তথাপি কখনও ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন নাই। কিছুদিন পরে আরও কয়েকটী স্বদেশীয় যুবক তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। ইহাঁরা সকলেই ধর্ম্মালোচনা, নির্জ্জন প্রার্থনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সদালোচনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, এই সময়ে তাঁহার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নানা প্রকার হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ অরণ্যে পথিক পথভ্রষ্ট হইলে যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হয়, ইনিও ধর্ম্মজগতে পথভ্রষ্ট হইয়া সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইলেন।

তাঁহার জীবনের এইরূপ ঘোর সমস্যা ও পরীক্ষার সময়ে তিনি কোন এক সংবাদপত্রে পাঠ করিলেন যে, ভারতবর্ষে 'ব্রাহ্ম' নামে এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে,

তাঁহারা আধ্যাত্মিকভাবে একেশ্বরের উপাসনা করেন, কোন দেবতা বা উপদেবতার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করেন না। ইহা পাঠ করিয়া তিনি পূর্ব্ব দিকে আশার আলোক দেখিতে পাইলেন। সেই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংবাদ জ্ঞাত হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে একখানি ফরাসী পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য অবগত হইলেন। তাঁহার তখন মনে হইতে লাগিল যে, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই সমাজ এবং ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ তাঁহারই ভ্রাতা ভগ্নী। বিদেশী হইয়াও এত দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজস্থ লোকদিগের প্রত্যেকের চরিত্র, এমন কি কে কি কার্য্য করেন তাহাও অবগত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে যাইবার জন্যও তাঁহার আন্তরিক ঔৎসুক্য জন্মিল। যদিও দরিদ্রতাবশতঃ প্রথমতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও আশা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। কিছু দিন পরে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অতি কষ্টে জন্মভূমি সুইডেন পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই সময়ে ইংলণ্ডে ছিলেন; এই স্থানে তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার এই সময়ের আর্থিক দুরবস্থার কথা বর্ণনাতীত। তিনি স্বীয় দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্যের কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতে ভাল বাসিতেন না। ইংলণ্ডগমনের পর তিনি কুমারী কলেটের ব্রাহ্ম (Year-Book) বার্ষিকী পাঠ করেন এবং তথাকার ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডে ৫ বৎসর বাস করিয়া ইংরাজী ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন এবং একটী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া কিছু অর্থও সংগ্রহ করেন। অতঃপর ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ইচ্ছা জন্মিল; কিন্তু অর্থাভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অন্য কেহ হইলে ইহাতেই নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িত, কিন্তু তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বহু চেষ্টার পর ও অসহনীয় দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিলেন।

রাজা রাম মোহন রায়ের প্রতি তাঁহার অটল ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ও তাঁহার দেশবাসীদিগকে দর্শনই তাঁহার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাজা রাম মোহন রায়ের প্রতি তাঁহার ভক্তি এত গভীর ছিল যে, তিনি যে বাড়ীতে থাকিতেন, প্রতিদিন সেই বাড়ীটা একবার করিয়া প্রায়ই দেখিতে যাইতেন। আদিসমাজের উপাসনার ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিতেন না, তথাপিও রাজা রাম মোহন রায়ের সমাজ বলিয়া সেই স্থানে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ একটী লাইব্রেরী করিবার জন্য তিনি অনেককে অনুরোধ ও নিজে সাধ্যমত ক্লেশও স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু

দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রাণের এই আশা পূর্ণ হয় নাই। কেহই জানিতেন না যে, তিনি এত সঙ্কীর্ণ সময়ের জন্য এ সংসারে থাকিবেন। অনেক সময় তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন যে, "হায়! রাজা রামমোহন রায়ের বাসস্থান কি ব্রাহ্ম সমাজ ক্রয় করিতে পারেন না?"

ছোট ছোট শিশুদিগকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন এবং বেড়াইতে যাইবার সময়ে দুই পকেট ভরিয়া পয়সা লইয়া যাইতেন। যেখানে একদল দরিদ্র বালক বালিকা দেখিতে পাইতেন, সেই-খানেই পয়সাগুলি ছড়াইয়া দিতেন, তার পর যখন তাহারা পরস্পরে কাড়াকাড়ি করিয়া লইত, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না।

মহাত্মা হামারগ্রেণ বাহ্যাড়ম্বর ভাল বলিতেন না। সর্ব্বদা সকলকেই বলিতেন, "ভাই, এ দেশে অনেকেই মুখে অনেক কথা বলেন, কিন্তু কার্য্যে কেহই কিছু প্রদর্শন করেন না; এস, আমরা কার্য্যে জীবনের পরিচয় দিই, মুখে ব্রাহ্ম বলিবার দরকার কি?" বাস্তবিকই দেখা গিয়াছে, যদি তাঁহাকে কোনও দিন ছাত্রসমাজে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইত, তিনি সবিনয়ে অস্বীকার করিতেন।

তাঁহার কোন কার্য্যে উৎসাহ দিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। একদা তিনি বামাবোধিনী-সম্পাদকের বাড়ীতে গিয়া-ছিলেন। সেখানে "বামাবোধিনী" পত্রিকা দেখিয়া তাহার সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যখন শুনিতে পাইলেন যে, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য উক্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তৎক্ষণাৎ এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য প্রদান করতঃ তাহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলেন, অথচ তিনি বাঙ্গালা ভাষা কিছুই জানিতেন না।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি সেখানে তাঁহার চরিত্রের এত মাধুর্য্য দেখাইয়াছেন যে, তাঁহা-দের পরিবারের প্রত্যেক লোক, ব্রাহ্ম সমাজের প্রত্যেক লোক, রাজপথের দরিদ্র বালকগণ এবং যাঁহার সহিত অন্ততঃ একদিনের জন্যও কথা বলিয়া-ছেন, তিনিও বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। এখানে আসিয়া তিনি লাটিন, জর্ম্মণ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দিয়া অনেক অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অন্য কোন লোক হইলে এত দরিদ্রতার পর অর্থোপার্জ্জন করিয়া হয়ত বিলাসী হইয়া পড়িতেন। কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। দরিদ্র হইলে যে কি প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সুতরাং তিনি স্বোপার্জ্জিত টাকাগুলি প্রাণের যত্নের সহিত দরিদ্র-দিগকে দান করিতেন।

মহাত্মা হামারগ্রেণ বিদেশী হইয়াও আমাদের দেশকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, দেশীয় খাদ্য অনেক সময় তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেন, দেশীয়দিগের সহিতই

মিশিয়া থাকিতেন এবং এ দেশের জল-বায়ু তাঁহার স্বাভাবিক হইবে বলিয়া রাস্তায় মাঠে ঘাটে রৌদ্রে বৃষ্টিতে সর্ব্বদাই বেড়াইতেন। কতকাল তিনি এ দেশে থাকিবেন, জিজ্ঞাসা করিলে মধুর হাস্য করিতেন, তাহাতে বোধ হইত এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। কালের গতি! হঠাৎ তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং ৪।৫ দিনে তাহাই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। যে বাঙ্গালী বন্ধুর বাড়ীতে তিনি ছিলেন, তাঁহারা সপরিবারে পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহাকে মমতা করিতেন—কোনও সেবাশুশ্রূষার ত্রুটি করেন নাই। পীড়িত অবস্থায় তাঁহাকে "কেমন আছেন?' জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন "আমি ভাল আছি, আমার কোনও অভাব নাই।" তাঁহার আত্মা দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। ব্রাহ্ম বন্ধুগণ ঈশ্বরোপাসনা-পূর্ব্বক তাঁহার শবদেহ স্কন্ধে করিয়া কলিকাতার নিমতলাঘাটে লইয়া যান এবং তথায় চিতাগ্নিতে তাহা ভস্মসাৎ হয়। কলিকাতায় ইউরোপীয়ের অগ্নি-সংস্কারের বোধ হয় এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

হামারগ্রেণের জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হস্ত প্রত্যক্ষ হয় এবং বাঙ্গালীদিগের সহিত তাঁহার মধুর সম্মিলন ও তাহাদের জন্য তাঁহার প্রাণদান চিরস্মরণীয়।

প্রভাতী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈত্রসংক্রান্তির প্রখর রৌদ্র গাছের উপর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, পদ্মগন্ধে সুরভিত সরোবর-সলিলে সরোজদলের পল্লবচ্ছায়ায় বসিয়া হংস সকল বিশ্রাম উপভোগ করিতেছে, বনের ভিতর গাছের তলে তলে আরণ্য মৃগ-মিথুনেরা নীরব নিস্পন্দভাবে চরিয়া বেড়াইতেছে। সেই সময় একটী কোকিল-কাকুলিত গভীর বনের ভিতরে একটী নবীন বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মধুমতী; তাহার সাক্ষাৎ সৌভাগ্য দেবীর ন্যায় প্রভাতী তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। মধুমতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, থামিয়া থামিয়া কহিল "প্রভাতি, এখানে এসে বস।"

প্রভাতী। আমি সচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি এখন অকপট হৃদয়ে তোমার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা কর। আমি আশা করি, তুমি আমার নিকট কিছুই গোপন করিবে না, ও করিবারও কিছু নাইও। তোমার কোষ্ঠীর ফল গণনা করিয়া পিতা মাতা তোমার ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে বিবাহ দিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহাতে তুমি আন্তরিক সন্তুষ্ট ছিলে। আমি জানি, শীঘ্রই তোমার ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হইবে। অতএব

শীঘ্রই উপযুক্ত স্বামী লাভ করিয়া সুখী হইবে। হঠাৎ তোমার এ দুঃখ বিমর্ষতার কারণ কি? খুলিয়া বল।

মধুমতী নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল। তারপর কহিল "আজ বলিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, তুমি জানিও আমার জীবন অল্প দিনেই শেষ হইবে।"

প্রভাতী তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল তাহার মুখের উপর ঘন ঘন শূন্য দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল ও অসাধারণ বিজ্ঞতার সহিত তাহার হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে বড় কষ্টকর—বড় কঠিন, যাহা বুঝিতে পারিল তাহাতে সে অস্থির হইয়া কহিল "মধুমতি, প্রাণের মধুমতি! বল বল, বিলম্ব করিও না, বলিয়া আমার মনের উদ্বেগ দূর কর।"

প্রভাতীর মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র মধুমতী বায়ুবিকম্পিত লতিকার ন্যায় কম্পিতহস্তে বস্ত্রাবরণ হইতে স্বহস্তলিখিত একখানি চিত্র বাহির করিয়া প্রভাতীর হস্তে দিল। প্রভাতী সেই মধুময় চিত্রখানি হস্তে লইয়াই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিল। তাহার বহুদিন-কার মনের ধাঁদা ঘুচিয়া গেল। বায়ু-কম্পিত বাপীর ন্যায় তাহার সমস্ত হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আলোক নির্ব্বাপিত হইলে গৃহ যেমন হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তাহার মনেরও সেই রকম অবস্থা হইল। কিন্তু সেই মহিমাময়ী রমণী অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত চিত্রখানি চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধরিতে গেল ও মধু-মতীকে উৎসাহ দিতে গেল, কিন্তু সে বড়ই কঠিন কাজ, দুঃখে কষ্টে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না—ক্ষণকাল মধ্যেই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল।

প্রভাতীর কষ্ট দেখিয়া মধুমতীরও হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। সেও তৎক্ষণাৎ প্রভাতীর পার্শ্বদেশে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। তারপর মধুমতীর যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিল সে আপন শয়নকক্ষে শায়িত, প্রভাতী তাহার নিকট বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে, প্রভাতীর ছেলেটী প্রভাতীর কাছে বসিয়া খেলা করিতেছে, আর মেয়েটী তাহার পায়ের কাছে বসিয়া অতি মধুরকণ্ঠে গান করিতেছে।

"তোর নাম রেখেছি হরিবোলা।
মনের সাধে ও আমার মন খেল না
হরিনামের খেলা।
প্রেমে মাখি ভক্তিমাটী, গড় না হরির
চরণদুটী,
আর দুজনে সেই 'চরণে পরিয়ে দিই
বনফুলের মালা।"

অনেক শুশ্রূষায় অনেকক্ষণে মধুমতী কিছু সুস্থ হইল দেখিয়া প্রভাতী মুক্তকণ্ঠে কহিল "মধুমতি! তোমার সুখের জন্য আমার নিজের সুখে কুঠারাঘাত করিতে প্রস্তুত হইলাম।" মধুমতী দেখিল তাহার জন্য তাহার একমাত্র হৃদয়ের বন্ধুর সমস্ত সুখের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে, দুঃখে

ক্ষোভে তাহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে উপাধানে মুখ লুকাইয়া দুই হস্তে বুক চাপিয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল। প্রভাতী কহিল "তুই কাঁদিস্ কেন? আমাদের উভয়ের মধ্যে যেরূপ বন্ধুতা আছে, তাহা বিধাতা বুঝি এই ঘটনা দ্বারা আরও সুন্দর, আরও মধুর করিতে চেষ্টা করিতেছেন! আমি জানি তুমি আমরাই দুঃখের জন্য কাঁদিতেছ, তুমি বিশ্বাস কর ইহাতে আর আমার বিশেষ কোন কষ্ট নাই।"

অতি ধীরে ধীরে মধুমতী কহিল "আমার জন্য তোমার বেশী কিছু করিতে হইবে না, কারণ মৃত্যু আমার নিকটবর্ত্তী হইতেছে।" প্রভাতী বুঝিল যে, তাহার জন্যই মধুমতী সংসার ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না—ভাবিতে ভাবিতে ছেলেটীকে কোলে লইয়া মেয়েটীর হাত ধরিয়া মধুমতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গম্ভীর অথচ ঈষৎ রুষ্টভাবে প্রভাতী অনিলকে কহিল "তোমাকে এখন অন্যমনস্ক দেখিতে পাই কেন?" গম্ভীর মুখে ঈষৎ হাস্যরেখা অঙ্কিত করিয়া অনিল কহিল "কই, এ তোমার বৃথা কল্পনা।"

প্রভাতী। যদি বৃথা কল্পনা হইত, তবে আমাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতাম। কিন্তু সে কথা পাড়িবার এখন সময় নয়। মধুমতীর অবস্থা বড় শোচনীয় দেখিয়া আসিলাম। তাহার বিবাহের যে প্রতিবন্ধকতা আছে, তাহা তুমি সকলি জান; কিন্তু সে ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই একজন দ্বাবিংশ বৎসরের যুবা পুরুষকে হৃদয় দান করিয়াছে। সে বড় কঠিন সমস্যা হইয়াছে—সে যাহাকে ভাল বাসিয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ কিছুতেই সম্ভবে না। কিন্তু আমি তোমার সাহায্যে সে কার্য্য সাধন করিব ভাবিয়াছি, কারণ রমণীর মনের দুঃখ রমণীই বুঝিতে পারে। সে যাহাকে ভাল বাসিয়াছে, প্রকাশ্যে তাহার সহিত বিবাহ হইলে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে। কিন্তু তাহাকে না পাইলেও মধুমতীর সুখের সম্ভাবনা নাই। সাধ্বীরা যাহাকে হৃদয় দান করে, সেই তাহাদের জীবন মরণে পতি হয়, হয়ত সে অন্য লোকের হস্তে পড়িবার ভয়ে জীবনও ত্যাগ করিতে পারে। আমি গোপনে তাহার উদ্দেশ্য সফল করিব, তুমি আমার সহায় হও।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনিল কহিল "সে আবার কি?" অনিলের মুখে একটী বিষাদের ছায়া পড়িল লক্ষ্য করিয়া অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া প্রভাতী কহিল "তোমাদের নিকট আমার জীবন বলি দিব। তুমি ভয় পাইও না, ব্যস্ত হইও না, গোপনে আমার সাহায্য করিবে কি না বল?" অনিলের মনের বিষাদের ছায়া অপসারিত হইল না, কিন্তু তেজস্বিনী প্রেয়সীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সে ক্ষণকাল

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। তার পর যেন নিজের অজ্ঞাতসারে কহিল "কি করিতে হইবে বল।" প্রভাতী ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "কহিব আর কি? যাহা করিতে বলি আমার সঙ্গে সঙ্গে নীরবে তাহাই করিও, তাহার পর স্খলিত নক্ষত্রের ন্যায় প্রভাতী স্বামীর কোলের উপর গিয়া পড়িল এবং কোমল বাহুলতা দ্বারা স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার পবিত্র মুখ ঘন ঘন চুম্বন করিতে করিতে অস্পষ্টস্বরে কহিল "প্রাণাধিক! কাঙ্গালিনীর একমাত্র ধন অনিল, তুমি কি মধুমতীকে ভালবাস?"

অনিল তখন এত অন্যমনস্ক ছিল যে, প্রভাতীর কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে কলের পুত্তলিকাবৎ প্রভাতীর মুখ মুছাইয়া ও চুম্বন করিয়া কহিল "প্রভাতী তুমি মধুমতীর কথা কি কহিলে?" প্রভাতী দেখিল তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, সে তখন আন্তরিক দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিল, "আমার বিশ্বাস, তুমি মধুমতীকে ভালবাস। প্রিয়তম, তুমি কেন এমন হইলে? মধুমতীকে ভালবাসিলে কেন? মধুমতী সহস্র আত্মীয় হইলেও তুমি আমার, তাহাকে মনে কেন স্থান দিলে?" প্রভাতী আর কথা কহিতে পারিল না, বজ্রাহত লতার ন্যায় স্বামীর কোলের উপর পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। প্রভাতীর কথা শেষ হইলেই অনিল বুঝিল যে, মধুমতীর ভালবাসার পাত্র সে নিজে। তখন তাহার মনের ভাবান্তর হইতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে তাহার নিকট পৃথিবী স্বর্গশোভা ধারণ করিল, কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যানী নন্দনবনে পরিণত হইল, তাহার সেই বিষাদক্লিষ্ট মলিন মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে মনের সুখে অস্থির হইয়া প্রভাতীকে বুকের মধ্যে টানিয়া কহিল "প্রভা! প্রভা! পৃথিবীতে এমন কি শাস্তি আছে যাহাতে, আমার মত লোকের প্রায়শ্চিত্ত হয়? আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়া দারুণ অপরাধে অপরাধী হইতেছি।"

ওঃ, অনিল! কি কথা কহিলে, একটী বারও অস্বীকার করিলে না। প্রথমেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা পাড়িলে? ইহাতে কি বুঝা যায় না যে, তুমি প্রভাতীকে ভুলিয়া মধুমতীকে ভালবাসিয়াছ! প্রভাতীর শুষ্ক কম্পিত অধর কি কহিতে গিয়া কহিতে পারিল না, তাহার মনের মধ্যে তখন নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, ভয়, সংশয়, প্রেম, ধর্ম্ম, ভালবাসা, স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা, এই সকল ভাব একত্র হইয়া মহা যুদ্ধ বাধাইল। এই ভাবে অনেকক্ষণ চলিল। অনিল নীরব নিঃস্পন্দভাবে পাষাণের ন্যায় বসিয়া প্রভাতীর সেই সুন্দর মুখখানিতে নানাভাবের লক্ষণ পরিলক্ষিত করিতে লাগিল—একটী মাত্র কথাও কহিল না। পুরুষ যে এমনতর কঠিন হইতে পারে, প্রভাতী জীবনে তাহা এই প্রথম জানিতে পারিল। প্রভাতী

স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। সন্ধ্যার আকাশ বড় নির্ম্মল, হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছে, ছোট ছোট কাল রঙ্গের পক্ষীগুলি উড়িয়া উড়িয়া খেলা করিতেছে, যেন বায়ুর সমুদ্রে তৃণগুচ্ছ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, ক্বচিৎ দুই একটী কোকিল পাখী বায়ু-সমুদ্রে অঙ্গ ভাসাইয়া, "চোখ গেল চোখ গেল, বৌ কথা কও বৌ কথা কও" গান করিতে করিতে দিক্ হইতে দিগন্তরে উড়িয়া যাইতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাল পাখীটীকে দেখা যাইতেছে, প্রভাতী তত-ক্ষণ চাহিয়া দেখিতেছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সঙ্গীতধ্বনি শুনা যাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভাতী তাহা শুনিতেছে। শুভ্র বলাকাবলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশ-পথে উড়িয়া বেড়াইতেছে। প্রভাতী শূন্য মনে শূন্যদৃষ্টিতে এই সব দৃশ্য বহুক্ষণ দেখিয়া চক্ষু মুদিত করিল। ক্ষণকাল মধ্যে সন্ধ্যার গাঢ় ছায়ায় দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইল। অন্যমনস্ক অনিল পাষাণবৎ বসিয়া তাহার কোলে মুদ্রিতনেত্রা প্রভাতীকে দেখিতে দেখিতে সমস্ত রজনী প্রভাত করিল, একটীবারও নড়িল না বা উঠিল না।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দত্তের জীবনচরিত।*

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দত্ত সন ১২৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন; জাতিতে তন্তুবায়, গোত্র অলংঋষি। ইহাঁর পিতার নাম ৺ দীননাথ দত্ত, পিতামহের নাম ৺ দুর্গা-চরণ দত্ত। দুর্গাচরণ হইতে উর্দ্ধে অষ্টম পুরুষ ৺ গণেশচন্দ্র দত্ত ১৭০০ সম্বতের প্রারম্ভে বারেন্দ্র ভূমি ত্যাগ করিয়া, সূতা ও বস্ত্রব্যবসায়ী শেঠ ও বসাক (বশুক) দিগের সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে গোবিন্দ-পুরে আসিয়া প্রথম বাস করেন। ইংরাজেরা দুর্গনির্ম্মাণের জন্য ঐ স্থান গ্রহণ করিলে ৺ গণেশ চন্দ্রের বংশধরেরা কলিকাতা বড়বাজার, পাথুরিয়াঘাটা, নিমতলা ষ্ট্রীট ও সিমলা প্রভৃতি স্থানে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা ৺ দুর্গাচরণ দত্তের নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে বাস করিতেন। পরে উক্ত বাটী বিক্রয় করিয়া, যোড়া বাগান, হরলাল দাসের লেনস্থ ৯নং বাটী ক্রয় করেন। ঐ বাটীতে ৺ নবীন চন্দ্র দত্তের জন্ম হয়। পরে তিনি নিজে ৭৩নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছিলেন।

ইনি বাল্যাবস্থায় গরাণহাটা গঙ্গাধর রায় বসুর পাঠশালে ৺গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় গুরুমহাশয়ের নিকট প্রায় পাঁচ বৎসর কাল শুভঙ্করী ও তদানীন্তন বাঙ্গালা এক প্রকার

* বামাবোধিনী ইহার প্রাচীন বন্ধু ও প্রবন্ধ-লেখক বাবু নবীনচন্দ্র দত্তকে হারাইয়া বিশেষ শোকার্ত্ত হইয়াছেন এবং সাদরে তাঁহার পুত্রের লিখিত তাঁহার জীবনীকে আপনার অঙ্কে স্থান দান করিতেছেন।

শিক্ষা করিয়া ৺ গোপালচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট চাণক্য শ্লোক, হিতোপদেশ ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া ফ্রিচার্চ ইনষ্টিটিউসনে প্রবিষ্ট হন। এখানে ১১ বৎসর কাল বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। প্রায় প্রতিবৎসর শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার, এতদ্ভিন্ন বাৎসরিক স্বতন্ত্র পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ডাক্তার ডফ, রেভারেণ্ড ইউয়ার্ট সাহেব ও লালবিহারী দে প্রভৃতি অধ্যাপক মহাশয়গণ ইহাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং প্রশংসাসূচক পত্র দিয়াছিলেন।

সন ১২৬৫ সালে ইউয়ার্ট সাহেবের সুপারিস্ পত্রে, মান্যবর ৺ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিবিল অডিটর আফিসে, ইহাঁকে একটী ১৫ টাকার কর্ম্ম করিয়া দেন। বৎসর তিন পরে উক্ত আফিস, বেঙ্গল একাউনটেণ্ট জেনারল আফিসের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই একাউণ্টেণ্ট জেনারল আফিসে, ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি হইয়া, তত্ত্বাবধায়কের (Superintendent) প্রাপ্ত হইয়া, প্রায় ৩০০ টাকা বেতনে, বাং ১২৯৭ সালে ৩২ বৎসর কর্ম্ম করিবার পর অবসর গ্রহণ করেন। মিঃ আর, সি, টলে ডবলিউ, সি, মেকলাউ, সি, এফ, এটকিন্‌সন্ ও ওয়েষ্টলেণ্ড সাহেব এবং অপরাপর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা নবীনচন্দ্রের কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। ওয়েষ্টলেণ্ড সাহেব ইহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া ইহাঁকে সবর্ডিনেট একাউণ্ট সারভিসে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবকাশকালে ইনি আফিসের কার্য্য সম্বন্ধীয় অনেক মন্তব্য লিখিতেন। নবীনচন্দ্র পঠদ্দশায় প্রভাকর, ভাস্কর প্রভৃতি সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন। সন ১২৬৫ সালে প্রভাকরে "পদার্থ বিদ্যা অনুশীলনের ফল" এই প্রবন্ধটী লিখিয়া বেশ সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন। নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটস্থ ৺ভুবন চন্দ্র বসাকের "সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর" পত্রিকায় প্রায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সন ১২৬৪ সালে ইনি নিজে "কলিকাতা পত্রিকা" নামে একখানি মাসিকী প্রচার করেন। এই পত্রিকাতে অনেকগুলি নীতি-সন্দর্ভের মধ্যে "বাঙ্গালার অবস্থার একটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ" প্রচারিত হয়। পত্রিকা খানি ১০।১২ সংখ্যার পর বন্ধ হইয়া যায়। ১২৬৮ সালে "শিল্প কল্পলতিকা" নামে একখানি মাসিকী প্রকাশিত হয়, তাহাতে কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ে যে প্রবন্ধ লেখা আছে, তাহা ইহাঁরই রচিত। সন ১২৬৯ সালে কবিবর তারা চরণ দাস প্রণীত "মন্মথ কাব্য" ইনি সংশোধিত করিয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করেন। ঐ সালে কলিকাতা বাজারে বহু-প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মান্যবর ব্রজগোপাল, নন্দ গোপাল ও মতিলালদিগের দ্বারা "মঙ্গলোদয়" নামে যে সপ্তাহিক সমাচার প্রচারিত হয়, ইনি তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

সন ১২৭৩ সালে "খগোল বিবরণ" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালা শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার ২০০ কাপি ক্রয় করেন। এই পুস্তক নরম্যাল বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য পুস্তকরূপে পরিগণিত হয়। এই গ্রন্থ তখনকার প্রকাশিত প্রায় সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রশংসিত হইয়াছিল।

সন ১২৭৬ সালে "ব্যাবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্র ব্যবহার, জরীপ ও সমস্থল প্রক্রিয়া" নামক গ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক ইনি প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি এ পর্য্যন্ত চারিবার মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গালা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তকের ২০০ কাপি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে ইউক্লিড্-রচিত জ্যামিতি-শাস্ত্র মন্থন করিয়া সার সংকলন করিয়াছিলেন। ইহাতে ইহাঁর উদ্দেশ্য এই যে, বালকেরা অল্প সময়ের মধ্যে জ্যামিতিঘটিত স্থূল স্থূল তত্ত্ব শিক্ষা করিবে, আর ইহার দ্বারা জ্যামিতি-শাস্ত্রের আলোচনা, সুসাধ্য হইয়া আসিবে, গণিতের প্রধান প্রধান শাখা অনায়াসে আয়ত্ত হইবে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন হইবে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সন ১২৭৬ সালে ২২ এ ভাদ্রের পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত ইতিপূর্ব্বে খগোল বিবরণ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অধিকার এবং বিশুদ্ধ অথচ সরল রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার সেই সকল গুণের অধিকতর পরিচয় হইতেছে।" তৎপরে এডুকেশন গেজেট-সম্পাদক এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"খগোল বিবরণ ও ব্যাবহারিক জ্যামিতিতে নবীন বাবু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থরচনায় বিশিষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রোফেসর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জ্যামিতি অনুবাদ করিয়া যেরূপ ভাষা প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা এই জ্যামিতির ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।"

১২৭৯ সালে "সংগীত রত্নাকর" নামে একখানি বৃহৎ সংগীত-গ্রন্থ ইনি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে সংগীতের যাবতীয় মূলসূত্র ও স্বরসাধন এবং সেতার, মৃদঙ্গ ও তবলা সাধনপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে। অপর বিস্তর রাগের গৎ ও কতিপয় রাগের তেলেনা ও সাধারণ প্রচলিত কতিপয় সেতারের গৎ ও গীত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইং ১৮৭৩ সালের ১৭ই মে তারিখে বিদ্যালয়সমূহের ডিরেক্টর সার্টক্লীফ্ সাহেব এই পুস্তকের একটী সমালোচনা প্রকাশ করেন।

সন ১২৮০ সালে "সাহিত্য মঞ্জরী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সময়ে সময়ে নবীন বাবুর যে সকল পদ্য প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয়েকটী প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিয়া ও দুই একটী প্রবন্ধ অন্যত্র হইতে

উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। পদ্য প্রবন্ধগুলি প্রায় সঙ্কলিত, কয়েকটী তিনি নিজেও লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অনেক গণনীয় বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

সন ১২৮৩ সালে নবীন বাবু "গীত সারসংগ্রহ" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইহাতে তাঁহার নিজের রচিত অনেকগুলি গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সন ১২৪৩ সালের ২০শে আশ্বিন মঙ্গলবার, অসিত পক্ষ, দশমী তিথি, মকরলগ্নে, নবীন বাবুর জন্ম হয়। ইহাঁর কোষ্ঠীতে ইনি বহুবিদ্যা ও গুণবিশিষ্ট হইবেন বলিয়া বর্ণনা ছিল এবং কোষ্ঠীর লেখা মত ইনি শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, বন্ধুর উপকারক, ধর্ম্মশীল, সাহসী, বিদ্যাস্মরণধারক হইয়াছিলেন।

সন ১২৭৯।৮০ সালে ঝামাপুকুর হইতে "দূত" নামে যে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়, তাহাতেও নবীন বাবু লিখিতেন। "ধান্য ও ইহার উৎপত্তি-প্রণালী" এই বিষয়ে একটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ তিনি এই পত্রিকাতে লিখিয়াছিলেন।

১২৮০ সালে নবীন বাবু স্কুলবুক সোসাইটীর আদেশমতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক স্কট্ সাহেবের "নোটস্ অন্ প্রাক্টিকেল জিওমেট্রি" এবং "নোটস্ অন্ সারভেয়িং", এই পুস্তকদ্বয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন।

১২৮১ সালে "হেমলতা" নামে যে একখানি পাক্ষিক পত্র ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহাতে নবীন বাবু "ওট্রেন্টো দুর্গ" এই বিষয়টী ইংরাজী হইতে অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সন ১২৮১ সালে কলিকাতা, মালদহ প্রভৃতি প্রদেশের বারেন্দ্রকুল তন্তুবায়সমূহ যাহাতে একশ্রেণীবদ্ধ হন তদ্বিষয়ে, ও তাঁহাদিগের পরস্পর আহার, ব্যবহার এবং বিবাহাদি প্রচলন বিষয়ে নবীন বাবু একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নবীন বাবু উদ্যোগী হইয়া নীলকমল বসাক, ৺রাধানাথ বসাক B. A., আনন্দনাথ বসাক ও ৺তারিণীচরণ দত্তের সাহায্যে কলিকাতা, মালদহ, গোবরডাঙ্গা, হুগলী, প্রভৃতি স্থানে স্বজাতীয়দিগের সহিত আদান প্রদান প্রচলিত করিবার, বিবাহঘটিত ব্যয় অনেক সংক্ষেপ করিবার ও বিবাহকার্য্যের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

১২৮২ সালে স্কুল বুক সোসাইটীর আদেশ মতে "Hints to Ameens on Khusrah Surveys in Bengal" এই পুস্তকের অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। এই তিনখানি পুস্তক প্রাইমারি পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

১২৮২ সালে নবীন বাবু "সচিত্র বর্ণবিবোধ", ১ম ভাগ প্রকাশ করেন। ঐ সালে "মহাজনী দর্শন ও সোজা ও শুভঙ্করী জমা খরচী হিসাব অনুসারে জমীদারী ও বাজার হিসাব" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সোজা তকরারী জমা খরচ শিক্ষার বাঙ্গালায় এইখানিই প্রথম

পুস্তক। পুস্তকখানি বালক, বিশেষতঃ বিষয়ী লোকদিগের বড় উপকারী।

নবীন বাবু "বামাবোধিনী পত্রিকায় ৩৬ বৎসর কাল নিয়মিতরূপে লিখিয়াছিলেন। বামাবোধিনী পত্রিকার জন্ম অবধি তিনি এই পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হিন্দু বিবাহপ্রণালী, বারিবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, ভূমির সার, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-রহস্য, পাঁচন ও মুষ্টিযোগ, বাদনপ্রণালী, স্বরসাধনপ্রণালী, গোপরিচর্য্যা, রত্ন, হিঁয়ালী, হারমোনিয়ম, ও বিবিধ সাময়িক প্রবন্ধ এইগুলিই প্রধান।

এতদ্ভিন্ন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়"; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের "সোমপ্রকাশ"; যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "সাপ্তাহিক সমাচার" প্রাণনাথ দত্ত রায় চৌধুরীর "রহস্য সন্দর্ভ"; এবং কেশবচন্দ্র সেনের "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাতেও অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

নবীন বাবু ৫৯ বৎসর বয়সেও পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি এত অধিক বয়সে পীড়াগ্রস্ত হইয়াও "'নিধু বাবুর গীতাবলীর সংশোধিত ভূমিকা", "নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি", "হারমোনিয়ম সূত্র" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া ১২৭নং মস্জিদবাড়ী ষ্ট্রীটস্থ বসাক এণ্ড সনস্ দ্বারা প্রকাশিত করেন। এতদ্ভিন্ন "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" লিখিয়া যান; ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য। ইহাতে বিস্তীর্ণ উপক্রমণিকা, প্রথম অধ্যায়ের আদিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ, মূল, স্বামীর টীকা, অন্বয়, দুরূহ শব্দের অর্থ, মূলের বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা পদ্যে ও ইংরাজীতে অনুবাদ, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, গীতা-মাহাত্ম্য বাঙ্গালায় অনুবাদ, হিন্দু যোগশাস্ত্র প্রভৃতি লিখিয়াছেন। এই পুস্তকখানি এখন যন্ত্রস্থ। আরও "সংগীত সোপান" নামে একখানি বৃহৎ সংগীত পুস্তক ২০।২২ বৎসর ধরিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে সঙ্গীতের বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সংগীতশিক্ষা বিষয়ক তাল, মাত্রা, অলঙ্কারাদি জ্ঞাতব্য বিষয়; ২য় ভাগে স্বরাধ্যায়; ৩য় ভাগে রাগাধ্যায়; ৪র্থ ভাগে যন্ত্রাধ্যায়; ৫ম ভাগে কণ্ঠ সংগীত; ৬ষ্ঠ ভাগে তালানার ছন্দ; ৭ম ভাগে গতাধ্যায়; ৮ম ভাগে গীতাধ্যায়; ৯ম ভাগে বৈদেশিক স্বর-বিন্যাস এবং এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তর বৈজ্ঞানিক তর্ক ও যুক্তির মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। সন ১২৬২ সালে বাগবাজারের স্বর্গীয় বিধুবদন দত্তের দ্বিতীয় কন্যা স্বর্গীয় কাদম্বিনী দাসীর সহিত নবীন বাবুর বিবাহ হয়। ইহাঁদের ৩টী পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। ১২৭৮ সালে নবীন বাবুর ৩৫ বৎসর বয়সের সময় পত্নীবিয়োগ হয়। তিনি আর দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তদবধি সুদীর্ঘকাল শুদ্ধাচারী ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে জীবন যাপন করিয়াছেন। ইহা সামান্য সাধুদৃষ্টান্ত নহে।

সন ১৩০৫ সালের ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার, রজনী ২।৩টার সময়ে সকল সন্তানকে রাখিয়া নবীন বাবু স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

রাসায়নিক পদার্থ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

অজোন বা গন্ধাম্লজান।

(OZONE).

চিহ্ন ০৩; সাংযোগিক গুরুত্ব ৪৮।

অজোন অম্লজানের রূপান্তর মাত্র।

ধর্ম্ম—১। অম্লজানের মধ্যে উপর্য্যুপরি বিদ্যুৎ পরিচালিত করিলে এক প্রকার গন্ধবিশিষ্ট 'অজোন'নামক পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহা অকৃসিজেন অপেক্ষা ১।।০ দেড় গুণ ভারী ও হাইড্রজেন অপেক্ষা ২৪ গুণ ভারী। অম্লজান অপেক্ষা অজোনের রাসায়নিক শক্তি অধিকতর প্রবল। অম্লজান অজোনে পরিণত হইলে উহার আয়তনের হ্রাস হয় ও গুণের বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ দেড় আয়তন অম্লজান ১ আয়তন অজোনে পরিণত হয়। অম্লজানও জলে পরিণত হইলে উহার আয়তনের হ্রাস ও গুণের বৃদ্ধি হয়। কোন ধাতুর সহিত অম্লজান সংযুক্ত হয় না, কিন্তু অজোন সহজেই সংযুক্ত হইয়া থাকে। অজোনের বর্ণনাশকতা শক্তি অতি প্রবল।

২। অজোন জলে কিম্বা এসিডে দ্রব হয় না। অজোন ২৮৮ ডিগ্রী তাপে পুনরায় অম্লজানে পরিণত হয়।

৩। জলকে তাড়িতদ্বারা বিশ্লিষ্ট করিবার সময় যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, উহা অজোনের গন্ধ; কারণ ঐ সময় কিয়ৎ পরিমাণে অম্লজান অজোনে পরিণত হয়।

৪। অজোনের গন্ধ অম্ল—ক্লোরাইন বা নাইট্রিক এসিডের ন্যায়। ইহা সহজেই সুগন্ধ হরণ করে। কেহ কেহ বলেন, বায়ুমণ্ডলে অজোন মিশ্রিত হইলে জ্বর ও ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ জন্মে; কিন্তু অজোন স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রধান উপকারী, এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন।

প্রস্তুতপ্রণালী—১। কোন অম্লজানপূর্ণ বোতলের মুখে কার্কছিদ্র দিয়া দুইটী বিদ্যুতের তার উক্ত বোতলমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিদ্যুৎ পরিচালিত করিলে অজোন প্রস্তুত হয়।

২। কোন পাত্রে কিয়ৎপরিমাণ জল রাখিয়া, এক খণ্ড ফসফরসের কিয়ৎভাগ জলে নিমগ্ন করিলে বায়ুস্থিত অম্লজান অজোনে পরিণত হয়।

৩। একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ সলফিউরিক ইথার রাখিয়া তদুপরি তপ্ত লৌহ রাখিলে অজোন উৎপন্ন হয়।

৪। বিদ্যুৎ হইবার সময়ে বায়ুরাশিতে অজোন জন্মে।

পরীক্ষা—কিছু ময়দা জলে গুলিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ আইয়োডাইড অব্ পটাশ মিশ্রিত করতঃ উক্ত দ্রব্য একখণ্ড ব্লটিং কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় মাখাইলে অজোন-

কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহা অম্লজানপূর্ণ বোতল মধ্যে নিমগ্ন করিলে উক্ত কাগজ তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ হইবে। ইহার কারণ, অজোন, পটাসিয়ম আইয়োডাইড্ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে আইয়োডাইড্ বাহির করিয়া দেওয়াতে, আইয়োডাইন্ ময়দার সহিত মিশ্রিত হইয়া, একপ্রকার নীলবর্ণ পদার্থ উৎপন্ন করে। এণ্টজোন (Antzone) আর এক প্রকার অজোনের রূপান্তর মাত্র

হাইড্রোজেন বা উদজান।

HYDROGEN.

সাঙ্কেতিক নাম H; পরমাণুর ভার—১।

ইতিহাস—১৬০০ অব্দে ডাং প্যারাসেল্সস্ (Paracelsus) হাইড্রোজেনের বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন। তিনি স্থির করেন যে, যখন লৌহ সালফিউরিক এসিডে দ্রব হয়,তখন হাইড্রোজেন বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৎপরে ১৭৭৬ অব্দে ডাক্তার ক্যাভেণ্ডিস্ প্রমাণ দ্বারা স্থির করেন যে, ইহা দাহ্য। ১৭৮১ অব্দে ইনি নির্ণয় করেন যে, এই পদার্থটী দহন সময়ে অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। হাইড্রস (Hydros) অর্থে জল ও জেনিরো (Genero) অর্থে প্রস্তুত করি; একারণ লেবোসিয়র (Lavosier) সাহেব ভাষায় ইহার নাম হাইড্রোজেন বা উদজান দেন। যখন ইহা ভূবায়ুতে দগ্ধ হয়, তখন বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে। শতাংশিকের ০ অংশ উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটর চাপে ১১.১৯ লিটর হাইড্রোজেনের ভার ১ গ্রাম

অবস্থা—অসংযুক্ত অবস্থায় ইহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল কোন কোন উল্কালৌহে আগ্নেয় গৈরিক গ্যাসবিশেষে সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিতি করে। সংযুক্ত অবস্থায় জলরাশির গুরুত্বের ১/৯ অংশ নানা প্রকার এসিডে, তৈলে, এমোনিয়া প্রভৃতি পদার্থে আছে।

ধর্ম্ম—হাইড্রোজেন বর্ণ-গন্ধ-স্বাদহীন স্বচ্ছ অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ। ইহা বায়ু অপেক্ষা অত্যন্ত লঘু। বায়ুর ভার ১ ধরিলে ইহার ভার .০৬৯২ ধরা যায়। ইহার ন্যায় লঘু পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই। এই সমায়তন গুরুত্বকে ১ ধরিলে যাবতীয় মূল পদার্থের সাংযোগিক, আণবিক ও পারমাণিক ভার নির্ণীত হইতে পারে। অম্লজানের ন্যায় উদজান দাহক নহে, দাহ্য পদার্থ। জ্বলন্ত দীপশলাকা হাইড্রোজেনপূর্ণ বোতলমধ্যে নিক্ষেপ করিলে নিবিয়া যায়; কিন্তু

মুখের গোড়ায় ধরিলে বাহিরের বায়ু সংযোগে অনুজ্জ্বল নীলবর্ণ হইয়া জ্বলিতে থাকে। ইহার শিখা নীলবর্ণ বটে, কিন্তু ইহার তাপ এত অধিক যে, ১ কিলগ্রাম হাইড্রোজেন ও ৮ কিলগ্রাম অক্সিজেন সংযোগে যে তাপ হয়, তদ্দ্বারা ৩৪৪৬২ কিলগ্রাম জলের উষ্ণতা ১ শতাংশিক বৃদ্ধি পায়। হাইড্রোজেন বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে। হাইড্রোজেন সংযুক্ত দ্রব্যকে হাইড্রেড বা উদ্জানিত এবং হাইড্রোজেন বিহীন দ্রব্যকে এসিডরাইড্ কহে।

সংগ্রহপ্রণালী ১। জলে কয়েক ফোঁটা অম্ল মিশ্রিত করিয়া উপর্য্যুপরি বিদ্যুতের স্রোত চালাইলে দস্তালগ্ন তার দিয়া যে পরিমাণে হাইড্রোজেন বহির্গত হইবে, প্লাটিনমসংযুক্ত তার দিয়া তাহার অর্দ্ধেক আয়তন অম্লজান বহির্গত হইবে। যথা—$২H_২O = O_২ + ২H_২$

২। জলের উপাদান বলিয়া, প্রধানতঃ জল হইতেই হাইড্রোজেন প্রস্তুত হয়। জলে পটাশিয়ম নিক্ষেপ করিলে, অন্যূন অর্দ্ধেক হাইড্রোজেন বহির্গত হয়। কিন্তু এত তাপ জন্মে যে, সমস্ত হাইড্রোজেন দগ্ধ হইয়া পাটাসিয়ম ও জলস্থ অম্লজান সংযুক্ত হইয়া পটাসিয়ম হাইড্রোমনক্সাইড অথবা কষ্টিক পটাস প্রস্তুত হয়। যথা —$২H_২O + k_২ = ২KHO + H_২$

৩। সচরাচর শীতল জলে সোডিয়ম নিক্ষেপ করিলে হাইড্রোজেন প্রস্তুত হয়। উষ্ণজলে সোডিয়ম নিক্ষেপ করিলে হাইড্রোজেন বহির্গত হইয়া যায়, ইহাতে অধিকক্ষণ পূর্ব্বের ন্যায় রাসায়নিক সংযোগ হয়, এবং পাত্র মধ্যে সোডিয়ম হাইড্রাইড্ প্রস্তুত হয়। যথা—$২H_২O + Na_২ = ২NaHO + H_২$।

৪। উত্তপ্ত লৌহ-চূর্ণ-পরিপূর্ণ নলের মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্পের স্রোত চালাইলে হাইড্রোজেন বহির্গত হয়, জলের অম্লজান লৌহের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফেরম্ অক্সাইড উৎপন্ন করে। যথা $Fe_৩ + ৪H_২O = Fe_৩O_৪ + ৪H_২$।

৫। সচারাচর দস্তাটুকরার উপর জল মিশ্রিত সলফিউরিক এসিড্ ঢালিলে হাইড্রোজেন বিমুক্ত হয় এবং জিঙ্কসলফেট ($ZNSO_৪$) বোতলমধ্যে থাকিয়া যায়। যথা $ZN + H_২SO_৪ = ZNSO_৪ + H_২$।

৬। উক্ত প্রকার সলফিউরিক এসিড লৌহ-চূর্ণের উপর ঢালিলে হাইড্রোজেন বহির্গত হয়, কিন্তু অল্প তাপ সংযোগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র হাইড্রোজেন বহির্গত হয়, বোতলের মধ্যে ফেরিক সলফিউরস বা হীরাকস জন্মে। যথা—$Fe + H_২SO_৪ = FeSO_৪ + H_২$।

পরীক্ষা—১। হাইড্রোজেন-পূর্ণ বোতলমধ্যে জলন্ত বাতি প্রবিষ্ট করিয়া দিলে নিবিয়া যায়, কিন্তু বহির্বায়ুর সংযোগে অনুজ্জ্বল নীলবর্ণ শিখায় জ্বলিতে থাকে।

২। উক্ত অনুজ্জ্বল শিখার উপর কোন প্রকাণ্ড পাত্র ধরিলে উহাতে শিশির-কণা সদৃশ জলবিন্দু সকল বিন্যস্ত হইবে;

কারণ হাইড্রোজেন দগ্ধ হইবার সময় বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে।

৩। একটী হাইড্রোজেনপূর্ণ বোতলের কার্কে একটী ছিদ্র করিয়া উহাতে একটী কাচ-নল প্রবিষ্ট করিয়া দাও, পরে উক্ত নলের উপর একটি জ্বলন্ত দীপ ধরিলে হাইড্রোজেন বাষ্প অনুজ্জ্বল শিখায় জ্বলিতে থাকে, তখন উহার উপর একটী সুদীর্ঘ কাচ-নলী ধরিলে সুমধুর বাদ্যধ্বনি সদৃশ শব্দ হইবে।

৪। একটী সোডাওয়াটারের বোতলে দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন একত্র করিয়া বিদ্যুৎ-চালিত দীপ স্পর্শ করিলে কামানের শব্দের ন্যায় শব্দ উৎপাদন করতঃ জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়।

৫। একটী রবরের বাঁশী উদ্জান দ্বারা পূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে বাঁশীটী উপরে উঠিতে থাকিবে। এই নিমিত্ত পূর্ব্বে ব্যোমযান উড়াইবার জন্য উদ্জান ব্যবহৃত হইত। কিন্তু উদ্জান সংগ্রহ ক্লেশকর বলিয়া এক্ষণে কোলগ্যাস ব্যবহৃত হয়।

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ।

(৪০৫-৬ সংখ্যা—২৩৪ পৃষ্ঠার পর)

পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা, ভ্রাতা ভগিনীগুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখা ও ভালবাসা তত কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। ইহাঁদিগের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন দ্বারা আমাদিগের বিশেষ কোনরূপ মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। যাঁহারা এত কষ্টে ও যত্নে লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি স্বাভাবিক। যাহাদিগের সঙ্গে শৈশবাবধি একত্র আহার বিহার করিয়াছি, মায়ের স্তন লইয়া কাড়াকাড়ী করিয়াছি, খেলনা লইয়া ঝগড়া করিয়াছি, খাবার দ্রব্য লইয়া কাঁদাকাঁদি করিয়াছি, তাহাদিগের প্রতি অনুরাগ এবং স্নেহ, ইহাও নৈসর্গিক। কিন্তু যাঁহাদিগের সহিত অধিক দিন বাস করি নাই, যাঁহাদিগের সঙ্গে পূর্ব্বে কোনরূপ পরিচয় ছিল না, তাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করা ও প্রাণ দিয়া ভালবাসা মহত্ত্বের কার্য্য। পরমার্চ্চনীয় শ্বশুর এবং শ্বশ্রূকে পিতৃমাতৃস্থানীয়া করিয়া তদ্রূপ শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করা আমাদিগের একটী শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ভক্তি-সাধনা কর্ত্তব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ভক্তি ব্যতিরেকে পুণ্য, নীতি এবং সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তব্য সাধন কদাচ হইতে পারে না। জনক, জননী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতি অর্চ্চনীয়াদিগের প্রতি ভক্তিমতী হইতে না পারিলে, পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিপরায়ণা হওয়া

কথনই সম্ভব নয়। ইহাঁদিগের প্রতি ভক্তিমতী হইলে ইহাঁদিগের আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করা স্বাভাবিক। আমরা যদি প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতা, মাতা, শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে প্রীতি করিতে না পারি, তবে পরম পিতা পরমেশ্বরকে ও অপরাপর পরিবারবর্গকে যে প্রীতি করিব এ আশা ও ইচ্ছা সম্পূর্ণ অমূলক। এই মহদ্‌ব্রতটী যদি আমাদিগের জীবনে অসম্পন্ন থাকে, তবে আমরা সুখ, শান্তি লাভে সমর্থ হইব না। ইহার জন্য একদিন আমাদিগকে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইতে হইবে। গুরুর গুরু পরম গুরু পিতা পরমেশ্বরে ভক্তি রাখিয়া এই মহদ্‌ব্রতসাধনে জীবন উৎসর্গ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

চরিত্রবতী হওয়া সর্ব্বোপরি প্রয়োজন। চরিত্রই মনুষ্যের সুখ ও দুঃখের এক মাত্র হেতু। চরিত্র সৎ হইলে সুখ অনিবার্য্য। নিজের সচ্চরিত্র দ্বারা যে কেবল নিজেই সুখ শান্তি উপভোগ করা যায় তাহা নয়, পরিবারের সকলে এবং প্রতিবেশিগণও ইহার অংশভাগী হন। যাঁহারা ভাবী বংশধরগণের জননী, যাঁহারা গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, তাঁহারা চরিত্রবতী না হইলে সুখের প্রত্যাশা করা "শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণ" ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সমদর্শিতা চরিত্রের একটী উপাদান। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা সমূলে বর্জ্জন করিতে হইবে। সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে ও প্রাণ দিয়া সকলকে ভালবাসিতে হইবে। স্বার্থের আধিক্য বা নূনতা প্রযুক্ত কাহাকেও কম বা কাহাকেও অধিক প্রীতির চক্ষে দেখিলে চলিবে না। উদার-প্রকৃতি-বিশিষ্ট না হইলে সুখ শান্তি লাভ অসম্ভব।

আত্মত্যাগ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সর্ব্বপ্রকার স্বার্থসুখ পরসুখে ও পরার্থে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। সদ্‌ব্যবহার দ্বারা গৃহের লক্ষ্মী ও শ্রীস্বরূপা হইতে হইবে।

যিনি বিনীত, পৃথিবী তাঁহার নিকট পরাজিত, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা বিনয়ী হওয়া কর্ত্তব্য।

আপাততঃ কষ্ট, যন্ত্রণা ও বিপদ দর্শনে পলায়মান না হইয়া সম্মুখীন হইবার ক্ষমতার নাম ধৈর্য্য। ধৈর্য্যগুণ অভ্যাস করিতে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। কোন অপ্রতিবিধেয় বিপদে পতিত হইলে ধৈর্য্যই আমাদিগের বর্ম্মস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে শান্ত চিত্তে রাখিতে সমর্থ হয়।

মিতাচারিতা দ্বারা আমরা সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। মিতাচারী হওয়া অতীব আবশ্যক।

দয়া চরিত্রের একটী অপর উপাদান। দয়া ব্যতীত মানব-হৃদয় সংসার-পিশাচ-গণের বাসস্থান হইয়া পড়ে। দয়া জীবের প্রধান ধর্ম্ম। দয়াবান্ যখন পরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দুঃখ বিমোচনে যত্নশীল হন, তখন জগৎ হইতে দরিদ্রতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া যায়। তিনি

অপরের উপকার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এবং উপকৃত ব্যক্তি স্বীয় অভাব মোচনের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে।

সর্ব্বজন সমক্ষে ও অগোচরে একই প্রকার কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে হইলেই সত্যপ্রিয় হইতে হইবে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই সত্য সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশিত রহিয়াছে। সত্যপ্রিয়তা ন্যায়পরায়ণতার সহিত সংযুক্ত হইলে প্রকৃত চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। যিনি ন্যায়বান্, তিনি কখনও কাহাকেও ন্যায্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করেন না। বিপদই হউক অথবা কোন স্বার্থের অনিষ্ট সংঘটনই হউক, ন্যায়বান্ কখনই নীতির আদেশ পালন করিতে কুণ্ঠিত হন না।

পদমর্য্যাদা অনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা চরিত্রের অপর একটি উপাদান। পিতার পুত্রের সহিত ও মাতার কন্যার সহিত সমবয়সী ভাব মর্য্যাদার হানিকর। প্রভু যদি সর্ব্বদা ভৃত্যকে লইয়া উপহাস করেন, অথবা দাস দাসীর প্রতি কু-অভিসন্ধি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এক দিন তাঁহাকে দাস দাসীর নিকট অপদস্থ হইতে হইবে সন্দেহ নাই। গুরুজনকে লোকে ভক্তি করে এবং ভয়ও করে, গুরুজনের প্রতি সেই ভয় বজায় রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য।

লজ্জা স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্ট ভূষণ। লজ্জা কি তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, বৈধ লজ্জার বশবর্ত্তী হওয়া প্রয়োজন।

সর্ব্ববিধ আলস্য, কপটতা, পরনিন্দা ও ঈর্ষ্যা ঐকান্তিক যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সাম্য ব্যতীত কোন জাতিই সিংহ-প্রতিম ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয় নাই। তদ্রূপ ধর্ম্ম,নীতি ও একতা ভিন্ন পারিবারিক জীবন অঙ্গহীন। পারিবারিক উন্নতি ধর্ম্ম, নীতি এবং একতার উপর দণ্ডায়মান। পৃথিবীতে একতা দ্বারাই যাবতীয় মঙ্গল সংসাধিত হইতেছে। যে দেশে ও যে পরিবারে একতা, সেই দেশ ও সেই পরিবার সুখসমৃদ্ধিশালী। যে পরিবারে একতার অভাব, সে পরিবারে কলহ বিবাদে শান্তিপ্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া অশেষ অমঙ্গল উৎপাদন করে। পরিবারকে সমুন্নত করিতে হইলে একতাই আমাদিগের অবলম্বনীয়।

পরিবারের প্রত্যেকের প্রতিই সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পরিবারস্থ বিধবাদিগের প্রতি অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষ যত্নসহকারে ইহাদিগের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

প্রেমের গৌরাঙ্গ।

(৪০৭ সংখ্যা ২৯১ পৃষ্ঠার পর)

প্রভু যে গ্রাম দিয়া একবার মাত্র গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক আত্মহারা হইয়া তচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। প্রভু শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পথে চলিয়াছেন, পথিমধ্যে মনুষ্য দেখিলে হরি নাম করিতে উপদেশ দিতেছেন, আর সেই লোক অমনি আনন্দে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া হরিনাম করিতেছে, আর প্রভুর সঙ্গ ছাড়িতে পারিতেছে না; যথা—

"সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরিকৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ॥" চৈঃ চঃ

কেবল মাত্র এক স্থলে যে এই ঘটনা ঘটিল তাহা নহে, প্রতি দেশে, প্রতি গ্রামে, প্রতি মনুষ্যের সম্বন্ধেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

"এইমত পথে যাইতে শত শত জন,
বৈষ্ণব করেন তারে দিয়া আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখি-
বারে।
প্রভুর কৃপায় হয় মহা ভাগবত।
সে সবে আচার্য্য হয়ে তারিলা জগৎ॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হইল প্রভুর সমন্ধে।"
চৈঃ চঃ।

প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কাহার দর্শনে মুহূর্ত্ত মাত্রে লক্ষ লক্ষ জীবের এমন মহান্ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? এই সময় কূর্ম্ম নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীপ্রভুর দর্শনলাভে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে তাঁহার সেবা করিলেন। প্রভুর বিদায়কাল সমাগত দৃষ্টে কূর্ম্ম ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়িলেন, আর তিল মাত্র প্রভুর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে বাস করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি প্রভুর সঙ্গে গমনেচ্ছা জানাইলে,

"প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না বলিবা।
গৃহে রহি নিরন্তর কৃষ্ণনাম লৈবা॥" চৈঃচঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের পূর্ণ উৎস। সে তরঙ্গে যে একবার ডুবিয়াছে, তাই তচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্ম-কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমোন্মত্ত অবস্থা দৃষ্টে সিদ্ধ বটেশ্বরে তীর্থরাম নামক এক ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে গিয়া স্বয়ং হৃতসর্ব্বস্ব অর্থাৎ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথা,—

"হেন কালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান্।
দুই জন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে।
চৈতন্যের ভারি ভুরি পরীক্ষা করিতে॥
সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে বসি কত কথা কয়॥

ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুইজন।
প্রভুরে বুঝিতে করে বহু আয়োজন॥
তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে।
সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে॥
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলী খুলিয়া সত্য দেখাইলা *।
সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ-সম্বোধন॥
থর থর কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে।
ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে।
কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।
ধেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে॥
কেন অপরাধী কর আমারে জননী।
এই মাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥
সব এলো থেলো হ'ল প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দর দরি॥

* * *

হরিনামে মত্ত হ'য়ে নাচে গোরারায়।
অঙ্গ হতে অদ্ভুত তেজ বাহিরায়॥
ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল।
চরণ তলেতে পড়ি আশ্রয় লইল॥"

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

প্রেমময়ের সেই প্রেমমূর্ত্তি দর্শনে ও তৎশ্রীমুখে মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে মহাপাপী দুরাচারিগণও পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জগাই মাধাই, মুসলমান কাজী, তীর্থরাম প্রভৃতি তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

গুর্জ্জরী নগরে তাঁহার প্রেমের একটি উজ্জ্বল চিত্র গোবিন্দ দাস স্বীয় কড়চায় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"এত বলি কৃষ্ণহে বলিয়া ডাক দিল।
সে স্থান অমনি যেন বৈকুণ্ঠ হইল॥
অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল।
দলে দলে গ্রাম্য লোক আসি দেখা দিল॥
ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি।
অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌর হরি॥
প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন।
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥
বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥
....
অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া॥"

প্রভুর সন্দর্শনে তৎকালে মানবচিত্ত কিরূপ বিমোহিত হইত, সংক্ষেপে তাহা দেখান গেল। কিন্তু প্রভুর প্রেমময় সেই শান্তিপূর্ণ করুণমূর্ত্তিখানি দৃষ্টে যে কেবল মানবচিত্ত মাতিয়া উঠিত, তাহা নহে, কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুপক্ষিগণ পর্য্যন্ত প্রেম-রসে আপ্লুত হইয়া উঠিত। যথা—

এক দিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী-স্নান।
মত্ত হস্তিযুথ আইল করিতে জলপান॥
প্রভু জলে কৃত্য করেন আগে হস্তী আইলা,
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জলকেলি যাইলা।
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায়।

সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে গায়॥"*

চৈঃ চঃ

এপর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল, তাহা তাঁহার সাধারণ প্রেমের অবস্থামাত্র। তাঁহার কমনীয় হৃদয়ে কিরূপ গাঢ় প্রেমোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল, বারান্তরে তদ্বিষয় আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

* ভক্তগণ চিরকাল সাধুদিগের অলৌকিক গুণ-কার্য্যের বর্ণনায় অনুরাগী, কিন্তু সাধুগণ নিজে তাহার তত মাহাত্ম্য স্বীকার করেন না। বা,বো,স।

দেবী কৈলাসকামিনীর স্মরণার্থ।

১০ মাস হইল সাধ্বী কৈলাসকামিনী পরলোকগতা হইয়াছেন। প্রথম এক মাস তাঁহার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনাদি যেরূপ হইয়াছে এবং পচম্বায় তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার বিবরণ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ১লা বৈশাখ দেহত্যাগ করেন, প্রতি মাসের ১লা তারিখে বিশেষ উপাসনাপূর্ব্বক তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। একটী মাসিক শ্রাদ্ধে, কোনও সুশিক্ষিতা সম্ভ্রান্তা মহিলা হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রীতিতে তাঁহার জীবনের যে ছবি অঙ্কিত করেন, তাহা পঠিত হয়। পাঠিকাদিগের গোচরার্থ তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। তাঁহার স্মরণার্থ পচম্বায় ও হরিনাভিতে দুইটী স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেকগুলি আত্মীয় বন্ধু লইয়া তাঁহার ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন হইয়াছে। গত অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহারই মনোনীত একটী পাত্রের সহিত তাঁহার মধ্যমা কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার বিবরণ অন্যত্র দৃষ্ট হইবে।

দেবী কৈলাসকামিনীর বিয়োগে আক্ষেপ করিয়া যে সকল সহৃদয় মহাত্মা ও মহোদয়া আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের সাধ্যের অতীত, এজন্য তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। কলিকাতার বহুসংখ্যক বন্ধুবান্ধব দুঃসময়ে শোকার্ত্ত পরিবারদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দূরদূরান্তর হইতেও অনেক সহৃদয় ব্যক্তি শোকলিপি দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা বর্ষণ করিয়াছেন। এক একখানি লিপি এরূপ হৃদয়স্পর্শী যে, বোধ হয় যেন তাহার মধ্যে করুণা ও সমবেদনা মূর্ত্তিমতী। সহানুভূতিকারী বন্ধুদিগের মধ্যে কতকগুলির নাম আমরা এখানে উল্লেখ মাত্র করিতেছি, ইহাতে আমাদের শোকসান্ত্বনার জন্য করুণাময় পরমেশ্বরের প্রেমালিঙ্গন কত হৃদয় গ্রথিত করিয়া কত বিস্তৃতভাবে আমাদিগকে আবেষ্টন করিয়াছে, সকলে বুঝিতে পারিবেন।

ইহাঁদের মঙ্গলেচ্ছায় স্বর্গীয় আত্মা শান্তি লাভ করিতেছেন এবং আমাদিগেরও তপ্ত হৃদয় অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি,তিনি আমাদের বিপৎকালের বন্ধুগণের আন্তরিক সদ্ভাবের প্রচুর পুরস্কার বিধান করুন্

যাঁহাদিগের নিকট হইতে সহানুভূতিপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কতকগুলির নাম :—

বিবী জে, বি, নাইট, ইংলণ্ড ; বিবী উইন্‌স, টিকারী ; পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী, শ্রীক্ষেত্র; কুচবিহারের মাননীযা মহারাণী ও তাঁহার ভগিনীগণ, শ্রীমতী মানকুমারী, সাগর দাঁড়ী ; অম্বুজাস্থন্দরী দাস গুপ্তা, রঙ্গপুর ; রেবা রায়, কটক ; সুশীলা সিংহ, বর্দ্ধমান ; নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, হুগলী ; সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর ; বসন্তবালা সোম, শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ ; বসন্তকুমারী দাসী, রাজপুর ; স্বর্ণপ্রভা বসু, দার্জিলিং ; বাবু আনন্দমোহন বসু, কেম্ব্রিজ ; রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ; বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, বেরিলি ; অবিনাশচন্দ্র মজুমদার সস্ত্রীক, লাহোর ; ভাই কাশী রাম, লাহোর ; বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর ; বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু, দেওঘর ; রাজ নারায়ণ বসু, ঐ ; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আবগাও কবিরাজ দ্বারকা নাথ রায়, ত্রিবেণী ; বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, ময়ূরভঞ্জ ; করুণাদাস বসু, বাঁকুড়া ; বরদাদান বসু, রামপুর বোয়ালিয়া ; বিহরীলাল ঘোষ, লক্ষ্ণৌ ; গুরুচরণ মহালনবিস, মধুপুর ; ডাক্তার নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধুবড়ী ; অভয়াচরণ বসু, প্যারীলাল ঘোষ, এম, এ, মেদিনীপুর ; রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ; কৈলাসচন্দ্র দাস গুপ্ত, এম, এ, রঙ্গপুর ; অমৃতলাল সাণ্যাল, জিসলমর, বারিষ্টার পি, দত্ত, হোসাঙ্গাবাদ ; মেঃ ও মিসেস কে এন রায়, পাবনা ; শশিভূষণ মিত্র, রেঙ্গুণ ; ভগবতীচরণ ঘোষ, মুঙ্গের ; গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, ময়মনসিংহ ; মহীন্দ্র মোহন চন্দ, ঐ ; কিশোরীমোহন রায়, কাকীনা ; অম্বিকাচরণ মিত্র এম, এ, বহরমপুর ; গোপাল চন্দ্র সেন, গিরিদি ; তিনকড়ী বসু, শ্রীরামপুর ; যতীন্দ্রমোহন বসু, আসাম ; চারুচন্দ্র নাগ, এম, এ, বি, এল, খুলনা ; রাধারমণ সিংহ, ভাগলপুর ; ডাক্তার জে, সি, বসু, দার্জিলিং ; আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সালেঘর ; কালীনাথ দত্ত, মজিলপুর ; নবীনচন্দ্র দত্ত, উমাচরণ মিত্র, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীমতী হেমকুসুম মল্লিক, বাঁকীপুর।

প্রেরিত বিবরণী।

কৈলাসকামিনী দেবী বাল্যকাল অবধি ব্রাহ্ম সমাজের সকলের নিকটেই নিজগুণে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার অকালে পৃথিবী ত্যাগ যে সুধু স্বামী ও সন্তানদেরই শোকের কারণ হইয়াছে, তাহা নহে ; অনেক হৃদয়ই তাঁহার বিচ্ছেদের তীব্রতা অনুভব করিয়া বিশেষ কাতর। সেই গুণবতী সতীর অকালমৃত্যুতে অনেক চক্ষু শোকাশ্রু প্রবাহিত করিয়াছে। আমিও তাহাদেরই একজন।

প্রথম জীবনে যখন কলিকাতা আমার নিকটে অপরিচিত ও নূতন স্থান ছিল, তখন ভারতাশ্রমের "শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে" কৈলাসকামিনীকে প্রথম দর্শন করি। সে আজ ২৬ বৎসরের কথা। ক্রমে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। তাঁহার বিবিধ সদ্গুণ

দর্শন করিয়া হৃদয় মুগ্ধ হইল। আমাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ মাত্রেই হৃদয়ের আবরণ উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত। ১৫ মিনিট সাক্ষাতেও স্বামী, গৃহাদি, আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতির সংবাদ কিছুই আমার নিকট অপ্রকাশিত রাখিতেন না। তাঁহার জীবনের সুখ-দুঃখ-কাহিনী সকলই আমার বিদিত ছিল। তাঁহার নিকট হৃদয় খুলিয়া আমি সর্ব্বদা যে সহানুভূতি ও উন্নত-ভাব-ব্যঞ্জক কথাগুলি শুনিয়া যে তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিব। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। সংসারের নানা গোলমালে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকিয়াও আত্মোন্নতির জন্য কঠোর নিয়মের অধীন থাকিয়া ব্রাহ্ম মহিলার কর্ত্তব্য যে ভাবে পালন করিতেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মিকাগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়। স্বামী উচ্চ শ্রেণীর সাধু পুরুষের যোগ্য সংসার হইতে নির্লিপ্ত ভাবে জীবনের কর্ত্তব্য রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, সংসার, টাকা কড়ি, ছেলেদের শিক্ষা কোনও বিষয়েই সংবাদ রাখিতেন না। কৈলাসকামিনী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অমানুষিক ধৈর্য্য সহকারে এতগুলি সন্তানের লালন পালন, শিক্ষা দান, সংসারিক সকল কর্ত্তব্য সাধন নীরবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর উচ্চ জীবনের মহত্ত্ব বুঝিয়া সাংসারিক কোনও বিষয়ের জন্য কথনও তাঁহার বিরক্তি কি অশান্তি উৎপাদন করেন নাই। স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ের অনুরূপ কার্য্য অবাধে করিতে দেওয়া তিনি আপনার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বোধ করিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি উচ্চ প্রশংসা ও সম্মানলাভের সর্ব্বথা উপযুক্ত। এমন নিঃস্বার্থভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীর স্কন্ধ হইতে সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিতে অল্প রমণীকেই অগ্রসরা দেখিয়াছি। সাধু পুরুষের সহধর্ম্মিণী বলিয়া কোন গর্ব্বের ভাব তাঁহার উন্নত হৃদয়ে স্থান পাইত না। স্বামী ব্রাহ্ম, সুতরাং তিনিও ব্রাহ্মিকা, এ ভাব কথনও তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। বরং সর্ব্ব প্রকারে আপনাকে স্বামীর অনুপযুক্ত মনে করিতেন।

এতগুলি সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের নানা কার্য্যে নিয়ত ব্যস্ত থাকিয়াও আত্মচিন্তা ও আত্মোন্নতির জন্য নিয়ত চেষ্টা পাইতেন। এ গুণটী ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা নূতন প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহারা যদি স্মরণ রাখিয়া চলেন, সমাজের অনেক উন্নতি হইতে পারে। তিনি অত্যন্ত শ্রমশীল ও সাংসারিক কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন। মিতব্যয়িতা গুণ তাঁহার বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। বিলাসিতা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার স্বামীর আয় এত বৃহৎ পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অথচ এই আয় হইতেই তিনি যে ভাবে কন্যার বিবাহ, পুত্র কন্যা দৌহিত্রের নামকরণ, গৃহনির্ম্মাণ, প্রভৃতিকার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং বন্ধু-

গণের সহিত সামাজিকতা রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহাতে শত মুখে তাঁহার মিতব্যয়িতা গুণের প্রশংসা করিতে হয়। আলস্যের বশীভূত হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করা পাপজনক কার্য্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। ভৃত্য কিম্বা কন্যাদের হস্তে সংসারের দৈনিক কার্য্যভার অর্পণ করিয়া অসুস্থতার সময়েও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কি উপায়ে পরিবারস্থ সকলকে সুখ সচ্ছন্দে রাখিবেন, অনুক্ষণ কেবল তাহার উপায়ই অন্বেষণ করিতেন। স্বামীর প্রতি অচল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার যে ভাবে সেবা করিয়াছেন, আমরা তাহা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং তিনি যে উদার হৃদয় লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শত মুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছি। বৃথা অভিমান কি আবদার করিয়া স্বামীকে কদাচ উৎপীড়িত করেন নাই। কার্য্যানুরোধে তাঁহার স্বামী মহাশয় আহারের সময় পর্য্যন্ত গৃহে আগমন করিতে অক্ষম হইয়াছেন। তিনি কতই যত্ন ও প্রীতি সহকারে একটী কৌটার মধ্যে খাদ্য সামগ্রী আবদ্ধ করিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিতেন। এজন্য কখনও তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার চিহ্ন দর্শন করি নাই। স্বামীর হৃদয়ের গতি কোন্ দিকে তাহা বুঝিয়া সকল দায়িত্ব গোলমাল নিজ স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশ্চিন্তমনে ঈশ্বরের সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছেন। কয়জন রমণী এরূপ নিঃস্বার্থভাবে পতির সাহায্য করিতে সক্ষম তাহা জানি না। সকল প্রকার সাধু কার্য্যে তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন এবং প্রকৃত নিষ্ঠা সহকারে নীরবে ঈশ্বরের সেবা করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি স্বাধীনপ্রকৃতি ও উচিতবক্তৃী রমণী ছিলেন। চক্ষুলজ্জার অনুরোধে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কোনও কার্য্যের প্রশ্রয় দিতেন না। সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুসরণ করিয়াও চির দিন আপনার স্বাধীন মত ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

ভগ্নী কৈলাসকামিনী দেবীর সহিত কার্য্যক্ষেত্রে ও ধর্ম্মসমাজে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছি। এক দিনের জন্যও কদাচ কোনও বিষয়ে মনোমালিন্য জন্মে নাই। এরূপ মহিলার সহিত একত্রে কার্য্য করা পরম প্রীতিকর মনে হইয়াছে। কয়েক বৎসর তিনি বঙ্গমহিলা সমাজের সম্পাদিকার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিচক্ষণতা সহকারে কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। স্ত্রী-সমাজের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইত। এরূপ গুণবতী মহিলা অকালে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বন্ধুবান্ধবকে যেরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। তাঁহার যশঃসৌরভ ব্রাহ্মসমাজে অবিকৃত থাকিবে। আশা করি, তাঁহার শিক্ষিতা কন্যারা নিজ নিজ জীবনে মাতার সদ্গুণ সকলের অনুকরণ করিয়া ধন্যা হইবেন। শ্রীস—

ময়ূর সিংহাসন।

সম্রাট্ সাহাজাহানের দুইটী কীর্ত্তি জগদ্-বিখ্যাত,—এক আগ্রার তাজমহল, দ্বিতীয় তখত্-তউস ময়ূর সিংহাসন। তাজমহল স্থাপত্যবিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি। তাহা দেখিয়া আজিও সভ্যজগতের লোক মুগ্ধ হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পরিব্রাজক বর্ণিয়ার এই তাজমহল সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম লিখিয়া যান—"ইহা জগতের আশ্চর্য্য কয়েকটীর মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। দুই বার মিসরের পিরামিড দেখিয়াছি,ইহার সহিত তুলনায় মিসরের পিরামিডগুলি স্তূপ (ঢিবি) মাত্র।" বর্ণিয়ার এ তুলনায় তাজমহলের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব প্রতিভারই সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন,—অন্য বিষয়ে যাহাই হউক, তাজমহল যে ভুবন-মনোহর পুরী, সভ্য জগৎ আজিও সে কথা স্বীকার করেন।

ময়ূর সিংহাসন সম্রাট্ সাহাজাহানের আদেশে বিনির্ম্মিত হয়। পর্য্যটকবর বর্ণিয়ার স্বচক্ষে সম্রাট আরংজেবকে এই অতি বিচিত্র সিংহাসনে সমাসীন দেখিয়া গিয়াছেন। দেখিয়া যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাহা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। নিম্নে তাঁহারই কথায় তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের ভাব মাত্র প্রকটিত হইল।—

"রাজসভার বিশাল চত্বরে সম্রাট্ সিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে অতি সূক্ষ্ম বুটিতোলা, অপূর্ব্ব শ্বেত রেসমের পরিচ্ছদ, তাহাতে রেসম ও সোণার জরির বিচিত্র কাজ করা। মস্তকে কিংখাবের উষ্ণীষ, তাহাতে মহামূল্য মুকুট, তাহার নিম্নদেশ দুর্ল্লভ হীরকখণ্ডসমূহে রঞ্জিত, মধ্যে অন্য এক ভাস্বর রত্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত রহিয়াছে। সম্রাটের কণ্ঠে বিমল মুক্তাহার, তাহা নাভিদেশের অধোভাগ পর্য্যন্ত বিলম্বিত রহিয়াছে। সম্রাট্ যে সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাহার ছয় পদ—প্রতি পদ অতি স্থূল-স্বর্ণখণ্ডখচিত, তাহার সর্ব্বত্র হীরক,মরকত ও পান্নাতে ভূষিত। তাহাতে যে সমস্ত মহামূল্য প্রস্তরাদি রহিয়াছে, তাহা যে সংখ্যায় কত অথবা তাহাদের মূল্য যে কত তাহা আমার অজ্ঞাত; কারণ কাহারও সে সিংহাসনের সমীপস্থ হইবার অধিকার নাই। তবে দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে সিংহাসনের মূল্য চারি ক্রোর টাকার ন্যূন নহে।

সম্রাট্ সাহাজাহান এই সিংহাসন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বহু দিন হইতে বহু রাজ্য-লুণ্ঠনলব্ধ আমীর-ওমরাগণ প্রদত্ত বিবিধ রত্নাদি রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছিল। তাহাই সাহাজাহান মোগল দিল্লীশ্বরের ঐশ্বর্য্যগরিমা দেখাইবার জন্য সিংহাসননির্ম্মাণে ব্যবহার করেন।

সিংহাসনের অন্যান্য অংশ তাদৃশ চমৎকার না হইলেও মণিমুক্তাখচিত ময়ুর-মুখের প্রতিকৃতি অতি সুগঠিত,—বিস্ময়কর; কারুকার্য্যে বিপুলকীর্ত্তি এক ফরাসী তাহা গড়িয়াছিল। ঐ ব্যক্তি কৃত্রিম রত্নাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিত; কৃত্রিম রত্নাদি বিক্রয় করিয়া সে ভারতবর্ষের অনেকানেক রাজাকে প্রতারণা করিয়াছিল। অবশেষে সে দিল্লীর বাদসাহের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং তথায় সাহাজাহানের আদেশে এই জ্যোতির্ম্ময় বিচিত্র সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।”

কালবশে ময়ুর সিংহাসন বিগত—নাদির সাহ তাহা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আর তাহা ভারতে নাই। দুইটী কীর্ত্তির এক কীর্ত্তি অদৃশ্য—স্মৃতিমাত্রে অবস্থিত, আর এক কীর্ত্তি এখনও রহিয়াছে, কিন্তু তাহাও বুঝি শোভাভ্রষ্ট ও হীনমূল্য হইয়াছে। কালের অনুগ্রহে কত দিন ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

অর্গলের রাণী।

সে আজ প্রায় সাত শত বৎসরের কথা, এখনকার এলাহাবাদ নগরের নিকটে অর্গল নামে একটি হিন্দুরাজধানী ছিল। অর্গল-পতি গৌতম তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও মহাপ্রাণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু তাঁহা হইতেও তাঁহার অতুলনীয়া প্রিয়তমা পত্নী আপনার ভুবনমোহন গুণে দেশবাসীর হৃদয় অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী কালস্রোতে ডুবিয়া গিয়াছে, আজও অর্গলের নরনারী বীররাণীর যুগান্তকালের বীরত্বকাহিনী স্মরণে সুখবোধ করে, আজও সে দেশের সকলে উচ্ছ্বাসিত-হৃদয়ে, মিলিতকণ্ঠে লোকললাম রাণীর বীরকীর্ত্তি গান করিতে করিতে তাহাদের দৈনন্দিন শ্রমশান্তি করে।

রাজা গৌতম যখন মুসলমান সম্রাট্‌কে কর দিতে অস্বীকার করিলেন, নসরুদ্দীন সাহ তখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। ক্ষুদ্র অর্গল অমিতপ্রতাপ দিল্লীর সহিত তুলনায় আপন ক্ষমতার স্পর্দ্ধা করিতেছে, ইহা সম্রাট্ নীরবে সহিলেন। অবিলম্বে তিনি অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্ত্তার প্রতি অর্গলরাজের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের আদেশ প্রচার করিবামাত্র অযোধ্যার কৃতপ্রতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা সুশিক্ষিত বৃহৎ সৈন্যদল সঙ্গে অর্গলরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। ক্ষুদ্র হিন্দুরাজা গৌতমকে নিশ্চয়ই শৃঙ্খল বন্ধনে দিল্লীরাজ সমীপে উপস্থিত করিবেন এই সুখকর কল্পনায় সেনাপতি ও তাঁহার রণোৎসাহী সৈন্যদলের সুখের অবধি রহিল না

কিন্তু সকলে যাহা ভাবিয়াছিল, ফলে তাহার বিপরীত ঘটিল,—দিল্লী-সম্রাটের গৌরব-পতাকা অর্গলরাজের প্রবল আঘাতে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। গর্ব্বিত দিল্লী-সৈন্য অন্যায়রূপে অর্গল নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে রাজা গৌতম ও তাঁহার দেশবাসী সকলেই ঘৃণা ও ক্রোধে বড়ই উত্তেজিত হইলেন,—মাতৃভূমির প্রতি এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে হৃদয়ের শোণিতপাত তাঁহাদের পণ হইল। রাজা গৌতম আনন্দে স্বদেশ-বৎসল বীরদের সেনাপতির স্থান গ্রহণ করিলেন; দেখিতে দেখিতে উভয়পক্ষে প্রবল রণাভিনয় আরম্ভ হইল—আহত ও ব্যথিতের আর্ত্তস্বরে চারি দিক্ পূর্ণ হইল। কিন্তু রাজা গৌতম অতি অল্প সময়ের মধ্যে শত্রুসেনা সম্পূর্ণ পরাস্ত করিলেন। রণক্ষেত্রে দশ সহস্র শত্রু-সৈন্য নিহত হইল। পরাজিত সেনাপতি কষ্টে স্থষ্টে অবশিষ্ট সেনাসহ প্রাণে প্রাণে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন।

বিজয়ী বীরদের অবিশ্রাম জয়ধ্বনি দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন হিন্দুসেনা দিল্লীর রাজচিহ্নিত পতাকা অধিকার করিয়াছে; দিল্লীর অধিকৃত রাজ্যেও অর্গলরাজের রাজপতাকা উড়িয়াছে; গৃহে গৃহে বিজয়োৎসব আরম্ভ হইল। মাতৃভূমির সম্মানরক্ষক বিজয়ী বীরপুত্রেরা আজ গৃহে ফিরিতেছেন, তাই তাঁহাদের প্রতি অর্গলের সমুদায় রমণীর প্রতিনিধিরূপে রাজরাণী নানাপ্রকারে কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ-চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। অতুলনীয়-রূপ-গুণান্বিতা রাণীর হস্তে সমুদায় রমণীকুলের এই স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অনুপম অনুরাগ-চিহ্ন-লাভে সকলেই স্বদেশের জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করা পরমবাঞ্ছিত মনে করিল। রণজয়ী রাজা গৌতম যথাকালে রাজপ্রাসাদে প্রিয় পরিজনের সহিত সম্মিলিত হইলেন। অবিলম্বে যুদ্ধজয়ের স্মরণার্থ রাজার নিমন্ত্রণপত্র প্রচারিত হইল। সে শুভ অনুষ্ঠানে অর্গলরাজ্যের স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকেই সাদরে নিমন্ত্রণ করা হইল। সে আনন্দ-উৎসবে অর্গলের সকলেই সংসারের অন্যকথা ভুলিল। দিনের পর দিন যায়, জাতীয় বিজয়োৎসবে সকলেই যেন আত্মহারা! এই মহা গৌরব ও আনন্দ যাঁহাদের যুদ্ধক্ষেত্রের নিদারুণ অগ্নি ও অস্ত্রের মধ্যে অর্জ্জিত, তাঁহাদের আনন্দ অপেক্ষাও এই ঘটনায় আর একজনের সুখোচ্ছ্বাস অধিক প্রকাশ পাইতেছিল। সেই এক জনের উৎসাহ ও আনন্দের মাধুরী অর্গলের সমুদায় নর-নারীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতেছিল। বিস্মিত হইয়া সকলেই দেখিল বিজয়োৎসবে তাহাদের নিরুপমা রাণী এবং তাঁহার প্রিয় সহচরীরা যেমন উচ্ছ্বাসিত ও আবেগপূর্ণহৃদয়ে যোগ দিয়াছেন, এমন আর কেহই নহে। সকলেই রাজধানীর বিজয়োৎসব-নিমন্ত্রণে তাহাদের বীর রাজা অপেক্ষা পুণ্যময়ী রাজ্ঞীর

কোমল, সোৎসুক ও সযত্ন আতিথেয়তায় সুখী হইতেছিল। সেই সর্ব্বাবয়বসুন্দর মহোৎসবের প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও শোভা সজ্জার মধ্যে রাণীর উদ্বেলিত সহৃদয়তা এবং কোমল শিল্পনিপুণ হস্তচিহ্ন বর্ণে বর্ণে প্রতিভাত হইতেছিল। এই অপূর্ব্ব রমণীর আদর্শ স্বভাবের প্রভাব অর্গলের সমুদায় সুন্দরীকুলকে স্বদেশপ্রেমের এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সুধাস্বাদ উপভোগ করাইয়া জাতীয় উৎসব ও একতার মহৎ অনুষ্ঠানে সুখদুঃখের অংশী করিল। রমণীরা এত দিন শুধু গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে পতি-পুত্র-ভ্রাতার সুখদুঃখের সঙ্গিনী ছিলেন, এখন হইতে সকল সুখ দুঃখেরই সমভাগিনী হইলেন। পূর্ব্বে প্রেমিক পতি একাকী কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে করিতে শুষ্কহৃদয় হইতে-ছিলেন, কিন্তু এখন পতির সহিত সম্মিলিত পত্নী কঠিনে কোমলে মিশিলে মরুভূমিতে জলসিঞ্চন হইল; পূর্ব্বে স্বভাবদুর্ব্বল ভাই একাকী নিদারুণ কঠোরতার মধ্যে থাকিতে থাকিতে দৃঢ়তার সংকল্প পরি-ত্যাগে উদ্যত হইতেছিল, কিন্তু এখন স্নেহময়ী ভগিনী আশা, উৎসাহ ও আদরের সঞ্জীবনী সুধা হস্তে লইয়া ভাইয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইলে ভাই কত শান্তি লাভ করিল! জাতীয় গৌরব ও উন্নতির এই উচ্চ আদর্শ দ্বারা সেই সাত শত বৎসর পূর্ব্বে একটী সুকোমলা সুন্দরী তাঁহার স্বদেশবাসী নরনারীকে অনু-প্রাণিত করিয়াছিলেন, তাই সেই যুগান্ত-ব্যাপী জাতীয় গৌরবের সত্য-কাহিনী ইতিহাসে চির-অঙ্কিত আছে। যাহা হউক্, বিজয়োৎসব বড়ই আমোদে আহ্লাদে পরিসমাপ্ত হইল। অবশেষে বীরপুত্র-কন্যারা তাঁহাদের রাজা ও রাণীর নিকট বিদায় লইলেন।

উৎসবান্তে এক দিন রাণী সহচরী-দিগের সহিত প্রাসাদশীর্ষ হইতে সুনীল আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখিতে-ছিলেন গঙ্গাস্নানের পুণ্যতিথি নিকটবর্ত্তী হঠাৎ মনে হইল। সেই শুভদিনে ভাগী-রথীর পবিত্র সলিলে অস্নাত থাকিলে নিশ্চয়ই গৃহের অমঙ্গল হইবে, এই চিন্তায় পুরনারীদের সহিত রাণী অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাদের ব্যাকুল হইবার বিশেষ কারণ ছিল। ভাগীরথী রাজধানীর নিতান্ত নিকটে নহে—কয়েক ক্রোশ ব্যবধানে। কেবল তাহাই নয়, সেই ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে হতমান, আহত দিল্লীসৈন্য প্রতিশোধ-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার আশায় তখনও বাস করিতে-ছিল। এত বিঘ্নসত্ত্বে রাণীর পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানবাসনা নিবৃত্ত হইল না। কিন্তু, সেই শত্রুসৈন্যপূর্ণ গঙ্গাতীর হইতে তিনি কেমন করিয়া নিরাপদে গৃহে ফিরিবেন, তাহাই তখন তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। অর্গলের রূপযৌবনসম্পন্না রাজরাণী সহস্র ক্ষুধিত-শার্দ্দূলোপম বিজাতীয় শত্রুসৈন্যের মধ্যে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবেন, ইহা কখনই রাজার অভিপ্রেত হইবে না, এ কথাও তিনি উত্তমরূপে

বুঝিলেন। কিন্তু প্রবল ইচ্ছার নিকট সকল বিঘ্নই অপসারিত হইল। রাজার সম্মতি প্রার্থনা করিলে পাছে মনোরথ ভঙ্গ হয়, এই জন্য গোপনে স্থির হইল কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সহচরী সঙ্গে লইয়া সাধারণ যাত্রীর মত রাণী রজনীতে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবেন এবং অতি প্রত্যূষেই গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। কত অসংখ্য যাত্রী সে দিন গঙ্গাস্নান করিবে, তাহার মধ্যে কে আর তাঁহাকে অর্গলের রাজরাণী বলিয়া চিনিতে পারিবে? শুভ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য এই নূতন উপায় স্থির হইলে নিশ্চিন্তমনা রাণী সখীদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট তিথির নিস্তব্ধ নিশীথে রাজপ্রাসাদ হইতে উন্মুক্ত প্রান্তরের পথে উপস্থিত হইলেন। নির্জ্জন রজনীতে তাঁহারা দ্রুতপদে প্রান্তরের পর প্রান্তর, লোকালয়ের পর লোকালয়, বনোদ্যানের পর বনোদ্যান অতিক্রম করিতে করিতে যখন প্রভাতের সুশীতল বায়ু অনুভব করিলেন, যখন নীলাকাশে উজ্জ্বল তারকামালা ক্রমে পরিম্লান দেখা গেল, নিদ্রোত্থিত প্রভাতের পাখী যখন সুমধুর সঙ্গীতে সুদিন সম্ভাষণ করিল, তখন প্রফুল্লিত রাজান্তঃপুরবাসিনীরা দেখিলেন সম্মুখেই উষার রক্তিমরাগ-রঞ্জিত-হৃদয়া জননী জাহ্নবী। কিন্তু তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে আসেন নাই;— কত যাত্রী রাত্রি থাকিতেই স্নানার্থ নদীতীরে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতেছিল। ক্রমে প্রভাত হইতে না হইতে অসংখ্য নরনারীর উৎসাহ-কোলাহলে নদীতীর উৎসবময় হইল। সূর্য্যদেব দেখা দিলেন, বিশ্বাসিগণের স্তবস্তুতিগানে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইবার আশায় নরনারী সুস্নিগ্ধ পবিত্রস্রোতে সাধ মিটাইয়া অবগাহন করিতে লাগিল।

রাণী ও সহচরীগণ এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোনই বিপদ্-চিহ্ন দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার মত ভুবনমোহিনী সুন্দরী যে পার্শ্ববর্ত্তী স্নানার্থী নরনারীর নির্দ্দোষ কৌতূহলদৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন না, ইহা সম্ভব নহে। ফলে রাণীর প্রতি ক্রমে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িল, এবং কোন কোন পুরুষ ও রমণীর কৌতূহল-জিজ্ঞাসা হইতেও রাজান্তঃপুরবাসিনীরা নিস্তার পাইলেন না। গঙ্গাতীরে রাজরাণীর মত না আসিলেও নিরাভরণা রাজ্ঞীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ত লুকাইবার সামগ্রী নয়, তাই তাঁহারা এত জিজ্ঞাসিত হইতেছেন। বাস্তবিক, সুরূপা রাজলক্ষ্মীর অনুপম দেহসৌন্দর্য্যে সেই বালারুণরাগ-রঞ্জিত স্রোতস্বিনীর শোভা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত দেখাইতেছিল। ভাগীরথীর সুবিস্তীর্ণ পুণ্যতটে সেই একই প্রভাতে কত অসংখ্য সুন্দরীর একত্র সমাবেশ হইয়াছিল, সারি সারি কত সম্ভ্রান্ত গৃহের চারুনয়না রমণী অপ্সরা কিন্নরীর মত দেখাইতেছিলেন, কিন্তু কৈ, ভাগ্যবান্ গৌতমের প্রিয়তমার সঙ্গে ত তাহাদের এক জনেরও তুলনা হয় না। গঙ্গার শুভ্র স্রোতোজলে

ভাসমান বিচিত্রবর্ণ ফুলরাশির মধ্যে কুসুম-সুকুমারী অর্গল-রাজলক্ষ্মীকে যেন যথার্থই দেববালা বলিয়া বোধ হইতেছিল। তখন ক্রমে তিনি সেখানকার অনেকেরই আলোচনার বিষয় হইলেন! অদ্যকার স্নানের ঘাটে সুন্দরী সহচরীবেষ্টিতা কে এই অলোকসামান্যা রমণী? জানিবার জন্য সেখানে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে বিলক্ষণ গোপন অনুসন্ধান ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। এ কথা কেবল নদীতীরেই আবদ্ধ থাকিল না—ক্রমে শত্রুপক্ষেরও কর্ণগোচর হইল।

রাণী যেখানে স্নান করিতেছিলেন, সে বিখ্যাত বক্সার ঘাট। তাহার অনতিদূরে পরাজিত মুসলমান সেনাপতির শিবির সন্নিবেশিত ছিল। তিনিও এ সংবাদ মনোযোগের সহিত শুনিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরদের নিকটে নদীতীরের সেই রাজচিহ্নিত সুন্দরী রমণীর যথার্থ পরিচয় কিছুই জানিতে পারিলেন না, তখন সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আপন কন্যাদ্বয়কে যথেষ্ট সতর্কতার সহিত স্নানের ঘাটে পাঠাইলেন। সেনাপতি-দুহিতা দুই ভগ্নী সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলার বেশে যেন যথার্থই গঙ্গাস্নান-বাসনায় যেখানে রাণী স্নান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজরাণী ও সেনাপতি-দুহিতা ইঁহাদের পরস্পরের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত হইল। বিস্মিতা মুসলমান-কন্যা অপরিচিত হিন্দুরমণীর দেবদুর্লভ শ্রী আপন নয়নে প্রত্যক্ষ করিলেন। অসন্দিগ্ধমনা, সরলহৃদয়া রাণী গঙ্গাস্নানে দুইটী বিদেশী সহযোগিনী লাভে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে আলাপ চলিতে লাগিল। ক্রমে সেই দুইটী কৌতুকহাস্য-পরায়ণা পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী সহযোগিনীর সরল ব্যবহারে মুগ্ধা রাণী বুঝি ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিলেন,—বুঝি আপনার অজ্ঞাতসারে কোন্ অলক্ষ্যমুহূর্ত্তে অর্গলের কথা উল্লিখিত হইল, তিনি জানিতেও পারিলেন না। মুসলমানকন্যাদ্বয়ের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তখন ত্বরিত স্নানান্তে তাঁহারা রাণীর নিকট আপ্যায়িত সম্ভাষণের সহিত বিদায় লইলেন—রাণীও অনতিবিলম্বে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ দিকে সেনাপতির কোনও কথাই অবিদিত রহিল না। নীচ প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি-বশে তিনি উত্তেজিত হইলেন। অর্গলরাজের হস্তে তিনি যে অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরাজয়ে হতমান হইয়াছেন, স্মরণীয় সমরক্ষেত্রে অর্গলরাজের দ্বারা যে মুসলমান-গৌরবের বিদ্যুদুজ্জ্বল জগজ্জ্যোতি শোচনীয়রূপে মলিন হইয়াছে, নিদারুণ অশুভমুহূর্ত্তে অর্গলরাজের হস্তে যে দশ সহস্র মুসলমানসন্তান বৃথা প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই কথা আজ সেনাপতির মর্ম্মান্তিক বোধ হইতেছিল। পরম শত্রু অর্গলের রাণী আজ ছদ্মবেশে মুসলমান অধিকারের মধ্যে—এ সুযোগ তিনি হেলায় হারাইতে চাহিলেন না। আত্মহারা সেনাপতি স্থানাস্থান

ভুলিলেন, স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য ভুলিলেন, রণনীতি বিসর্জ্জন দিলেন, দিল্লীরও গৌরব বিস্মৃত হইলেন। অসহায়া রাজরাণীকে বন্দিনী করিতে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজা গৌতমের পবিত্র কুলে কলঙ্ক অর্পণে তিনি পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিলেন;— অহংকৃত অর্গলরাজের সুন্দরী অঙ্কলক্ষ্মীকে প্রভু দিল্লীশ্বরের বিলাস-লালসাসেবার কিঙ্করীরূপে দেখিবেন, ইহাই তাঁহার পণ হইল।

বিধির এমনি নির্ব্বন্ধ! অর্গলের প্রাণের প্রাণ, উৎসাহের উৎস, আনন্দদায়িনী, প্রাণাধিক রাজলক্ষ্মী আপন গৃহ হইতে দূর দূরান্তরে বন্ধুহীন বিদেশে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় প্রবল শত্রুর বেষ্টিত জালে আবদ্ধা হইলেন।

গঙ্গাস্নানান্তে গৃহগমনোদ্যতা, নববস্ত্রপরিহিতা রাণী প্রিয় সহচরীদের সহিত যখন নদীতীরের অনতিদূরে রাজপথে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সহসা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। চকিতের মধ্যে তিনি দেখিলেন, সারির পর সারি, দলের পর দল, সশস্ত্র মুসলমান সৈন্য-বৃতিকায় তাঁহার পথ রুদ্ধ! আরও দেখিলেন, সঙ্গে রক্ষক বলিতে কেহই নাই, পশ্চাতে, নদীতীরে শুধু নিরস্ত্র নিরীহ হিন্দুযাত্রিদল; কিন্তু সম্মুখে অগণিত শত্রুসেনা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। তথায় নিরস্ত্র ও নিঃসহায় রমণীর প্রতি মুসলমান সৈন্যের এই নীচ আক্রমণের উদ্যমে রাণী ঘৃণা,রোষ ও লজ্জায় দন্তে অধর নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। ক্রোধাবেগে তাঁহার শতদল শুভ্র গণ্ডস্থল ও ললাটে সজোরে শোণিত সঞ্চালিত হইল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় তিনি একবার পশ্চাতে, আর একবার সখীদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার সে দৃষ্টিতে একাধারে নিদারুণ আত্মগ্লানি, অভিমান, ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছিল। এমন সময়ে কৃতপ্রতিজ্ঞ ক্রুদ্ধ মুসলমানসৈন্যের সমবেত জয়শব্দ শুনা গেল। তখনই রাজরাণীর অনতিদূরে একজন মুসলমান দলপতি চীৎকারস্বরে বলিতেছিল,—"সৈন্যগণ! ঐ যে! ঐ যে! তোমাদের সম্মুখে অর্গলের দুষ্টা রাণী! তোমরা সত্বর অগ্রসর হও, উহাকে ধর, অপমানিত কর, সেদিনকার উত্তম প্রতিশোধ আজ দাও। শত্রু অর্গলরাজের প্রাণ আজ তোমাদের হাতে, সেই পাপপ্রাণের বিনিময়ে দিল্লীর মান রক্ষা কর।" দলপতির সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র মুসলমানকণ্ঠে বিকট জয়ধ্বনি উঠিল, অর্গলরাজান্তঃপুরবাসিনীদের সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে শত্রুহস্তে সূর্য্যকিরণ-প্রতিফলিত সহস্র শাণিত তরবারি উদ্যত হইল।

অপমানের আশঙ্কায় রাজরাণী আহত ফণিনীর মত ফিরিলেন। তাঁহার প্রায় চারি দিকেই শত্রুস্রোত, কেবল পশ্চাতে হিন্দুযাত্রিস্রোত। কিন্তু তাহারাত নিরীহ, নিরস্ত্র, স্নানার্থী বৈ আর কিছু নয়। তথাপি তখন সেই দিকে, সেই মুসলমান সৈন্যের সমবেত উল্লাসশব্দের মধ্যেও

ক্রোধোদ্দীপ্ত রাণীর তীব্র কণ্ঠস্বর শুনা গেল। যেন মুহূর্ত্তের জন্য শত্রুসেনার গতিরোধ হইল। রাণী উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতেছিলেন,—"পরাজিত মুসলমান সেনাপতিকে ধিক্! মুসলমান সেনাকে ধিক্! দিল্লীর গৌরবেও ধিক্! পরাজিত কাপুরুষের অধম, তাই নিরস্ত্র স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার ভিন্ন পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে অন্য উপায়ে অক্ষম। আমার সম্মুখে ইহারা সৈনিকপুরুষ না ফেরুপাল? সৈনিক হইলে ইহারা অর্গলের বীরপুরুষদের সম্মুখীন হইতে এত ভয় পায় কেন? আমরা আজ ইহাদেরই হাতে বন্দিনী হইব? অর্গলের গৌরবগর্ব্বিত বীররাজার পত্নী আজ ভীরু ধূর্ত্ত শৃগালের করস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে? কখনই না। আমার পশ্চাতে আজ কি অর্গলের একটি বীরপুত্রও উপস্থিত নাই? গঙ্গাতীরে স্নানার্থী হিন্দুযাত্রীদের মধ্যে কি আজ আমাদের রাজপুত ভাই এক জনও নাই, যাঁহার নিকট রাজপুত-রমণী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়? এই বর্ব্বর শত্রুসেনার সম্মুখ হইতে আমরা কখনই পলাইব না। ইহারা আজ দেখুক অর্গলের রমণীরা আপনাদের গৌরবরক্ষা করিতে কেমন অম্লানমুখে প্রাণত্যাগ করিতে জানে!"

রাণীর মুখে এই উদ্দীপনাপূর্ণ কথা শেষ হইতে না হইতেই সকলে সবিস্ময়ে শুনিল অনতিদূরে, সমবেত পুরুষকণ্ঠে বজ্রগম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল,—"রাণীজি কি জয়!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমান্ শরদিন্দু বিশ্বাসের সহিত শ্রীমতী চারুশীলা দত্তের শুভবিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

(২৪এ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, বঙ্গাব্দ ১৩০৫।)

ঈশ্বর-স্মরণ।

কন্যাকর্ত্তা বেদীর সম্মুখে বরকে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন; যথা,

সেই পূর্ণমঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব ধ্যান করি, যিনি অদ্যকার শুভ অনুষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও কল্যাণফলবিধাতা হইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন।

সভাস্থগণের অনুমতি গ্রহণ।

[কন্যাকর্ত্তা দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক]

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা পুণ্যাহ বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ পুণ্যাহং।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তোধিব্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা ঋদ্ধি বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ ঋদ্ধতাং।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোধিব্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা স্বস্তি বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ স্বস্তি।

পাত্রের বরণ।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্।

বর—অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি।

অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ এষঃ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করুন্।

বর—প্রতিগৃহ্লামি।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইদং অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন্।

বর—প্রতিগৃহ্লামি।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ তৎসদদ্য বিংশাধিকাষ্টাদশশততম শকাব্দে মার্গশীর্ষে মাসি চতুর্ব্বিংশ দিবসে বৃশ্চিকরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে একাদশ্যাং তিথৌ শুক্রবাসরে কাশ্যপগোত্রস্য স্বর্গগতস্য রামহরি বিশ্বাসস্য প্রপৌত্রং, স্বর্গগতস্য গৌরমোহন বিশ্বাসস্য পৌত্রং, স্বর্গগতস্য প্যারীমোহন বিশ্বাসস্য পুত্রং, কাশ্যপগোত্রং শ্রীশরদিন্দু বিশ্বাসং কাশ্যপগোত্রস্য স্বর্গগতস্য ষষ্ঠীচরণ দত্তস্য প্রপৌত্র্যাঃ, স্বর্গগতস্য হরমোহন দত্তস্য পৌত্র্যাঃ, শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তস্য পুত্র্যাঃ কাশ্যপগোত্রায়াঃ চারুশীলা দত্তজায়াঃ কন্যায়াঃ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি এভিরুপকরণাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

বর—ওঁ বৃতোঽস্মি।

বৃত হইলাম।

অনন্তর বর অন্তঃপুরে নীত ও নারীগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইবেন।

ব্রহ্মোপাসনা।

বর কন্যার সহিত সভাস্থলে প্রত্যাগত হইলে কন্যাকর্ত্তা বেদীর অভিমুখীন হইয়া বসিবেন এবং কন্যা ও বরকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া আপনার দুই পার্শ্বে বসাইবেন। অনন্তর আচার্য্যকর্ত্তৃক সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। উপাসনার পর

কন্যাকর্ত্তা—(কন্যার প্রতি) তব বিবাহার্থং যথাবিধি অর্চ্চিতং ইমং সদ্গুণান্বিতং ব্রহ্মনিষ্ঠং বরং সাদরং পতিত্বেন বৃণুষ্ব।

তোমার বিবাহার্থ যথাবিধি অর্চ্চিত সদ্গুণান্বিত ব্রহ্মনিষ্ঠ এই বরকে তুমি সাদরে পতিত্বে বরণ কর।

কন্যা—সাদরং বৃণোমি।

সাদরে বরণ করিলাম।

কন্যা সম্প্রদান।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া)—ওঁ তৎসদদ্য বিংশাধিকাষ্টাদশশততমশকাব্দে মার্গশীর্ষে-মাসি চতুর্ব্বিংশদিবসে মেষরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে একাদশ্যাং তিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তঃ ঈশ্বর-প্রীতিকামঃ কাশ্যপ-গোত্রস্য স্বর্গগতস্য রামহরি বিশ্বাসস্য প্রপৌত্রায়, স্বর্গগতস্য গৌরমোহন বিশ্বাসস্য পৌত্রায়, স্বর্গগতস্য প্যারীমোহন বিশ্বাসস্য পুত্রায় কাশ্যপ-গোত্রায় শ্রীশরদিন্দু বিশ্বাসায় বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠায় ব্রাহ্মায় যথাবিধি অর্চ্চিতায় কাশ্যপগোত্রস্য স্বর্গতগস্য ষষ্ঠীচরণ দত্তস্য প্রপৌত্রীং, স্বর্গগতস্য হরমোহন দত্তস্য পৌত্রীং, শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তস্য পুত্রীং কাশ্যপগোত্রাং সুশীলাং সালঙ্কারাং বাসসা-চ্ছাদিতাং শ্রীমতীং চারুশীলা-দত্তজাং ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।*

বর—কন্যামিমাং সাদরমহং গৃহ্লামি।

আমি এই কন্যাকে পবিত্র উদ্বাহ-যোগের জন্য সাদরে গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যার হস্ত পুষ্প-মালা দ্বারা বন্ধন করিয়া দিয়া)

বরের প্রতি—ধর্ম্মে চ অর্থে চ জ্ঞানে চ ভোগে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং।

ধর্ম্মে, অর্থে, জ্ঞানে, ও ভোগে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না।

বর—নাতিচরিষ্যামি।

অতিক্রম করিব না।

কন্যার প্রতি—ধর্ম্মে চ অর্থে চ জ্ঞানে চ ভোগে চ নাতিচরিতব্যস্ত্বয়ায়ং।

ধর্ম্মে, অর্থে, জ্ঞানে ও ভোগে তুমিও ইহাকে অতিক্রম করিবে না।

কন্যা—নাতিচরিষ্যামি।

অতিক্রম করিব না।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যা উভয়ের প্রতি)—"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং ব্রহ্মসাৎ-কৃতমানসৌ।"

তোমরা উভয়ে পরব্রহ্মে মনঃ প্রাণ সমাধান করিয়া এক সঙ্গে অভিন্নভাবে ধর্ম্মাচরণ কর।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা।

বর—অদ্য আমি শ্রীশরদিন্দু বিশ্বাস সর্ব্বসাক্ষী পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে ও সমাগত ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দচিত্তে তোমাকে আমার বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায় তোমার মঙ্গল সাধনে ও তোমার প্রতি সৎপতির কর্ত্তব্য পালনে আমি যাব-জ্জীবন যত্নবান্ থাকিব।

কন্যা—অদ্য আমি শ্রীচারুশীলা দত্ত সর্ব্বসাক্ষী পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে ও সমাগত ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া

* সম্প্রদানের প্রকৃত অর্থ—"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং"—উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর এই কথা বলিয়া বিবাহার্থ কন্যাকে বরের হস্তে অর্পণ করা। সামান্য তৈজসপাত্র বা গো অশ্ব দানের ন্যায় এ দান যথেচ্ছাচারিতার জন্য নহে।

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ও স্বচ্ছন্দচিত্তে তোমাকে আমার বৈধপতিরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে ও তোমার প্রতি সৎপত্নীর কর্ত্তব্যপালনে যাবজ্জীবন যত্নবতী থাকিব।

অতঃপর গ্রন্থি বন্ধন হইবে।

ভর্ত্তা ও বধূ—

ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।
যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
আবয়োর্হৃদয়ং যত্তু তদস্তু ব্রহ্মণঃ সদা।

আমি সত্যগ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করি। আমার যে হৃদয়, তাহা তোমার হউক ; তোমার যে হৃদয়, তাহা আমার হউক এবং আমাদের উভয়ের হৃদয়, সর্ব্বদা ঈশ্বরের হউক।

মালা ও অঙ্গুরীয় বিনিময়।

ভর্ত্তা ও বধূ—"ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি, অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি, ত্বচাত্বচং।"

আমার প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ সংযুক্ত করিতেছি। অস্থি দ্বারা অস্থি, মাংস দ্বারা মাংস এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয় সংযুক্ত করিতেছি।

ভর্ত্তা (বধূর প্রতি)—ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নোধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।"

তোমার চক্ষু প্রসন্ন হউক। তুমি পতির হিতকারিণী হও, পতির প্রতিকূলাচারিণী হইও না। জীবগণের প্রতি কল্যাণদায়িনী হও। তোমার মন সুন্দর হউক। তুমি তেজস্বিনী হও।

"ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব ননন্দরি চ সাম্রাজ্ঞী, সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু দ্বিপদে বা চতুষ্পদে।"

শ্বশুর, শাশুড়ী, ননন্দা ও দেবরগণ এবং গৃহস্থ পশুপক্ষীর উপর তুমি শোভমানা হইয়া প্রেমের সাম্রাজ্য বিস্তার কর।

"ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ ; ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবং পতিকূলে ইয়ং।"

দ্যুলোক যেমন ধ্রুব,পৃথিবী যেমন ধ্রুব, এই সমস্ত জগৎ যেমন ধ্রুব, এই সকল পর্ব্বত যেমন ধ্রুব—সেইরূপ এই স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুব হইয়া থাকুন।

ভর্ত্তা ও বধূ উভয়ে—

"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো
হৃদয়ানি নৌ।"

বিশ্বপতি আমাদের উভয়ের হৃদয় সংযুক্ত করুন্।

ওঁ সুগং নু পন্থাং প্রদিশন্ন এহি জ্যোতিষ্মধ্যে হ্যজরন্ন আয়ুঃ।"

"অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগাদ্বৈবস্বতো
নোঽভয়ং কৃণোতু নঃ।"

হে জ্যোতির জ্যোতিঃ পরমাত্মন্! এস, আমাদের পথ দেখাও, যে পথে আমরা সুখে গমন করিতে পারি, যে পথে চলিলে আমরা মৃত্যুকে পরিহার করিয়া অমৃত লাভ করিতে পারি, সেই পথ আমাদিগকে দেখাও, আমাদিগকে অভয় প্রদান কর।

(অনন্তর কন্যাকর্ত্তা ও আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ)।

সপ্তপদী গমন।

অতঃপর উদ্বাহস্থান হইতে বাসগৃহে গমনের পথে প্রদত্ত সাতখানি আসনে ক্রমান্বয়ে পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে ভর্ত্তা ও বধূ এইরূপে প্রার্থনা করিবেন; যথা—

(১) ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত আমরা প্রথম পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(২) সংসার-ধর্ম্মপালনে বললাভের নিমিত্ত আমরা দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৩) পবিত্র দাম্পত্য ব্রত সাধনের নিমিত্ত আমরা তৃতীয় পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৪) জনসমাজের হিতসাধনের নিমিত্ত আমরা চতুর্থ পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৫) সকল জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য আমরা পঞ্চম পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৬) শীত বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতুতে ধর্ম্মসাধনের আনুকূল্য কামনায় আমরা ষষ্ঠ পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৭) সত্য লাভের নিমিত্ত আমরা সপ্তম পদে আরোহণ করি; ব্রহ্ম আমাদিগকে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে লইয়া যাউন। আমরা উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

যৌতুক।

(স্নেহের ভগিনী চারুশীলার শুভবিবাহে)

১

মা বাপের সোহাগের বালিকা সরলা,
পবিত্রতা-মাখা মুখ
প্রভাতী মল্লিকাটুক!
লজ্জাবতী লতা যেন লাজে ঢলা ঢলা!
প্রিয় বোন চারুশীলে,
কি আজি তোমারে দিলে,
পূরিবে আমার সাধ—নাহি যায় বলা,
কি দিব "যৌতুক" আজি মন-প্রাণ-গলা?

২

তব এ গরীব "দিদি" কি দিবে তোমায়?—
পারি নাতো এক বিন্দু
পাড়িয়া শরত-ইন্দু,
হীরার মুকুটরূপে, পরা'তে মাথায়!
পারি না তারার ঝাড়
গলে দিতে—গেঁথে হার,
পারি না মাখাতে দেহে পারিজাত-বা'য়!—
কিসে তবে হব সুখী, কি দিব তোমায়?

৩

তবে

প্রাণের আশীষ সহ স্নেহের আদর,
দিতেছি খুলিয়া হৃদি,
হাসি মুখে লহ দিদি!
আনন্দে ভরিয়া যা'ক ভগিনী-অন্তর।
বিভু-পদে মতি রাখ,
চির দিন সুখে থাক,
তুমি হও সীতা সতী, রাম হোন্ বর;
এয়োতী সাবিত্রী-সমা,
সোহাগিনী স্বাহা, রমা,
দুজনে একত্ব লভি সুখে কর ঘর;
এই ভিক্ষা দিন বিধি মঙ্গল-আকর।

৪

সুপবিত্র গৃহাশ্রম দেবতার স্থল,
দেব, সাধু, গুরুভক্তি,
পূত কাজে অনুরক্তি—
ছোট বড়, আত্ম পর, সবারি মঙ্গল;
উচ্চ সাধ উচ্চ আশ,
উচ্চ লক্ষ্যে ভালবাসা,
দম্পতীর এক হিয়া—বিশ্বাস প্রবল,
যেথা হয়, সেথা "শুভ বিবাহ" সফল।

৫

হীনতা নীচতা সব দলিয়া চরণে
বিধাতার স্নেহাশীষ,
প্রাণে পেয়ে অহর্নিশ,
"সহধর্ম্মিণী"র নাম রেখ প্রাণপণে।
পতি জ্ঞান নারী ভক্তি,
মিলিত সে শিব শক্তি,
উভয়ের এক যোগ সংসার-পালনে।
নারীর দেবতা পতি,
সাহস, সহায়, গতি,
সার্থক রমণীজন্ম সে পদ সেবনে;
পতি যদি পথ ভুলে,
জায়া লবে পুনঃ তুলে,
জপিবে তাঁহারি নাম নিদ্রা জাগরণে,
শাস্ত্র-উপদেশ এই, রেখ বোন, মনে।

৬

জগতের যাহা কিছু আপদ বালাই,
হয়ে যাক্ শত দূর—
তোমাদের গৃহ-পুর,
হউক আনন্দ-ধাম, এই বর চাই।
সুখী হও সত্য সুখে,
পূত-হাসি থাক্ মুখে,
থাক্ আনন্দের ঊষা পরাণে সদাই,
জগৎ দেখুক চেয়ে
জননীর যোগ্যা মেয়ে!
তেমনি সৌভাগ্য হ'লে আর কিবা চাই?
কও বোন চারুশীলে!
কেমন "যৌতুক" নিলে?—
আর হেথা কিবা মিলে, ভাবিতেছি তাই—
ধর এই উপহার সুখে ভেসে যাই।

২৪ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩০৫ সাল। | শুভাকাঙ্ক্ষিণী সেই দিদি।

বাদসাহী রহস্য।

আমরা বাঙ্গালী,—বাঙ্গালী হইয়া বাদসাহী রহস্যের কথা যতটুকু জানা সম্ভব, আমরা তাহাই জানি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপালের রহস্যের কথাই আমাদের বিদিত; তাহাও কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, জানিবার উপায় নাই। অনেকেই অনেক রহস্য রচিয়া গোপালের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। যাহাহউক, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপালের রহস্য পরিহাসই, বাঙ্গালীর কাছে বাদসাহী রহস্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের গোপালের আদর্শ হিন্দুরাজগণের বিদূষকে পাওয়া যায়। হিন্দুরাজগণ মনোরঞ্জনের জন্য সভায় বিদূষক রাখিতেন, রহস্য পরিহাসে, রাজার চিত্ততুষ্টি করাই বিদূষকের কার্য্য ছিল; কিন্তু বিদূষক শুধু "ভাঁড়" নহে, অনেক সময় তিনি রাজার প্রধান অন্তরঙ্গ বয়স্য, অন্যের অজ্ঞেয় রাজার গোপনীয় সুখ দুঃখের কথা তিনি ভিন্ন আর কেহই জানিতেন না। যাঁহারা সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল ও রত্নাবলী পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, বিদূষকগণ রাজার কতদূর বিশ্বাস ও স্নেহের পাত্র ছিলেন।

মুসলমান মোগল বাদসাহগণ বিদূষকশ্রেণীর লোক রাখিতেন কি না, তাহার বিশেষ বিবরণ জানি না; তবে তাঁহারা যে রহস্যপ্রিয় ছিলেন, তাহার পরিচয় আজিও অনেকটা পাওয়া যায়। কেবল জনশ্রুতি প্রসঙ্গে নহে, ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ বাদসাহী রহস্যের কথা কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, পাঠককে তাহারই দুই একটী উপহার দিতেছি।

দিল্লীশ্বর মোগল বাদসাহগণের সভায় অনেক বিদেশী দূত আসিতেন। তাতার, আরব, তুর্কীস্থান, মিশর হইতে কত দূত আসিত। কত ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্টুগীজ, কত বহুমূল্য বিচিত্র উপহার লইয়া সম্রাটের কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করিয়া কক্ষায় কক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সম্রাটের সিংহাসনতলে ভূমি চুম্বন করিয়া কুর্ণিস করিতে পাইলে আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করিতেন। যাউক, এ সব কথায় বৃথা প্রবন্ধ-কলেবর বাড়াইবার ইচ্ছা নাই।

দিল্লীশ্বরের সভায় সমাগত দূতগণের মধ্যে পারস্যজাতির দূতগণ কিছু অধিক সম্মান পাইতেন, অনেকটা স্বাধীনতাও ভোগ করিতেন। পারস্যজাতির সম্মাননার জন্য দিল্লীর বাদসাহকে অনেক সময় পারস্য দূতগণের অনেক তীব্র কথাও সহ্য করিতে হইত। অন্যান্য বাদসাহের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং আরংজেবও অনেক সময় ক্রোধে ফুলিয়া নীরব হইয়া থাকিতেন। তবে সাহজাহান বড় সহিতে পারিতেন না।

একবার সম্রাট্ সাহজাহানের নিকট পারস্যরাজ শাহ আব্বাসের এক দূত আসিয়াছিলেন। দূতপ্রবর বড় রুক্ষ-স্বভাব, মহাদর্পী। দূত বাদসাহের সহিত সমান সমান ব্যবহার করিতেন, রাজ-সাক্ষাৎকারকালে অথবা অন্য সময় ভুলিয়াও কখনও তসলীম করিতেন না, —মাথা নোয়াইতেন না। দেখিয়া দেখিয়া সাহাজাহান অন্তরে অন্তরে জ্বলিলেন, জ্বলিয়া এক কৌশল করিলেন।

একদিন দূতকে সংবাদ দিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমখাসে বাদসাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। দূত আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন যে, আমখাসের ফটক বন্ধ, কেবল তাহার গাত্রসংলগ্ন একটী অতি ছোট দ্বার খোলা আছে, সে দ্বার এত ক্ষুদ্র যে, প্রবেশ করিতে হইলে মস্তক অবনত না করিয়া প্রবেশ করা অসম্ভব। বাদসাহ ভাবিয়াছিলেন যে, এই সুযোগে অন্ততঃ প্রকারান্তরে দূতের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন, তাই এ কৌশল। দূত কিন্তু বড়ই দাম্ভিক, বড়ই ধূর্ত্ত— তিনি বাদসাহের দিকে পিছন করিয়া সেই ছোট দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সাহজাহান রোষভরে বলিলেন—"আঃ হতভাগ্য! তুমি কি মনে করিয়াছিলে যে, তোমার মত গর্দ্দভের পায়খানায় প্রবেশ করিতেছ, তাই এরূপ করিলে?" দূত অম্লানবদনে বলিলেন, "তাই মনে করিয়াছিলাম বই কি; এত ছোট দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে কে মনে করে যে, সে গর্দ্দভ ভিন্ন আর কাহারও সহিত দেখা করিতে যাইতেছে?"

আর এক দিন পারস্যদূতের কঠোর কথায় রুষ্ট হইয়া সাহজাহান বলিয়াছিলেন, "সাহ আব্বাসের সভায় কি কোন ভদ্রলোক ছিলেন না, তাই তিনি তোমার মত নির্ব্বোধকে এখানে পাঠাইয়াছেন?" দূত বলিলেন, "থাকিবে না কেন? শত শত সম্ভ্রান্ত লোক আছেন, কিন্তু যেমন বাদসাহের কাছে আসিতে হইবে, তেমনই দূত পাঠাইয়াছেন।"

আর এক দিন সাহজাহান পারস্য দূতকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয়ে আহার করিতেছেন, সাহজাহান দূতকে কেবল বিরক্ত ও অপদস্থ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছেন। দেখিলেন যে, দূতপ্রবর ব্যঞ্জনের অস্থিখণ্ডগুলি উত্তমরূপে চুষিয়া চুষিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন; ধীরভাবে হাসিয়া বলিলেন "এলচিনী (দূত প্রবর) কুকুরে খাইবে কি?" দূতপ্রবর বলিলেন "খিচুড়ী।" বলা বাহুল্য যে, সাহজাহান বড় খিচুড়ী-প্রিয় ছিলেন, এবং ঐ সময় ঐ দ্রব্য অতি সন্তোষের সহিত ভোজন করিতেছিলেন।

ইহার পর অন্য এক সময় সাহজাহান সরলভাবে হিন্দুস্থানের মোগল বাদসাহ ও পারস্য জাতির ক্ষমতা বিবৃত করিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলুন্ দেখি কে বড়?" তাহাতে দূত বলিয়াছিলেন

"ভারতবর্ষে মোগলের ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য পূর্ণচন্দ্রের সহিত তুলনার যোগ্য, আর পারস্যের প্রতাপ দুই তিন দিনের নব শশি-কলার মত।" অবশ্য সাহজাহান এ প্রীতিপূর্ণ উত্তরে বড় সুখী হইলেন; কিন্তু পরে যখন দূতপ্রবরের বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিলেন, তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন—বুঝিলেন যে, দূতের কথার উদ্দেশ্য,—মোগলের সুখৈশ্বর্য্য প্রতাপ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে ক্ষয়োন্মুখ; আর পারস্যের প্রভাব নবকল চন্দ্রের ন্যায় নিত্য বাড়িতেছে।

যাহা হউক, দূতপ্রবর শেষে এতদূর বাড়াবাড়ি করিষাছিলেন যে, নিতান্ত মানে মানে দেশে ফিরিতে পারেন নাই। ইটটী মারিয়া কিছু বড় রকম পাটকেল খাইতে হইয়াছিল। দিল্লীতে যে দেহ রাখিয়া যাইতে হয় নাই, ইহাই তাঁহার পরম ভাগ্য। সাহজাহান শেষে দূতের ব্যবহারে একান্ত বিরক্ত হইয়া গোপনে তাঁহার প্রাণবধের কল্পনা করিলেন,—পথিমধ্যে অকস্মাৎ মত্ত হস্তিপদে দলন করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইল। সে অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে গোপনে বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আদেশও দিলেন। দরবার-গৃহে যাইতে হইলে দূতপ্রবরকে এক অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে হইত। এক দিন পাল্‌কী করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ তাহার দিকে এক হস্তী ছুটিয়া আসিল। তখন তিনি পাল্‌কী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সঙ্গী বাহকগণের সহিত একযোগে হস্তীর প্রতি এরূপ সত্বর তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, হস্তী আহত হইয়া ফিরিয়া পলাইল। যাহা হউক, দূতবর শেষে প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে দিল্লীর দরবারে পুনর্বায় আসিয়াছিলেন কি না, সে কথা জানা নাই।

প্রেরিত পত্র।

বাঙ্গালীর গৌরব।

আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, রাজপুতানা যোধপুর রাজ্যে অদ্য ১৭ বৎসর যাবৎ কলিকাতা কুমারটুলী-নিবাসী ৺অপূর্ব্ব ডাক্তারের পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ গুপ্ত মহারাজা বাহাদুরের গৃহ-চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত আছেন। স্বর্গীয় মহারাজা যশোবন্ত সিংহ বাহাদুর ইহাঁর চিকিৎসার বিশেষ সুখ্যাতি করিতেন। বাল্যে উপস্থিত মহারাজাধিরাজ সর্দার্ সিংহ বাহাদুর

ইহাঁর সুচিকিৎসায় নানারূপ কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। মহারাজাধিরাজের খুল্লতাত, যোধপুর রাজ্যের প্রধান সচিব মহারাজ কর্ণেল সার প্রতাপ সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, এবং অন্যান্য বড় বড় ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই প্রিয়নাথ বাবুর সুচিকিৎসার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি যশের পুরস্কারস্বরূপ যাহা রাজপুতানায় অত্যন্ত সম্মানের চিহ্ন এবং জয়পুর রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যতীত যাহা দ্বিতীয় বাঙ্গালীর ভাগ্যে হয় নাই, সেই সম্মানে সম্মানিত করিয়া মহারাজাধিরাজ সর্দার সিংহ বাহাদুর প্রিয়নাথ বাবুর পায়ে "তাজিম কা সোণা" দিয়াছেন, অর্থাৎ সোণার মল পরাইয়া দিয়াছেন।

ইহা পায়ে থাকিলে, প্রিয়নাথ বাবু রাজসমীপে উপস্থিত হইলে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যদ্যপি সিংহাসনে বসিয়া থাকেন, তো তাহা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সম্ভাষণ করিবেন, এবং দৈবক্রমে যদি অন্য দেশের রাজাও সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও উপরি-উক্তরূপ সম্ভাষণ করিতে হইবে।

এ সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? ইহা বাঙ্গালীর গৌরব করিবার বিষয় নহে কি? বলা বাহুল্য, এ সংবাদে রাজপুতানার সমস্ত বাঙ্গালীই বিশেষ প্রীত হইয়াছেন এবং মনে মনে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছেন। আশা করি, আপনি আপনার বহু-বিস্তৃত সংবাদপত্রে ইহা প্রচার করিয়া সমস্ত বাঙ্গালী-সমাজকে গৌরবান্বিত করিবেন।

তাজিমের সোণা পাইলে বাৎসরিক অন্ততঃ ৬০০০ ছয় হাজার টাকা আয়ের একখানি জায়গীর উপহার পাওয়া যায়, আশা আছে, সে বিষয়েও প্রিয়নাথ বাবু বঞ্চিত হইবেন না।

শ্রীহরিগোপাল গুপ্ত।

মার কাছে যাওয়া হ'ল না।

(১)

সন্ধ্যা হইয়াছে। নীল নভঃস্থলে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি শ্যামল তৃণাবৃত প্রান্তরে প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয়ের ন্যায় মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রফুল্ল-কুসুম-গন্ধ মাখিয়া সমীরণ মৃদুমন্দগমনে জগৎ পুলকিত করিতেছে, পক্ষিগণের কলরব, সায়ংকালোচিত পুরনারীগণের মঙ্গল শঙ্খ-ধ্বনি এখনও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয় নাই। এই সময়ে হরেন্দ্র তাহার দিদি সরলার কোলে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া কত কথা কহিতেছে। অনেক দিন দিদিকে দেখে

নাই, অনেক দিন তাহার কোলে বসে নাই, তাহার সহিত কথা কহিতে পায় নাই, আজ ছমাসের পর দিদি শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসিয়াছে, তাই হরেন্দ্রের কতই আনন্দ! এ আনন্দ তাহার রাখিবার স্থান হইতেছে না। সে কত কথা কহিতেছে—কত কথা শুনিতেছে—তবু যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। দুটী একটী করিয়া সরলা কত গল্পই হরেণকে বলিল, কিন্তু তবু হরেণের মন উঠিল না। সে কেবল গল্প শুনিতে চাহিতেছে। সরলা কি করে—তাহার গল্পের ভাণ্ডার শেষ হইয়াছে, তাই তাহার শ্বশুরবাড়ীর ধারে একজন গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল, তাহার গল্প তুলিল। হরেণ একটুখানি শুনিয়া বলিল "দিদি, গলায় দড়ি দিলে কি মরণ হয়?" সরলা বলিল "হুঁ।" গল্প শেষ হইয়া গেল। হরেন্দ্র এবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, মরিলে কি হয়?"

সরলা। স্বর্গে যায়।

হরেন্দ্র। স্বর্গ কোথায় দিদি, সকলে কি স্বর্গে যায়?

স। ঐ আকাশে, যেখানে নক্ষত্র উঠিয়াছে। মানুষ ম'রে ঐ সব নক্ষত্র হয়েছে।

হ। ঐ সকল নক্ষত্র কি মানুষ? যে মরে, সেই নক্ষত্র হয়? মা তবে নক্ষত্র হয়েছেন? আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরলার মুখ বিষণ্ণ হইল, মাতৃশোক তাহার হৃদয়ে নবীভূত হইল; অজ্ঞাতে দু এক ফোঁটা অশ্রু তাহার কপোলে গড়াইয়া পড়িল। সরলা একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "হাঁ আমাদিগকে তিনি সর্ব্বদা দেখিতেছেন বৈ কি?"

হ। দিদি! মাকে দেখিবার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হচ্চে। মা আমাকে দেখিতেছেন, কিন্তু আমি মাকে দেখিতে পাই না কেন? আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই, আমি ওখানে মায়ের কাছে যাব।

স। ছিঃ, ওখানে কি যেতে আছে,—এই সময়ে সরলতার বিমাতা ভাত খাইতে ডাকিল। হরেণকে কোলে করিয়া সরলা তাহার কাছে গেল।

(২)

সরলার বয়স ১২ বৎসর, হরেণ সবে ৬ ছয় বৎসরে পড়িয়াছে। দুই বৎসর হইল সরলার মার ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে। সরলার পিতা পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছেন। বিমাতা হরেণকে দেখিতে পারে না। ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য অন্য লোককে দেয়, আপনি খায়, বাপের বাড়ী পাঠায়, কিন্তু হরেণকে দেয় না। কোনও ভাল খেলনা পাইলে নিজের ভাইকে দেয়; ভাল কাপড়, ভাল জুতা সকলই নিজের ভাইটী যাদুর জন্য, হরেণের জন্য কিছুই নয়। ভাইটী কাঁদিলে কত আদর করে, কত ভাল ভাল খেলনা দেয়, কিন্তু হরেণ কাঁদিলে আদর করা দূরের কথা—প্রহারে তাহার অস্থি ভাঙ্গিয়া দেয়। দেখিয়া শুনিয়া হরেণ

আর বড় কাঁদে না, ইচ্ছা হইলেও কিছু চায় না। বিমাতা যা দেয়, তাই খায়, ক্ষুধা পাইলে চুপ করিয়া থাকে, আর সুবিধা পাইলে গোপনে মার জন্য দু চার ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

আজ দিদি আসিয়াছে; মার কাছে যাইবার পথও জানিতে পারিয়াছে। তাই হরেণের মনে বড়ই ইচ্ছা হইল—এক বার মার কাছে যায়। আহারাদির পর দিদির কাছে শয়ন করিয়া হরেণ বলিল, "দিদি, চল আমরা মার কাছে যাই। মা আমায় কত ভালবাসিতেন, আমায় কত আদর করিতেন, কেমন ভাল ভাল খাবার দিতেন, কত নূতন নূতন কাপড় জামা দিতেন, কোলে ক'রে কত কথা বলিতেন। এ মা আমাদের ত তেমন করেন না। মা আমায় কখন মারিতেন না। এ মা আমায় মেরে মেরে রোগা করে দেছেন, যাদু আমার খাবার কেড়ে খেলে আমি কাঁদি, কিন্তু এ মা যাদুকে কিছু না ব'লে আমাকেই মারেন, আমি আর এখানে থাক্‌বো না। মা থাক্‌তে বাবা আমায় কত ভালবাস্‌তেন, এখন তিনি আমায় আর তত আদর যত্ন করেন না। দিদি, মার সঙ্গে কি ভালবাসাও স্বর্গে চলে গেছে! তা বেশ, আমিও স্বর্গে যাব! দিদি তুমি যাবে ত? সরলা কোমল হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। কিন্তু তাহা গোপন করিয়া হরেণকে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্য কথা বলিতে লাগিল, সাত ভাই সম্পর্কের গল্প আরম্ভ করিল। কিন্তু হরেণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিল, "বুঝেছি তুমি যাবে না, মাকে দেখবার জন্য তোমার একটুও ইচ্ছে নাই।" সরলা চুপ করিয়া রহিল। হরেণও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, সরলা নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(৩)

হরেণের আর নিদ্রা হইল না, দিদি ঘুমাইয়াছে দেখিয়া সে বিছানা হইতে উঠিল, দুয়ার খুলিয়া বারাণ্ডায় গেল। একে পূর্ণিমা, তায় আবার আকাশে একটুও মেঘ নাই—রাত্রি যেন ঠিক্ দিনের বেলার ন্যায় বোধ হইতেছিল। হরেণ একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল —আবার কি ভাবিয়া ঘরের ভিতর গিয়া মশারির দড়ীটী খুলিল। পরে উহা মালার মত করিয়া নিজ গলদেশে পরিয়া আবার বারাণ্ডায় আসিল! কচি হাত দুখানি যুক্ত করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রদেব নিজসৌন্দর্য্যে হরেণের গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তাহার সুন্দর চক্ষু দুটী ছল ছল করিতেছে, সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়াছে, মুখ দিয়া অস্পষ্টে 'মা মা' শব্দ নির্গত হইতেছে।

এক খণ্ড মেঘ আসিয়া অল্পে অল্পে আকাশকে আচ্ছন্ন করিল। হাস্যময়ী প্রকৃতি মলিনা হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিল। এই সময়ে অদূরে বৃক্ষশাখে এক পেচক বিকট চিৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। হরেণ ভীত হইয়া বারাণ্ডায় শুইয়া পড়িল।

সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, "গলায় দড়ী ত দিয়াছি, আমি কি মরিয়াছি? যদি মরিয়াছি, তবে মার কাছে যাই নাই কেন?"

(৪)

হরেণের বিমাতা দুয়ার খোলার শব্দে শয্যা হইতে উঠিয়া এতক্ষণ হরেণের কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করিতেছিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারায় তাহার কাছে গিয়া স্বভাবসুলভ কর্কশ স্বরে কহিল, "হরা, তুই এখানে শুয়ে কেন রে?" বিমাতার স্বর বুঝিতে পারিয়া ভয়-বিজড়িত স্বরে কহিল, "আমি—আমি মার কাছে যাব, তাই গলায় দড়ী দিয়া মরিতেছি, আর কিছু করি নাই মা, আর কিছু নয়।"

সপত্নী-পুত্রকে শত্রু জ্ঞান করা স্ত্রীলোক-গণের স্বভাবসিদ্ধ কিনা তাহা বলা দুষ্কর, তবে এ দেশের অনেক বিমাতা বিকৃত-ভাবাপন্ন তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। হরেণ মরিতেছে শুনিয়া প্রথমে বিমাতার মনে একটু দয়া হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিমাতা ভাবিল, হরা ত আর আমার ছেলে নয়, আমার সতীন পো, এ মরে আমার কি? মরে ত বরং ভালই হয়, আমার ছেলে পুলে হলে তারা নিষ্কণ্টকে আমার স্বামীর সমুদায় বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিবে। এইরূপ স্থির করিয়াই বিমাতা বলিল, "দূর পাগল, অমন করে কি গলায় দড়ী দেয়?" হরেন্দ্র পূর্ব্বে কখন তাহার মুখে এমন নম্র বাক্য শুনে নাই, তাই সাহস করিয়া বলিল, "কেমন করিয়া গলায় দড়ী দেয় বল না মা?" বিমাতা তখন দড়ীগাছটী হরেণের গলা হইতে খুলিয়া লইয়া উহার এক প্রান্তে একটী ফাঁস প্রস্তুত করিল। পরে ঐ ফাঁসটী হরেণের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, "আমি নিচু হইতেছি, তুমি আমার কাঁধে উঠিয়া বেশ করিয়া বস। যা করিতে হয়, আমি করিতেছি।" বিমাতা হরেণকে কাঁধে লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং দড়ীগাছটীর অপর প্রান্ত চালের সহিত বদ্ধ করিবার জন্য উহা গ্রহণ করিয়া যেমন চালে হাত দিয়াছে, অমনি ফোঁস করিয়া একটী শব্দ হইল। হরেণ ভয়ে "বাবারে মারে" বলিয়া বিমাতার স্কন্ধ হইতে লাফাইয়া পড়িল, বিমাতাও "ও বাবারে জ্বলে মরি" বলিয়া ভূশায়ী হইল। মাতাপুত্রের চিৎকারে বাটীর সকলে জাগ্রত হইয়া দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। এই সময়ে পবন-তাড়নে ঘনঘটা বিদূরিত হইল। নভঃসরোবরে হীরক কমল হাসিতে লাগিল। প্রকৃতি তাহার হাসিতে হাস্যময়ী। হরেণের পিতা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে?" বিমাতা মুমূর্ষু স্বরে কহিল, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, আমি নারকী, আমার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে, কাল সাপের বিষে আমার শরীর জ্বলে গেল, আমি মহাপাপী, আমাকে দেখিও না, তোমাদের পাপ হবে।" বিমাতা নীরব

হইল। সরলা তাড়াতাড়ি বিমাতার কাছে গেল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে সদাগর্ব্বিত মুখখানি মসীসিক্ত বস্ত্রের ন্যায় মলিন হইয়াছে, চক্ষু দুটী মুদ্রিত ও কোটরগত; সর্ব্বশরীর স্থির ও নিস্পন্দ। সরলা কাঁদিয়া বলিল, "বাবা! এ কি হইল, মা যে মরিয়া গেল।"

হরেণ এতক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। মৃত্যুর কথা শুনিয়া তাহার যেন জ্ঞান হইল। সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "এ মাও সে মার কাছে গেল! আমার মার কাছে যাওয়া হল না!!"

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

ভারতহিতৈষিণী কুমারী ই, এ, ম্যানিং।

কুমারী ম্যানিং সুবিখ্যাত কুমারী কার্পেণ্টারের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বপ্রকার হিতব্রতে ইঁহার সহানুভূতি ও সহায়তা দেখা যায়। ইনি বহু দিনাবধি ভারত জাতীয় সভার সম্পাদিকা এবং তাহার পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন। ইংলণ্ড-প্রবাসী যুবকদিগের মাতৃস্বরূপিণী হইয়া ইনি তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ, সদুপদেশ দ্বারা সহায়তা এবং সময় সময় অর্থানুকূল্য দ্বারাও অভাব দূর করিয়া থাকেন। ইনি কলিকাতায় এই দ্বিতীয় বার আসিয়াছেন এবং এখানকার নারীজাতি সম্বন্ধীয় শুভানুষ্ঠান সকল পরিদর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। গত ৯ই জানুয়ারি সোমবার বরাহনগর বিধবাশ্রম দর্শন করিতে গেলে তত্রত্য অধিবাসিনীগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। কুমারী ম্যানিং এই আশ্রমের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ও সকল বন্দোবস্ত বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়া যারপরনাই প্রীত হইয়াছেন। তিনি জানুয়ারির শেষে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজে গিয়াছেন, তথা হইতে বোম্বাই দিয়া বিলাত যাত্রা করিবেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে নিরাপদে স্বদেশে উত্তীর্ণ করুন, এবং তাঁহা দ্বারা ভারতের নরনারীদিগের আরও কল্যাণ ও উন্নতি বর্দ্ধিত করুন্।

অভিনন্দন-পত্র।

রমণীকুল-বরণীয়া মাননীয়া
কুমারী শ্রীমতী ম্যানিং মহোদয়া
উদারহৃদয়াসু—

প্রিয় ভগিনি!

আমরা এই দূরদেশ হইতে আপনার গুণাবলী শুনিয়া মোহিত হইয়াছি! যে দিন শুনিয়াছি, আপনি স্ত্রীজাতির হিতাকাঙ্ক্ষিণী; যাহারা শিক্ষার অভাবে—জ্ঞানের অভাবে ইতর শ্রেণীর জীবের ন্যায় দুঃখে জীবন যাপন করে, আপনি

তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিতা এবং তাহাদিগের ক্লেশমোচনের জন্য সতত চেষ্টাবতী, সেই দিন হইতেই আপনাকে শ্রদ্ধা করি। যে দিন শুনিয়াছি, আপনি স্বার্থ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ভোগ-বিলাসে বিমুখ হইয়া পরের হিতব্রত ধারণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আপনাকে হৃদয়ের উচ্চ আসন দান করিয়াছি। যে দিন শুনিয়াছি, দুঃখিনী হিন্দু-বিধবাদিগের ক্রন্দনধ্বনি, কত নদ নদী, কত দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহাসাগরের পারে সুদূর ইংলণ্ডে আপনার কর্ণে প্রবেশ করে, এবং সেই স্থান হইতে আপনি তাহাদের দুরবস্থামোচনে সাহায্যকারিণী, সেই দিন হইতেই আমাদের চিত্ত আপনার নিকটে কৃতজ্ঞ।

আমরা সেই দুঃখিনী হিন্দুবিধবা! আপনাকে আজ নিকটে পাইয়া আমাদের অন্তঃকরণের আনন্দোচ্ছ্বাস জানাইতেছি, আমদের দুঃখের কথা আজ আর আপনাকে কি বলিব! আমরা কাঙ্গালিনী, ধন রত্ন আমাদের কিছুই নাই, আপনার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার উপযুক্ত আয়োজন আমাদের নাই, আমাদের বিদ্যা নাই, শিক্ষা নাই, অর্থ নাই। আমাদের ন্যায় শত শত অনাথা স্ত্রীলোক এ দেশে ঐরূপ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে; শত শত বিধবা, ভদ্রবংশে জন্মিয়া সুশিক্ষার অভাবে সাহায্যের অভাবে, ইতর বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, কে তাহাদের মুখের দিকে চায়? কে তাহাদের হইয়া দুটা কথা বলে?

আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনার করুণ-দৃষ্টি এই পতিত দেশে পতিত হইয়াছে, আজ আপনার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুররুদ্ধা বিধবাদিগের হৃদয়ে গভীর ভাব আপনার প্রতি উত্থিত হইতেছে। তাহাদিগের রুদ্ধ কণ্ঠ তাহা প্রকাশ করিতে না পারিলেও অন্তর্যামী ভগবান্ তাহা জানিতেছেন।

আপনি যে ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগের হিত উদ্দেশ্যে এ দেশে আসিয়াছেন, আমরা সে জন্য আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আপনি সুস্থকায় এবং দীর্ঘজীবিনী হইয়া এইরূপ পরোপকারব্রতে চিরদিন স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করুন, আমরা সর্ব্বসাক্ষী দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

বরাহনগর,
৯ জানুয়ারী, ১৮৯৯

বরাহনগর—
হিন্দু-বিধবাশ্রমবাসিনী
বিধবাগণ।

সাধুসঙ্কল্প ও সাধুচেষ্টা।

গোহত্যা নিবারণ।

ঢাকার প্রখ্যাতনামা বাবু লাল মোহন সাহা শঙ্খনিধির সাধু চেষ্টা ও দানশীলতা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। গত ৮ই পৌষ, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাবু ভজহরি সাহা শঙ্খনিধির আদ্য শ্রাদ্ধ গিয়াছে। লাল মোহন বাবু চিরন্তন প্রথানুসারে মুক্তহস্ততার পরিচয় প্রদান করিয়া বহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বিস্তর দান দক্ষিণা ভোজনাদি এবং সহস্র সহস্র দরিদ্রদিগকে আহার ও অর্থ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শঙ্খনিধির উদ্ভাবনী শক্তি ও ঈশ্বরাদিষ্ট সাধু অভিপ্রায় হইতে সেইদিনে আর একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে ঢাকা একটী মুসলমান-প্রধান প্রধান নগর। এই নগরে বিস্তর মুসলমানের বাস, সুতরাং প্রতি দিনই বহু বহু গোহত্যা হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে গোমাংস বিক্রয়ের দোকানও যথেষ্ট। কিন্তু বড় সুখের বিষয় লালমোহন বাবু সেই শ্রাদ্ধসময়ে ঢাকায় গোহত্যা হইতে দেন নাই, সুতরাং সেই এক দিনে তাঁহার যত্নে বহু গোর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

এমন কি সেই দিনে ঢাকার সমস্ত গোমাংসের (কসাই) দোকান বন্ধ ছিল। লালমোহন বাবু পরম বৈষ্ণব, সেই বৈষ্ণবোচিত সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানে সফলকাম হইয়াছেন। যে একটী দুইটী গোহত্যার ক্ষণ নিবারণের জন্য ভারতে স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঘোর দাঙ্গা ও বিবাদ চলিতেছে,—এমন কি কোন রাজা কি ধনীও যাহাতে কখন ও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, আজ লালমোহন বাবুর চেষ্টায় শত শত গোর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, লালমোহন বাবুর উদারতায়, সাধুতায় দানশীলতায়, ঢাকায় কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ ও তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার বাক্য পালন করিয়া থাকেন। আমরা হিন্দু আর্য্যগণের আশীর্ব্বাদ লইয়া কায়মনোবাক্যে লালমোহন বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি। না হবে কেন সাধু যাহার চেষ্টা, ঈশ্বর তাহার সহায়। এক বৎসর হয় নাই এই লাল মোহন বাবুই কন্যা বিবাহ উপলক্ষে অনেক কয়েদীকে তাহাদের দেনা ও অর্থদণ্ডের টাকা প্রদান করিয়া দেওয়ানি ও ফৌজদারি কয়েদ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহারই কিছু পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ সময়ে নিজ বাটীতে প্রকাণ্ড অন্নছত্র করিয়া বহুদিন সহস্র ২ লোককে আহার প্রদান করেন। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাশী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, ও বঙ্গ বিহার সর্ব্বদেশ হইতে পণ্ডিত-

দিগকে আহ্বান করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহুদান দক্ষিণা প্রদান করেন। লাল মোহন বাবুকে ঢাকার সাহেবগণও সম্মাননা ও তাঁহার সদনুষ্ঠানে আদর এবং বিনীত ব্যবহারে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার বাটীতে যাইয়া অনুগৃহীত করেন। লাল মোহন বাবুই মুসলমানদের সহানুভূতি পাইয়া শত ২ গোহত্যা নিবারণে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রী—

সংখ্যাবাচক পদার্থ।

(৪০৭ সংখ্যা—২৯০ পৃষ্ঠার পর)

ছয়—ষট্‌কর্ম্ম (১) ব্রাহ্মণের ছয়টী কর্ত্তব্য —অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ; (২) মারণ, উচ্চাটন, বশী-করণ,স্তম্ভন, বিদ্বেষ ও শান্তি। ষট্‌ কারক —কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। ষট্‌কুঠা (ছয় প্রকার প্রেতিনী—ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, সাকিনী ও হাকিনী)। ষট্‌চক্র (যোগশাস্ত্র মতে শরীরস্থ ৬ চক্র—মূলাধার, লিঙ্গমূল, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও ভ্রূযুগ)। ষট্‌পদ—ভ্রমর; ষট্‌পদী—ভ্রমরী। ষট্‌ প্রাজ্ঞ—ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ, লোকব্যবহার ও তত্ত্বার্থ এই ছয় বিষয়ে যাহার প্রাজ্ঞতা। ষড়ঙ্গ—(১) ২ জঙ্ঘা, ২ বাহু, শির ও মধ্য-দেশ,(২) ছয় শাস্ত্র—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। ষড়্‌ষ্টক— (১) মকরমিথুন, কন্যাকুম্ভ, সিংহমীন, বৃষতুলা, অলিমেষ, কর্কট ধনু—মিত্রষড়্‌ষ্টক (২) মকরসিংহ, কন্যামেষ, তুলামীন, কর্কটকুম্ভ, বৃষধনু, বৃশ্চিকমিথুন— অরি ষড়্‌ষ্টক। ষড়্‌ গয়া—গয়াগজ, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া ও গয়া-সুর। ষড়্‌দুর্গ—গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, ধান্য-দুর্গ, মহীদুর্গ, মৃৎদুর্গ ও বনদুর্গ। ষড়্‌ রস —মধুর, লবণ. তিক্ত, অম্ল, কষায় ও কটু। ষড়্‌ রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। ষড়্‌দুঃখভাগী— নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় দোষ বিশিষ্ট লোক। ষড়ানন ও ষড়্‌বক্ত্র—কার্ত্তিক; ষড়্‌ মাতৃকা —অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা। ছয় ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ষড়্‌ভগ বা ষড়ৈশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। ষড়্‌গুণ—সন্ধি, বিগ্রহ, যান (শত্রুরাজ্যের দিকে অগ্রসরণ), আসন (শত্রুরাজ্যে গাঢ় প্রবেশ), দ্বৈধ (বিভাগ), আশ্রয় (শত্রুরাজ্য হস্তগত করা)। ষড়্‌বিধ সৈন্য—মৌল (কুল-ক্রমাগত) ভৃত্য, সুহৃদ, শ্রেণী (ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী সাহায্যকারী লোক), শত্রু (শত্রুর বিপক্ষ),আটবিক (জঙ্গলে, পাহাড়ে)।

বড়বীহি—শ্যামর, নীয়ার জর্ত্তিল, য়াবেধুক বেণুযব,মর্কটক। ছয়রাগ—(১) ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ ও মেঘ ; মতান্তরে—শিব মুখ হইতে জাত পঞ্চরাগ—শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব ও মেঘ এবং দুর্গার মুখজাত নটনারায়ণ।

সাত—সপ্তপাতাল—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিম, মহাতল, সতল, পাতাল। সপ্তসমুদ্র—লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জলের সমুদ্র। সপ্তজিহ্ব—অগ্নি (ইহার সাত জিহ্বা,—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিত, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা)। সপ্তবার—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। সপ্ত-বর্ণ—বায়লেট, ধূমল, নীল, হরিত, পীত, পাটল, লোহিত। সপ্তাশ্ব—সূর্য্য। সপ্তসাম—রথন্তর, বৃহৎসাম, বামদেব্য, বৈরূপ, পাবমান, বৈরাজ ও চান্দ্রমস সামবেদের এই ৭ প্রকরণ। সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। সপ্তভুবন—ভু, ভুব, স্বর্গ, জন, তপ, মহ ও সত্য। সপ্তগণ—যক্ষ, জাগৃ, দরিদ্রা, কাস, শ্বাস, দীধী, বেবী ব্যাকরণের সাত গণ। সপ্তকুলপর্ব্বত—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষবান্, পারিপাত্র ও বিন্ধ্য। সপ্তস্বর বা স্বর—সা, রে, গা, মা, পা ধা, নি। সপ্তরাজ্য—স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল। সপ্তধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। সপ্তপদী—বিবাহে দম্পতীর এক এক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সপ্তপদ অগ্রসরণ; সপ্তপত্রী—ছাদিম গাছ। সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গীরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। সপ্তশলাকা—(তির্য্যক, উর্দ্ধ, জ্যোতিষের সপ্তরেখা)। সপ্তবীহি—ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু।

আট—অষ্ট দিক্—(দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, বায়ু, অগ্নি, ঈশান ও নৈঋত। অষ্টযোগাঙ্গ—শম, দম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। অষ্টবসু—ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। অষ্ট শিবমূর্ত্তি—পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য ও যজমান মূর্ত্তি। অষ্টৈশ্বর্য্য বা অষ্টসিদ্ধি—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি,প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও কামাবশায়িতা। দিক্‌পাল—পূর্ব্ব দিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে বহ্নি, দক্ষিণে যম, নৈঋতে নিঋত, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মরুৎ, উত্তরে কুবের, ঈশানে ঈশ। দিক্‌পতি—পূর্ব্বে রবি, অগ্নিকোণে শুক্র, দক্ষিণে মঙ্গল, নৈঋত কোণে রাহু, পশ্চিমে শনি, বায়ুকোণে চন্দ্র, উত্তরে বুধ, ঈশানে বৃহস্পতি। অষ্টগজ—ঐরাবত, সার্ব্বভৌম, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদণ্ড, সুপ্রতীক, পুণ্ডরীক। অষ্টনাগ (১) অনন্ত, বাসকী কম্বল ইত্যাদি ৮ নাগ। অষ্টধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ ও দস্তা। অষ্টব্রীহি—ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু ও কুলথ।

নূতন সংবাদ।

১। রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কুর্জন সস্ত্রীক আগামী ২৮শে মার্চ্চ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া এপ্রেলের মধ্যভাগে সিমলায় উপনীত হইবেন। পথে দেশীয় শিল্পানুষ্ঠান সকল পরিদর্শন করিয়া যাইবেন।

২। ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট মহামান্য ফর তিন ঘণ্টার পীড়ায় গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে মুসিয়ার লোবে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

৩। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ওবারটুন হলে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি বোল্টন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। সকল শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধিগণ বক্তৃতাদি দ্বারা উৎসাহদান করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ প্রায় ৫০ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

৪। রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কর্ম্ম হইতে অবসৃত হওয়াতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হিল সাহেব তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাধিকা বাবু সুদীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন।

৫। রুষ ও চীনদিগের মধ্যে টাক্স লইয়া ঘোরতর বিবাদ হইয়া শতাধিক চীনেম্যান হত হইয়াছে।

৬। ইংলণ্ডেশ্বরীর আদেশে লেডি কুর্জন ভারতমুকুটে ভূষিত হইয়াছেন।

৭। ঢাকার নবাব স্যার আসানুল্লা বাহাদুর ভারত ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সেক্সপিয়র, ৩য় ভাগ—শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র রক্ষিত সঙ্কলিত। মূল্য সুলভ সংস্করণ ১।০; রাজসংস্করণ ২৲ টাকা। কলিকাতা ১৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

তৃতীয় ভাগে সেক্সপিয়রে জগদ্বিখ্যাত হাম্লেট্, জুলিয়াস সিজার, মাচ-এডু, আণ্টনি-ক্লিওপেট্রা, কিং জন, রিচার্ডাদি, থার্ড, য়্যাজ ইউ লাইক ইট ও মিডসামার—এই আটখানি উপন্যাস ও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ অপেক্ষাও তৃতীয় ভাগ সেক্সপিয়রের আকার বাড়িয়াছে; মূল্য বাড়ে নাই।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকা, হারাণ বাবুর সেক্‌সপিয়র অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যাঁহারা ক্রয় করিয়াছেন, তৃতীয় ভাগও তাঁহারা ক্রয় করিতে প্রলুব্ধ হইবেন। এমন সরল, মধুর ও অপূর্ব্ব বঙ্গানুবাদ বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব। পাঠে মূল গ্রন্থের অপূর্ব্ব ভাব ও রস-মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়। ভাষা এমন প্রাঞ্জল ও মিষ্ট হইয়াছে যে, পণ্ডিতে ও পুরনারীতে সমান আগ্রহে ইহা পাঠ করিবেন। একে জগতের মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়রের অদ্ভুত কবিত্ব, তাহার উপর হারাণ বাবুর অমৃতময়ী-লেখনী-নিঃসৃত উপাখ্যানের সরসতা, মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে। হারাণ চন্দ্রের প্রতিভা যে সর্ব্বতোমুখী ও লিখনভঙ্গিমা যে অপূর্ব্ব, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

২। মন্ত্রের সাধন—ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য সুলভ সংস্করণ ৵৹ আনা; রাজসংস্করণ ১৷৹ পাঁচ সিকা।

গ্রন্থের নাম শুনিবামাত্রই মনে যে গম্ভীর ভাবের উদয় হয়, গ্রন্থ পাঠ করিয়াও সেই ভাব মনে চির-জাগরূক থাকে। "বঙ্গের শেষ বীর" রচনায়, স্বদেশ-প্রেমিক হারাণ চন্দ্র যে বীণার ঝঙ্কার করিয়াছিলেন, "মন্ত্রের সাধনে" সে ঝঙ্কার সপ্তমে উঠিয়াছে। এমন স্বদেশ-ভক্তিময় উদ্দীপনাপূর্ণ আদর্শ বীরচরিত্র,—এমন সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির সহিত ইতিপূর্ব্বে আর কেহ কাব্য চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন, বোধ হয় না। রাজপুত-কেশরী প্রতাপ সিংহ এই গ্রন্থের নায়ক। তাঁহার স্বদেশ সেবা-ব্রতকে সাক্ষ্য করিয়া গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে—"মন্ত্রের সাধন"। কবিগণ বহু যত্নে যে আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করেন,—পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ—বিধাতার বরে সেই চরিত্র লইয়াই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবি ও ঔপন্যাসিক হারাণচন্দ্র অদ্ভুত প্রতিভাবলে, সেই মহান্ চরিত্র সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন অসামান্য কবিত্ব তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। "মন্ত্রের সাধন" নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী-জন্মে ধিক্কার জন্মে; ইতিপূর্ব্বে এই প্রতাপ-চরিত্র লইয়া অনেকেই নাটক উপন্যাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু হারাণ বাবুর ন্যায় এমন তন্ময়ভাবে কেহ লেখনী ধারণ করেন নাই। তন্ময় হইয়া লিখিয়াছেন বলিয়াই হারাণচন্দ্রের প্রতাপ পাঠকের বুক চিরিয়া বুকে বসে। গ্রন্থে করুণ রস ও বীররস এমন প্রগাঢ়রূপে প্রবাহিত যে, পাঠে প্রাণ গলিয়া যায়, কখন বা নির্জ্জীব প্রাণ সজীব হইয়া উঠে। বিশেষ হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ নরোজামেশা, প্রতাপের একবার মাত্র পদস্খলন, পরার্থে একটী রাজপুত পুরোহিতের আত্মোৎসর্গ, নির্জ্জন পাহাড়ে প্রেমিক প্রেমিকার খেদোক্তি, এই সকল অধ্যায় বিশেষ দক্ষতার সহিত লিখিত।

যমুনা, কিরণময়ী, পদ্মাবতী প্রভৃতি

স্ত্রী-চরিত-চিত্রণে কবির প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস যে, এমন সরস, সরল ও মনোজ্ঞ হইতে পারে—ইতিহাসের সকল কথা বজায় রাখিয়াও যে, এমন অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা রচিত হইতে পারে, হারাণ চন্দ্রই বঙ্গে তাহার পথ দেখাইলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "মন্ত্রের সাধনে" যে কয়টি সঙ্গীত আছে, তাহাও অতি উৎকৃষ্ট। সঙ্গীত রচনাতেও যে হারাণচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। বিশেষ,

"নাথ্ জনমে প্রেম পাইয়ে,
সে প্রেমে বঞ্চিত যে,
আপনার চিতা আপনি সাজায়,
তার বাড়া দুখী কে।"

ইতিশীর্ষক গানটি এখনও আমাদের কাণে বাজিতেছে।

হারাণ চন্দ্রের লেখনী-মুখে পারিজাত-বৃষ্টি হউক। "মন্ত্রের সাধন" বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। বাঙ্গালী স্ত্রী, পুরুষ, এই গ্রন্থপাঠে জাতীয় চরিত্র গঠিত করুন। এমন উপদেশময়, সন্নীতি ও শিক্ষা পূর্ণ উপন্যাস, আমরা বহুকাল পাঠ করি নাই।

৩। হরিদাসী—এই জীবনী স্বর্গীয়া হরিদাসীর স্বামী বাবু গৌরীনাথ বসু হৃদয় খুলিয়া লিখিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার গুণবতী ভার্য্যার অনেক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার চরম অবস্থাতেও তাঁহার শান্তভাব, ঈশ্বরনির্ভর ও প্রফুল্ল মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার জীবনীতে তাঁহার আরও অনেক গুণ বর্ণিত আছে, যথা—ধর্ম্ম ও পরকালে বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, মিতব্যয়িতা, শ্রমশীলতা, দীনতা, ভক্তিপ্রবণতা, কৃতজ্ঞতা, সরলতা, স্বাধীন ভাব, শান্তিপ্রিয়তা, সকলের প্রতি সদ্ভাব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগ, গুরুভক্তি, পতিভক্তি, ঋণভয়, বিলাসশূন্যতা, বিধাতার বিধাতৃত্বে দৃঢ় বিশ্বাস। এরূপ নারী যে স্ত্রীকুলের ভূষণ, তাহার সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় ত্রয়োবিংশমাত্র বয়সে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়াছে!

৪। স্ত্রী-চরিত্র—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ৷৷৹ আনা। এই পুস্তকখানি স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে এবং ইহাতে স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে অনেক উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্তগুলি স্বদেশ বিদেশ উভয় স্থান হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পাঠক-পাঠিকাগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, বলা বাহুল্য। শ্রদ্ধাস্পদ মজুমদার মহাশয় ইংরাজীতে সুপণ্ডিত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও বাগ্মী। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার শুভাগমনে আমরা বিশেষ আনন্দিত ও আশান্বিত হইলাম। তাঁহার মত সুযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন হইবে, ইহা আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি।

বামারচনা।

কেন?

শূন্য মরুভূমি প্রাণে,
কেন দুদিনের তরে,
ফুটিয়া কুসুম তুই
দুদিনেই গেলি ঝরে

আঁধার সংসার পথে
কেন তুই শুকতারা,
দেখা দিয়ে ডুবে গেলি
আঁধার করিয়া ধরা।

অন্ধ এ নয়ন তলে
উষার আলোক এসে,
ছড়ায়ে মুহূর্ত্ত জ্যোতি
মিশালি আবার শেষে।

পড়িয়া সুধার কণা
কোন্ স্বর্গ পথ হতে,
বাসনার রাশি মোর
দলে গেলি অকালেতে।

তোরে পেয়ে সপ্ত স্বর্গ—
কি ছিলিস্ মোর তুই,
আজি প্রাণ কিছু নয়—
শূন্য মরু ভূমি বই

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী

সে দিন।

তেমনি ত বহিছে তটিনী;
শাখা পরে বিকাশে পল্লব।
চুম্বিতেও শ্যামল ধরণী,
ঝরে পড়ে কিশলয় দল॥
তেমনি ত আকাশ ললাট,
জ্বলে উঠে উষার চুম্বনে।
শ্যাম হাসি হাসিতেছে তট,
তরঙ্গের মর্ম্ম কথা শুনে॥
তেমনি ত অনিল-কাহিনী
শুনিয়া অরণ্য উঠে কাঁদি।
হরষে শিহরে প্রতিধ্বনি,
শবদ যখন উঠে ডাকি॥
সব আছে তেমনি হেলায়ে,
শুধু হায়! সে দিন গো নাই।
ম্লান মুখে স্মিরিতি শুধায়—
সে দিনের সে স্বপন কই?
যে মোহন সুবর্ণ স্বপন,
সে দিনেরে ছিল পর্শ করি,
শুধু তার ছায়াটি এখন,
কাঁদে হায় সদা মোরে ঘেরি॥
চলে গেছে সে দিনের সাথে
পরিচিত জীবন আমার।
এবে হায়! যাহা কিছু আছে,
মনে হয় সব অচেনার॥
এদিনের কত হাসি খেলা,
আমারে গো নিত্য রহে ঘেরি
প্রাণ সব করি অবহেলা,
সেদিনের পানে রহে ফিরি

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

সে যে স্বরগের ফুল।

সে যে স্বরগের ফুল ;
কিবা রূপ মনোহর শোভায় অতুল ;
কি জানি কিসের তরে, অমর উদ্যান ছেড়ে,
এসে এই ধরাপরে হইল মুকুল ;
হায় ! সে যে পারিজাত ফুল।

সে যে পারিজাত ফুল।
বুঝি কোন্ দেববালা করি মহা ভুল,
কুসুমটি হাতে করে, ফেলেছিল ধরাপরে,
তাই সে এখানে পড়ে হইল মুকুল,
জনমিল ধরাতলে পারিজাত ফুল।
সে যে স্বরগের ফুল !

সে যে মন্দারের ফুল,
মর্ত্ত্যে এসে জনমিল হইয়া মুকুল,
যে ফুল ত্রিদিবে রাজে, তাহা কি মরতে সাজে ?
দেখিবারে পাইলেন শেষে দেবকুল,
সে যে মন্দারের ফুল।

মর্ত্ত্যে স্বরগের ফুল,
দেখিয়া ত্রিদিববাসী হলেন আকুল.
একদিন নিশাশেষে, ছিনু আমি নিদ্রাবেশে,
সে সময়ে গুপ্তবেশে আসি দেবকুল.
ছিঁড়ে লয়ে গেল মোর সাধের মুকুল।
হায় সে যে স্বরগের ফুল !

সে যে স্বরগের ফুল !
কি মোহের ঘোরে মোর হয়েছিল ভুল !
চিনিতে নারিনু হায়, যতনে রাখিনু তায়,
(কিন্তু) দেবগণ লয়ে তারে গেল সুরপুর,
অভাগী-হৃদয় হায় করে গেল চুর !
সে যে স্বরগের ফুল।

শ্রীমতী নী···বসু।

প্রার্থনা।।

(১১ই মাঘ ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে)

অদ্যকার প্রভাত আমার কাছে কি মধুর বোধ হইতেছে। শত শত নর নারী তোমার পূজার জন্য কত দূর দূরান্তর হইতে একত্র সমবেত হইয়াছে, যাহার যাহা সাধ্য তাহা লইয়া আসিয়াছে, তোমার চরণে দিয়া ধন্য হইবে, শত শত নর নারী তোমার পূজা করিতেছে, কি মনোহর দৃশ্য ! আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, আর আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতেছে। এ দিকে আবার প্রকৃতিদেবী তোমার পূজার আয়োজন করিতেছে, প্রভাতের মলয়ানিল তোমায় চামর ব্যজন করিতেছে—প্রভাত সমীরণস্পর্শে কাননে কুসুম ফুটিয়া তোমার চরণে আপনাকে অর্পণ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র জীবন সার্থক করিতেছে, পক্ষীরা উষা দেবীকে দেখিয়া নীড় পরিত্যাগ করিয়া তোমার নাম গান করিতেছে। হে পরমাত্মন্ ! এমন সুন্দর প্রভাত সমীর-

স্পর্শে আমার হৃদয়-কাননের কুসুমগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে; নাথ! মধ্যাহ্ন কালের আতপতাপে মলিন হইয়া যাইবে, সেই জন্য আমি বহুযত্নে কুসুমগুলিকে চয়ন করিয়া তোমার চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি। যাঁহারা ধনী, তাঁহারা তোমার পূজার কত না আয়োজন করিয়াছেন, আমার যে আর কিছুই নাই, আমি যে তোমার ধনহীনা তনয়া, আমার সুধুই ব্যাকুলতা ও আমার বহুযত্নের ফুলগুলিতে ভক্তি চন্দন মিশ্রিত করিয়া নয়নজলের সহিত তোমার চরণতলে অর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর, আমার জীবন সার্থক হউক। হে মহিমাময়! তুমি আমাদের অন্তরে বাহিরে বিরাজিত রহিয়াছ, মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মস্থ হইয়া আমরা যথন তোমাকে দেখি, তথন দেখি তুমি আমাদের আত্মাতে আত্মারাম হইয়া বিরাজিত রহিয়াছ, তথন আমরা "দ্বাসুপর্ণা" ঋষিবাক্যের অর্থ সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিয়া থাকি। তুমি আমাদের আত্মাতে সখারূপে রহিয়াছ। আবার যখন মোহ-আবরণ সরাইয়া তোমার জড়জগতে [illegible]ত করি, তথন তোমাকে মহিমাময় পিতারূপে বিরাজিত দেখিতে পাই; এবং "কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি" অনুভব করিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকি। এই শস্যশালিনী বসুন্ধরা শ্যামল নবদূর্ব্বাদল বিস্তৃত; তাহার বক্ষে তোমার সিংহাসন পাতা রহিয়াছে, আর তুমি তাহাতে মহারাজাধিরাজ-রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ, বিহগে তোমার স্তুতি গীন করিতেছে। যখন আবার ঊর্দ্ধে [illegible] করি, অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র-শোভিত নীল চন্দ্রাতপ রহিয়াছে। তোমাকে যখন যে ভাবে দেখি মুহূর্ত্তের জন্য আপনাকে ভুলিয়া অবাক্ হইয়া থাকি, তুমি আমাদের মাতা পিতা ও রাজারূপে হে অনন্তস্বরূপ অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছ ও এই জগতে ওতপ্রোত ভাবেও অবস্থান করিতেছ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা অজ্ঞান অন্ধকারে কূপ-মধ্যস্থিত ভেকের ন্যায় বাস করিতেছি, আমাদের মোহ-আবরণ দূর করিয়া দাও, আমাদের হৃদাকাশে জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হউক, অন্তরে বাহিরে তোমাকে দেখিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক হউক। দয়াময়! আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সকলই দিয়াছ, চাহিবার তো কিছুই নাই। আমরা তোমায় ছাড়িয়া সুখ-অন্বেষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হই। আর যেন তোমায় ছাড়িয়া না ভ্রমি, অমৃতের সাগর ছাড়িয়া বিষে অবগাহন না করি, এই তোমার চরণে করযোড়ে ভিক্ষা চাই। শ্রীইন্দিরা।

মাঘোৎসব উপলক্ষে।

আবার আসিল ঘুরে সমবৎসর পরে,
প্রিয়তম মাঘোৎসব আমাদের তরে।
প্রিয় মাঘোৎসব এল মোদের কারণ,
করিব কি মহোৎসব আমরা এখন?

দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, দোল, গোষ্ঠ, রাস,
হিন্দুদের পর্ব্ব পূজা কতই উল্লাস।
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, আমোদ আহ্লাদ,
নৃত্য গীত শেষে হায় ঘোর অবসাদ!
নহে ওপ্রকার আমাদের মাঘোৎসব;
বাহিরে কিছুই নাই ভিতরের সব।
মনের ব্যাপার ইথে এ উৎসব সনে।
সব ফেলে মন গড়া চাই সে কারণে।
আমাদের পাপমতি হিংসা দ্বেষ ভরা।
আমরা হয়েছি হায় জীবনেতে মরা।
হরিনাম হরিকথা করিয়া বিদায়;
পরনিন্দারূপ মালা আমাদের হায়!
ভাঙ্গা ঘর ছেঁড়া কাঁথা শাক অন্নসার।
গরবে ধরারে সরা ধারণা আবার।
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে সদা ভাবি হাম্‌বড়া,
ধার্ম্মিকা আমিই বড় ভেবে দিশাহারা।
এ বয়সে কত বার বরষে বরষে,
যতন করিনু মন ফিরাবার আশে।
কিছুইতো হইল না—ফিরিল না মন,
পূর্ব্বেও যেমন ছিল আজিও তেমন।
উৎসাহ উদ্যম তেজ ভাল হব আশা,
পূর্ব্বেতে যা ছিল কিন্তু এবে কর্ম্মনাশা
সংসার নদীর হায় ভীষণ তরঙ্গে
কোথায় ভাসিয়া গেছে কালের প্রভঙ্গে।
সুসময় কর্‌মক্ষেত্র ধরমমন্দিরে,
অতি সূক্ষ্ম কাপট্যের বসন শরীরে
ঘেরা সদা; আমাদের নিকট মরণ
হইতেছে এত, তাহা ভাবি না কখন।
নারিবে না বুঝিবারে কেহ কভু হায়,
আমরা অমর জীব কাজে ও কথায়।

এই দশা আমাদের আমরা কেমনে,
করিব ব্রহ্মের পূজা ভাবি তাই মনে।
শুনিয়াছি সাধু মুখে পুরাণে কোরাণে,
সুনির্ম্মল চিত্ত চাই ব্রহ্ম-পূজা ধ্যানে।
দীনবেশে ম্লান মুখে অনুতপ্ত মনে
ব্রহ্মকৃপা লভি লহ ভাই ভগ্নী সনে,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ দমি রিপুগণে,
এক মনে এক প্রাণে বসি যোগাসনে;
ভক্তিযোগে ব্রহ্মপদ করিলে চিন্তন,
তবে ব্রহ্ম স্বরূপেতে হইবে মগন।
এরূপ না হলে যদি ব্রহ্ম-উপাসনা
নাহি হয় করা, তবে মোদের বলনা
কি হবে উপায়? তবে কি হইবে গতি?
একেতে হয়েছি মরা আরো অধোগতি
হইবে কি দীননাথ? পতিতপাবন!
তুমিহে অখিলপতি কাঙ্গাল শরণ,
ধুয়ে দাও পাপ মলা; তোমার পূজায়
বসাও আমারে যেন আর কভু হায়!
নাহি যাই পাপপথে; তোমার কথায়
থাকি যেন দিবা নিশি হেথায় সেথায়।
এই ব্রহ্মোৎসব যেন নিত্যোৎসব হয়।
এ উৎসবে চিত্ত যেন চিরমগ্ন রয়।
তোমার সংসার ভাবি সংসারের কাজ
করি যেন, আশীর্ব্বাদ কর বিশ্বরাজ!
ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা নামে এখন যেমন
উপহাসে দেখে সবে মন্দ আচরণ।
এ উৎসব হতে যেন আর তাহা কভু
না পারে ঘটিতে, তাই কর মহাপ্রভু!

শ্রীমোক্ষদা সুন্দরী,
কাকীনা।

সঙ্গীত।

সুর—মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।

ওরে আমার মন ভ্রমরা।
কেনরে বেড়াস ছুটে হয়ে পাগলপারা।
মধুপান করবি বলে, সংসার মোহফুলে,
ছুটাছুটি করে শেষে হস্ দিশাহারা।
এ ফুলে মিলে না মধু, দেহ হয় ক্ষত সুধু,
ব্রহ্ম-পাদপদ্মে যা'রে, দেখবি সুধু মধুভরা;
ফুরাবে না পেট ভরে, মনের সুখে খেয়ে নেরে,
খেতে পাবি, দিতে পারবি, হবি প্রেমে মাতোয়ারা।
ও চরণ সরোজে বসি, পিও মধু দিবানিশি,
পাবি সুখ অবিনাশী, পদছায়া দুঃখহরা।

শ্রীমোক্ষদা সুন্দরী।

সুর—প্রেম বিনে কি সে ধন মিলে।

মন কেন দুর্ম্মতি এমন!
পূজিলি না ভজিলি না, বিভুর চরণ।
দেখিতেছ যত সব, হইলে এ দেহ শব,
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে, বিনে সে পরম ধন।
সংসার মোহ আঁধারে, দিবা নিশি রলি পড়ে,
এখন সময় আছে কর হরি নাম সাধন।
সে হরি আলো আঁধারে, প্রাণ খুলে ডাক তাঁরে,
ভব তাপ যাবে দূরে, ঘুচিবে ভববন্ধন।
মোক্ষদা, মোক্ষদা মারে, আর ভুলে থেক নারে।
মোক্ষধন হৃদে ধর, মোক্ষদ মায়ের চরণ।

প্রাণের পূজা।

আমি—সকল ভুলিয়ে, তোমায় লইয়ে,
হইব উদাসী সন্ন্যাসী।
গহন কাননে, খুঁজিব রতনে
ডাকিব কলুষবিনাশি।
নিশিতে দিবসে, পূজিব আবেশে
ভাসিব ভকতি-হিল্লোলে।
দিয়ে—প্রেম কোকনদ, পূজিব শ্রীপদ
প্রীতিফুল আঁখি সলিলে।
তুলসী জীবন, হৃদয় চন্দন,
সৌন্দর্য্যেতে দীপ জ্বালিব।

অর্ঘ্য দিব মন, নৈবেদ্য যৌবন,
কাম ক্রোধ বলি দানিব।
প্রবৃত্তি সকলি, হইবে অঞ্জলি,
বিল্বপত্র হবে বাসনা।
শুদ্ধতা বসন, করিয়া ধারণ,
করিব শ্রীপদ অর্চ্চনা।
ভক্তি মদে মেতে, পাখীর সঙ্গীতে
শুনিব সঙ্গীত তোমারি,
বসিয়া বিরলে, কুসুম কোমলে,
(প্রভু হে!) হেরিব তোমার মাধুরী।

স্বভাব শরীরে হেরিব তোমারে,
হয়—তোমারই শ্বাস সমীরণ।
পুষ্পিত লতিকা, শারদ চন্দ্রিকা,
তোমারই দেব-শরীর।
নির্ম্মল আকাশে, ললাট প্রকাশে,
কেশরাশি বন নিকর।
নীল সরোবর, আঁখি মনোহর,
বালার্ক কিরণ অধর।
পাদপ শ্যামল, বাহু সুকোমল,
ধরাধর পদ যুগল।
রবির কিরণ, তোমার বরণ,
শশধর মুখকমল।
কমল কোমল, তোমারি কপোল,
নব ঘন নেত্র নীলিম।
চন্দ্রাতপ তলে, তব গৃহ জলে
সকলি তোমার অসীম।
জাহ্নবী যমুনা, কালিন্দী শোভনা,
তব আস্তরণ স্বরূপ।
সকলি তোমার, সুধার আধার,
কেবলে হে তুমি অরূপ ?
নিশিতে চাঁদিয়া, দিতেছে জ্বালিয়া,
সুবর্ণ প্রদীপ শীতল,
নবীন বল্লরী, রেখেছে বিস্তারি,
তোমার ব্যজন শ্যামল।
এ অনন্ত ধরা তোমাতেই ভরা,
তোমাতেই তোমা হেরিব।
প্রভু!—তোমার এ প্রাণ, তোমাকেই দান
তোমার আজ্ঞায় করিব।

অম্বুজা সুন্দরীদাস
"প্রীতি ও পূজা" রচয়িত্রী।

শেষ কথা।

যেতে হবে যেতে হবে দুর দুরান্তর মাঝ,
শেষ বিদায়ের কথা বলিতে এলাম আজ।
যেতে হবে বেলা শেষে যখন নিভিবে রবি,
খেলা ধূলা হবে শেষ আমার জুড়াবে সবি।
ভেবেছিনু রেখে যাব স্নেহের প্রতিমাগুলি,
দারুণ নিঠুর কাল আগে সবে গেছে দলি।
অফুট কুসুম সম, কোমল শিশুর কায়,
কঠিন ধরণীতলে শয়ান রয়েছে হায়!
এই শেষ সাধ সখা, মিটাইও এ আশায়,
'সেই' নদী তটে মোর দগ্ধ কোরো এই কায়।
দারুণ হিয়ার জ্বালা নিভাইও বহ্নিতাপে,
পূত জাহ্নবীর জলে মুছে ফেল সব পাপে।
রোপিও অশোক বৃক্ষ চিতার শিয়র পরে,
অশোক সুখের কথা সেথানে শুনাবে মোরে।
যবে সব শেষ হবে মনে রেখ এই স্মৃতি,
ছিলাম তোমারি আমি তোমাতেই স্নেহ প্রীতি।

পঙ্কজ কুমারী দেবী। *

---

* এই রমণী কবিত্বশক্তিসম্পন্না ছিলেন—ফুটিতে না ফুটিতে ১৬ বর্ষ বয়সে কালক্রোড়ে অদৃশ্য হইয়াছেন। ইতিমধ্যে দুইটী কন্যার বিয়োগশোক পাইয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয়, ইঁহার শক্তি ইঁহার মহোদয়া "হাসি ও অশ্রুর" রচয়িত্রী সরোজ কুমারীতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বা, বো, স।

No. 410-11. March & April, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৬ বর্ষ। ৪১০-১১ সংখ্যা। | ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৫—মার্চ ও এপ্রেল ১৮৯৯। | ৬ষ্ঠ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সিমলা যাত্রা—গত ৪ঠা মার্চ্চ লেডী কুর্জন সদল সন্তানগণ সহিত সিমলা যাত্রা করিয়াছেন। লর্ড কুর্জন হাবড়া পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছেন।

কালা বোবা বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ ফণ্ড—ঈশ্বরেচ্ছায় এই ফণ্ডের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ইহাতে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ দান করিয়াছেন—

ভাওয়ালের মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ	৫০০০,
মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৩০০০,
মহারাজা মুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী	১০০০,
দ্বারবঙ্গের মহারাজা	১০০০,
নবাব বাহাদুর আসানুল্লা, ঢাকা	৩০০০,
রায় কমলেশ্বরী প্রসাদ সিং বাহাদুর মুঙ্গের	৫০০০,

নূতন রেলওয়ে—গত ৬ই মার্চ্চ হইতে বি এন রেলওয়ের গাড়ী কলিকাতা হইতে কটক হইয়া জগন্নাথপুরীতে যাইবে। ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৩৷৵১০ মাত্র। আপাততঃ রূপনারায়ণের ধার কোলা পর্য্যন্ত ষ্টিমার যাইতে প্রায় ৯ ঘণ্টা এবং তথা হইতে পুরী যাইতে ২৪ ঘণ্টা লাগিবে।

কাউণ্টেস কানাভারো—এই মাননীয়া মহিলা সিংহল হইতে সম্প্রতি কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বিনী হইলেও সকল ধর্ম্মের প্রতি উদারহৃদয়া ও শ্রদ্ধাবতী। ইঁহার দ্বারা ভারতের উপকারের আশা করা যায়।

লেডী ডফরিণ হাঁসপাতালের বার্ষিক অধিবেশন—গত ৩রা মার্চ্চ ইহার চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বড় লাট ও ছোট

লাট সস্ত্রীক উপস্থিত হন। কলিকাতার দেশীয় বিদেশীয় প্রায় সকল মান্যগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকার জয়—যুক্তরাজ্যের সৈন্যেরা ফিলিপাইন পুঞ্জের সিবুদ্বীপ অধিকার করিয়া দুর্গোপরি জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। বিদ্রোহীরা পাহাড়ে গিয়া লুকাইয়াছে।

এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়—উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট সার এণ্টনি ম্যাক ডোনাল্ড—গত ৮ই মার্চ্চ উপাধি বিতরণ সভায় সভাপতিত্ব করিয়া সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

স্ত্রী উকিল—কুমারী কর্ণেলা সরাবজী বি, এ, উঃ পঃ প্রদেশের আদালতের উকিল শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইনি অতি সু-শিক্ষিত এবং বিলাত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাঁর সিদ্ধি কামনা করি।

স্ত্রী কর্ম্মচারী—মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বের ছয় বৎসর পূর্ব্বে যে লোক সংখ্যা গণনা হয়, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের চাকরাণীর কাজ ভিন্ন অন্য ব্যবসায় ছিল না। গত আদমসুমারীতে প্রকাশ ৬১ হাজার স্ত্রীলোক পরিচ্ছদ প্রস্তুতকারিণী, ৭০ হাজার ছাপাখানার কাজ করে, ৩০ হাজার ডাক বিভাগে কেরাণী ইত্যাদি, ১ লক্ষ ৩০ হাজার শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী (ইহাদের সংখ্যা পুরুষশিক্ষকের তিনগুণ), ৪ হাজার ৭ শত ২১ জন খনিতে কাজ করে এবং ২০০ শত স্ত্রীলোক গবর্ণমেণ্ট আফিসে টাইপ লেখিকা।

মহারাণীর পৌত্র শোক—মধ্যম রাজকুমারের একমাত্র পুত্র স্যাক্সকোবর্গের প্রিন্স আলফ্রেড ২৪ বৎসর বয়সে লোকান্তর-গত হইয়াছেন। মহারাণীর পারিবারিক দুর্ঘটনায় প্রজামাত্রেই শোকার্ত্ত।

লণ্ডনে মৃত্যু—লণ্ডনে একসপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়ায় ৫৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। লর্ড জষ্টিস চিটী এই রোগে মরিয়াছেন।

বাঙ্গালায় জন্মমৃত্যু—১৮৯৭-৯৮ সালে বঙ্গদেশে ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৮২৪টী লোক জন্মিয়াছে এবং ২৩ লক্ষ, ১১ হাজার ৩৩২ লোক মরিয়াছে। মৃত্যু সংখ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অধিক।

লেডী কুর্জনের আত্মীয়গণ—লেডী কুর্জনের মাতা ও ভগিনীরা ভারত দর্শনে আসিতেছেন। লেডী কুর্জন আমেরিকার মেয়ে, এদেশের মহিলাগণের সহিত ইতিমধ্যে বেশ মিশিয়াছেন। তাঁহার কুটুম্বগণের আগমনও শুভজনক হইবে আশা করা যায়।

পৃথিবীর লবণ ভাগ—কোনও বৈজ্ঞানিক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে পৃথিবীর নদনদী সমুদ্র প্রভৃতিতে যে লবণ মিশ্রিত আছে, তাহা কোনও প্রকারে উদ্ধার করিতে পারিলে সমুদায় পৃথিবীর

পৃষ্ঠোপরি ১০০ ফিট উচ্চ লবণ স্তর সঞ্চিত হয়।

ব্যারণ রয়টার—ইনি পৃথিবীব্যাপী তারের সংবাদ চালনার প্রথম প্রবর্ত্তক, সম্প্রতি পরলোক গত হইয়াছেন। ইনি ১৮৭১ সালে লণ্ডনে বাস স্থাপন করেন এবং জর্ম্মণ ডিউক কর্ত্তৃক "ব্যারণ" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল।

রস্কিনের জন্মদিন—বিলাতের মহাজ্ঞানী রস্কিনের বয়স ৮০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে যুবরাজ এবং বিলাতের অনেক মহাপণ্ডিত ব্যক্তিসকল তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

দেবল রাজ।

(৮)

আমরা দেবলকে কখন কখন দেবনাথ বা দেবনাথ পাল বলিয়া সম্বোধন করিব। তাহাতে বোধ হয়, পাঠকগণ কোনও দোষ লইবেন না। বুড়োশিবের মেলায় দেবনাথ বেচা কেনা শেষ করিয়া চৌপালে চড়িয়া বাড়ী আসিলেন এবং জননীর সঙ্গে যেরূপে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, জননী তাহাতেই বিস্মিতা হইয়াছিলেন। তাহার পর যখন, সেদিনকার বেচা-কেনার কথা, বুড়োশিবের কথা এবং মামার বাড়ীর কথা পুত্রমুখে শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়াছিল। দেবনাথের তহবিল হইতে সেই মোহরটী লইয়া তাহাতে সিন্দুর চন্দন মাখাইয়া যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিলেন এবং ঐ মোহর কস্মিন্‌কালে ব্যয় না করেন, দেবনাথকে সেই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করিলেন। বিক্রয়-লব্ধ টাকা পয়সা হইতে যথাকালে বুড়োশিবের পূজা দিবার জন্য একটী টাকা ও চারি আনা পয়সা তুলিয়া রাখিলেন।

ঊনবিংশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত দেবনাথ কালেভদ্রে মাতুলালয়ে যাইতেন। তাহার পর তিন বৎসর যাবৎ এককালে মাতামহালয়ে গমন করেন নাই, সে কথা মেলার দিন তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুলের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু দেবনাথ কি কারণে মাতুলালয় সম্বন্ধে এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, বোধ হয়, পাঠকগণ এখনো তাহা বিশদরূপে বুঝিতে পারেন নাই। একবার পূজার পর বিজয়া দশমীর দিন দেবনাথ দশমী-কৃত্য করণোদ্দেশে মাতুলালয়ে গমন করেন। সে যাত্রা দুই চারিদিন তথায় ছিলেন। মাতামহী, গৃহস্থ সমস্ত পুরুষগণকে এক গৃহে ভোজন করাইতেন। দেবনাথও সেই সঙ্গে ভোজন করিতেন; কেবল তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল সে গৃহে ভোজন

করিতেন না। আপনারা "বড়লোক" বলিয়া কনিষ্ঠ মাতুলের মনে বিলক্ষণ অভিমান জন্মিয়াছিল, কেননা তাঁহার কিছুমাত্র সুশিক্ষা ছিল না। উপরি উক্ত গৃহে স্বজনগণের সহিত ভোজন না করিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, বলিয়াছিলেন, "হাঁড়ীগড়া ছোট জাতের সঙ্গে এক ঘরে আহার করিলে মান থাকে না।" ভোজন-গৃহে দেবনাথ ভিন্ন "হাঁড়ীগড়া ছোট জাত্" আর কেহ ছিল না। কনিষ্ঠ মাতুলের এই অযোগ্য ও অসঙ্গত বাক্যই, দেবনাথের মাতুলালয় সংস্রব পরিত্যাগের হেতু হইয়াছিল।

দেবনাথ-জননী পঞ্চ ভ্রাতার প্রিয়া ভগ্নী, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই ভগ্নী সম্বন্ধে দেবনাথও মাতামহ ও মাতুল গোষ্ঠীর পরম প্রিয় ও স্নেহাস্পদ ছিলেন। ছোট বাবুর "বাঁদরামি বাক্যে" সেই দেবনাথ মামার বাড়ী যাতায়াত ত্যাগ করিয়াছেন, ক্রমে এই ঘটনা মাতুলালয়স্থ সকলেরই বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিল। একেই নীচ কর্ম্ম করেন বলিয়া দেবনাথ প্রায়ই চৌবেড়ে যান না, তাহার উপর এই কথা। দেবনাথের এরূপ উৎকট অভিমান হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই ঘটনায় মাতামহ রাজারাম পাল মনে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলেন। একদিন কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, সে যদি দেবনাথকে তাঁহার নিকট আনিয়া না দেয়, তবে তিনি তাহার মুখ দেখিবেন না। কনিষ্ঠ পুত্র পিতার এই তিরস্কারে অতীব ব্যথিত ও ভীত হইয়া দেবনাথের সন্ধান আরম্ভ করিলেন। পরে কিরূপে এবং কোথায় দেবনাথকে "গ্রেপ্তার" করিয়াছিলেন, সপ্তমাধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

দেবনাথ মাতৃসমীপে মেলার দিনকার সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মা, চৌবেড়েত তোমার বাপের বাড়ী, —অবশ্যই বুড়োশিব দেখিয়াছ। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে দশ হাত অন্তরে একটা চৌকোণা গহ্বর ও তার মধ্যে সিঁড়ি আছে, দেখিয়াছ কি?"

জননী কহিলেন—

"কতবার দেখিয়াছি, কেন?"

গহ্বরের মধ্যে কি আছে; আর ঐ সিঁড়ি দিয়া ভিতরে নামা যায় কিনা, বলিতে পার?"

"কেন? তুমি উহার মধ্যে নামিবে নাকি?"

"সেই জন্যইত জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

আমার পায়ে হাত দিয়া শপথ কর্,— কখনো উহার নিকটে যাইবি না,—তবে উহার কথা বলিব। ওটা গহ্বর ত নয়, যমপুরী। শুনেছি, তোর মত ডাংপিটে দুই চারিটা ছেলে উহার মধ্যে নামিয়াছিল,—কিন্তু আর উঠে নাই।"

"ছেলেগুলা নামিল,—উঠিল না, কেহ তার সন্ধানও করিল না?"

"একেবারে কি দুই চারিটা নামিয়াছিল —তাহা নহে। উহার ভিতর কি

আছে, দেখিবার জন্য আগে এক জন নামিল,—আর উঠিল না। তার সন্ধানে আর একজন নামিল,—সেও উঠিল না। এই প্রকারে পূর্ব্বকালে ঐ গহ্বরে চারিটা প্রাণী নষ্ট হইয়াছিল। সেই অবধি এদেশের লোক উহার নিকটে ঘেঁসে না,—উহাকে যমালয়ের মত ভয় করে।"

"আমি যে আজ শুনে এলাম,—উহার মধ্যে একটি সন্ন্যাসী বাস করেন;—কখনো কখনো দশ পনর দিন, কি মাসেক অন্তরে বাহির হয়ে গ্রাম মধ্যে ভিক্ষা করেন।"

"সাধু-সন্ন্যাসী-যোগী-মোহান্তের অসাধ্য কি আছে? তাঁহারা ইচ্ছায় মরিতে পারেন,—ইচ্ছায় বাঁচিতে পারেন। পাখীর ন্যায় আকাশে উড়িতে পারেন,—জলের উপর দিয়া খড়ম পায়ে চলিয়া যাইতে পারেন। কখনো গোরু,—কখনো বাঘ, কখনো সাপ, কখনো বা অদৃশ্য পোকামাকড়ের আকার ধরিতে পারেন। তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দাও।"

"মা বুড়োশিব তলায় আজ আর একটা কাণ্ড দেখে এলাম।"

"কি বল দেখি?"

"মন্দির ও গহ্বরের মধ্যে যে জায়গা ছিল, তাহাতে "ঘাঁটাঘুঁটের" পর্ব্বত। গহ্বর ও ঐ স্থানটা এক দম্ জঙ্গলে ঢাকা, এ জন্যে প্রায়ই সে দিকে কেহ যায় না। কেহ কদাচ গহ্বর দেখিতে যায়, অনেকেই বলিল, এক রাতে ঐ ঘুঁটের পর্ব্বতটা মাটীর ভিতর থেকে বাহির হয়েছে।"

দেবল জননী কহিলেন,—

"দেবল, দেবতার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে। ইন্দ্রের পুরী শ্মশান হতে পারে,—সমুদ্র শুকিয়ে বালি উড়িতে পারে;—তোমার এই খড়-উড়া কুঁড়ে ঘরখানি রাজপুরী হতে পারে। বুনো বুড়োশিব, কি না করিতে পারেন? তাঁর মত 'জাগ্রত ঠাকুর' কোথাও নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, সন্ন্যাসী ঠাকুরই রান্নাবান্নার জন্যে ক্রমে ক্রমে ঘুঁটে সঞ্চয় করেছেন।"

(৯)

দেবনাথ পালের গৃহে দুইখানি বাঙ্গালা ঘর এবং দুইখানি বাঙ্গালা চালা। বর্ত্তমান কালের চৌকাঘর (চুমরী) ও দোচালার যেরূপ গঠন হইয়া থাকে, সেকালের বাঙ্গালা ঘর ও চালার গঠন সেরূপ ছিল না। তখন তিনখানি মাত্র চালে প্রকাণ্ড বাসগৃহ নির্ম্মিত হইত। চাল তিনখানি চতুর্থীর চন্দ্রকলাবৎ বক্রাকারে নির্ম্মিত ও ভিত্তির উপর ব্যবস্থাপিত হইত। সেরূপ চালের ঘর নিতান্ত মন্দ দেখাইত না, তথাপি কাল-ভেদে রুচিভেদবশতঃ এখন সেরূপ ঘর প্রায় দেখা যায় না। নিতান্ত পল্লীগ্রামে ঐরূপ ঘর, হয়ত অদ্যাপি দুই একখানা থাকিতেও পারে। এখন তদ্রূপ এক-খানা ঘরে পাঁচখানা চাল দেওয়া হইয়া থাকে। দেবনাথের বাসগৃহ দুইখানির একখানি পূর্ব্বদ্বারী, ও একখানি দক্ষিণ-দ্বারী। চালা দুইখানির একখানিতে

পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইত। অপরখানির চতুর্দ্দিক্ প্রায় অনাবৃত, দৈর্ঘ্য প্রায় বিংশতি হস্ত পরিমিত। তাহার অর্দ্ধাংশে চাকুঘর ও অর্দ্ধাংশে পোঁয়ান ঘর। চাকঘরে হাঁড়ি কলসীর গড়ন হইত, পোঁয়ান ঘরে সেই সকল মৃৎপাত্র পোড়ান হইত। মাটী কাটা মুড়ি কোদাইলখানি কখনও চাক ঘরে, কখনও বা পোঁয়ান ঘরে পতিত থাকিত। তৎসঙ্গে কাষ্ঠ কর্ত্তনের কুঠার, দা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রও ঐ দুই ঘরের যেথানে সেথানে পড়িয়া থাকিত।

সপ্তম অষ্টমাধ্যায়ে যে দিনকার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, সেই দিন হইতে গণনা করিলে যে দিন এক পক্ষ শেষ হয়, সেই দিন অতি প্রত্যূষে দেবনাথ-জননী চাক-ঘরে গমন করিয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়াই শশব্যস্তে নিদ্রিত দেবনাথকে ডাকিতে লাগিলেন। জননীর আহ্বানে দেবনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। না জানি কি বিপদ্ উপস্থিত ভাবিয়া, দেবনাথ সত্বরপদে জননীর নিকটস্থ হইলেন। জননী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেবনাথকে পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটনা দেখাইলেন। দেবনাথ দেখিলেন, চাকুঘরের মধ্যে একটী ঝোলা আড়ায় ঝুলিতেছে। গতরাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল, চালের ছিদ্রপথে জল পড়িয়া সেই ঝোলা ভিজিয়াছে। ঝোলার নিম্নভাগ হইতে ফোঁটা ফোঁটা বারি তখনও গৃহতলে পড়িতেছে। চাকঘরের যেথানে ঝোলায় জল পড়িতেছিল, ঠিক্ সেই স্থলে একখানি টকটকে সোণার মুড়ি কোদাল ও একখানি সোণার দা পড়িয়া আছে। সদর রাস্তার ধারে অনাবৃত চালা ঘরে সোণার কোদাল ও সোণার দা দেখিয়া জননী পুত্র দুইজনেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। "ঝোলা দেখ!" হঠাৎ এই শব্দটা যেন দেবনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। দেবনাথ তৎক্ষণাৎ ঝোলাটী পাড়িয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে এক খণ্ড আগুণ জ্বলিতেছে! আগুণের আর একটী বিশেষ গুণ দেখিলেন, ঝোলার সকল দ্রব্যাদি ভিজিয়াছে,—সে অগ্নিখণ্ডও ভিজিয়াছে,—তথাপি তাহা নির্ব্বাণ হয় নাই,—বরং অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে!

জননীকে ঝোলামধ্যস্থ অগ্নিখণ্ড দেখাইয়া জননী পুত্রে তৎসম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ কি পরামর্শ করিলেন। ঝোলা পুনরায় পূর্ব্বস্থানে স্থাপিত হইল। সোণার কোদাল ও সোণার দা লইয়া দেবনাথ ও তাঁহার জননী উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

মুদ্রাবিনিময়।

সভ্য দেশ মাত্রে দ্রব্য সকল ক্রয় বিক্রয়ার্থ এখন প্রায় মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, চর্ম্ম বা কাগজ নির্ম্মিত মুদ্রা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাহা

টাকা, পয়সা বা নোট নামে আখ্যাত। মুদ্রা ব্যবহারের, প্রধান লাভ এই যে ইহা অধিক মূল্যের ও স্বল্লাকারে অনায়াসে যেখানে ইচ্ছা সঙ্গে ২ লইয়া যাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যে কোনও আবশ্যক দ্রব্য যে কোনও পরিমাণে প্রয়োজন হয় ইহাদ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ ইহা মূল্যের একটী সাধারণ মাপকাটি, ইহা দ্বারা দ্রব্য সকলের মূল্যের ঠিক্ তুলনা হয়। মুদ্রার ব্যবহার কিন্তু সর্ব্বকালে ছিল না এবং এখনও অনেক দেশে ইহার ব্যবহার অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত। মানব প্রথম প্রথম বিনিময় প্রথা দ্বারাই দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করিত অর্থাৎ এক জনের ঘরে চাউল আছে, বস্ত্রের প্রয়োজন। যাহার ঘরে আবার অতিরিক্ত বস্ত্র আছে, কিন্তু চাউলের অভাব, প্রথোমক্ত ব্যক্তি তাহার নিকট জিনিষ বদলাইয়া আনিত। বাজার হাটে যাহার যাহা অতিরিক্ত থাকিত, তাহা বহিয়া লইয়া যাইত এবং তৎপরিবর্ত্তে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই লইয়া আসিত। এরূপ কারবারে যে কত অসুবিধা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। একত কোথায় কাহার প্রয়োজন হইবে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিকট তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থিত করা কঠিন ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ অনেক ভার বহিয়া লইয়া গিয়া কিছু বিনিময় করিয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া আনিতে হয়। আর কাপড়, বাক্স বা ঘড়া ঘটীর কতক অংশ দিয়া তাহার তুল্য মূল্য অন্য বস্তুর কতক অংশ লওয়া অনেক সময় বিড়ম্বনা সার হয়। ইহার ফল এই হয় যে অনেক সময় অল্পমূল্যের বস্তুর জন্য অধিক মূল্যের বস্তু ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়।

যাহা হউক মুদ্রার পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতি মধ্যে যে সকল বস্তু ব্যবহৃত হয়, তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

নরওয়ে দেশে মুদ্রার পরিবর্ত্তে শস্য ব্যবহার হইয়া থাকে।

আদিমকালে পশুচর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে মুদ্রা-রূপে ব্যবহৃত হইত।

ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে চার রুটী এবং চীন দেশে রেশম টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন রোমকদিগের নিকট ভেড়া এবং বলদ সকল মুদ্রা স্থানীয় ছিল।

জুলু এবং কাফ্রি জাতির মধ্যে বলদ সকল মুদ্রার ন্যায় হস্তান্তরিত হয়।

রুষিয়ার নিজনি নভোগরড্ প্রদেশে দস্তা আজও মুদ্রা রূপে চলে।

নবগিনির মফঃস্বল স্থানে ক্রীত দাসী সকল মুদ্রাস্থানীয়।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসীদিগের মধ্যে কোন কোন ফলের বীজ মুদ্রা রূপে প্রচলিত।

দক্ষিণ আমেরিকার অভ্যন্তরস্থ প্রদেশ সকলে নারিকেল, ও ডিম্ব প্রভৃতি মুদ্রার পরিবর্ত্তে চলিত। মধ্য আফ্রিকার কোন কোন স্থানে ছুরি, বড়সার মাথা, পিতলের সলা প্রভৃতি মুদ্রাস্থানীয়। গ্রীস দেশে

একতাল ধাতু মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত, তাহার উপরে মূল্য পরিমাণ অঙ্কিত থাকিত।

এডাম স্মিথ বলেন "অধিক দিনের কথা নহে, স্কটলণ্ডে পেরেক মুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত।"

ফিজিদ্বীপবাসীরা তিমির দন্ত, দক্ষিণ-সাগর দ্বীপবাসীরা লাল পালক এবং এবেসিনিয়াবাসীরা লবণ মুদ্রারূপে ব্যবহার করে। আইসলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের প্রাচীন আইন পাঠ করিলে দেখা যায়, তথায় গো মেষাদি মুদ্রাস্থানীয় ছিল।

টিউটনিক জাতীয়েরাও প্রাচীন কালে জরিমানা স্থলে গোমেষ প্রদান করিত।

১৬৫২ সালে আমেরিকার উপনিবেশে, তমাক, সোলা ও কডমৎস্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত।

ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষীয় দ্বীপসমূহ এবং আফ্রিকার অনেক স্থানে কড়ি মুদ্রারূপে প্রচলিত।

কার্থেজিনিয়েরা বাণিজ্যের উন্নতি সহ ধাতুমুদ্রা ব্যবহার করিত।

১১৫৮ খৃষ্টাব্দে বারবারোসা নরপতি মিলনের সহিত যুদ্ধের সময় চামড়ার টাকা চালান।

ফ্রান্সরাজ সাধু জনও ১৩৬০ সালে ইহাঁর অনুকরণ করেন। বৃটিশাধিকৃত ওয়েষ্টইণ্ডিস দ্বীপে আল্পিন, একটুক্রা রুটী অথবা এক চিম্‌টা নস্য দিয়া জিনিষ কেনা যায়।

আফ্রিকার উপকূলে কুড়ালি মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তি নাই। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার উপনিবেশী-দিগের মধ্যে বন্দুকের গুলি এক ফার্দ্দিং হইতে এক শিলিং পর্য্যন্ত মূল্যে গৃহীত হইত।

উদাসীনের চিন্তা।

সরোজিনী একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া এক বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা কার্য্য করিতেছেন। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন কার্য্য শেষ করেন নাই—নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নে অবসর সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চ্চা করিতেও ভাল বাসেন। বিশেষ ভাবে ডার্ব্বিন এবং তাঁহারই অনুবর্ত্তী লেখকদিগের গ্রন্থের বড় আদর করেন। তাঁহার একজন সহাধ্যায়িনী তাঁহার ন্যায় উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত না হইলেও উচ্চশিক্ষার চর্চ্চা করিতে ভাল বাসেন। ইনিও সর্ব্বদা সরোজিনীর সহিত বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। এক সময়ে উভয়ে কার্য্যস্থল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পর্য্যটনে বহির্গত হন। ভারতের নানা

তীর্থ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন কামনাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থান পর্য্যটনের পর এক তীর্থে উপনীত হইলেন। তীর্থের কোন এক পাণ্ডার সাহায্যে দর্শনযোগ্য অনেক স্থান দেখিলেন। অবশেষে এক পাহাড়ে উপনীত হইলেন। তথায় পাণ্ডা এক খণ্ড প্রস্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিল, "মা! ঐ দেখুন সীতা দেবীর হস্ত। সীতা দেবী এস্থলে রাবণকে ভিক্ষা দিবার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন, সেই হাত পাথর হয়ে এখনও রয়েছে।" সরোজিনী কিংবা তাঁহার সহচরী পাণ্ডার একথা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু দেখিলেন প্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তখানি অনেক পরিমাণে মানবের হস্তেরই প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহারা প্রথম দৃষ্টিতে মনে করিয়াছিলেন যে উহা মানবেরই হস্ত-নির্ম্মিত—কোনও ব্যক্তি অন্ধ বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস গাঢ়তর করিবার জন্য ওরূপ চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়াছে। পরে অগ্রসর হইয়া বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহাদের প্রথম সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক। উহা কোনও মানুষের হস্ত-রচিত নহে, স্বাভাবিক শক্তিতেই ওরূপ হস্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। মনে করিলেন যে বর্ষার জলধারা হয়ত প্রস্তরের উপর বৎসর বৎসর পড়িতে পড়িতে কতক অংশ ক্ষয় করিয়া ঐরূপ হস্ত নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু উভয়েরই মনে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া উভয়ে যখন উপবেশন করিলেন, তখন এই বিষয়েরই প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। সরোজিনী তাঁহার সহচরী মানময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই মান! আজ আমার মনের বহুদিনের একটা খট্‌কা ভেঙ্গে গেল।"

মান—ভাই সে খট্‌কাটা কি?

সরোজিনী—ডার্ব্বিনের সেই প্রাকৃতিক মনোনয়নের (Natural selection) বিষয়টা আমি অনেক দিন ধরে চিন্তা কচ্ছিলেম, কিন্তু কিছুতেই ওর ঠিক্ মীমাংসা করে উঠ্‌তে পারি নাই। আজ ঐ হাতখানি দেখে আমার সব সন্দেহের মীমাংসা হয়ে গেল।"

মান—বিষয়টা কি এতই সহজ যে তুমি হঠাৎ মীমাংসা করে ফেল্লে? ডার্ব্বিনের মত পণ্ডিত লোক যার পিছনে এত মাথা ঘুরিতেছে! তুমি তার ভুলের এত সহজেই মীমাংসা কল্লে! আচ্ছা মীমাংসাটা কি, একবার শুনি না।

সরোজিনী—আমি তাঁর বই পড়ে ভাবছিলেম যে প্রকৃতি বলেত কোন জিনিস নেই, তবে তার আবার একটা মনোনয়ন কি? মন থাক্‌লে না মনোনয়ন? প্রকৃতি কি এক ব্যক্তি যে তার আবার একটা মন থাক্‌বে, আর মনোনয়ন হবে? আজ তার মীমাংসা পেলেম। প্রাকৃতিক শক্তিতে কাজ হয়, অথচ তাহা যেন মনোনীত কার্য্য ব'লে বোধ হয়। যেমন এই হাত

খানি, কোন মানুষ ইহা গড়ে তোলে নাই, অথচ মানুষের গড়া হাতের মত বোধ হয়। উহা প্রাকৃতিক শক্তিরই ক্রিয়া।

মান—বেশত বুঝেছ, ডার্ব্বিন কি কথা বলেছেন? ডার্ব্বিন বোধ হয় বলেছেন যে কখন কোন স্বাভাবিক কারণে কোনও জন্তুর, অঙ্গের যদি সামান্য পরিবর্ত্তন হয় এবং সে পরিবর্ত্তন, যদি জন্তুর উপকার-জনক হয়, তা হলে সে পরিবর্ত্তিত অঙ্গ তিরোহিত না হয়ে বংশপরম্পরায় রক্ষিত হতে থাকে; এবং কালে উহা পরিস্ফুট অবস্থায় পরিণত হয়ে সেই জাতীয় জন্তুর উপকার কর্ত্তে থাকে। পক্ষান্তরে যে অঙ্গ অসুবিধাজনক কিংবা অনুপকারী, তাহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়। ঐ হাত খানির ভাব কি সেরূপ?

সরোজিনী—নয় কেন? হাত খানিও হয়ত একদিনে গড়ে উঠে নাই; ঐরূপ গঠিত হতে হয়ত শত শত বৎসর চলে গিয়েছে। আজ একটু—কাল একটু এরূপ করে কত বৎসর যে চলে গিয়েছে, তার কি কিছু ইয়ত্তা আছে? কোনও জন্তুর হলে হয়ত এতেই কত বংশ পার হয়ে যেত।

মান—ঘটনাত কেবল সময়ের নয়। এর ভিতর আর একটু খটকা আছে, তা কি তলিয়ে দেখেছ?

সরোজিনী—কি? ভেঙ্গেই বলনা কেন?

মান—হাতখানির সঙ্গে কোন ব্যক্তির কিংবা জাতির উপকার অনুপকারের কোনও সম্বন্ধ নাই।

সরোজিনী—বেশত বলছ, ওখানে যে পাণ্ডা রয়েছে, সে হাত দেখিয়ে ঢের পয়সা উপার্জ্জন কচ্ছে, তবে উপকারের সম্বন্ধ নাই কি করে? এর দ্বারা পাণ্ডার বংশপরম্পরার উপকার হবে।

মান—তুমি এত বড় মোটা কথাটা বুঝতে পার না? কি অলীক যুক্তি কচ্ছ। এই যে পাণ্ডা উপকার পাচ্ছে, তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক। এই হস্তখানি যদি নিবিড় বনে গড়ে উঠত, তাহলে কেহ ইহা দেখতে পেত না আর সীতা-দেবীর ইতিহাসটা যদি না থাকৃত, এবং লোক সকল যদি সীতাদেবীর ইতিহাসটাকে দেবলীলা বলে এত আদর না কর্ত্ত, তাহলে কেহ কি পয়সা দিত?

সরোজিনী—আমরা পয়সা দিলুম কেন? আমরা কি আর দেবলীলায় বিশ্বাস করে দিয়েছি?

মান—তোমার সঙ্গে যুক্তি করা বিড়ম্বনা। দেবলীলা বলে বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু হিমালয়ের অগম্য স্থলে যে এরূপ হাত নাই তার প্রমাণ কি? তা কি কেও দেখতে পায়, না তা কোনও পাণ্ডার উপার্জ্জনের পথ হয়েছে? এর দশাও ঐরূপ হতে পার্ত্ত। এই হস্ত এবং পাণ্ডার অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে কোনও স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। উহা সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার। কিন্তু ডার্ব্বিনের মত তা নয়। পরিবর্ত্তিত অঙ্গ এবং

উহার সহিত জন্তুর উপকার অনুপকারের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ। উপকারপ্রদ অঙ্গ থাক্‌বে এবং অনিষ্টকারী অঙ্গ লোপ পাবে, ইহাও স্থির নিশ্চিত; এজন্যই প্রশ্নটী দুরূহ।

সরোজিনী—প্রশ্নটি এতেই বা দুরূহ বলি কেন?

মান—প্রকৃতির কি উপকার অনুপকার বোধ আছে? অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইল, প্রাকৃতিক শক্তিতে দুই খানি জীর্ণ বাড়ী পড়ে গিয়ে কতকগুলি লোক মারা গেল। প্রকৃতি উপকার খুঁজিল কই? প্রাকৃতিক নিয়ম এই দেখি যে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হতে পরবর্ত্তী কার্য্যের উৎপত্তি হয়। বর্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, জীর্ণ বাড়ীর ইষ্টকগুলির যোগাকর্ষণের শিথিলতা তাহার ফল। তৎপরে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, ইষ্টকাদির ভূমিতে পতন তাহার ফল। এইরূপ প্রাকৃতিক শক্তিতে কোনও জন্তুর এক অঙ্গের পরিবর্ত্তন হতে পারে এবং সেইটি কারণ হলে ফল স্বরূপ একটি কার্য্য হতে পারে। কিন্তু সেই কার্য্যটি যে জন্তুর উপকারজনক, ইহা কি অন্ধ প্রকৃতি স্থির করে দিতে পারে? এবং উপকারজনক হলেই যে সে অঙ্গ সে কাজে সর্ব্বদা ব্যবহার কর্ত্তে হবে, ইহাও কি অন্ধ প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তে পারে? ইহার মূলে বুদ্ধিই কার্য্য করে, স্বীকার কর্ত্তে হবে। মনে কর কোনও জন্তুর কর্ণ লম্বমান। সে বনের কোন বলবান্ জন্তুর ভয়ে ভীত, তাই সে বলবান্ জন্তুর স্বর শুনতে পেলেই কর্ণকে সে দিকে প্রসারিত কর্ত্তে চেষ্টা করে; পৌনঃপুনিক এবম্বিধ চেষ্টার ফল স্বরূপ লম্বমান কর্ণ উৎপন্ন হতে থাকে। যে জন্তুর বুদ্ধি নাই, সে তাহা অপেক্ষা বলবান্ জন্তুর অনুমান কর্ত্তে পারে না। তৎপরে সে স্বরের তারতম্য করিতেও অক্ষম হইবে। প্রাকৃতিক শক্তি বশেই স্বরের তারতম্য হইবে এবং এক জন্তু অন্য জন্তু অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া অনুমিত হইবে ইহা স্বীকার করা যেতে পারে না। আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক স্বীকার করিলেও উক্ত দুই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজনীয়। কিন্তু পণ্ডিতদিগের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক কি বুদ্ধিগত, তদ্বিষয়েও মতভেদ দেখা যায়। কোনও ক্রিয়া প্রথমতঃ বুদ্ধিগত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহা এত অভ্যস্ত হয় যে উহা স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদিগের চক্ষুর পলক ধরা যাইতে পারে। শিশুর চক্ষুর পলক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরে চক্ষু রক্ষা করিবার জন্য ঘন ঘন পলক ফেলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইতে উহা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও প্রথমতঃ একরূপ বুদ্ধিগত ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। কারণ আত্মরক্ষা কথাটার মধ্যে তিনটি বিচার্য্য বিষয় আছে:—আত্ম, কোন্ কারণে আত্মরক্ষা এবং কোন্ কারণে আত্ম বিনাশ হয় এতদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়।

সরোজিনী—কেন, জ্ঞান না থাকলে কি হয় না? কোন কোন লতা আছে, তাহাকে ছায়ায় রেখে দিলে উহা রোদের দিকে অগ্রসর হয়। এ যে আত্মরক্ষার ভাব, ইহা কি বুদ্ধিগত না স্বভাবজ?

মান—এবিষয়ের জবাব দেওয়া মুস্কিল। যদি লতা হতে পার্ত্তেম এবং সে জ্ঞান লয়ে আবার মানুষ হতেম, তাহলে বল্‌তে পার্‌তম।

সরোজিনী—ঠেকিলেই তোমার কুতর্ক! আচ্ছা শিশু যখন খিদে পেলে কাঁদে, তখন তার ওরূপ কান্না কি স্বাভাবিক নয়?

মান—না, আমার তা মনে হয় না, শিশুর প্রথম কান্না স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু যখন কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাঁদে, তখন স্বাভাবিক আত্মরক্ষার ভাব থেকে নয়। উহা বুদ্ধিগত, কিন্তু সে বুদ্ধির কার্য্য এত অস্পষ্ট যে শিশুর তাহা মনে থাকে না।

সরোজিনী—তুমি উপরে যে জন্তুর দৃষ্টান্তটি দেখালে, তাহা বুদ্ধির কার্য্য মানিয়া লইলেও ডার্ব্বিনের মতের কি কোন দোষ হয়?

মান—হাঁ উহা মানিয়া লইলে বুদ্ধির কারণের কারণ আদিকারণ অনুসন্ধান কর্ত্তে হয়, এরূপ কর্ত্তে কর্ত্তে জ্ঞানময় ঈশ্বরের সত্তা না মানিয়া থাকা যায় না। এ বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা আছে, পরে সুবিধা মতে তোমায় বুঝাব।

প্রভাতী।

নবম পরিচ্ছেদ।

এক দিন রজনী দ্বিপ্রহরে প্রভাতী বৃদ্ধা ঝিকে ডাকিয়া কহিল "তুই আমাকে মার মত মানুষ করিয়াছিস্। আজ আমি তোকে সুনীল ও বিভাতীকে দিয়া গেলাম, যদি কখনও ফিরিয়া আসি, তবে আমাকে ফিরাইয়া দিস, নচেৎ তুই ইহাদের মায়ের কাজ করিস!"

মুমূর্ষু উষায় নলিনী-দলগত শিশির-বিন্দু যেমন রবিতাপে শুখাইয়া যায়, তেমনি প্রভাতী প্রখর জ্ঞানে ও কঠোর প্রতিজ্ঞার দ্বারা উথলিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইল। বৃদ্ধা প্রভাতীর পবিত্র মনোভাব এবং জলন্ত প্রতিজ্ঞার কথা পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিল, অতএব বিনা বাক্যব্যয়ে বসিয়া অজস্র অশ্রুজলে বালক বালিকার মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল। প্রভাতী স্বামীকে শয্যা হইতে উঠাইয়া কহিল "তুমি নদী-তীরে গিয়া আমার অপেক্ষা কর, আমি আসি।" এই বলিয়া সে মধুমতীর নিকট গেল। প্রভাতীর মতানুসারে মধুমতী ফটকের দরজা রাত্রি দুপ্রহর পর্য্যন্ত মুক্ত রাখিয়াছিল। প্রভাতী একবারে মধুমতীর

শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত। মধুমতী শয্যার উপরে ছট্‌ ফট্‌ করিতেছিল। প্রভাতীকে দেখিয়া উঠিল। প্রভাতী কহিল আমার সঙ্গে আইস। মধুমতী প্রভাতীর সঙ্গে সঙ্গে ফটকের দরজা পার হইয়া চলিল এবং ক্ষণকাল পরে কহিল "পোড়ামুখী! তুই কোথায় যাইতেছিস্।"

প্রভাতী—"চুপ কর্‌। আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়।" কতক্ষণ চলিয়া ম দেখিল প্রভাতী নদীর তীরাভিমুখে যাইতেছে। তখন সে কহিল "প্রভাতী! দেখ আমি আর চলিতে পারি না। আমার পা আর উঠিতেছে না। আমি কখনও ফটকের বাহির হই নাই। তুই বল্‌ তুই আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছিস?" প্রভাতীর মনোভাব মধুমতী পূর্ব্বেই অনেকটা বুঝিয়াছিল। সে চিরকাল ঈশ্বরের নিকট নির্দ্দোষ থাকিয়া অতি পবিত্র ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এই তাহার ইচ্ছা। দোষের কাজ অন্যায় কাজ সে কখনও করিবে না এই তাহার অনন্ত প্রতিজ্ঞা। সে অনিলকে ভালবাসে একথা সত্য, কিন্তু ভালবাসা একটা দোষের কাজ বলিয়া সে মনে করে না। পাইবার আশা এবং পাইতে চেষ্টা করাই দোষের কাজ বলিয়া মনে করে। অতএব সে প্রভাতীর সঙ্গে আজ যাইতে ভয় পাইতেছে। সে অনিলকে ভালবাসে। এ ভালবাসা নদীর সাগরের প্রতি ভালবাসার মত নয়; কুসুম যেমন নক্ষত্রকে ভালবাসে, তদ্রূপ সে অনিলকে ভালবাসে। সে অনিলকে ভালবাসিয়াই সুখী, অনিলকে দেখিয়াই সুখী, অনিলের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই সুখী এবং অনিল যে দেশে যে রাজ্যে থাকে, সে সেই দেশে সেই রাজ্যে থাকিয়াই সুখী। সে ভাবে প্রভাতী এক রকম তপস্যা করিয়াছিল, আমি অন্য রকম তপস্যা করিয়াছি। প্রভাতী অনিলের পাদস্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়, আমি অনিলের চরণ চিন্তা করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করি।

প্রভাতী মধুমতীর হৃদয়ের হৃদয়, মধুমতী হৃদয়কে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না। প্রভাতীর নিকট হইতে সে প্রভাতীর হৃদয়-রত্নকে কাড়িয়া লইতে চাহে না। তবে কিনা সে প্রভাতীর স্বামীকে ভালবাসে, সে কথা সত্য। কিন্তু সে ভাবে সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণকে কে না ভালবাসে? দেবতাকে কে না পূজা করে? অনিলও দেবতা, তাঁহাকে কি প্রভাতী একা পূজা করিবে? মধুমতী ত নিষ্কাম হইয়া দেবতা পূজা করিতেছে মাত্র, তাহাতে আবার দোষ কি?

কিন্তু ইহা সত্বেও মধুমতী প্রভাতীর স্বামীকে ভালবাসিয়া অপরাধী, মধুমতী ঈশ্বরের নিকট—জগতের নিকট—প্রভাতীর নিকট অপরাধীর ন্যায় ভয়ে ভয়ে থাকে।

মধুমতী অনিলকে মনে মনে ভালবাসে, কিন্তু প্রকাশ্যে সে সে ভালবাসার কোনও পরিচয় দেয় না। এক দিন সে একটি

মাত্র অন্যায় কাজ করিয়াছিল। সে এক দিন অনিলের একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আঁকিয়া হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন সে দেখিল প্রভাতীর স্বামীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ও, হৃদয়ে ধরিয়া দারুণ অন্যায় কাজ করিয়াছে ও যখন সে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল বিচারপতি ভগবান্ লোহিতলোচনে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন, তখন সে পাপ-ভয়ে ভীত হইয়া প্রভাতীর স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি প্রভাতীর নিকট ফিরাইয়া দিয়াছিল। তাহার চিরজীবন এইভাবে কাটিয়া যাইবে, এই তাহার মনের বিশ্বাস। কিন্তু আজ প্রভাতী আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার হৃদয়-রত্ন তাহাকে দান করিতে যাইতেছে। মধুমতী ভাবিল, প্রভাতী নর-জগতের দেবতা। সে আপনার হৃদয়রত্ন আমাকে দান করিতেছে, আর আমি তাহাতে সুখী হইতেছি, কি অসম্ভব। প্রভাতী কমলাসনা লক্ষ্মী, আমি তাহার চরণস্থিত পদ্ম দলের কীটাণুকীট বিশেষ। কিন্তু আমি তাহা কিছুতেই হইতে দিব না। এই ভাবিয়া মধুমতী প্রভাতীকে কহিল "তুই আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছিস্? আমি যাইব না, কিছুতেই যাইব না।" "চুপ কর, গোল করিও না। আমি তোমাকে বিবাহ দিবার জন্য লইয়া যাইতেছি।" মধুমতী মনকে যতই ঠিক্ করুক না কেন, মানব-প্রকৃতি তাহাকে এখনও ছাড়ে নাই, বিবাহের কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত শরীর যুগপৎ হর্ষোল্লাসে শিহরিয়া উঠিল, সেখানে, তাহার অনিচ্ছা হইতে ইচ্ছার প্রাধান্যই বেশী হইয়া উঠিল। প্রথম বিবাহের কথা শুনিয়া কোন্ নবযুবতীর হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার না হয়! ভয় দুঃখও যে তাহার মনে উদয় হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু প্রবল সুখাতিশয্যে মনের সে ভাবগুলি ম্রিয়মাণ হইয়াছে। সে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রভাতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মকরন্দ গন্ধ পরিপূর্ণ চপল মধুকর-সমন্বিত সরোজসমূহে অলঙ্কৃত একটী সরোবরের বিস্তীর্ণ তটভূমি অতিক্রম করিয়া অতি প্রত্যূষে মধুমতীর হাত ধরিয়া প্রভাতী এবং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনিল অতি দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে সকলেই নীরব, সকলের মুখেই গভীর বিষাদ রেখা অঙ্কিত। তাহাদের কাহারও মধ্যে যেন আপনার বল নাই। কোনও দেববলে যেন তাহারা চালিত হইতেছে।

এইরূপ অনেক পথ চলিয়া তাহারা এক বৃহৎ প্রান্তরে গিয়া উপনীত হইল এবং সেই প্রান্তরে অনেকক্ষণ হাঁটিয়া একটী নিবিড় বনের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই বনের গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে এক অত্যুচ্চকায় ধবল গিরি দণ্ডায়মান ছিল। সেই পর্ব্বতের নিকট পঁহুছিতে তাহাদের ঠিক্ মধ্যাহ্ন সময় অতীত হইল। মধ্যাহ্নকালে সেই বনের

শোভা অতি রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গভীর বনস্থলী যেন আকুল কেশপাশ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রখর সূর্য্য-কিরণে অভিতপ্ত হইয়া নাসিকা-ধ্বনি করিতে করিতে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিতা। সেই উচ্চ গিরিবরের নিম্নদেশ পরিবেষ্টন করিয়া ফুলভারে নতাঙ্গী ফুলতরু স্তরে স্তরে নিচয় শোভা পাইতেছে। বনের চারিদিকে কাঠঠোকরার একঘেয়ে আওয়াজ ও নানাবিধ পক্ষীর সুকণ্ঠের সহিত কালো কোকিলের মধুর ঝংকার উত্থিত হইতেছে, কোনওদিকে জন মানবের সমাগম নাই। তাহারা কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া অনন্যমনে অতি দ্রুতপদে সেই উচ্চ পর্ব্বতারোহণে ব্যস্ত হইল।

কিন্তু তাহারা পর্ব্বত পথ চলিতে চির অনভ্যস্ত, অতএব পর্ব্বতের উপর পঁহুছিতে তাহাদের ৫।৬ ঘণ্টা লাগিল। যখন তাহারা পর্ব্বতের উপরিভাগে গিয়া পঁহুছিল, তখন বৈশাখের নীল সন্ধ্যা পর্য্যুষিত পুষ্পমাল্য হৃদয় হইতে অপনীত করিয়া মনোহর নবফুলে দেহ সজ্জিত করিতে করিতে সমস্ত জগৎকে কোলে করিয়া বসিল। পর্ব্বতের অধিত্যকা অতি সুন্দর—অতি পবিত্র। সে স্থল হইতে নিম্নদেশে নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষে শোভিত প্রমোদিত বিহঙ্গকুলের নিনাদ দ্বারা আকুলিত স্থাণুময় শৈলের রাশি বিস্তারিত। শিলাতল হইতে উন্নত গিরিশৃঙ্গ সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। চারিদিকে অত্যুৎকৃষ্ট হেম কান্তিবিশিষ্ট পুষ্পবর্ষী চম্পক-বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। পর্ব্বতের উপরে বহুদূর পর্য্যন্ত সমতল ভূমি, তাহার এক পাশে একটী ক্ষুদ্র স্বর্ণ মন্দিরে একখানি ক্ষুদ্র ভগবতী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছে, তাহার নাম "বরালিকা"। মন্দিরের অতি নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে সুন্দর কুসুমারণ্য ফুলভার মস্তকে বহন করিতেছে। সম্মুখ দিয়া সজ্জনের মোক্ষের প্রতিভূস্বরূপা গঙ্গা নদী বিশুদ্ধ বায়ুহিল্লোলে কুল কুল করিয়া বহিতেছে। পিয়াল তরু মঞ্জরীর পরাগ-কণায় শোভান্বিত হইয়া মধুকর সকল চারিদিকে নৃত্য করিতেছে।

ক্ষুদ্র তৃণ যেমন নদীর স্রোতে অনিবার গতিতে ছুটিয়া যায়, কোনও প্রতিবন্ধক পাইলেই হঠাৎ দণ্ডায়মান হয়; সেইরূপ প্রভাতী, অনিল ও মধুমতী মানবত্রয় চিন্তার স্রোতে অবিরাম গতিতে ছুটিতে ছুটিতে গন্তব্য পথের প্রান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

এক দরিদ্র কতকগুলি বিদেশী লোক অনিলকে বিনা অপরাধে চোর অপবাদ দিয়া আদালতে উপস্থিত করে এবং কোন সাক্ষি-বল না থাকায় অনিলের কারাদণ্ডের হুকুম হয়। কারাগারে গিয়া অনিল একজন সাধু বৃদ্ধ সন্ন্যাসী-বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনিল তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার সহিত কারাগার হইতে পলায়ন করে ও এই পর্ব্বতোপরি নির্জ্জন স্থানে আসিয়া

বাস করে। এখানে সন্ন্যাসীর দীক্ষা-গুরু বাস করিতেন। তিনি অনিলকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তৎকালে প্রভাতীর রূপে অনিলের মন মুগ্ধ ছিল, সে সন্ন্যাসীর কথা অমান্য করিয়া সংসার ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিল।

এই মনোরম পর্ব্বতোপরি অনিল প্রভাতীকে লইয়া আরও কতবার আসিয়াছিল। আজ আবার ঘটনা চক্রে পতিত হইয়া আপনার অজ্ঞাতসারে অনিল প্রভাতীর সঙ্গে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বর্ণ মন্দিরের সম্মুখস্থ গঙ্গাতীরস্থ এক উচ্চ ভূমিতে প্রকাণ্ড একখণ্ড কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সায়ংকালীন ধ্যানে নিমগ্ন। মন্দ বায়ুভরে মৃদুকম্পিত ললিত পল্লব-শোভিত নব মাধবী লতার ন্যায় প্রভাতী প্রবালোপম অভিনব কর-পল্লব উত্তোলন করিয়া সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহাপুরুষকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং অনিল ও মধুমতীর অগ্রবর্ত্তী হইয়া উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় তৎসমক্ষে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

তপ্তকাঞ্চন তুল্য সুন্দর-কান্তি মহা-পুরুষকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেস্থলে সেই কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড প্রস্ফুরিত তড়িৎ-সমন্বিত শরৎকালের জলদ খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। চারিদিকে জল-প্রপাতের মধুরধ্বনি, সম্মুখে "বরালিকার" সুপবিত্র স্বর্ণশরীর, ও ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গার প্রাণভরা প্রেমসঙ্গীত।

এই সব পবিত্র শোভা অবলোকন করিয়া প্রভাতীর মানব প্রবৃত্তি সকল যেন একে একে দেবত্বে পরিণত হইতে লাগিল।

সেই অতি উচ্চ ও নির্জ্জনস্থানে আসিয়া প্রভাতী আপনার উপস্থিত সুখ দুঃখ সকলি ভুলিয়া গেল ও জগতের নিকট আপনাকে অতি ক্ষুদ্র দেখিতে লাগিল। তৎকালে অনিল ও মধুমতী নীরব-নিস্পন্দভাবে বিষয়ান্তর-জ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। দুঃখ, সুখ, প্রেম, প্রণয়, পবিত্র, অপবিত্র, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তৎকালে তাহাদের মনে কোনও রকম ভাবের উদয় হইতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া তাহাদিগকে আপনার নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহাদিগের শুষ্ক মুখ এবং ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহাপুরুষ তাহাদিগের মনের ভাব সকলি বুঝিয়া লইলেন। ক্রমশঃ।

চতুরে চতুরে।

লাওয়ারেশের অর্থাৎ যাহার উত্তরাধিকারী নাই,তাহার সম্পত্তি রাজসরকারে যায়, ইহা প্রায় সর্ব্বদেশের রাজবিধি। হিন্দুরাজত্বেও এই নিয়ম ছিল। দিল্লীতে মোগল বাদসাহের রাজত্বকালেও এই প্রথার অতি বিচিত্র বিকট প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবিধি অনুসারে শুদ্ধ লাওয়ারেশের সম্পত্তি নহে—বাদসাহের বেতনভুক্ লোকমাত্র মরিলেই তাহার তাবৎ সম্পত্তি অবিলম্বে রাজ-সরকারে জমা হইত এবং বাদসাহ স্বয়ং তাহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতেন। এক মুহূর্ত্তে ধনীর বিধবাগণ, পুত্রকন্যাগণ এবং পরিবারবৃন্দ পথের ভিখারী হইত। কাল যে লক্ষপতির ভার্য্যা বা সন্তান ছিল, আজ তাহাকে সামান্য উদরান্নের জন্য রাজপ্রসাদ-প্রার্থী হইতে হইত। বাদসাহ অনুগ্রহ করিয়া যদি কিছু মাসহারা দিতেন, তাহা হইলেই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, নচেৎ কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিত না। অনেক সময় এই কুপ্রথা হেতু আমীর ওমরাহের পুত্রকেও সামান্য সৈনিকের কার্য্য করিতে হইত।

অবশ্য সকল বাদসাহ এরূপ অর্থলোলুপ ছিলেন না; নানা দোষ সত্ত্বেও আরংজেব এ প্রথার বিরোধী ছিলেন—এ প্রথাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পিতা সাহজাহান এ বিষয়ে বড় লোভী ছিলেন—তাঁহার দারুণ অর্থতৃষ্ণাহেতু কত লোক যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

এইরূপ সম্পত্তি গ্রহণ সম্বন্ধে লোভী সুচতুর সাহজাহানের সহিত দুই ব্যক্তির চতুরতার কথা বর্ণিয়ার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই বলিব।

দিল্লীর রাজসভায় নেকনাম খাঁ এক বিখ্যাত ওমরাহ। তিনি বাদসাহ সরকারে ৪০।৫০ বৎসর নানাপ্রকার সম্ভ্রান্ত কাজ করিয়া প্রভূত সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। নেকনাম খাঁ সাহজাহানের পরস্ব-লোলুপতা বড় ঘৃণা করিতেন। যখন নেকনাম সাংঘাতিক পীড়ায় অবসন্ন—তাঁহার শেষ অবস্থা উপস্থিত, তখন তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গোপনে নিজের সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র স্ত্রীলোক ও সেনানীগণ মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। তার পর সিন্দুক ও পেঁটরাগুলি পুরাতন লৌহখণ্ড, অস্থি, ছিন্ন বিনামা, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে পূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে তালা বন্ধ করিয়া মোহর আঁটিয়া দিলেন। মরিবার সময় বলিয়া গেলেন—"সম্রাট্ সাহজাহানের জন্য এই সব রহিল।"

নেকনাম খাঁর মৃত্যু হইলে সিন্দুকগুলি প্রকাশ্য সভায় নীত হইল। সাহজাহানের

হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। তখনই সভাস্থলে সিন্দুকগুলি খুলিবার আদেশ দিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে চক্ষু স্থির। ঘৃণা, লজ্জা ও ক্রোধে অবিলম্বে রাজসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল "উপযুক্ত হইয়াছে।"

আর একটী ঘটনা এই। এক ধনী হিন্দু বণিক কুসীদ ব্যবহারে অনেক অর্থ সঞ্চয় করেন, তদ্ব্যতীত সে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে রাজকার্য্যেও নিযুক্ত হইতেন, তাহাতেও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। মৃত্যুকালে বণিক্ অনেক অর্থ রাখিয়া যান, —প্রায় দুই লক্ষ টাকা। বণিকের একমাত্র পুত্র ছিল, পুত্র অসচ্চরিত্র। পিতার মৃত্যুর পর সে অর্থের জন্য মাতার সহিত অনেক বিবাদ করিল; কিন্তু সম্পত্তির ভাগ কিছুই পাইল না; বুদ্ধিমান্ বণিক তাহার স্ত্রীকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে যুবক বিফলমনোরথ হইয়া একযুক্তি অবলম্বন করিল। সে যাইয়া সম্রাট্-সমীপে নিবেদন করিল যে, তাহার পিতা মধ্যে মধ্যে রাজ-সরকারে কার্য্য করিতেন, এবং মৃত্যুকালে প্রায় দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্ত বৃদ্ধা মাতার হস্তগত।

সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র সাহজাহান বৃদ্ধাকে প্রকাশ্য রাজসভায় আনাইয়া অনুমতি প্রচার করিলেন যে, মৃত বণিকের সম্পত্তি হইতে এক লক্ষ মুদ্রা অবিলম্বে রাজ-ভাণ্ডারে আসিবে, পঞ্চাশ সহস্র তাহার পুত্র পাইবে, আর অবশিষ্ট বৃদ্ধার থাকিবে। আদেশ প্রচার করিয়াই রক্ষীদিগকে আদেশ করিলেন—"বুড়ীকে জোর করিয়া রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দাও।"

বৃদ্ধা বাদসাহের এ নিদারুণ অনুমতি ও পরুষ ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইল। মনে মনে করিল—"আমিত গিয়াছি, এখন যাহা বলিবার তাহা বলিয়া লই, না হয় প্রাণদণ্ড হইবে।" রক্ষিগণ তাহাকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিতেছিল। বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে, বাদসাহ-সমীপে তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার আরও কিছু গোপনীয় সংবাদ দিবার ইচ্ছা আছে। শুনিয়া সাহজাহান কহিলেন "তবে কি শুনিবার আছে, শুনা যাউক।"

বৃদ্ধা সবিনয়ে বলিল "হজরৎ সেলামৎ! জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন্। আপনি অতি সুবিচার করিয়াছেন। আমার পুত্র বিষয়ের উত্তরাধিকারী, সে যে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা পাইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত; আর আমি মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, আমাকে দয়া করিয়া যাহা দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু একটী বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইবে। আমার মৃত স্বামীর সহিত জাঁহাপনার কিরূপ শোণিত-সম্বন্ধ, যেহেতু রাজ-সরকারে এক লক্ষ টাকা আসিবে, তাহা আমি অবগত নহি; কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।"

বাদসাহ বৃদ্ধার শ্লেষোক্তি বুঝিলেন;

বুঝিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখনি পুনরাদেশ করিলেন—"তোমার সম্পত্তি তোমার রহিল, আমি কিছুই লইব না, এখন তোমার পুত্র কিছুই পাইবে না, আমার পূর্ব্বাদেশ রহিত করিলাম।"

বৃদ্ধা সানন্দে গৃহে ফিরিয়া গেল, দুর্বৃত্ত যুবকের যে ক্ষোভের সীমা রহিল না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

জননী দেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, আমার পরম পূজনীয়া স্নেহময়ী জননী উক্ত অতীত বৎসরের অতীত মাঘের শেষে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ও ইহলোকের শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতধামে অমৃতধামবাসিনী দেবীবৃন্দের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন। তিনি এই গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার চিরবিরহে আমাদের এই সুখের সংসার বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন, ভগ্ন ও শূন্য ও তাঁহা বিহনে আজ আমরা অনাথ। মা আমার ইহজগতে দেবীপ্রকৃতিতে বিরাজ করিতেন। তাঁর সতীত্ব, পাতিব্রত্য, অনিন্দিত প্রেমপ্রতিভা, পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, দীনে দয়া, সরলতা, সুবিবেচনা, লজ্জাশীলতা, সন্তান-বাৎসল্য ও ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণসমূহ তাঁহাকে দেবীরূপে সাজাইয়া ইহলোকেই সেই স্বর্গরাজ্যের উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিল। তিনি ধন্যা, তাঁহার গর্ভে আমরা সঞ্জাত হইয়া আমরাও ধন্য হইয়াছি। মা আমাদের সতীকুল-গৌরব। বিশ্বজননী তাঁহার সরল প্রাণে কি এক মধুরতা-পূর্ণ ভাবের সমাবেশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই পবিত্র প্রেমানন সন্দর্শন করিলে আমার মন প্রাণ আনন্দসিক্ত হইয়া উঠিত। মার আমার সেই পবিত্র সুকোমল মূর্ত্তিখানি আজও সমভাবে এ দীনের প্রাণে জাগিতেছে। পুণ্যবতী জননী যখন সেই বিশ্বারাধ্য বিশ্বপিতার ধ্যানধারণায় চিত্তকে সমাহিত করিতেন, তখন তাঁহার সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি কি অপূর্ব্ব পবিত্র ও শান্তভাব ধারণ করিত! সতী-জীবনের প্রভা ও মাধুর্য্য তাঁহার সরল প্রাণে সুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছিল। সাধ্বী পতিব্রতাদিগের হৃদয়োদ্যানে সদ্গুণ-কুসুম-কলিকা যেমন স্বর্গীয় সৌরভে ভরিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, মার আমার প্রাণে সেই সকল অম্লান কুসুম-কলিকা প্রস্ফুটিত থাকিত। তিনি পবিত্রহৃদয়া, সদাচারবতী ও সকলের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। পরসেবা তাঁহার জীবনের

প্রিয় নিত্য ব্রত ছিল। তিনি তাঁহার সমবয়স্কা পুরস্ত্রীদিগকে তাঁর পবিত্র জীবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগকে সত্যের পথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেন ও তাঁহাদের সুকোমল নারী-জীবনে পুণ্যের বিমল সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত দেখিতে ভালবাসিতেন। সতী-জীবনের যে একটী প্রধান ভূষণ পবিত্রতা, মা আমার সেই পবিত্রতার জীবন্ত মূর্ত্তি ছিলেন ও সদা স্বচ্ছ থাকিতেন। নরজগতের শোকতাপ যে স্থানকে স্পর্শ করিতে পারে না, যেখানে বিমল আনন্দের উৎস সদা উৎসারিত হইতেছে, প্রেম ভক্তির স্রোত যেখানে নিয়ত প্রবাহিত এবং যেখানে ভগবদ্‌ভক্ত দেবদেবীবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া সেই আনন্দময় অমৃতময় দেবতার আরাধনা করিতেছেন, যেখানে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া পরলোকবাসী প্রেমিকগণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-তরঙ্গে ভাসিতেছেন, সেই অমর লোকে অমৃতময়ী বিশ্বজননীর ক্রোড়ে, যে ক্রোড় সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতি, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্য নারীগণের চির অধিকৃত, সেই পবিত্র প্রেম-ক্রোড়ে আমার পুণ্যবতী স্বর্গীয়া জননী বিরাজ করিতেছেন—ইহা স্মরণে মাতৃ বিয়োগ-জনিত অনাথ সন্তানের অবসন্ন প্রাণ উত্তেজিত ও পরিতৃপ্ত হয়। আহা! মার আমার সেই আনন্দভরা প্রেম-প্রতিমা যদি এ ভগ্ন গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে এ দীন সন্তান তাঁর পবিত্র জীবনের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া ও তাঁর সেই প্রেমপূর্ণ শান্ত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া এ ভগ্ন ও রুগ্ন প্রাণে কত শান্তি প্রাপ্ত হইত! কিন্তু আবার মনে হয় মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী তাঁর কোন নিগূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহজগতের নানা বিপদ্ আপদ্ হইতে মুক্ত করিয়া ভালই করিয়াছেন। মার আমার স্বর্গারোহণের পর হইতে এ সংসারে কত শোক দুঃখের ঝড় বহিয়া গেল, মার সেই কোমল প্রাণে এ সকল দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করিতে হইল না, ইহাতেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, কত চলিয়া গেল—ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মার সেই প্রেমভরা মুখখানি আরত দেখিতে পাইতেছি না, তাঁর সেই হৃদয়-ভরা স্নেহ আরত উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। এ জগতে সে প্রেম সম্ভোগের আশা এককালে ফুরাইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ হইতে আমরা বঞ্চিত নহি। মাতঃ! আমরা আপনার সেই আদরের পুত্র কন্যাগুলি—যাহাদিগের লালনপালনোদ্দেশে কত ত্যাগস্বীকার ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, যাহাদিগের মঙ্গলকামনায় অসহনীয় রোগ যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করিয়া মধুর মাতৃ-প্রেমের মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন, আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদে ও করুণারূপিণী বিশ্বজননীর অপার করুণায় কত দুর্ঘটনা অতিক্রম করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। মা! তুমি যেমন আমাদিগকে তোমার

সুকোমল বাৎসল্য প্রেমের শীতল ছায়ায় রক্ষা করিয়া আমাদিগের সকল সন্তাপ বিদূরিত করিতে, সেইরূপ প্রেমময়ী বিশ্বমাতা তাঁহার অহেতুক প্রেমে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। জননি! প্রেমময়ী জগন্মাতার অতুল স্নেহপ্রভাবে আজও আপনার এ দীন সন্তানের রুগ্ন জীবনটুকু সঞ্জীবিত রহিয়াছে। মাতঃ! অগ্রে আপনাকে স্নেহময়ী জননী বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, আপনি শুদ্ধ মায়াময়ী মা ছিলেন না, আপনি আমার দেবীরূপিণী জননী। স্বর্গীয় সাধুভাবে আপনি বিভূষিতা ছিলেন, আমরা দেবীর সন্তান, দেবীর গর্ভে আমাদের জন্ম, দেবীর পবিত্র শোণিতে আমাদের জীবন গঠিত ও দেবীর স্নেহে আমরা পালিত, তবে কেন না আমরা সেই দেবভাব লাভ করিব ও সেই দেব-ভূষণে বিভূষিত হইব? মাতঃ! আপনি এই গৃহের গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। আপনি বিশ্বজননীর অনন্ত প্রেমের বিন্দুমাত্র প্রতিকৃতি। আপনার সেই সুধামাখা শান্তিপ্রদ বিমল মূর্ত্তি কখনও ভুলিতে পারিব না। আপনার সেই অমৃতময় কোমল করস্পর্শ, যাহা দ্বারা এ দীন সন্তানের সকল সন্তাপ বিদূরিত হইত, সেই প্রেমহস্ত দুখানিও ভুলিতে পারিব না। আর মা, আপনার সেই সুন্দর পবিত্র চরণ দুখানি—যাহা স্মরণ করিয়া আমার মন প্রাণ শীতল হয়, তাহাও চির দিন এ প্রাণে আঁকিয়া রাখিব। আহা! মাতৃচরণ-ধূলি ভক্তির সহিত গ্রহণ করিলে সন্তানের প্রাণ পবিত্র হয় ও জননীর পবিত্র জীবনাদর্শে জীবন গঠিত হইলে মানব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। জননি! আপনার প্রেমের ঋণ অপরি-শোধনীয়। মাতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন এ দীন সন্তান আপনার উপযুক্ত সন্তান হইয়া আপনার পবিত্র জীবনের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হয় ও যত দিন সন্তান জীবিত থাকিবে, যেন সেই প্রেমময়ী পরম মাতার চরণে মতি ভক্তি রাখিয়া তাঁহাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁর পূজায় ও তাঁর সেবায় রত থাকিতে পারে।

মা জগজ্জননি! আমার স্নেহময়ী মাকে ইহলোক হইতে লইয়া গিয়াছ, তবে তুমি মা! আমার মা হ'য়ে নিকটে থাক। মাকে ডাকিলে মা কাছে আসেন, মার কাছে কাঁদিলে মা কোলে তুলে আদর করেন, রোগে শোকে পড়িলে মা বুকে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া মধুর বচনে সান্ত্বনা দেন। সেইরূপ মা বিশ্বজননী তুমিও সেই মায়ের মত হইয়া কাছে কাছে থাক, যখন মাতৃবিরহে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে, তখন তুমি তোমার সেই সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী প্রেমমূর্ত্তি দেখাইয়া তোমার সেই সুকোমল পদ্মহস্ত দ্বারা আমার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া তোমার শান্তি-ক্রোড়ে তুলিয়া লও এবং আমার সকল সন্তাপ বিদূরিত কর। মা! এ সংসারে নানা বিপদ আপদ রহিয়াছে,

যখন দুঃখ, যন্ত্রণা, প্রলোভন পরীক্ষা আসিবে, তখন দয়া করিয়া তোমার চরণাশ্রয়ে রাখিও, ও তোমার সেই প্রেমপূর্ণ মধুর বচন দ্বারা সান্ত্বনা দিও। জগজ্জননি! তুমি মাতৃহীনের জননী, তুমিই এ দীনের চির-নির্ভর, চির-ভরসা। অগ্রে যদি জানিতাম যে, আমার ইহ-জগতের জননী তাঁহার অভাব মোচনের নিমিত্ত তাঁর পরিবর্ত্তে এক অনন্ত স্নেহ-রূপিণী মাতৃসত্তা আমার সমক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে, সেই মাতৃবিয়োগ-কালে—দুদিনের মাতৃবিরহে আকুল প্রাণ হইয়া এত কাঁদিতাম না। বিশ্বজননি! তোমার অপার কৃপায় অনাথ সন্তানকে বুঝিতে দিয়াছ যে, যদিও কালকরভগ্ন ক্ষুদ্র মাতৃক্রোড় ও মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, কিন্তু মা তুমি তোমার অনন্ত প্রেমের ক্রোড় সকল সময় আমাদের জন্য পাতিয়া রাখিয়াছ। মা বিশ্বজননি! আমাদের পার্থিব জননীর আমরা চারিটী সন্তান, যেন চির দিন তোমার প্রেমে মগ্ন হয়ে তোমার স্নেহের ক্রোড়ে বসিয়া তোমার প্রেমাননের প্রতি তাকাইয়া থাকিতে পারি এবং ভক্তিভরে তোমাকে মা মা বলিয়া ডাকিতে ও তোমার সেই প্রেমসুধা পান করিয়া নবজীবন লাভ করিতে পারি। বিশ্বমাতঃ! আমার সেই স্নেহময়ী মাকে তুমি তোমার স্নেহের ক্রোড়ে বসাইয়া অনন্তকাল অক্ষয় আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ করিয়া রাখিও এবং দিন দিন তাঁর সেই পবিত্র আত্মাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিও, কাঙ্গালের এই একমাত্র প্রার্থনা।

মা! বহু দিন হল আজ গিয়াছ চলিয়া এ
প্রবাস ছাড়ি,
আনন্দে আনন্দময়ীর আনন্দ ভবনে।
জগতের মা তোমায় নিয়েছেন ডেকে
প্রসারি স্নেহের ক্রোড়,
কেন মা থাকিবে হেথা?
স্বরগের দেবী তুমি গিয়াছ স্বরগে।
আনন্দের ধ্যানে সদা থাক মা আনন্দে সেথা।
আনন্দে পূজ মা নিত্য আনন্দময়ীরে,
আনন্দে রাখুন তোমা আনন্দরূপিণী।
চিরানন্দ সুধাপানে হয়ে পুলকিত
অনন্ত উন্নতি-পথে উঠ মা সতত,
তোমার আদর্শে করি জীবন গঠিত
মুক্তির সোপানে যেন উঠি অবিরত।
তব শুভাশীষ-বলে যেন মাগো অবহেলে
সংসার-সাগর হতে হই মা উদ্ধার।
চিরভক্তি চির প্রীতি থাকে যেন তোমা
প্রতি,
চির সুখ চির শান্তি দেও দগধ পরাণে।

* স্বর্গীয়া দাক্ষায়ণী ঘোষ বারুইপুরের নিকটস্থ কোনও পল্লীগ্রামের এক ধনীর একমাত্র কন্যা ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক ঈশ্বরনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য, অলৌকিক পাতিব্রত্য ও স্বামি-হিতৈষণা, সরলতা, সহৃদয়তা পরার্থপরতা ও পরসেবার অনেক দৃষ্টান্ত অনেক সময় দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার চিররুগ্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঈশ্বর ইহাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহাঁর জীবনে মাতৃজীবন হইতে যে দেবভাব আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হইয়া মাতৃ-স্মৃতি চির-জাগ্রত করিয়া রাখে। বা, বো, স।

গার্হস্থ্য বিষয়ে নর নারীর কর্ত্তব্য।

সন্তান পালন।

সন্তানদিগকে বাধ্য করিতে হইলে, স্নেহ, প্রীতি ও শাসন মিশ্রিত ব্যবহার করিতে হইবে। শুধু তিরস্কার করিলে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ভক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। শুধু ভয় করিয়া কার্য্য করিলে, তাহার কোনও সুফল ফলে না। অন্যায় করিবামাত্র রাগের উত্তেজনায় শিশুদিগকে শাস্তি দেওয়া অবিধেয়, কারণ তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান করিলে ফলদায়ক হয় না।

স্বেচ্ছাচারিতা শিশুদিগের প্রধান দোষ। মঙ্গলময় বিধাতা শিশুগণের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত কতকগুলি বৃত্তি প্রবল করিয়া দিয়াছেন। প্রায় অনেক সময়ে বালক বালিকাগণ কুর্দ্দন ও ধাবন করিবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হয়। স্বাস্থ্যবান্ হইবার নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহাদিগের ঐ সকল বৃত্তি এরূপ প্রবল করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ কোন অনিষ্টজনক কারণ না থাকিলে; তাহাদের ঐ সকল ইচ্ছাতে বাধা দিয়া, অসন্তুষ্ট করা নিতান্ত অন্যায়; কারণ ইহাতে তাহাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়। যখন কোন বালক হঠাৎ ভূমিতে পতিত হইয়া আহত হয়, তখন তাহার সন্তোষের নিমিত্ত ভূমিতে পদাঘাত বা প্রতিহিংসাজনিত অপর কোন প্রকার আচরণ না করিয়া, শিশুর অসাবধানতা এবং পতিত হইবার কারণ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। এতদ্দ্বারা তাহাদের সতর্কতা বৃদ্ধি হয় ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনার অভ্যাস হয়। আশৈশব যদি পিতা মাতা সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন, তবে তাহারা কোন কালে পিতামাতার অবাধ্য হইতে পারে না। যাঁহাদের কৃপায় আমরা সুন্দররূপে লালিত পালিত হইয়া ভাবী জীবন সুখে কর্ত্তনের উপযোগী গুণাবলী প্রাপ্ত হই, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া, নিয়ত আমাদের মঙ্গল বিধান করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল, তাঁহাদিগকে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পূজা করা সন্তানের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ বৃদ্ধকালে অনেকে কিছু উগ্রস্বভাবান্বিত হইয়া থাকেন। জনক জননীর বৃদ্ধাবস্থায় ঐ উগ্রস্বভাবের জন্য ও অনর্থক তিরস্কারের নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ সন্তানের বিরক্ত, বিচলিত বা বিষণ্ণ হওয়া অবিধেয়। যখন সন্তান জরাজীর্ণ পীড়িত জনক জননীর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া, দিবানিশি সর্ব্বপ্রকার কষ্ট যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া, আপনার সমস্ত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন করিয়া, কেবল প্রফুল্ল অন্তরে তাঁহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকেন, তখনকার ন্যায় স্বর্গীয় সুখকর দৃশ্য জগতে আর নাই।

পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, অনেক সময়ে জনক জননী অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু তজ্জন্য পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা ও অনাদর প্রকাশ করা কোন মতেই বিধেয় নয়।

অনেকে পিতামাতার প্রতি কিয়ৎপরিমাণে সদ্ব্যবহার করিয়াই মনে করেন যে, পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করা হইল। কিন্তু ইহা সকলের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সন্তান চিরকাল সাধ্যানুসারে পিতামাতার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তাঁহাদের সেবা এবং সন্তোষ সাধন করিলেও পিতা মাতার ঋণপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কথিত আছে একদা জনৈক ব্যক্তি মাতার শ্মশানের উপর স্বর্ণমন্দির তৈয়ার করিয়া বলিয়াছিলেন, "মাতঃ! আমি অদ্যাবধি তোমার ঋণ-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম।" এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্রই ঐ স্বর্ণমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফলতঃ সন্তান শতবর্ষ কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াও পিতা মাতার ঋণ-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তথাপি সাধ্যানুসারে জনক জননীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিয়াছি, এ বিষয় চিন্তা করিতে পারাও সৌভাগ্যের বিষয়। এ সংসারে কয়ব্যক্তি পিতামাতার মনে কোন প্রকার কষ্ট না দিয়া, সতত তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সাধ্যমত পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে যে শুধু আত্ম-প্রসাদ লাভ হয়, তাহা নয়, এতদ্দ্বারা পিতা মাতাও সুখী হন এবং আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম পালন করিয়া ধন্য হইতে পারি। যে শ্রদ্ধাভিষিক্ত ভক্তি-পরায়ণ সন্তান পিতামাতার প্রতি কোনরূপ অন্যায়াচরণ না করিয়া চিরদিন তাঁহাদের সুখ সাধনের জন্য মনঃপ্রাণের সহিত চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করিয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

অর্গলের রাণী।

(গত প্রকাশিতের পর)

বিস্মিত মুসলমান সৈন্য তাহাদের বিপরীত দিকে ক্ষুদ্র এক দল মনুষ্যকে প্রবল বাত্যাপ্রবাহের মত আসিতে দেখিল—তাহাদের মাথার উপর প্রবলবেগে ঘূর্ণিত শাণিতাস্ত্র বিদ্যুদ্দীপ্তির মত বোধ হইতেছিল। মুসলমানগণ তখন আরও বিচলিত হইল, উত্তোলিত অস্ত্র হস্তে মার্ মার্ শব্দে ধাবিত হইল। কিন্তু তখনও সেই সহস্র মুসলমান সৈন্যের গতিশব্দ, অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা ও উত্তেজিত

জয়ধ্বনির ভীষণ কোলাহল মধ্যেও আর একটী অধিকতর উত্তেজিত সমবেত জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছিল,—"রাণীজীকি জয়।" ●

তখন নিমেষমধ্যে রাণী দেখিতে পাইলেন, কয়েকটীমাত্র অস্ত্রধারী তরুণ যুবক সিংহবিক্রমে তাঁহারই উদ্ধারের জন্য শত্রুসেনা আক্রমণ করিয়াছেন। সেই নির্ভীক যুবকদের দৃঢ়হস্তচালিত তরবারীর আঘাতে বিভ্রান্ত শত্রুসৈন্য তখন মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে শত্রুবেষ্টিত অসহায়া রাণী 'মৃত্যুই একমাত্র পরিত্রাণের উপায় মনে করিতেছিলেন, সহসা আশার আলো দেখিতে পাইলেন। ক্ষণেকের জন্যে তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু তখন আর ভাবিবার অবসর ছিল না, ততক্ষণে অর্গলের রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীগণ দ্রুতগামী অশ্বে স্থাপিত হইয়াছেন, তাঁহাদের চারি দিকে তেজস্বী, অস্ত্রাঘাতনিপুণ হিন্দু যুবকদল অগণিত-শত্রুসেনা-প্রবাহ মধ্যে আপনাদের রক্তাক্ত তরবারীর সম্মুখে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই অপূর্ব্ব বীরত্ব ও সাহসিকতার অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্তনীয় ঘটনায় হিতাহিতবিমূঢ় বিশৃঙ্খল শত্রুসেনা সেই প্রবল বাত্যাতাড়িত অগ্নিরাশিতুল্য হিন্দু যোদ্ধাদলের ঘূর্ণিত অস্ত্রের সম্মুখে পড়িতেছিল ও মরিতেছিল। কিন্তু হইলে কি হইবে? তখনও উদ্ধারের আশা ছিল না। বীর হিন্দুদের বাহুতে বল ছিল, কিন্তু সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ বিপক্ষসেনা পার হইতে তাঁহাদের একবিন্দু জীবন্ত রক্ত অবশিষ্ট থাকিবে কি না সন্দেহ হইল,—তখন অগণিত হতাহত শত্রুসেনার সঙ্গে ক্রমে দুইটি চারিটি হিন্দুও সেই রক্তাক্ত ক্ষেত্রে প্রাণ আহুতি দিতেছিলেন। বিপক্ষের উন্মত্ত তরঙ্গায়িত সমুদ্র, তাহারি মধ্যে হিন্দু কয়জন? মুষ্টিমেয়। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় হিন্দুসন্তান আজ অর্গলরাজান্তঃপুরবাসিনীদিগকে নিরাপদ দেখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াই আসিয়াছেন। যতক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকিবেন, ততক্ষণ হস্তচালিত বিশ্বস্ত তরবারী দ্বারা উন্মত্ত শত্রুর বিস্তীর্ণ অস্ত্রকণ্টক মধ্যেও হিন্দুনারীর গৃহগমনের পথ প্রস্তুত রাখিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা।

দুইটি মহাপ্রাণ বীর যুবক এই উদ্ধারকারী দলের নেতা,—অভয় চাঁদ ও নির্ভয় চাঁদ। উভয়েই বৈশ্য রাজপুত-সন্তান, সেই স্মরণীয় দিনে, একই সময়ে গঙ্গাস্নানমানসে বল্লারঘাটে উপস্থিত। স্নানান্তে অভয় ও নির্ভয় যখন মুসলমান সৈন্যের অসম্ভব জনতা ও অস্ত্রসজ্জা দেখিলেন এবং অবিলম্বে জানিতে পারিলেন অর্গলের ভুবনমোহিনী যশস্বিনী রাণী শত্রুর বেষ্টিত জালে বিপন্ন, তখন তাঁহারা চক্ষুর নিমেষে সেই ভাগীরথীর পুণ্যতটে, নিরীহ স্নানার্থীদের মধ্য হইতেই কয়েকটি

পরিচিত সহৃদয় সমবয়স্ক বন্ধু একত্রিত করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক অসাধারণ অনুরাগ ও কর্ত্তব্যবোধে উদ্দীপিত হইয়া এই ক্ষণকাল পূর্ব্বের শিষ্টশান্ত যুবকেরা দুর্দ্দমনীয় যুদ্ধপিপাসায় উন্মত্ত হইলেন। দৈবও যেন তাঁহাদের সাধু প্রতিজ্ঞার সহায় হইল,—সুশাণিত তরবারীর অভাব হইল না, আরও দুইটি চারিটি দশটি অপরিচিত হিন্দুসন্তান তাঁহাদের অপরিচিত বীর বন্ধুদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই স্বদেশপ্রেমিক, অসমসাহসী যুবকদল যখন তাঁহাদের সমবেত উদ্যত শাণিতাস্ত্র দ্বারা সহসা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন, তখন অকস্মাৎ সেই অভাবনায় ঘটনায়, মুসলমান পক্ষকে প্রথমে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল দেখা গেল, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের বিশাল সেনার সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র একদল অস্ত্রধারীর হস্তে মুহূর্ত্ত-কালের মধ্যে শত শত সৈন্যবধ হইতেছে ও অর্গলের রাণীর সঙ্গে তাঁহারা অসম-সাহসে সম্মুখে আপনাদের পথ পরিষ্কার করিতেছে, তখন তাহাদের পূর্ব্ব ক্রোধ দ্বিগুণিত হইল, তাহারা দারুণ ক্রুদ্ধ শোণিতলোলুপ পশুর ন্যায় হিন্দুদলকে আক্রমণ করিল। অর্গলরাজান্তঃপুর-বাসিনীগণের চারিদিকে হিন্দু মুসলমানে যে হৃদয়ভেদী মনুষ্যহত্যা আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। মনুষ্যশোণিতে পথ ঘাট প্লাবিত হইল, জয়ধ্বনি ও আর্ত্তনাদ মিশ্রণে এক ভীষণশব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই অগণিত হতাহতের উপরে হিন্দুবীরদের ঘূর্ণিত তরবারী-বেষ্টনে রাজরাণী তখনও তীব্রবেগে আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। যুবকদের অমানুষিক সাহস, ধৈর্য্য ও একাগ্রতার গুণে কৃত-কার্য্যতা যেন সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।" কিন্তু হায়, এমনি সঙ্কটসময়ে বীরমণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ নির্ভয়চাঁদ শত্রু-অস্ত্রে মারাত্মক আঘাতে ক্ষণকাল পরেই রাণীর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিলেন। সহসা এই শোচনীয় ঘটনা হিন্দুযুবকদলের মর্ম্ম স্পর্শ করিল, কৃতজ্ঞ রাণী ও তাঁহার সহচরীদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের কঠিন কর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে সেই পরম হিতকারী বীর বন্ধুকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। তখন যুবকদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে একমাত্র অভয়চাঁদই অবশিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে দেখিতে কয়েকটি প্রাণাধিক বন্ধু অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হইলেন, ক্রমে তাঁহাদের জনবল কমিয়া আসিল। কিন্তু, তথাপি, অবশিষ্ট যুবকদলের অদমিত সাহস ও প্রতিজ্ঞার বল কিছুতেই কমিল না, তাঁহারা অসংখ্য-শত্রু-হস্তচালিত অস্ত্রের সম্মুখে আপনাদের হৃদয় পাতিয়া অর্গলের রাজান্তঃপুর-বাসিনীগণকে তখনও নিরাপদে গৃহা-ভিমুখে চালিত করিতে লাগিলেন।

সেই মুসলমান সৈন্য-সাগরের সঙ্গে

অর্গলের রাজরাণীর অদ্যকার এই অপূর্ব্ব রণাভিনয়ের সংবাদ দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণকালের মধ্যে বীর রাজা গৌতমের কর্ণেও এ সংবাদ পৌঁছিল। অর্গলের রাজমহিষী শত্রু-সেনা মধ্যে! সহসা তিনি বিস্মিত হইলেন! কিন্তু প্রকৃত কথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ বীর রাজা গৌতম অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অর্গল দুর্গ হইতে দলে দলে সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য শত্রুসেনার দিকে ধাবিত হইল।

অবিলম্বে বক্‌সার ও অর্গলের মধ্যবর্ত্তী-স্থানে রাজার সহিত শত্রুপক্ষের সাক্ষাৎ হইল। রাজা তাঁহার সুনিপুণ সৈন্যদল সঙ্গে শত্রুসেনার ঘনসন্নিবিষ্ট মধ্যদেশ আক্রমণ করিলেন,—তখন যে স্থানে মুষ্টিমেয় হিন্দুযুবকদল তখনও শত্রুপক্ষের বিস্তীর্ণ সৈন্যব্যূহ অস্ত্রদ্বারা অপসারিত করিতে করিতে হিন্দু নারীদিগকে নিরাপদে অগ্রসর করিতেছিলেন, তাহার বিপরীত দিকের প্রান্তভাগে সহসা ভীষণ রণকোলাহল শোনা গেল। যেন মুহূর্ত্তকালের জন্য এই নূতন ঘটনায় উন্মনা হিন্দু যুবকদল ও তাঁহাদের শত্রু-পক্ষ পরস্পর মারাত্মক হত্যাকাণ্ডে নিবৃত্ত হইল। এমন সময়ে বুদ্ধিমতী রাণী সকলই বুঝিতে পারিয়াছেন। একবারে আনন্দ ও উৎসাহ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রাণী বলিলেন,—"আর কি দেখিতেছেন? স্বয়ং অর্গল-রাজ, আমার প্রিয়তম স্বামী আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। ঐত হিন্দুসেনার উন্মত্ত জয়ধ্বনি শোনা যায়। ঐত তিনিই! আক্রমণের এমন সুনিপুণ কৌশল আর কাহার? অগ্রসর হউন, শত্রু বিনাশ করুন, পথ পরিষ্কার করুন, মহারাজার সহিত মিলিত হউন।" শুনিবামাত্র সেই রক্তাক্তকলেবর হিন্দু যুবকদল অসীম আনন্দে জয়ধ্বনি করিলেন, এই কথায় তাঁহারা অবসন্ন বাহুতে যেন নবীন বল লাভ করিলেন। তখন শত্রুসেনার উভয়দিক্ আক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদের জয়লাভ অসম্ভব বোধ হইল। এক দিকে রাণী, আর এক দিকে রাজা, মধ্যস্থলে শত্রুসেনা অবিশ্রান্ত অস্ত্রাঘাতে মরিতে লাগিল। মুসলমান সেনাপতি বিপদ বুঝিবামাত্র পলায়নে তৎপর হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে উভয় হিন্দু বীরদলের মধ্যে যে শত্রুসৈন্যদল ছিল, তাহা অপসারিত হইল, তখন সেই শোণিতসিক্ত, মৃতদেহসমাকীর্ণ, উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের উপরে অশ্বারূঢ় রাজা ও রাণী উভয়ে উভয়ের দিকে ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে দৃশ্য অতি সুন্দর! দূরে বিচ্ছিন্ন শত্রু-সেনা পলাইতেছে, এদিকে নিস্তব্ধ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের উপর একদিক্ হইতে রাজা, আর একদিক্ হইতে রাণী অশ্বারোহণে ক্রমশঃ পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। দূর হইতেই উভয়ে উভয়কে চিনিলেন। কিন্তু উভয়েরই মুখ ফুটিল না, উভয়েরই উত্তেজিত মুখশ্রীর সুমহান্

গাম্ভীর্য্য সামান্যমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইল না—তাঁহারা যেন দুইটী শিল্পিহস্ত-খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তির মত জীবন্ত অশ্বপৃষ্ঠে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। এই যে সাগরতরঙ্গের ন্যায় প্রবল শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধে অসাধারণ বিজয়গৌরব, এই যে নিদারুণ বিপদের দৈবদুর্ব্বিপাকে বিচ্ছিন্ন প্রণয়ী দম্পতীর অপ্রত্যাশিত পুনর্ম্মিলন, ইহার আনন্দ রাজ-দম্পতী সেই মুহূর্ত্তে হৃদয়ে যথেষ্টই উপলব্ধি করিতেছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত বীরের ন্যায় তাঁহারা তাঁহাদের আনন্দোচ্ছ্বাস অসীম ধৈর্য্যের সহিত সংযমনপূর্ব্বক সেই বেষ্টিত অনুগত সৈন্যদলের সম্মুখে আপনাদের পদোচিত গৌরব ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতেছিলেন। সকলেই দেখিল রাণীর শ্রম-স্বেদ-কণাসিক্ত লোহিতাভ অপূর্ব্ব মুখশ্রী অসাধারণ গম্ভীর, কিন্তু অত্যুজ্জ্বল কৃষ্ণকান্তি বিস্ফারিত নয়নদ্বয় তাঁহার বীর পতির নয়নের সহিত একাগ্রে সম্বদ্ধ। সে দৃষ্টি কি আত্মানুযোগ ও ক্ষমা ভিক্ষা? কে জানে? সকলেই দেখিল বীর রাজা গৌতমের কৃতপ্রতিজ্ঞ উত্তেজিত মুখশ্রী অসাধারণ গম্ভীর, কিন্তু গুর্ব্বব্যঞ্জক বিশাল নয়নদ্বয় তাঁহার নিরুপমা পত্নীর পলকহীন নয়নের সহিত নির্নিমেষে সম্বদ্ধ। স্বামীর সেই শীতল দৃষ্টি কি প্রিয়তমার প্রতি নীরব অভিমান? আর কেহ তাহার অর্থ বুঝিল না। সেখানে তখন কিঞ্চিদূন সহস্র অশ্বারোহী ধীরে ধীরে একটী বিশাল, কৃষ্ণবর্ণ জীবন্ত শৈল-প্রাচীরের ন্যায় তাহাদের প্রভুর সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু সকলেই গম্ভীর, সকলেই নীরব, তাহারা কেবল অর্গলের অসামান্যা রাণী এবং তাঁহার সাহায্যকারী হিন্দু বীর যুবকদিগের প্রতি তাহাদের বিস্ময় ও ভক্তি মিশ্রিত দৃষ্টি একাগ্রে সন্নিবিষ্ট রাখিয়াছিল।

সেই বিপ্লব-ক্ষেত্রে রাজা ও রাণী যখন পুনরায় সম্মিলিত হইলেন, তখন সকলের সুখের পরিমাণ আমরা ভাষায় কি বুঝাইব? সুগভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভাবে অবনতহৃদয় বীর রাজা গৌতম আগ্রহের সহিত সর্ব্বাগ্রে সস্নেহ-সম্মান-সহকারে নবীন যুবক বীর অভয়ের করপল্লব ধারণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মনের সহস্র কথার এক কথাও তখন অভয়কে বলিতে পারিলেন না। কেবল অবশিষ্ট হিন্দু যুবকদিগের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিপাতের সহিত গদ্গদ-কণ্ঠে কহিলেন,—"তোমরাই মাতৃভূমির সু-সন্তান, তোমরাই পূজনীয় মহাবীর।"

সেখানে আনন্দোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সকলেরই হৃদয়ে এক নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস বহিতেছিল। হায়, নির্ভরচাঁদ যদি জীবিত থাকিতেন! সেই সাধুহৃদয় বীরপুরুষ সুকঠিন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া অম্লানমুখে আপন দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এখন তাঁহারই প্রখর শোক-স্মৃতি সকলের হৃদয়ে জাগ্রত, তাই সকলের সঙ্গে সঙ্গে অর্গলরাজ-দম্পতীর নয়ন-প্রান্তে অশ্রুজল!

কিন্তু অন্তরের এই শোকস্মৃতি তখন অন্তরে রাখিতে হইল। উপস্থিত গৌরবকে সম্বর্দ্ধনা না করিলে নয়। যে স্বর্ণপ্রতিমা রাজলক্ষ্মীকে রক্ষা করিবার একমাত্র বাসনায় বীর নির্ভয়চাঁদ প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণ-প্রতিমা সর্ব্বথা নিরাপদে রক্ষিত হইয়াছেন, নির্ভয়চাঁদের পবিত্র বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, ইহাতেই অবশেষে সকলে সমবেত স্বরে আনন্দধ্বনি করিলেন। সুখের সংবাদ দেখিতে দেখিতে দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, রাজা গৌতম তাঁহার প্রিয়তমা রাজলক্ষ্মীর সহিত উৎসবময়ী নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, সুগন্ধি পুষ্প-সমাকীর্ণ পথের উপর বীরদম্পতী ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন, গীত-বাদ্য-নূপুর-নিক্বণের সহিত রাজধানী যেন সুখের হিল্লোলে ভাসিতে লাগিল। কিন্তু সেই সুখোৎসবের মধ্যেও রাজ-পরিবার এবং জনসাধারণ স্বর্গীয় বীর নির্ভয়ের জন্য শোকচিহ্ন ধারণ করিতে ভুলিলেন না।

আরও এ কি? অর্গলের কুতূহলী নরনারী দেখিল সেই বিজয়োৎসবের মধ্যে অভিনব বিবাহোৎসবের মধুর বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজ-পরিবার যেন কি এক পবিত্র শুভ-সম্মিলন আকাঙ্ক্ষায় সেই উপলক্ষে সব গৃহ দ্বার তোরণ স্বহস্তে সাজাইতেছেন। বিস্মিত জনসাধারণ প্রথমে কিয়ৎকাল কিছুই বুঝিতে পারিল না, পরে দেখিতে দেখিতে শুভসমাচার প্রচারিত হইল—বালিকা রাজকুমারীর বিবাহ। অর্গলের রাজধানী হইতে প্রতি গৃহে, প্রতি নরনারীর কর্ণে সুধাধারার ন্যায় শুভসমাচার প্রচারিত হইল। বীর যুবক অভয়চাঁদের সহিত স্নেহ-পুত্তলি লাবণ্যলতিকা রাজদুহিতার বিবাহ শুনিয়া স্বদেশভক্ত, রাজভক্ত নরনারীর সুখ যেন ষোলকলায় পূর্ণ হইল। অর্গল-রাজ্যের প্রত্যেক অট্টালিকা ও পর্ণকুটীর-বাসী যেন রাজগৃহের এই আনন্দের অংশী হইল। পবিত্র দেববালার মত সুন্দরী লাবণ্যবতী বালিকা রাজকুমারী বীরহৃদয়, সৎসাহসী, সুন্দর নবীন যুবক অভয় চাঁদের সহিত মধুর পরিণয় সম্বন্ধে আবদ্ধা হইবেন, ইহাতে দেশের সকল নরনারী অকপটে আনন্দ প্রকাশ করিল। —কিন্তু রাজকুমারী যে বালিকা, আজিও বুঝি সুকুমারী নিরুপমা জননীর স্নেহ ক্রোড়-বিচ্ছিন্ন হইতে অথবা স্বামিসম্ভাষণ করিতে যাইবার উপযুক্ত হন নাই। কিন্তু তাহারই বা আর অধিক বিলম্ব কি? আর অভয় চাঁদও রূপে, গুণে, বয়সে—সর্ব্বাংশেই রাজকুমারীর উপযুক্ত বর। কাহারও মনে কোন সংশয় রহিল না। কাহারও মনে কোন নিরানন্দের ছায়া স্পর্শ করিল না! প্রেমিক রাজদম্পতী তাঁহাদের স্নেহপ্রতিমা কন্যাটীকে একটি যোগ্য বরের সহিত স্বর্গীয় প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন। সুখে দুঃখে রাজকুমারী তাঁহার হইলেন, তিনি রাজকুমারীর হইলেন। মহাপ্রাণ অর্গলরাজ ও তাঁহার

প্রিয়তমা পত্নী জগতে এমন আর কিছু অমূল্য পদার্থ পাইলেন না যদ্দ্বারা অভয় চাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে পারেন, তাই প্রাণাধিকা স্নেহ-লতিকা দুহিতা সমর্পণে কিয়ৎপরিমাণে মনের আশা পূর্ণ করিলেন। শুভবিবাহের যৌতুক স্বরূপ শুধুই দ্রব্যসম্ভারে রাজ-দম্পতীর হৃদয় তৃপ্তি মানিল না, সেই সঙ্গে অর্গলরাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী ভাগীরথীর সমগ্র উত্তর প্রদেশ কন্যা জামাতাকে উপহার দিলেন। শ্রীমান্ অভয় চাঁদ বৈশ্য রাজপুত সন্তান। বিশুদ্ধ রাজপুতের তুলনায় বৈশ্য রাজপুতেরা অপেক্ষাকৃত হীনভাবে গণ্য, কিন্তু তথাপি জামাতার মহদ্‌গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে রাজা ও রাণী বৈশ্য-রাজপুতকে আপন বংশে গ্রহণ করিলেন,—জামাতা অভয় চাঁদকে গৌরবান্বিত "রাও" উপাধি অর্পণে সমুদায় বৈশ্য-রাজপুত সন্তানের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।

এই সত্য কাহিনীর নায়ক নায়িকারা যে দেশে একদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যদেশ আজিও যেখানকার সেখানেই আছে, কিন্তু তথাপি সে দেশ আর নাই! যে ধর্ম্মাত্মা রাজা গৌতম উদার-হৃদয়, আদর্শ চরিত্র ও অসাধারণ বীরত্বের জন্য ভারত-বিখ্যাত ছিলেন, তিনি আর নাই; যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যশালিনী রাজরাণী অনুপম সুন্দর স্বভাব, স্বদেশ-প্রেম ও বীরপূজাপ্রবৃত্তির জন্য সকলেরই হৃদয়ের আবেগপূর্ণ ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও আর নাই; যে অপরিচিত নবীন যুবক অভয় ও নির্ভয় চাঁদ নদীর ঘাটে অগণিত শত্রুসৈন্যের অস্ত্ররাশির মধ্যে আপনাদের হৃদয় পাতিয়া দিয়াও অপরিচিত অসহায়া রমণীদিগকে নিরাপদে রক্ষা করাকে সম্ভ্রান্ত রাজপুতের অবশ্য-কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারাও আর নাই। নিদারুণ কালের প্রভাবে তাঁহারা সকলেই অন্তরালে অপসারিত; কিন্তু তথাপি আজিও সে দেশের নরনারীর বুকে তাঁহাদের মধুর সুখস্মৃতি সজীব আছে। আজিও সেথায় সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে কৃষক-কুটীরে অথবা গৃহস্থগৃহে, শ্রম অথবা বিশ্রামের মধ্যে সুকণ্ঠ ললনারা আকুল হৃদয়ে তাহাদের অনুপমা সুন্দরী মহারাণীর গীতি-ইতিহাস গান করে।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

কাশি।

১। আদার রস একতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দি ও কাশি নিবারিত হয়।

২। কণ্টিকারীর রসে অথবা বাকস ছালের রসে পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিম্বা তুলসীপত্রের রস মরিচের গুঁড়াসহ সেবনে কাশরোগের উপশম হয়।

৩। মুখে গঁদ ও মিছরী কিম্বা হরীতকী ও যষ্টিমধু অথবা লবঙ্গ বা কাবাব চিনি রাখিলে, কাশির বেগ শান্ত হয়।

৪। বুকে সর্দ্দি বসিলে পুরাতন ঘৃত কণ্ঠদেশে মালিস করিবে, কিম্বা একটী পাতি লেবু গোবরের ভিতর করিয়া পোড়াইবে এবং সেই লেবু ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া বুকে মালিস করিলে উপকার হয়। বুকে বেদনা হইলে পুরাতন ঘৃতে আদার রস ও কর্পূর মিশাইয়া মালিস করিবে। গরম দুগ্ধের সহিত গাওয়া ঘৃত অল্প করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি ও কাশির লাঘব হয়।

৫। বাকস পাতার রস কাঁচ্চা খানেক লইয়া সেইরূপে কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া তিন চারি দিন খাইলে কাশি ভাল হয়।

৬। পুষ্করিণীর পাড়ের আমগাছের অর্দ্ধ জলপচা পাতা দিয়া নূতন হাঁড়ি ... সের থাকিতে নামাইয়া ২।৩ দিন খাইলে কাশি ভাল হয়।

৭। কাবাব চিনি পানের সহিত ২।৪ দিন খাইলে কিম্বা মিছরী ও মরিচ এক সঙ্গে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে কাশি ভাল হয়।

৮। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, অল্প পাথরকুচি পাঁচটী গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে অথবা কাল অপরাজিতার পাতার রস বুকে ও মাথায় মালিস করিলে অথবা অনেক দিনের পুরাতন তেঁতুল পূর্ব্ব দিবস-সন্ধ্যার সময় একটী পাথরবাটিতে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার স্বচ্ছ জল প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে হাঁপানি রোগের শান্তি হয়।

৯। কটফল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, ধনে, মুতা, বচ, হরীতকী, ক্ষেতপাপড়া, শুণ্ঠি, দেবদারু, এই ক্বাথে ।• আনা মধু এবং এক রতি হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত ও কফোত্থিত কাশ, কণ্ঠরোগ, ক্ষয়রোগ, হিক্কা, শ্বাস ...

বর্ষ-শেষ-চিন্তা

সখি সেফালি! আমি স্বপনে রয়েছি, আমাকে কেন জাগালে? যদি শোকাশ্রু-পূর্ণ অন্ধ নয়নকে উন্মীলনের শক্তি দিতে পারিয়াছ, তবে কি মলিনহীন আত্মাটুকুকে বিশ্ব-প্রেমের দীক্ষা দান করিয়া সঞ্জীবিত করিবে না? আমার শৈশব-সঙ্গিনী সেফালি! তুমি এখনও সেই হাস্যময়ী, কুসুম-কোমলা ও আশালতারূপিণী। এ রোগ-শোক-দগ্ধ, হীনতাতে নিমজ্জিত, মৃতপ্রায় আত্মার সম্মুখে বিশ্বাস-প্রদীপটী হস্তে ধরিয়া মুমূর্ষু আত্মাতে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রেম, ও ভালবাসা জানাইতেছ! তোমার শীতল ছায়াতে

আশ্রয় লাভ করিয়া, "সাহারাতে" বিচরণ করিতে করিতে মরীচিকা দর্শনে ভ্রান্ত, অন্ধের ন্যায় লক্ষ্যবিহীন, উদ্দেশ্যহারা, বাণবিদ্ধ মৃগতুল্য ছুটা ছুটী করিয়া বিনাশের পথে ধাবিত হইতেছিলাম। কে আমাকে দিব্য আশার সঙ্গীত শুনাইতেছে? সঞ্জীবিত করিবার জন্য কোমল দক্ষিণকর সঞ্চালনে, আজ এ গভীর যামিনীতে মধুর স্বরে আবাহন করিতেছে? সেফালি! শৈশবসঙ্গিনী! তুমি সর্ব্বদাই নিকটে। প্রেমের নীরব আকর্ষণে টানিয়া মহাশক্তিপূর্ণ অনন্ত বারিধিনীরে কি সঙ্কীর্ণ আবিল ও আবর্জ্জনা-পূর্ণ ক্ষীণ স্রোতকে মিশাইতে চাও? কালরূপসিন্ধু জলে গড়ায়ে পড়িল বৎসর, উঠিল কালের ঊর্ম্মি। তরঙ্গ আঘাতে নিত্যগামী রথচক্র, আবার ঘুরিল অনন্ত কাল সাগরের আয়ুর পথে। এই সঙ্গম-স্থলে দাঁড়াইয়া জগতের কতই মায়ার খেলা লক্ষ্য করিতেছি। আপনা ভুলিয়া, তাঁহাকে লইয়া অনন্ত স্রোতোমুখে এ ভগ্ন তরী ভাসাইয়া দিবার জন্য হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সম্মুখে কাল-সাগরের ভীষণ উচ্ছৃঙ্খল বীচিমালা প্রবৃত্তির ঘূর্ণিপাকে জীবন তরীখানা চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্য মহা আয়োজন করিয়া অট্টহাস্যে ভীত প্রাণকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। আজ আমি কাল সাগরের বেলাভূমিতে একান্তই যে একা। তাই ভীতি-বিহ্বল হৃদয় ত্রাসে ডুবিতেছে। একখণ্ড উপল সঞ্চয়ও কি এ দুরাকাঙ্ক্ষ-ভাগ্যে ঘটিবে না? এখনই যে পুরাতন, অতীতকাল সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ভাবিতেছি "আপনার তরে মরে যেই জন, মরণে তাহারি ব্যথা। মুছায়ে পরের বিষাদের ধারা, বাঁচায়ে পতিপ্রাণ কি সুখ মরণে, যে মরে সে জানে কি আনন্দ! বলিদান। সমবেদনার নির্ম্মল উৎস সেফালী! ত্রিদিব দুয়ার, খোল একবার, দেখিব মায়ের ছবি। শয়নে স্বপনে স্বজনে, বিজনে যে মূরতি মোর সার। জনমের তরে দেখ্‌বে কি সখি! সে মুখ অমিয়া-মাখা? বোন সেফালি! সংসার-মোহে অন্ধ এ ভ্রান্ত ও শ্রান্ত পথিকের কর্ণে খাম্বাজ রাগে আশার মোহন গীতিধ্বনি ভাল করিয়া কি শুনাইবে বা যে আশা বিজলী দেখাইতেছ, তাহা কি চপলারূপিণী নয়, কিন্তু স্থির সৌদামিনী রূপে, এ আঁধার আবর্জ্জনাপূর্ণ রাজ্যে জ্যোতি বিকাশ করিবে? ভাঙ্গা আর গড়া অবরুদ্ধ জীবন প্রবাহের নিত্যকাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন উপাস্য দেবতা কি বর্ষশেষের এ তীর্থসঙ্গম ভূমিতে খুঁজিয়া মিলিবে না, যাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বিশ্বাস প্রেম ও ভক্তি কুসুমের অঞ্জলী সহকারে অর্চ্চনা করিয়া জীবন ধন্য করিবে, সেই অধিষ্ঠাত্রী, মঙ্গল-রূপিণী জননী কোথায় লুকাইয়া আছেন বল বোন সেফালি! বলিয়া দাও যে পুরাতনকে নূতনরূপে আশ্রয় করিয়া একটু বিশ্বাস, প্রেম, ভালবাসার শীতল

ছায়া লাভ করিয়া ত্রাসিত হৃদয় একবিন্দু বিরাম লাভের আয়োজন করিতে মহা ব্যস্ত ছিল, নূতনের রাজ্যে ভগ্ন তরণী কোন মতেই আগুসার হইতে চাহিতেছে না। আবার এ অচেনা বন্ধুর দোষ "নূতনতা"। নূতন আলাপ প্রেম ও সখ্যতার মিলন প্রয়াস কি এ শ্রান্ত পান্থের পক্ষে সম্ভবে? তাই বোন সেফালি! একাই ভাবিতেছি "মোহময় সংসারে থেকে কেমন করে পাইব তাঁহায়। আমি যতনে বাঁধিয়া প্রাণ দিতে চাই তাঁহারে, পথ মাঝে প্রলোভন ঘিরেছে আমারে। ভীষণ তরঙ্গ দেখে ভয়ে প্রাণ কাঁপে অনিবার।"

বর্ষশেষ দিনে।

নীরবে এসেছ বর্ষ, নীরবে যেতেছ ভাল,
আমাকে যা দিতে চাও, নিঃশব্দ নীরবে ঢাল।
নীরবে বহিছ ধুনী, নীরবে সমীর ববে,
মোর সাথে ভবঘরে নীরবে খেলিতে হবে।
নীরবে বরষা সুধা ঢালিয়াছে কাদম্বিনী,
নীরবেই মোর বীণা গাবে "পূরবী" রাগিণী।
নীরবে ফুটেছে সবি, নীরবে শুকাল আশা,
নীরব হৃদয় মোর গেয়েছে শোকের ভাষা।
নীরবে তারকা-মালা মোর পানে আছে চেয়ে,
আবাহন, বিসর্জ্জন নীরবেই গেছে স'য়ে।
বসন্ত শরৎ মোর নীরবেতে দূরে এসে,
নীরব অটল ভাবে কতই না ভালবাসে!
নীরবে জাহ্নবী-বুকে মিশায়েছি অশ্রুধারা,
নীরবে দেখেছ বর্ষ! কত ভালবাসে তারা।
নীরব প্রভাত মম নিঝুম সাঁঝের বেলা,
আমি যে এসেছি ভবে খেলিতে নীরব খেলা।
নীরব গম্ভীর অই শ্মশানের একপাশে,
নীরব সাধনা নিতি হৃদয়েতে ছুটে আসে।
জীবনের আশা-ছবি নীরবে মিশায়ে গেল,
সুধুই বিষাদ-ছায়া পরাণেতে ঢেলে দিল।
নীরবে উপাস্য আসি কেন মোরে দেখা দিল?
হিয়ার মাঝারে পুনঃ আশালোক বিরাজিল?
নীরবে যে মহাশক্তি এই ভবে নিয়ে এল,
নীরবে গাহিয়া গীতি তাঁরি পানে ছুটি চল।
নীরবেতে প্রাণটুকু তাঁরি পদে সমর্পিয়া,
বৈতরণী তীরে মোর নীরব হইবে হিয়া।
পুরাণ বছর মোর অসীম আদর ধন,
যাও চলে—মৃতপ্রাণে সঞ্চারি নব জীবন।

কেন বহে আঁখিজল?

১

আজি
কেন বহে আঁখিজল?—
যা ছিল কামনা, কিছুই হল না,
জলবিম্ব হল জল!—
শ্রান্ত দেহ হায়, চাহিছে "বিদায়",
এ জীবন অ-সফল!
তাই বহে আঁখিজল।

২

কেন বহে আঁখি জল?—
লয়ে কত আশা ধরাতলে আসা,
কার্য্য-ক্ষেত্র ভূমণ্ডল,
কতই শিখিব, কতই খাটিব,
কতই উদ্যম বল!—
আজ শুধু আঁখি-জল।

৩

কেন বহে আঁখি-জল?—
ধর্ম্মজ্ঞান ধনে, অর্জ্জিয়া যতনে
পূরিব হৃদয়-তল;
বিধাতার পা'য়, সঁপি আপনায়
হ'য়ে রব নিরমল!—
তাই বহে আঁখি-জল।

৪

কেন বহে আঁখি-জল?—
কই সে শকতি, কই সে ভকতি,
কই সে মনের বল?—
"অসার সংসার" হইয়াছে সার,
রিপুকুল মহাবল!
তাই বহে আঁখি-জল!

৫

কেন বহে আঁখি-জল?—
প্রাণপ্রিয় কাজ, অসমাপ্ত আজ,
মৃত আমি, শৃঙ্খবল,
রহিয়াছি পড়ি—হরি! হরি! হরি!
তুচ্ছ চিন্তা অবিরল!
তাই বহে আঁখি-জল।

৬

কেন বহে আঁখি-জল?—
হৃদি উপবন, বিশুষ্ক কানন,
মরে গেছে ফুলদল,
উড়েছে বিহঙ্গ, ফিরিছে ভুজঙ্গ,
ঘুরিছে শ্বাপদ-দল!
তাই বহে আঁখি-জল।

৭

কেন বহে আঁখি-জল?—
পরার্থ-পরতা, প্রেম,উদারতা,
গেছে বুঝি রসাতল?
কোথা মনুষ্যত্ব, কোথা বা মহত্ত্ব?
স্বার্থভরা সর্ব্বস্থল!—
তাই বহে আঁখি-জল।

৮

কেন বহে আঁখি-জল?—
কোথা সত্য ধর্ম্ম, হে নিষ্কাম কর্ম
আনন্দের কোলাহল?

কোথা হে উন্নতি? মানব-শকতি
এত ক্ষুদ্র, দুরবল!—
সার শুধু আঁখি-জল?

৯

সার শুধু আঁখি-জল?—
হে বিশ্ব-জীবন! এ তুচ্ছ জীবন
কেমনে ফিরায়ে দিব?—
এত যে কামনা কিছুই হল না,
শুধুই বিদায় নিব?—
কেন দিলে নাথ, মানব জনম,
কেন দিলে বোধ, বল?
তাই বহে আঁখি-জল।

লেখিকা
শ্রীমা।

প্রেমের গৌরাঙ্গ।

(৪০৮-৯ সংখ্যার ৩২৯ পৃষ্ঠার পর)

জীব সংসারে থাকিয়া কিরূপে শ্রীরাধা কৃষ্ণের অমৃতময় প্রেমাস্বাদন করিয়া আত্মকৃতার্থতা লাভ করিতে পারে, তাহাই শিখাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মরভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংসারে অবস্থানকালে সংসারী জীবের কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছেন। অনন্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসারী ও বৈরাগী জীবকে যথোচিত কর্ত্তব্য শিক্ষাদান করিয়াছেন। সংসারী জীবদিগকে যেমন সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন, বৈরাগীদিগকে তদ্রূপ সংসার হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। বৈরাগীদিগের প্রতি মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"......বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥"
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

কিন্তু আধুনিক বৈরাগিগণ মহাপ্রভুর এই অমূল্য উপদেশ সকল অতলগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছেন। ইহাঁদের জন্যই আজ মহাপ্রভুর পবিত্র ধর্ম্মে কলঙ্কারো[illegible] হইতেছে। সংসারে যত কিছু মোহ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীলোকের মোহই প্রবল, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন,—

"দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।" চৈঃচঃ

অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত নারীদর্শনেও জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের চিত্ত-বিকার ঘটে। জীব সকল প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের অমূল্য উপদেশাবলী যতই ভুলিয়া যাইতেছে, ততই তাহাদিগের অধঃপতন ঘটিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারাশ্রমে থাকিয়া সম্যক্-রূপে তাঁহার উদ্দেশ্য পালন করিতে পারেন নাই। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে অবস্থান করিয়া জগতে অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা বহাইয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের বিকাশ করিয়াছিলেন। যখন

সমগ্র জীব আসিয়া প্রেমময়ের শীতল চরণে আশ্রয় লইল, তখন শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য (প্রবাদ ইহাঁরই আকর্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন) শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এক তরজা লিখিয়া পাঠাইলেন। যথা,—

"বাউলকে কহিও সবে হঞাছে বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।"
চৈঃ চঃ।

তাৎপর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের অমৃতময় প্রেমে জগৎ ডুবিয়াছে, আর প্রেমরূপ চাউল গ্রহণের লোক নাই, এখন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

এই তরজা প্রাপ্ত হওয়ার পর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ শতগুণে বৃদ্ধি হইল। তিনি গম্ভীরায় রাত্রে শয়ন করিতেন। একদা নিশীথে প্রেমোন্মাদ অবস্থায় গম্ভীরা ত্যাগ করিয়া শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে গিয়া পড়িয়াছেন। ভক্তগণ প্রভুকে না দেখিয়া ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহার অন্বেষণার্থ গমন করিয়া অবশেষে সিংহদ্বারে তাঁহার দর্শন পাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীচরিতামৃতে সে বর্ণনা এইরূপ,—

"সিংহদ্বারে উত্তর দিশায় আছে একঠাঁই।
তার মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্য গোসাঞী॥
দেখি স্বরূপ গোসাঞী আদি আনন্দিত হৈলা,
প্রভুর দশা দেখি পুন চিন্তিতে লাগিলা॥
প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘে হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাশায়.শ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত॥
হস্ত পাদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা কেন প্রভুর উত্তান নয়ন॥"

প্রেমের এরূপ অদ্ভুত বিকার প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অন্যত্র,—

"প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার॥
কণ্ঠেতে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার।
দুই নেত্র বহি অশ্রু বহয়ে অপার॥
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনাধার॥
বৈবর্ণ শঙ্খপ্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রে তরঙ্গ॥"

এই সময় প্রভু সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসে নিমগ্ন থাকিতেন। অভ্যাস-বশতঃ বাহ্যকৃত্য সমাধা করিতেন মাত্র। তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রেমলহরী উচ্ছ্বসিত হওয়ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ব্যতীত তাঁহার নয়নপথে আর কিছুই স্থান পাইত না। একদা তিনি প্রেমোন্মাদে অচেতন হইলে ভক্তগণ শুশ্রূষাপূর্ব্বক তাঁহাকে চেতন করাইলে তিনি বলিতেছেন,—

"কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইনু দর্শন।
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র মন॥"
চৈঃ চঃ।

আবার কখনও রাধা ভাবে ভবিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া হারাইয়াছেন, তাই বলিতেছেন,—

"......কৃষ্ণ মুই এখনি দেখিনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুন হারাইনু॥" চৈঃ চঃ।

প্রেমময় গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া যখন বিলাপ করিতেন, সে বিলাপই বা কি প্রাণস্পর্শী!! পাঠিকা ভগিনীদিগের জ্ঞাপনার্থে একস্থল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা,—

"হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্য সদ্গুণ সাগর!
হাহা শ্যাম সুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাস বিলাস নাগর!
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই,
এত কহি চলিলা ধাইয়া।" চৈঃ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ উদিত হইলে প্রভু একেবারে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া পড়িতেন। এক দিন,—

"বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরা ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥
সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।"
চৈঃ চঃ।

শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি নাহি পায় পার॥
চৈঃ চঃ।

বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের অমূল্য চরিত্র বিচারের দ্রব্য নহে, উপভোগের বস্তু। এরূপ অতুলনীয় প্রেম একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গেই সম্ভবে। তিনিই তাঁহার তুলনা। এই অমূল্য প্রেমই শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

পাঠিকা ভগিনীগণ! তোমরা প্রেমময় শ্রীগৌরসুন্দরের কমনীয় চরিত্র উপভোগ কর। আমরা এক্ষণে প্রেমময়ের শ্রীচরণে প্রণতিপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

হিন্দু নীতি।

১। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে প্রকৃত সুখ হয় না, অতএব ধর্ম্মে তৎপর হইবে। যে অর্থ ও কামে ধর্ম্ম না থাকে, তাহাতে প্রবৃত্তি করিবে না। অর্থ ও কামের সহিত ধর্ম্মের যোগেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।

২। কেশ, নখ এবং শ্মশ্রু এই সকলকে খর্ব্ব করিবে।

৩। ছত্র এবং পাদুকা সহিত চারি হস্ত পরিমাণ পর্য্যন্ত দর্শন হয়, এই ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক গমনাগমন করিবে।

৪। মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না।

৫। জীবহত্যা, অপহরণ, অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবা, খলতা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা ব্যবহার, অযুক্ত আলাপের দ্বারা মনোভঙ্গ, অবিনয়, নাস্তিকতা, এবং অবৈধ আচরণ এই দশ

প্রকার পাপ কার্য্য শরীরের দ্বারা কিম্বা বাক্যের দ্বারা অথবা মনের দ্বারা করিবে না।

৬। জীবিকারহিত, রোগপীড়িত এবং শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণের সাধ্যানুসারে উপকার করিবে।

৭। কোন শত্রু যদ্যপি অপকার করে, অপকার করিবার শক্তি থাকিলেও তাহার উপকারই করিবে।

৮। ইন্দ্রিয়গণকে অত্যন্ত পীড়িত বা উত্তেজিত করিবে না।

৯। বয়ঃস্থা ভগিনী বা কন্যা অথবা মাতার সহিতও বয়ঃস্থ পুরুষ একাকী অতিশয় নির্জ্জন স্থানে বসতি করিবে না।

১০। পর পুরুষের সহিত একত্র বাস, যথেচ্ছ কথোপকথন, এবং পরের গৃহেতে অবস্থিতি, ইহা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে নিতান্ত গর্হণীয়।

১১। পতি যদ্যপি ক্রোধপরায়ণ হয়, কিম্বা উৎপীড়ক হয়, কিম্বা চিরপ্রবাসী, দরিদ্র, রোগী, অথবা অন্য স্ত্রীতে রত হয়, তাহা হইলে স্ত্রী অনুরক্তা হয় না, অথবা অন্যপুরুষকে আশ্রয় করে, অতএব এই সকল দোষ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীগণকে রক্ষা করিবে।

১২। যাহার যেমন শক্তি, তদনুসারে বস্ত্রের দ্বারা, অন্নের দ্বারা, ভূষণের দ্বারা, স্নেহের দ্বারা এবং মধুর বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া স্ত্রী ও সন্তানগণকে সুখী করিবে।

১৩। চিতা সম্বন্ধীয় কাষ্ঠ প্রভৃতি, পূজনীয় ব্যক্তি, ধ্বজ, প্রশস্ত বস্ত, ছায়া, ভস্ম, তুষ, ও পূজার উপকরণ উল্লঙ্ঘন করিবে না।

১৪। শরীরের কোনও অঙ্গের বিকৃতি বা অপব্যবহার করিবে না। ঊর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ স্থিতি করিবে না। রাত্রিতে বৃক্ষ, চত্বর, চিতার স্থান, চতুষ্পথ ও দেবালয়েতে অবস্থিতি করিবে না।

১৫। নির্জ্জনকানন ও শ্মশানস্থানে অসতর্কভাবে দিবাতেও গমন করিবে না।

১৬। সূর্য্যকে সর্ব্বদা অবলোকন করিবে না। সূক্ষ্মবস্তু, দীপ্তিযুক্ত পদার্থ, এবং অপবিত্র ও অপ্রিয় দ্রব্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি করিবে না।

১৭। রাজধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম ইহাদিগকে দূষিত করিবে না; এবং বিনা কারণে লোকাচারকেও উল্লঙ্ঘন করিবে না।

১৮। আমি সহস্রপ্রকার পাপশীল, অতএব একটী পাপের দ্বারা আর আমার কি হইবে, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া অতি সামান্য পাপ করিতেও ইচ্ছা করিবে না।

১৯। মাতা, পিতা, গুরু, স্বামী, স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র ও সখা ইহাদিগের মধ্যে কাহারও সহিত বিরুদ্ধাচরণ কি ইহাদিগের কোনমতে অপকার মনের দ্বারাও করিবে না।

২০। স্বজনের সহিত বিবাদ, প্রবল ব্যক্তির সম্মুখে স্পর্দ্ধা, এবং স্ত্রী, বালক,

বৃদ্ধ ও মূর্খের সহিত বাদানুবাদ কখনই করিবে না।

২১। অপরের ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবে না এবং অপরের ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহীও হইবে না। আর যাহারা হীন কর্ম্ম ও হীন গুণ অবলম্বন করে, তাহাদিগের সহিত একাসনে কদাপি উপবেশন করিবে না।

২২। আপনার দৈন্যভাব কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না। কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কাহারো নিকট গৃহ-কথা প্রকাশ করিবে না।

২৩। শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে না।

২৪। আপৎসময়ে কোন কার্য্যে বিচলিত না হইয়া সাধ্যানুসারে কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবে।

২৫। কাহারও মর্ম্মান্তিক যাতনা কি কাহারও প্রতি কোন মতে মিথ্যাপবাদ প্রদান করিবে না।

২৬। কোন গুপ্ত কথা সহসা ব্যক্ত করিবে না। সকল লোকের প্রতিই সর্ব্বদা সদ্ভাব রাখিবে। সর্ব্বদা বহুদর্শী ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইবে। দীর্ঘসূত্রী হইবে না।

২৭। পুত্র হউক, ভ্রাতাই হউক, ভার্য্যাই হউক, অমাত্যই হউক, অথবা কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীই হউক, ইহাদের কোন ব্যক্তিকেই সর্ব্বদা অতি-বিশ্বাস করিবে না।

২৮। কখনই উগ্রদণ্ড ও কটুবাক্য ব্যবহার করিবে না, সর্ব্বদাই সুমধুর বাক্য ব্যবহার করিবে।

২৯। বিদ্যার দ্বারা, কি শৌর্য্যের দ্বারা, কি ধনের দ্বারা, কি কৌলীন্যের দ্বারা কদাপি প্রমত্ত ও অভিমানী হইবে না।

৩০। আপনার কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করিলে মান পরিত্যাগ করিয়া অতি কুৎসিত কুল হইতেও বিদ্যা, মন্ত্র ও ঔষধ যত্নের সহিত গ্রহণ করিবে।

৩১। বালক ও স্ত্রী * ইহাদিগকে অত্যন্ত লালিত কিম্বা অত্যন্ত পীড়িতও করিবে না। বালককে সর্ব্বদা বিদ্যার অভ্যাস বিষয়ে ও স্ত্রীকে গৃহকার্য্যে নিয়োজিত করিবে। কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

৩২। পরের দ্রব্য অতি ক্ষুদ্র হইলেও সে প্রদান না করিলে গ্রহণ করিবে না।

৩৩। সর্প, অগ্নি, দুর্জ্জন, রাজা, জামাতা, ভাগিনেয়, রোগ, এবং শত্রু ইহারা ক্ষুদ্র হইলেও অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া অবহেলা করিবে না।

৩৪। ঋণের শেষ, রোগের শেষ এবং শত্রুর শেষ রাখিবে না। যাচকগণ কিছু প্রার্থনা করিলে তাহাদিগের প্রতি কর্কশ উত্তর প্রদান করিবে না, এবং সমর্থ হইলে তাহাদিগের প্রার্থনা স্বতঃ পরতঃ পূর্ণ করিবে।

* হিন্দু-গৃহে মূর্খা স্ত্রী অজ্ঞান বালকদিগের মধ্যে গণ্যা, সুতরাং তাহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারের উপদেশ আছে। শিক্ষিতা উন্নতচরিত্রা স্ত্রীগণের পক্ষে এ কথা প্রযোজ্য নহে।

৩৫। দাতৃগণ, ধার্ম্মিকগণ, শূরগণ—ইহাদিগের গুণ ও কীর্ত্তি সর্ব্বদা শ্রবণ করিবে। কদাপি ইহাদিগের দোষের প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

৩৬। যে কলহের দ্বারা ইষ্ট সাধন হয়, সেই কলহ উত্তম; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার কলহ করিলে সেই কলহ আয়ুক্ষয়, ধননাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ, যশের লাঘব ও সুখক্ষয়ের কারণ হয়।

৩৭। গুরুজনকে, বলবান্‌কে, রোগীকে, শবকে, রাজাকে, মাননীয় ব্যক্তিকে ও ব্রহ্মচারীকে পথ ছাড়িয়া দিবে।

৩৮। মাতা, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃপত্নী এবং সপত্নীর কোন অপরাধের কথা স্ত্রী ব্যক্ত করিলে তাহা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কদাপি অনুমোদিত করিবে না।

৩৯। কেহ আততায়ী হইয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে আত্মরক্ষার্থ তাঁহাকে বধ করা অন্যায় নহে।

৪০। পিতা প্রভৃতি গুরুজন এবং রাজার সম্মুখে চরণ উত্তোলিত করিয়া বা উচ্চ আসনে উপবেশন করিবে না; এবং তর্ক-বিতর্ক স্থলেও তাহাদিগকে অবজ্ঞা বা অবমাননা করিবে না।

৪১। যে পিতা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ও ভবিষ্যতে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যত্ন করেন, এবং নিত্য নীতি শিক্ষা প্রদান করেন, সেই পিতাই প্রীতিপ্রদ হইয়া পুত্রের ঋণ হইতে মুক্ত হন।

৪২। অর্থরক্ষা, সাংসারিক ব্যয়, রন্ধন, গৃহসামগ্রীর পর্য্যবেক্ষণ এবং শুচিত্বসম্পাদনে পত্নীকে নিযুক্ত রাখা পতির একান্ত কর্ত্তব্য।

৪৩। দেবতা, বেদ, নৃপতি, সাধু, তপস্বী ও পতিব্রতা নারীর নিন্দা কদাচ করিবে না।

৪৪। উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতের আশা করিবে না।

৪৫। অধর্ম্ম করিলে প্রথমে বৃদ্ধি, শত্রুজয় ও সুখসমৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়।

৪৬। দেশ ও কাল বিশেষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবে। যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান ও প্রতিগ্রহ করে, সেই দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই স্বর্গ লাভ করে। অশ্রদ্ধায় দান কিংবা প্রতিগ্রহ করিলে অধঃপতন হয়।

৪৭। পুণ্য কর্ম্ম, ভার্য্যা-গ্রহণ, কৃষিকর্ম্ম, মহৎসেবা ও নিজের উপভোগ্য বিষয়ে প্রতিনিধি চলে না।

৪৮। গৃহস্থের অন্তঃপুরে সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ত, আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ পুরুষ বা স্ত্রীকে পরিচর্য্যার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবে।

৪৯। সাধু ব্যক্তি অন্যের কৃত অল্প উপকারও প্রচুর মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু খল বৃহৎ উপকারকে শর্ষপ হইতেও ক্ষুদ্র মনে করে।

(ক্রমশঃ)

কোথা তুমি ?

সুখ আশা পরিহরি
তোমারি চরণ স্মরি
আসিয়া পড়েছি আজ বহু দূরে দূরে;
বড়ই হয়েছি শ্রান্ত
লক্ষ্যহারা পথভ্রান্ত,
বল দেব কোথা তুমি? আছ কোন্ পুরে?

শত কাঁটা বিঁধিয়াছে,
শত অশ্রু ঝরিয়াছে,
শত আশা একে একে নিবিয়া গিয়াছে;
শত কৌমুদীর রাশি,
উদিত যেখানে আসি,
আঁধারের ঘন ছায়া সেথা মিশিয়াছে।

মরতের কত কথা,
হৃদয়ে ছিল যা গাঁথা,
একটি একটি করি ঝরে গেছে সব;
দূর স্বপনের মত,
দু' একটি রেখা তার,
কেন আসি প্রাণে মোর ঘটায় বিপ্লব?

সুখ শান্তি কথা দুটী,
স্মরিলে আসিত ছুটি,
আর তারা আমাপানে ফিরে নাহি চায়;

আশা! সেত মরীচিকা,
ছলিয়া আমারে একা,
মরু-মাঝে ফেলে পুন আরো সরে যায়।

দূরে কত লোক যায়,
কেহ নাহি ফিরে চায়,
অসহায় ব'লে কেহ কাছে নাহি ডাকে;
যদি কারো পাশে আসি,
হাসিয়া ঘৃণার হাসি,
অবহেলে দ'লে যায় ফেলিয়া বিপাকে।

কোথায় আশ্রয় পাই,
কে মোরে দিবেগো ঠাঁই,
এ আঁধারে কে ফুটাবে আশার আলোক;
অযাচিত স্নেহরাশি,
কে হেথা ঢালিবে আসি,
বিনাশিয়ে হৃদয়ের এ অনন্ত শোক?

পাষাণে গঠিত দেশ,
নাহি দয়া মায়া লেশ,
(হেথা) নিরাশায় আশা দিতে কেবা আছে আর?
কে দেখিবে অভাগারে,
তুমি বিনা এ সংসারে,
কে মুছাবে তাপিতের তপ্ত অশ্রুধার? শ্রীঅ—

রোগীর শুশ্রূষা।

সংসারের কার্য্যসমূহ সুন্দররূপে সাধিত হইবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা মানবজাতির শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীকে নিজ নিজ কর্ম্মে দক্ষতাও প্রদান

করিয়াছেন। সেই কর্ত্তব্য কার্য্যনিচয়ের মধ্যে পীড়িতের সেবা যত্নপূর্ব্বক উপযুক্তরূপে সম্পন্ন করা একটি প্রধান কার্য্য।

জীব দেহ ধারণ করিলেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু মানবগণ ব্যাধিরূপ শত্রুর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলেই তাহার প্রতীকার করিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইলেই রোগের যাতনা দূর হইতে পারে। বিশেষতঃ শুশ্রূষাই অধিক প্রয়োজনীয়। ইহা নিতান্ত গুরুতর কার্য্য। অনেক স্থলে উপযুক্ত শুশ্রূষা অভাবে সুচিকিৎসা সত্ত্বেও পীড়ার উপশম হয় না। এজন্য ইহা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি শিক্ষণীয়। আমাদের শরীর ও মনের এত নিকট সম্বন্ধ যে, একের উন্নতি ও অবনতিতে অপরের উন্নতি ও অবনতি হয়। এ নিমিত্ত এরূপে পরিচর্য্যা করা উচিত যে, রুগ্ন ব্যক্তির দেহ ও মন স্নিগ্ধ হইতে পারে। স্ত্রীলোকের শরীর কোমল ও মন স্নেহপ্রবণ, এই জন্য শুশ্রূষা কার্য্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উপযোগিতা অধিক। তাই এ কার্য্যে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছি। শুশ্রূষাকারিণী নিজে সুস্থপ্রাণা, সবলকায়া, শ্রমদক্ষা, শান্তশীলা, সহিষ্ণুতা-পরায়ণা ও প্রফুল্লচিত্তা হইবেন; কারণ নিজের সুস্থতা ও সচ্ছন্দ না থাকিলে অপরের প্রাণে সুস্থতা ও সচ্ছন্দ আনিয়া দেওয়া দুরূহ।

রোগীর শুশ্রূষার প্রথম নিয়ম—বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতা। যে স্থলে পীড়িতকে রোগশয্যায় দিবস যামিনী একভাবে শয়ান অবস্থায় থাকিতে হইবে, উহা অতিশয় সুপরিষ্কৃত ভাবে রাখিতে হইবে—কোন প্রকার মলিনতা যেন তথায় জন্মিতে না পারে। শয্যা, ভূমি, পীড়িতের বস্ত্রাদি কোন প্রকারে আর্দ্র না থাকে। গৃহটীর অভ্যন্তরে যেন সুবায়ুর চলাচল থাকিতে পারে। বায়ুই মনুষ্যের জীবন রক্ষার প্রধান উপাদান। আমরা যতবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লই, কেবল বায়ুভক্ষণে শরীরে পুষ্টি লাভ করি, এজন্য অপরিষ্কৃত ও দূষিত বায়ু রোগীর পক্ষে কত অনিষ্টকারী, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হয়। অপরিষ্কার বায়ুর দ্বারা শরীর দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। কোনরূপ দুর্গন্ধ বস্তু থাকিলেই তাহা বায়ু সহকারে রোগীর শরীরে প্রবেশ করিয়া যথেষ্ট ক্ষতি জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু বাতাসের উপকারিতা বোধে, রোগীকে অপরিমিত বায়ুর মধ্যে অবস্থিত করান উচিত নহে, কেবল বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতার নিমিত্ত যতটা আবশ্যক, উহাই লইতে হইবে। রোগীর শয্যা ঠিক্ শীতল বাতাসের সম্মুখে রক্ষা করিবে না, উহা দ্বারা শরীরের উত্তাপভাগ হ্রাস হইয়া যায়।

রোগীর শয্যা প্রতিদিন পরিবর্ত্তন করিবে। বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতার প্রতি সাবধানে দৃষ্টি রাখিবে। সুপরিষ্কৃত, কোমল অথচ শরীরে শীত ও তাপ নিবারণ-যোগ্য বস্ত্র ব্যবহার করিবে।

ঘর্ম্মাক্ত দেহে কিম্বা ঘর্ম্মাক্ত বস্ত্রে এক নিমেষও রাখা বিধেয় নহে। ঘর্ম্ম শরীরের ক্লেদ; তাহা নির্গত হইয়া পুনরায় শরীরকে স্পর্শ করিলেই ক্ষতি হয়। যখন স্বেদ-জল মুছাইবে, অতি সাবধানে কোমল হস্তে সযত্নে মুছাইবে, যেন কোন রূপে রোগীর বেদনা বা কষ্ট না জন্মে। বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় সকল দ্বার জানালা রুদ্ধ করিয়া পরিবর্ত্তন করিবে এবং অতি সত্বরে এই কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় নিয়ম—রোগীর গৃহের নির্জনতা। পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে অধিক লোকের সমাগম কষ্টদায়ক। অনেকের পদশব্দ, কথোপকথনের গোল, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্ষেপ—এ সমুদয়ই পীড়িতের পক্ষে অপকারী বই উপকারী নহে। সচরাচর আমাদের গৃহে রোগীর নিকট উহার অনেক বর্ষীয়সী আত্মীয়া উপস্থিত হইয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ, রোদন, তাহার পীড়ার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা যথাযথ বর্ণন ও সেইরূপ ব্যারামে কত জনের জীবনের শেষ হইয়াছে ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া ফেলেন। এই সকল মহা অনিষ্টকারী।

পীড়িতের নিকট অতি মৃদুস্বরে কথা কহা এবং ধীরে ধীরে গৃহে পদক্ষেপ করা আবশ্যক; যেন কোন রূপ কর্কশ শব্দে তাহার কষ্টবৃদ্ধি না হয়। অবসর মত যদি সে ইচ্ছা করে কিম্বা যখন নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটিতে পারে, এমন অবস্থায় মনোহর উপাখ্যান পাঠে কিম্বা শ্রুতি-মধুর কথা বার্ত্তা কহিয়া ও সঙ্গীত করিয়া তাহাকে প্রফুল্লিত করা বিধেয়। রোগীর নিতান্ত আত্মীয় ও শুশ্রূষাকারিণী ছাড়া অন্যান্য লোকের বাহির হইতে তত্ত্বাবধান ও সংবাদ লওয়াই উচিত। রোগীর গৃহ সম্পূর্ণ সুস্থির ও নিস্তব্ধ থাকিবে।

পীড়িত ব্যক্তিকে এমন কোন কথা কহিবে না যদ্দ্বারা উহার অন্তঃকরণে কোন প্রকারে রাগ, দুঃখ, ভয় বা হঠাৎ অধিক আনন্দ জন্মিতে পারে। অনুক্ষণ অতি স্নেহ মমতা ভরে আলাপ করিবে। সর্ব্বদা একপ্রাণা হইয়া সমবেদনার সহিত পরিচর্য্যা করিয়া অসুস্থতা বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

যখন ভয়ানক জ্বালায় গাত্রদাহ হইতেছে, বেদনায় প্রাণ অস্থির করিতেছে, তখন শুশ্রূষাকারিণী সুকোমল হস্তের মৃদু সঞ্চালনে তাহার সর্ব্বাঙ্গের ব্যথা ও জ্বালা দূর করিবেন। মাতা যেমন শিশু সন্তানের মুখের প্রতি প্রতিনিয়ত চাহিয়া অব্যক্তভাবেই তাহার সকল দুঃখের সমভাগিনী হইয়া তাহা দূর করিতে যত্নবতী হয়েন, সেই ভাবে রোগীর যখন যে যাতনা প্রবল হয়, উহা নিবারণে শুশ্রূষাকারিণী চেষ্টিত হইবেন। কিন্তু এমন আরামের উপায়—যাহা আশু কষ্ট-বিনাশক পরে অপকারী, তাহা কোন মতে অবলম্বন করিবেন না। রোগীর পক্ষে যখন যাহা উপকারজনক ও কষ্ট-নিবারক, ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া তাহাই করিতে হইবে।

তৃতীয়—পথ্য। ইহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য। পথ্যাভাবে অনেক পীড়িত অবিলম্বে

সবল হইতে পারে না, বরং দুর্ব্বলতা দ্বারা রোগ প্রবল হইয়া ঔষধের গুণ বিনাশ করত জীবনের হানি করিয়া ফেলে।

পথ্যের সময় ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত অর্থাৎ সবলতার জন্য বারম্বার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করান চাই। নিষিদ্ধ কিম্বা অল্লাধিক পরিমাণে সময় উত্তীর্ণ হইয়া পথ্য গ্রহণ করা অপকারী। পথ্য লঘুপাক ও বলকারক হইবে। যে খাদ্য অনায়াসে পরিপাক না হইতে পারে কিম্বা উপযুক্ত পরিমাণে বলদায়ক না হয়, সে পথ্যে কোন উপকার নাই। অধিকাংশ স্থলে রোগীর রুচিজনক পথ্য দেওয়া চাই, অরুচিকর পথ্য গ্রহণে কে সম্মত হয়? কিন্তু তাই বলিয়া কোনরূপ কুপথ্য দিয়া পীড়িতকে সন্তুষ্ট করিবে না, তাহা হইলে কেবল রোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। চিকিৎসকের আজ্ঞামত স্বাদবিহীন সুপথ্য শ্রেষ্ঠতর।

পানীয় জল নির্ম্মল ও সুস্বাদযুক্ত হওয়া উচিত। উষ্ণ কিম্বা শীতল যেরূপ চিকিৎসকের ব্যবস্থা সেইরূপ জল দিবে। কিন্তু তাহার মাত্রা অধিক করিতে বা একেবারে না দিয়া পিপাসার যাতনা দিতে নাই; উহা দ্বারা স্থলবিশেষে রোগেরও বৃদ্ধি ঘটে। যে কূপ অথবা পুষ্করিণীর জলে সর্ব্বদা বৃক্ষের পত্রাদি পড়িয়া থাকে কিম্বা কোনরূপ মল মূত্রাদির নালীর সহিত যোগ থাকে অথবা কোন সংক্রামক পীড়িত ব্যক্তির বস্ত্রাদির প্রক্ষালন হয়, সেখানকার জল অতি দূষিত। জল উষ্ণ করিয়া পরে শীতল করিয়া দিলে জলের দোষ কাটে। অতি পরিষ্কার পাত্রে স্বচ্ছ নির্ম্মল জল প্রয়োজন মতে দেওয়া উচিত।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা। ইহা দ্বারা অনেক গ্লানি দূর হয়; রোগীর চক্ষে যদি কোন মতে নিদ্রা আইসে, তন্নিমিত্ত তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য গায় পায় হাত বুলাইয়া কোন মতে একটু আরাম জন্মাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিদ্রা দেবী সর্ব্ব-সন্তাপ হারিণী, ইহার ক্রোড়ে স্থান পাইলে রোগ শোক সকল অশান্তির বিরাম হয়।

চতুর্থ নিয়ম—ঔষধ সেবন। রোগ হইলে ঔষধ খাইতে হয়,ইহা সকলেই জানেন,কিন্তু সকল চিকিৎসকের প্রদত্ত সকল প্রকার ঔষধ উপকারজনক নহে। সুদক্ষ চিকিৎসকের হস্তে জীবন না রক্ষা হয়, তাহাও তত ক্ষোভের নহে; কিন্তু কুচিকিৎসকের হস্তে যাতনা ভোগ করা বড়ই শোচনীয়। বিশ্বাস-পাত্র সুচিকিৎসকের নিকট ঔষধ গ্রহণ আবশ্যক। চিকিৎসকের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবান্ না হইলে ঔষধের গুণাগুণ বোধ করিতে সক্ষম হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক শুশ্রূষাকারিণীর পক্ষে চিকিৎসকের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ যথাসময়ে যথাপরিমাণে যাহাতে সেবন হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। বিষাক্ত ঔষধ সকল বাছিয়া পৃথক্ রাখা উচিত। এ বিষয়ে বড়ই সতর্কতার প্রয়োজন। যে ঔষধ সেবনে যখন যেরূপ ফললাভ হয়, তাহাও লক্ষ্য করিয়া মনে রাখা এবং চিকিৎসককে বলা আবশ্যক।

চিকিৎসকের নিকট কোনও বিষয় গোপন রাখিবে না। রোগের বিবরণ আদ্যোপান্ত যথাযথ বর্ণন করিবে এবং অবিকল চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে চলিতে হইবে। অনেকে অবিলম্বে রোগমুক্ত হইবার ইচ্ছায় নানা প্রকার চিকিৎসা একত্র করাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও উপকারী না হইয়া অপকারী হয়। বৈদ্য ও চিকিৎসা সঙ্কটে হয়ত স্থলবিশেষে অমূল্য জীবন অলক্ষ্যে হারাইয়া ফেলিতে হয়, শুশ্রূষাকারিণীর সকল যত্ন ও পরিশ্রম বিফল হয়।

কোন কোন সময়ে অনেক কাল ঔষধ সেবন ও চিকিৎসা করিয়াও সুফল জন্মে না। তখন আমাদের উচিত উত্তম জল বায়ু-বিশিষ্ট স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করা। কিন্তু রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাকে স্থানান্তরিত করা বিধেয়। উঠিতে বসিতে, যানারোহণে তাহার কিরূপ কষ্ট হইবে এবং সেই সামর্থ্যটুকু রোগীর আছে কি না, সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। আবার কোন্ রোগের কোন্ বিশেষ স্থানের জল বায়ু উপকার করে, এ সকল চিকিৎসকের মতসাপেক্ষ। সর্ব্বত্র সমভাবে রোগীর প্রধান প্রয়োজন শুশ্রূষা। চিকিৎসকের অপেক্ষা শুশ্রূষার দায়িত্ব গুরুতর ও অধিক কষ্টসাধ্য। উপযুক্ত শুশ্রূষা-গুণে দুশ্চিকিৎস্য পীড়া আরোগ্য হয় এবং তাহার অভাব বশতঃ সামান্য রোগ প্রবল হইয়া জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।

রোগীর শুশ্রূষা করা অতি কঠিন কার্য্য। দিবা নিশি অবিরাম আহার-নিদ্রা-বর্জ্জিত-প্রায় হইয়া পীড়িতের নিকট থাকিয়া পরিচর্য্যা না করিলে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। এজন্য জগতে যত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে পীড়াক্লিষ্ট ব্যক্তির সুস্থতা দানের চেষ্টা করা অতি প্রধান। যত পুণ্য কর্ম্ম লোকে করিয়া থাকে, পরে তাহার ফল লাভ করিবার আশায়, কিন্তু পীড়িতের শুশ্রূষার ফল হাতে হাতে লাভ হয়। যে মুহূর্ত্তে পীড়িত ব্যক্তির রোগের উপশম বা অবসান হয়, সেই মুহূর্ত্তেই শুশ্রূষাকারিণীর কঠিন পরিশ্রম সার্থক হয় এবং তাহার প্রাণে স্বর্গের সুখ আনিয়া দেয়। আর রোগীর সহিত সমব্যথী হইতে ও অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইতে পারিলে হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দ লাভ হয়। পুণ্যের পুরস্কার সুখেও হয়, দুঃখেও হয়।

কত ইয়ুরোপীয় ভদ্র ও কৃতবিদ্য মহিলা রোগীর শুশ্রূষার্থে নিজ গৃহ ও সংসারের সুখ সচ্ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া দেশ দেশান্তরে গিয়া নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। পীড়িতবর্গের আবাসভূমি ও চিকিৎসালয়ে সর্ব্বত্র রোগিগণ তাঁহাদের আত্মীয় জনের সমান। অবিশ্রান্ত জননীর মত স্নেহ মমতায় পূর্ণ হইয়া তাঁহারা পর-সেবায় নিযুক্ত।

এই মহৎ ব্রতের অনুষ্ঠানের উপযোগী শিক্ষা লাভ করা আমাদের প্রত্যেকের

কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কি গৃহে কি অপর স্থানে বঙ্গনারীগণ রোগীর শুশ্রূষা-রূপ পুণ্য কার্য্য করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বিদ্যুৎ ও তাহা ধরিবার উপায়।

প্রাচীনকালের অজ্ঞান লোকদিগের নিকটে বিদ্যুৎ একটী নিতান্ত অপরিচিত পদার্থ ছিল। ইহা কোথা হইতে আইসে, কোথায় চলিয়া যায়, তাহারা ইহার তত্ত্ব কিছুই জানিত না। ইহা ক্ষণিক, আকস্মিক ও অতি দূরস্থ কোনও বস্তু বলিয়া তাহাদের ধারণা ছিল; ইহাকে তাহারা ক্ষণপ্রভা বলিত। ইহার প্রকাশ দেখিয়া তাহারা চমকিত ও ভীত হইত। বিদ্যুৎ আপনা আপনি সুদূর আকাশ হইতে হঠাৎ দীপ্যমান হইয়া অন্ধকারময় পৃথিবী ও আকাশকে আলোকিত করিত, আবার তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া চক্ষু ধাঁধিয়া ফেলিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জ্জন ও অশনিপাত হইয়া ত্রিভুবনকে কম্পান্বিত করিয়া তুলিত। বিদ্যুৎ কি অজ্ঞাত নিগূঢ় পদার্থ! কি ভয়ঙ্কর!!!

মানবের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যত বিজ্ঞানচর্চ্চা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই এই আশ্চর্য্য বিদ্যুৎ পদার্থের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। কোনও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সূত্রযোগে ইহাকে নভোমণ্ডল হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ করিবার কৌশল বাহির করিলেন। কেহ এই চঞ্চলা চপলাকে যন্ত্রবিশেষের মধ্যে বদ্ধ করিয়া সুস্থির করিলেন; কেহ ইহাকে বার্ত্তাবহ দাসরূপে আপনার কার্য্যসাধনার্থ নিযুক্ত করিলেন। দূরস্থ বিদ্যুৎ নিকটস্থ হইল। ক্ষণপ্রভা স্থির সৌদামিনীরূপে দীপাধারে উপবিষ্ট হইয়া চারিদিকে জ্যোতি বিস্তার করিতে লাগিল। বিজ্ঞানের গভীর গবেষণাতে প্রকাশিত হইল যে, বিদ্যুৎ কেবল আকাশবিহারী একটী বস্তু নহে, কিন্তু ইহা সমুদায় বিশ্বসংসারব্যাপী। এই পৃথিবীর অণুতে অণুতে ইহা বিদ্যমান, আমাদের শরীরের পরমাণুতে পরমাণুতে ইহার অধিষ্ঠান। এখন বিদ্যুৎপ্রভাবে গৃহ ও নগর আলোকিত হইতেছে, ইহার শক্তি দ্বারা সহস্র সহস্র যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে। যে কার্য্য জল, বায়ু, অগ্নি, বাষ্প প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের স্বতন্ত্র বা সমবেত শক্তির অতীত ছিল, এই অদ্ভুত বৈদ্যুতিক শক্তিতে তাহা অতি সহজে সম্পন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ ইহা মানবসংসারে অসাধ্য সাধন করিতেছে। ইহা দ্বারা যে আরও কত অলৌকিক কার্য্য সম্পাদিত হইবে, তাহা এখন আমরা কল্পনাতেও স্থির করিতে পারি না। বিদ্যুতের গূঢ়তত্ত্ব আজিও বৈজ্ঞানিকের সম্পূর্ণ অগোচর।

আমাদের প্রাচীন ঋষিরা ঈশ্বরকে 'বিদ্যুৎপুরুষ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিদ্যুতের ইতিহাসের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের ইতিহাসের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাচীন, অসভ্য, অজ্ঞান মানবের নিকটে পরব্রহ্ম অতি দূরস্থ বস্তু ছিলেন। তাহারা মনে করিত, কোন আকাশে বা স্বর্গে তিনি বসতি করেন। তিনি অতি অজ্ঞেয় বস্তু, ক্ষণকালের জন্য যদি কখনও প্রকাশিত হন, সে কেবল মানবকে চমকিত ও ভীত করিবার জন্য। তিনি "মহদ্ভয়ম্ বজ্রমুদ্যতম্।" তিনি পাপীকে শাসন করিবার জন্য বিকট ভ্রূকুটি এবং ভয়ঙ্কর বজ্রনিনাদ করিয়া থাকেন।

অনভিজ্ঞ লোকদিগের নিকটে ঈশ্বরের স্বরূপ ও কার্য্যের কত ভীষণ ও বিকৃত কল্পনা! কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে মানবের সংস্কারের কত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যে অদৃশ্য নিরাকার পরমেশ্বর দূরস্থ আকাশের অন্তরালে থাকিয়া মানবকে কেবল আশ্চর্য্য ও ভীত করিতেন, মানব ক্রমে তাঁহাকে নিকট হইতে নিকটতর করিয়া দেখিতে লাগিল। সেই দেবতাকে "যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।"

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার—এই বলিয়া উপাসক দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উর্দ্ধ, অধঃ সকল দিকে তাঁহার চরণে অবনত হইয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদ্রতরঙ্গে, নদীর লহরীতে, পর্ব্বতের তুষার-ধবলশৃঙ্গে, বায়ুহিল্লোলে, পুষ্পকাননে, প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মধ্যে সেই ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। ক্রমে দেখিলেন যে, এই জড়জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে সত্তার সত্তা হইয়া তিনি বিদ্যমানঃ—"প্রাণোহ্যেষঃ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি" ইনিই সকলের প্রাণস্বরূপ যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সাধকগণ ক্রমে তাঁহাকে চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, ও প্রাণের প্রাণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। সেই দূরস্থ অজ্ঞেয় পরব্রহ্মকে আত্মস্থ করিয়া তাঁহারা দিব্য আলোকে আলোকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কি অদ্ভুত জ্যোতি!

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ।"

ঋষি বলিলেন সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকাও পারে না, বিদ্যুৎসকলও পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। তাঁহারই প্রকাশে এই বিশ্বসংসার অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এইরূপে সেই

ভয়ের বস্তু জগতের শাসনকর্ত্তা ও পাপীর শাস্তা পরমেশ্বরকে "সত্যং শিবং সুন্দরং" রূপে—হৃদয়াকাশের প্রেমচন্দ্ররূপে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত ও বিহ্বল হইতে লাগিলেন। নিজ জীবনের ও মানবসমাজের ঘটনা সকলের মধ্যে তাঁহারই মঙ্গলহস্ত দর্শন করিয়া তাঁহারই চরণে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন "In Him we live and move and have our being"—আমরা তাঁহার মধ্যে বাঁচিয়া আছি, বিচরণ করিতেছি এবং জীবন ধারণ করিতেছি। ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মসাধকের অন্তর বাহির উজ্জ্বল। ব্রহ্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি অদ্ভুত কার্য্য সাধনে সমর্থ। এই দিব্য আলোকে কোন্ অন্ধকার না দূর হয়? এই দৈব- শক্তিতে কোন্ অসম্ভব কার্য্য সম্ভবপর হইতে না পারে?

অধরা বিদ্যুৎ ধরা পড়ে বিজ্ঞান-কৌশলে। বৈজ্ঞানিক কঠিন ধাতুময় পাত্রে এক প্রকার দ্রাবক ঢালিয়া বিদ্যুৎ পদার্থ [illegible] করেন এবং সূক্ষ্ম তার-যোগে তাহা হইতে আলোক ও শক্তির বিচিত্র কার্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক একটী সামান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা অশেষ প্রকার অদ্ভুতকার্য্য সম্পন্ন হয়। মানবের হৃদয়পাত্র যখন বিশ্বাসে দৃঢ় হয় এবং তাহাতে ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়, তখন অগম্য অপার ব্রহ্ম সেইখানে ধরা পড়েন। তিনি বিশ্বাসীর জীবন্ত বর্ত্তমান দেবতা, তিনি ভক্তাধীন ভগবান্! বিশ্বাস এবং ভক্তিযোগে মানব সেই অরূপী ঈশ্বরের দর্শন পায়। তাঁহার সহিত আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া জ্ঞানেতে, প্রেমেতে, পুণ্যেতে, আনন্দেতে পরিপূর্ণ হয়। যত দৃঢ়তর বিশ্বাস, যত গভীরতর প্রেম, মানবাত্মা ততই পবিত্র হইতে পবিত্রতর আলোকে উজ্জ্বল হয় এবং ঐশী শক্তি অন্তরে লাভ করিয়া অলৌকিক কার্য্য সাধনে সক্ষম হয়। ব্রহ্ম অক্ষয় জলধি, আত্মা নদী তাঁহার সংযোগে চির দিন পরিপুষ্ট হইয়া অনন্তের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই যোগ অধ্যাত্ম যোগ—এই ব্রহ্মযোগে মুক্তি ও পরিত্রাণ।

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা স্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥"

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন "হে পার্থ! এই পরব্রহ্মে আত্মার স্থিতি ব্রাহ্মী স্থিতি, এ যোগ এক বার লাভ করিলে আর মোহাচ্ছন্ন হইতে হয় না, অন্তকালেও এই যোগে স্থিতি করিতে পারিলে জীব ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

পল্লীগ্রামে গৃহচিকিৎসা।

১। কাউর ঘা।

আমরা শত শত স্থলে দেখিয়াছি, যদি কোন ব্যক্তির পায়ে কিম্বা হাতে কাউরের ঘা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ যথাবিধি লাগাইলে, অর্থাৎ তিন দিবস ব্যবহার করিলে ঐ ঘা একেবারেই ভাল হইয়া যায়। চৈত্রমাস পড়িবার সময় যে সংক্রান্তি হয়, ইহাকে আমাদের দেশে ঘেঁটু-সংক্রান্তি বলে। ঐ সংক্রান্তি দিবসে যে ঘেঁটুফুল বা ভাঁট ফুল দিয়া ঘেঁটু-পূজা করা হয়, সেই ঘেঁটু গাছের পাতা কতক-গুলি আর এক তোলা আন্দাজ সোমরাজ একত্র করিয়া হুঁকার জল দিয়া শিলে বাটিয়া গরম করিতে হয়, এবং সামান্য গরম থাকিতে থাকিতে ঘায়ে লাগাইতে হয়। ইহা দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়। এই নিয়মে তিন দিবস ব্যবহার করিলেই নিশ্চয় রোগের শান্তি হইবে।

২। গাল ফোলার মহৌষধ।

সচরাচর জল ব্যবহার করিয়া যদি গালে ব্যথা হয়, কিম্বা যিনি সতত সাবধানে থাকেন এমন ব্যক্তির যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া গালে ব্যথা হইয়া থাকে, ইহার ঔষধের ব্যবস্থা এইরূপ আছে,—দারুচিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল দিয়া বাটিয়া ঐ ব্যথার জায়গায় লাগাইতে হয়। লাগান হইলেই একবার রৌদ্রের উত্তাপে গাল পাতিয়া স্থির হইয়া থাকিতে হয়। এই মত এক দিন করিলেই রোগের শান্তি হয়। গালে ব্যথার আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। আমাদের দেশে যে শ্বেত করবী ফুল ফুটিয়া থাকে, ঐ ফুল গাছের শিকড় আর কাঁই বীচি অর্থাৎ পাকা তেঁতুলের বীজ হুঁকার জল দিয়া বাটিয়া গরম করিয়া ব্যথায় লাগাইলে এক দিবসেই রোগের অবসান হইয়া যায়।

৩। আশুঁলা চাটা ঘার মহৌষধ।

মুখে কিম্বা মস্তকে অথবা গাত্রের কোন স্থানে যদি ঘা হইয়া থাকে, সেই ঘা দৈবক্রমে আশুঁলায় চাটিলে ঘা বড় বিপরীত হইয়া থাকে। আশুঁলায় চাটিয়াছে, কিম্বা না চাটিয়াছে, ইহা জানিবার একটি নিয়ম এইরূপ আছে। যে ঘা গুলি আশুঁলায় চাটিয়া থাকে, সেই ঘায়ের ধারে ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ-কুড়ী বিজকুড়ী বাহির হয়, আর রস বাহির হইতে থাকে। খুব রস বাহির হয় না, অথচ অল্প পরিমাণে সর্ব্বদাই বাহির হইতে দেখা যায়। এই ঘা আরোগ্য হইবার এই একটি বিশেষ ঔষধ বাহির হইয়াছে। তেঁতুল পাতা আর কুমীরে পোকার ঘর অর্থাৎ সেই ঘরের মাটীগুলি তেঁতুল পাতার সহিত মিশাইয়া হুঁকার জল দিয়া বাটিয়া গরম করিয়া

ঘায়ে লাগাইতে হয়। ইহা দুই দিবস ব্যবহার করিলেই রোগের শেষ বুঝিতে পারা যায়।

৪। কচিছেলের গা-বালসান।

কচিছেলের গা বাল্‌সাইলে আমাদের দেশে সেই ছেলের প্রতি প্রথমতঃ এইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। শনিবার কিম্বা মঙ্গলবার বাদ দিয়া যে কোন বারেই হউক ছেলেকে এক চামচ্ আন্দাজ উচ্ছেপাতার স্বত্ব কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হয়, কিম্বা এক বড় মটর কলাই প্রমাণ আলুই বড়ী প্রস্থৃতির স্তনদুগ্ধে ভিজাইয়া এক চামচ্ আন্দাজ ছেলেকে খাওয়ান হয়, ইহা করিলে ছেলে বাহ্যে ও বমী করিয়া কতক সুস্থ হয়। পরে এক কোষা রসুনকে ছাড়াইয়া সূতাতে বান্ধিয়া ছেলের গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়।*

* পাড়াগাঁর মেয়েরা ছেলের বালসা হইলে যে ঝাড়ার মন্ত্র ব্যবহার করেন, তাহা পাঠিকাগণের গোচরার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে, যাঁহার শ্রদ্ধা হয় ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। মন্ত্রের গুণ হউক না হউক, ঝাড়নের গুণে অনেক পীড়ার আরাম হয়।

বালসা ঝাড়া।

সাজ বালসা সাজ লতী,
কেন বালসা এত রাত্তি,
পো হাসে পুয়াতী হাসে,
সাজ বালসা ধুলায় নাশে,
কাঁউর থেকে এলো বুড়ী,
হাতে লইয়া রসের ডালী,
এ রসের নাম কি—স্বরূপ
এ রস থাকে কোথা?
সাত সমুদ্র লঙ্কাপারে,
আমাদের কচী খোকার
গাত্র হইতে এক্ষণি যা,
এক্ষণি যা, এক্ষণি যা।
এই বাক্যটি তিনবার বলিতে হয়।

৫। নবজ্বরের মহৌষধ।

আমাদের দেশে যদি কাহারও নবজ্বর হয়, তাহা হইলে অগ্রেই ডাক্তার দেখান হয় না, বাটীর গৃহিণীরা অগ্রেই নানামত গৃহচিকিৎসা অর্থাৎ গাছ গাছড়া, লতা পাতা ইত্যাদি আনিয়া ঔষধ তৈয়ার করিয়া খাওয়াইয়া দেন। এই গাছ গাছড়ার ঔষধ যদি কাহারও আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তিনি এই সকল লইয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে পারিবেন। হঠাৎ যদি কাহারও নবজ্বর হয়, তাহা হইলে ঐ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে এই ঔষধ খাওয়ান হয়। এক ছটাক আন্দাজ বিল্বপত্রের স্বত্ব (ইহাতে জল যেন না থাকে), আর এক তোলা আন্দাজ মুথাঃ ঘাসের স্বত্ব, এবং একটা হরিতকীর ছাল, ও স্বল্প পরিমাণ জুয়ান, এই কয়টি দ্রব্য একত্রে বাটিয়া ঐ বিল্বপত্রের স্বত্ব ও মুথা ঘাসের স্বত্বের সহিত মিশাইয়া রোগীকে খাওয়াইতে হয়। আর যদি রোগীর তলপেটে ব্যথা থাকে, তাহা হইলে মাতাঘলার সঙ্গে যে আমলা থাকে, সেই আমলাকে কাঁচা দুগ্ধের সহিত শিলে বাটিয়া গরম করিয়া নাভিস্থলের চারি ধারে চাপন দিতে হয়, ইহা হইলে পেট ব্যথার যাতনা অবিলম্বেই আরোগ্য

হয়। আর যদি গায়ের খুব ব্যথা থাকে অর্থাৎ গা সমস্ত টাটাইয়া উঠে, তাহা হইলে খুঁদে মেথি ভাজিয়া এক মুষ্টি চাউল ভাজার সঙ্গে মিশাইয়া চিবাইয়া খাইতে হয়। ইহা হইলে অচিরে গায়ের ব্যথা আরাম হয়।

৬। রক্ত আমাশয়ের মহৌষধ।

যদি কাহারও রক্ত আমাশয় হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশে এই গৃহ-ঔষধ ব্যবহার করা হয়। কদবেলের পাতা, আর তেঁতুল পাতা, থুনকুড়ী ও ভুঁই-কামড়ী ও বাবলা গাছের কুঁড়ী এইগুলি একত্রিত করিয়া শিলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জলের সহিত বাটিয়া উহার রস বাহির করিয়া প্রাতঃকালে দিবসে একবার করিয়া খাওয়াইতে হয়। ইহা এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলেই রোগের অন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত এই রোগে আরও একটি ঔষধ ব্যবহৃত হয়, ইহাও প্রসিদ্ধ ঔষধ। শনিবার কিম্বা মঙ্গলবারে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে নাই। বুধবার বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার, এই তিন দিবস ব্যবহার করা যায়। প্রাতে শয্যা হইতে যখন ওঠা হয়, তখন মুখ না ধুইয়া অর্থাৎ বাসি মুখে কতকগুলি তেলাকুচার পাতা আনিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া হাতে করিয়া রগড়াইয়া এক তোলা আন্দাজ স্বত্ব বাহির করিয়া প্রথমতঃ রোগীকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। তৎপরে ঐ স্বত্ব বাহির করিয়া যে তেলাকুচা পাতার সিটেগুলি থাকিবে, সেইগুলি হাতে করিয়া লইয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলির টীপন দিয়া কিঞ্চিৎ স্বত্ব বাহির করিয়া অর্থাৎ ঐ স্বত্ব ঐ বৃদ্ধ অঙ্গুলি করিয়া লইয়া রোগীর অষ্টাঙ্গে আট ফোঁটা দিয়া অর্থাৎ মস্তকে, দুই স্কন্ধদেশে, বক্ষে ও দুই কর্ণে ও পৃষ্ঠদেশে দিয়া পরে অন্তরে ফেলিয়া দিতে হয়। এই মত নিয়ম তিন দিবস করিলেই রোগের উপশম হয়।

(ক্রমশঃ)।

ত্রিকূট পশু।

সারমেয়, শার্দ্দূল ও মার্জ্জার এই ত্রিবিধ জন্তুর জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি ও প্রকৃতি প্রায় একই প্রকার; এই জন্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কুকুর, বিড়াল ও ব্যাঘ্র 'ত্রিকূট' পশু নামে অভিহিত হইয়াছে। ইংরাজি ভাষায় ঠিক্ এইরূপ অর্থব্যঞ্জক কোনও শব্দ নাই বটে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মহাশয়েরা "Feline species" শ্রেণীর মধ্যে বিড়াল ও ব্যাঘ্রকে সন্নিবিষ্ট করিয়া উভয়ের প্রকৃতির একতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা আরও একটু সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইতেন যে, কয়েকটী সামান্য বিষয় ভিন্ন এই তিনটি জন্তু প্রায় একই প্রকার প্রকৃতির

পশু। ব্যাঘ্রাদি ভয়াল হিংস্র শ্বাপদ সমূহ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু বোধ হয় এমন দিনই নাই যে দিন অন্ততঃ আমরা একটিও কুকুর বা বিড়াল দেখিতে না পাই। ইহাদিগকে "গৃহপালিত" বা "গ্রাম্য পশু" বলা যাইতে পারে; গৃহস্থের সহিত পৃথিবীর আর কোনও পশুর এত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ নাই; সুতরাং ইহাদের প্রকৃতি ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। অনেক সময়ে ইহারা আমাদের প্রভূত উপকার ও ব্যবহারে আইসে এবং অতি শীঘ্র বশ্যতা স্বীকার করে। একবার পালিত বা পোষিত হইলে ইহারা প্রভুর নিতান্ত অনুগত হয় এবং অসাধারণ প্রভুভক্তি, স্বার্থত্যাগ, আনুগত্য, বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সদৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই জন্য অনেক বুদ্ধিমান ধনী পুরুষ আপনাপন বালক বালিকাকে পোষিত কুকুর ও বিড়ালের সহিত খেলা করিতে দেয়।

জর্ম্মণির উদ্ভিদ্‌মাত্রভোজী পণ্ডিতেরা সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ অথবা আফ্রিকার ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে কুকুর বা বিড়ালকে শিশুকাল হইতে মৎস্য বা মাংস খাইতে না দিলে এবং যাবজ্জীবন নিরামিষাশী করিয়া রাখিলে অথবা মাসে একবার কিম্বা দুইবার মাত্র মাংস খাইতে দিলে তাহাদের স্বাস্থ্য বা শক্তির হানি হয় না। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা এই মতের সারবত্তা স্বীকার করিয়াছেন। গেজ্‌লার নামক একজন পশুপ্রিয় সাহেব লিখিয়াছেন "আমার একটি প্রিয় সারমেয়কে প্রথমে আমি তিন মাস কাল প্রতি সপ্তাহে দুইবার মাত্র মাংস দিতাম, তদনন্তর প্রতি মাসে দুইবার এবং তাহার পরে এক মাস অন্তর একবার করিয়া আমিষ দেওয়া হইত। কিছুদিন পরে উহাকে আদৌ আমিষ দেওয়া হইত না, এজন্য তাহার দুর্ব্বলতা বা ভীরুতা লক্ষিত হয় নাই। আমার আর একটি কুকুরকে কখনই মাংস খাইতে দিই নাই; এই কুকুর বলবান্‌ ও সাহসী হইয়াছিল, কিন্তু কি কারণবশতঃ বলিতে পারি না অধিক দিন বাঁচে নাই। বোধ হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইলে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারিত।" যাহাই হউক, যে দেশে সূর্য্যের রশ্মি প্রখর, সে দেশের অধিবাসীদিগকে যেমন মৎস্য, মাংস বা সুরার আধিপত্য স্বীকার করিতে হয় না, সেইরূপ সে দেশের কুকুর বা বিড়ালেরা আমিষ পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে অক্ষম হয় না; কিন্তু ব্যাঘ্রাদি পশুর পক্ষে এ কথা খাটে কিনা, সন্দেহস্থল। প্রবাদ আছে লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ নবাব ওয়াজিদ্‌ আলি সাহ একটি ব্যাঘ্র-শিশুকে নিরামিষাশী করিয়া নয় মাস পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ব্যাঘ্রী, বিড়ালী ও কুকুরী গর্ভবতী হইলে ভয়ানক আকার ধারণ করে, তখন তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া থাকে। এই সময়ে ইহারা কাহাকে দংশন করিলে অথবা কাহারও গাত্রে নখ বা দন্ত বসাইয়া দিলে

সর্ব্ব শরীর বিষাক্ত হয়। এই তিন প্রকার জন্তুর কপোলে এবং নাসিকারন্ধ্রের পার্শ্বে লম্বা লম্বা ও অল্প অল্প যে লোম জন্মে, তাহা নিতান্ত বিপজ্জনক। এই লোম সকল বিষে পূর্ণ। দুগ্ধ বা খাদ্য দ্রব্যের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া যদি ভোক্তার উদরে যায়, তাহা হইলে গলা হইতে পেট পর্য্যন্ত পীড়িতহইয়া থাকে। প্রাচীন বৈদ্য-গ্রন্থেও এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং যে যে স্থানে ব্যাঘ্রের ও কুকুর বিড়ালের সংখ্যা অধিক, সেই সেই স্থানের লোকেরা এই জন্য বিশেষ সাবধানে থাকে। মনুষ্যের মস্তকের কেশও ভাল জিনিষ নহে। গলার ভিতরে প্রবেশ করিলে গলার স্থানে স্থানে বেদনা অনুভূত হয় এবং পাক-শক্তির হীনতা উৎপাদন করে অথচ একবার প্রবেশ করিলে শীঘ্র নির্গত হয় না।

একটি বিষাক্ত সর্প আর একটি বিষাক্ত সর্প দ্বারা দংশিত হইলে যেমন মৃত্যুগ্রাসে পতিত অথবা পীড়িত হয় না, কুকুর বা বিড়ালদিগের মধ্যে তাহা নহে। একটি কুকুর আর একটী কুকুর কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া পীড়িত অথবা মৃত হইয়াছে, ইহা আমরা অনেকবার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহার কারণ এই যে, কুকুর ও বিড়াল জাতীয় পশুদিগের মধ্যে সকলের বিষ সমান নহে; বিষের তীব্রতা ও লঘুতা ইহার কারণ। কিন্তু কুকুর বা বিড়াল ভয়ানক বিষাক্ত অহি কর্ত্তৃক দংশিত হইলেও মরে না বা পীড়াগ্রস্ত হয় না। কাশীপুর রাসায়নিক কারখানার অধ্যক্ষ (কেমিকেল ওয়ার্কস্) শ্রীযুক্ত ডেবিড ওয়াল্ডি সাহেব গভীর পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ব্যাঘ্র, কুকুর, বিড়াল, সর্প এবং নেউল এই কয়েকটি পশুর শরীরের প্রধান প্রধান অংশসমূহ এক প্রকার জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে, তাহা বিষঘ্ন, সুতরাং বিষে জর্জ্জরিত হয় না। এ কথা কতদূর ঠিক্ বলিতে পারি না; কিন্তু কুচলা খাওয়াইয়া অনেক কুকুরকে বেদিয়া ও ব্যাধেরা মারিয়াছে, ইহা চক্ষে দেখিয়াছি। উক্ত সাহেবের মতে হনুমান, মনুষ্য, গবাদি প্রাণীর শরীরে সর্প বিষের টীকা দিয়া যদি তাহা-দিগকে কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাঁচাইয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে ইহারা বিষে মরে না। আমরা এতদূর বৈজ্ঞানিক হই নাই যে,ইহার সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখি। যাহাহউক, খাদ্য-দ্রব্যে বিড়াল বা কুকুরের মুখের লালা যাহাতে মিশ্রিত না হয়, প্রতি গৃহস্থের তাহাতে সাবধান থাকা উচিত। অনেক সময়ে কুকুর ও বিড়ালে সর্প খাইয়া থাকে এবং মুখে মৃত সর্প অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাখে। স্ত্রীলোকদিগের এই কথাটি যেন মনে থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রে এই জন্য কুকুর ও বিড়াল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট খাদ্যাদি ভক্ষণ বা গ্রহণের নিষেধ ও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যদি কোনও সময়ে কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক এইরূপ খাদ্য খাইয়া পীড়িত হয়েন এবং তাহা স্পষ্টতঃ জানিতে পারেন, তাহা

হইলে তিনি যেন তদ্দণ্ডে বাঘা ভেরেণ্ডা (এরণ্ড) গাছের কিয়দংশ মূল অতি পুরাতন ইক্ষু গুড় বা পুরাতন ঘৃতের সহিত বাটিয়া ভক্ষণ করেন, এবং দুই তিন দিন পর্য্যন্ত শাক ও অম্ল এবং মিষ্টান্ন ভক্ষণ না করেন। ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কিছুদিন বিলম্বে পীড়ার কারণ জানিতে পারিলে, অপামার্গ (আপাং) গাছের মূল (অর্দ্ধ তোলা) পাঁচটি গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইবেন। ঐ দিবস তিন চারি বার স্নান এবং শীতল বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য, নতুবা শরীর ও মস্তিষ্ক অত্যন্ত গরম হয়। ইহাও অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ রোগে পুনঃপুনঃ স্নান এবং কাঁজি বা আমানি পান ও লেবুর সরবৎ বা লেমনডের ব্যবস্থা করিতেন।

বিড়াল অপেক্ষা কুকুরের প্রভুভক্তি প্রসিদ্ধ। মূষিক, সর্প প্রভৃতি নিবারণ পক্ষে মার্জ্জার বড় উপকারী। কিন্তু বহির্দ্দেশের শান্তিরক্ষা-হেতু কুকুর অপেক্ষা আর কোনও জন্তুই অধিকতর উপকারী নহে। কুকুরের স্মরণশক্তি বিড়ালের অপেক্ষা অধিক, কিন্তু দ্রুতগতি ও পরিশ্রমপরায়ণতায় সারমেয় অপেক্ষা মার্জ্জার অধিকতর পটু। পালিত কুকুর ও বিড়াল অল্প আহারেই সন্তুষ্ট হয়, অপালিত পশু সেরূপ নহে। কুকুর ও বিড়াল সম্বন্ধে অনেক গুরুতর, প্রয়োজনীয়, এবং কৌতুককর নূতন কথা জানিবার আছে; পাঠিকাদিগের তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার উপনগর ইটালির কৈলাসচন্দ্র-হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ে বঙ্গের ছোট লাট উপস্থিত হইয়া বালিকাদিগকে স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় ২৩ বৎসর চলিতেছে। গত ছয় বৎসরে ৬৫টী বালিকা নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৯টী বৃত্তি পাইয়াছে।

২। গত ৯ই এপ্রেল রাজবাড়ী হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছে।

৩। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত স্যার মনিয়ার উইলিয়মসের মৃত্যু হইয়াছে।

৪। গত ৯ই এপ্রেল রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় দার্জ্জিলিংএ ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। কম্পন প্রায় একমিনিট ছিল।

৫। গত ১লা এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে কলিকাতার মৃত্যুসংখ্যা এ বৎসর ৫২৩, গত বৎসর ২৮৪ মাত্র হইয়াছিল। প্লেগে প্রায় ১০০ শত লোক মরিয়াছে।

৬। গত ৮ই এপ্রেল রাত্রি ১০ দশটার পর দিল্লী অঞ্চলে প্রকাণ্ড দ্বাদশটী উল্কাপাত হয়।

৭। বড় লাট লর্ড কুর্জ্জন শিমলা দর্শনে বড়ই সুখী হইয়াছেন। তিনি আশা করেন এই শান্তিময় স্থলে গুরুতর রাজকার্য্য সকল সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

৮। রুষিয়ার ভল্‌গা নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

৯। গত ২১ মার্চ্চ শ্রীহট্ট অঞ্চলে ৬ ঘণ্টার মধ্যে ৭ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। অনেক বাড়ী ফাটিয়া গিয়াছে।

১০। গত ১৫ই চৈত্র ফরিদপুরে যে ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়াছে, তাহাতে ১০। ১২টি গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার গৃহ চূর্ণ হইয়াছে। ছোট বৃক্ষাদি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে, একস্থানে লৌহ শৃঙ্খলবদ্ধ ৬।৭ মণ ওজনের লোহার সিন্ধুক ২৫।৩০ হাত দূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ১৩।১৪ জন লোক মরিয়াছে, অসংখ্য গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে।

১১। ইহুদিদিগের আদিম বাসস্থান প্যালেষ্টাইনে বর্ত্তমান ইহুদিসংখ্যা একলক্ষ। ইহুদিরা প্রবাস হইতে বোধ হয় স্বদেশে ফিরিতে অনুরাগী হইয়াছে।

১২। গত ২৪এ মার্চ্চ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউট হলে অনাথ আশ্রমের বার্ষিক সভায় ছোটলাট সভাপতিত্ব করেন। আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণার্থ রায় মন্মথনাথ মিত্র ১০ হাজার এবং অন্যান্য মহাত্মাগণের দান সভাস্থলে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

১৩। সেনাপতি গর্ডনের স্মরণার্থ তাহার বীরত্বস্থান খার্টুমে যে কলেজ হইতেছে, বিলাতের লোক এ পর্য্যন্ত তাহার ফণ্ডে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১৪। কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে রেজোয়ান বাবা নামক মুসলমান ১৩৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার পত্নী আয়েসা সিদ্দিকার ১০০ বৎসরে মৃত্যু হয়। উভয়েই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল ছিলেন।—সুধাকর।

পুস্তক-সমালোচনা।

কেনিলওয়ার্থ—শ্রীশরৎ চন্দ্র মিত্র প্রণীত, মূল্য ১৷০ টাকা। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী উপন্যাসলেখক সার ওয়াল্টার স্কটের প্রণীত "কেনিলওয়ার্থ" বঙ্গীয় পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক ভাষান্তর কার্য্য এরূপ সুনিপুণরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে, ইহা মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া ভ্রম হয়। বস্তুতঃ ইংরাজী নাম সকল না থাকিলে ইহা যে ইংরাজী হইতে গৃহীত, তাহা কোনও মতেই প্রতীত হইত না। ভাষা যেমন বিশুদ্ধ, সেইরূপ সরল ও যথাযথ ভাববাঞ্জক হইয়াছে

এবং বর্ণনাগুলি অতি সুন্দর সুচিত্রিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে যিনি আরম্ভ করিবেন, শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না। নবীন লেখকের এই লিপিনৈপুণ্যের জন্য আমরা তাঁহাকে সহস্র সহস্রে ধন্যবাদ করি এবং আশা করি সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি অচিরে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইতে পারিবেন। ইহাঁর গুণের সমুচিত সমাদর হওয়া আবশ্যক। কেনিলওয়ার্থের গল্পটী অভিনয়োপযোগী বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং ইহা শোকান্ত।

বামারচনা।

অণুর জাতকর্ম্ম।

ছিনু সবে, দূরে দূরে আপনা লইয়ে,
আজ কেন মিলিয়াছি? কার সাড়া পেয়ে?
আজিকে সবারে ডাকি আনিল কে বল?
কার তরে এত হাসি এত কোলাহল? ১
আজ হেথা শুভদিনে বন্ধুগণে মিলি
এসেছি পুজিতে দেবে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।
সিদ্ধিদাতা পিতা তুমি সিদ্ধ হোক তবে
স্বরগের শিশুটীর 'জাত কর্ম্ম' ভবে। ২
আজ হ'তে তুমি ওরে চিহ্ন দিয়ে রেখো,
সংসার সংগ্রাম মাঝে ওরে তুমি দেখো।
স্বরগকুমার আহা জানেনা সংসার,
বুঝে না কেমন ধারা কিবা রীতি তার। ৩
অমর বন্দিত ধামে এ শিশু সুন্দর
ছিল যবে; তুমি তার করেছ আদর,
তোমারি সুখের কোলে করিত বিহার,
বিশ্বরাজ তুমি তার লয়েছিলে ভার। ৪
এবে বল দয়াময় কার হাতে তারে
দিলে সঁপে; নিরাপদে সদা রাখিবারে?
কোন্ দোষে বল বিভু স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে
দেব শিশু 'অণু' এল মানব আলয়ে? ৫

স্বরগ উদ্যানে বসি শিশু সুকুমার,
আছিল বিকাশি কত সৌন্দর্য্য অপার,
অজানিত সেই ধামে হেন কত ফুল,
রেখেছ সাজায়ে তুমি, শোভায় অতুল! ৬
আছে ফুটে কত শত পারিজাত সেথা,
এ কলিকা এল হেথা ল'য়ে কি বারতা?
তুমি তারে পাঠায়েছ কণ্টকের মাঝ,
(তাই) বৃন্তচ্যুত ফুল হেথা ফুটিয়াছে আজ। ৭
দিলে যদি দিব্য রত্ন আমাদের করে,
লইব তোমার দান পরম আদরে।
তোমারি আশীষোপরি করিয়া নির্ভর
ফুটাতে পারিগো যেন এ কলি সুন্দর। ৮
হেথা তার কিছুই যে জানা শোনা নাই,
এসেছে দীনের মত আমাদের ঠাঁই,
সুরপুরবাসী শিশু, স্বরগ বিভব
বিলায়ে লইল করি আপনার সব। ৯
এই মত শিশু যেন থাকে প্রফুল্লিত,
সংসার কণ্টকাঘাতে না হয় ব্যথিত।
মলিনতা যেন ওরে না পারে ছুঁইতে,
অকলঙ্ক হাসি টুকু না পারে মুছিতে। ১০

পিতার আশীষে 'অণু' থাকে যেন সুখে,
বরষি অমিয় রাশি সবাকার বুকে।
ধন্য হবে পিতামাতা আর পরিজন,
পূর্ণ হবে আনন্দেতে মাসিমার মন। ১১
(অণু) ত্রিদিবদুর্লভ তুমি পারিজাত ফুল
আলো করে ছিলে পূত মন্দাকিনী-কূল।
দেববালা—মনোলোভা সে বিমল বিভা,
(হেথা) এসেছ কি বিকশিতে ; সে নন্দন-
শোভা। ১২
সত্য পথে 'অণু' তুমি থেক অনুক্ষণ,
পিতারে দেখায়ে করো সন্দেহ ভঞ্জন,
সুমধুর হাসে, ভাষে, নাশিও বিষাদ,
শুভ দিনে মাসিমার এই আশীর্ব্বাদ। ১৩

শ্রীমতী কমলিনী -

বিদায়।

(রাণী কুসুমকুমারী দেবী মহাশয়ার স্থানান্তর গমনোপলক্ষে প্রীতি-উপহার)।

কত ফুল ফোটে এই সংসার কাননে—
মানবের প্রীতি তরে—দেব-আরাধনে ;
সকলে মানব-যোগ্য, হয় না দেবের ভোগ্য,
সুবাসে করে না কারো আকুল পরাণ—
করে না সবার কাছে আত্মবলিদান।

কত স্নেহ যত্ন করে আপন উদ্যানে—
রোপে চারু গাছগুলি অতি সযতনে ;
একে একে ফোটে যবে, কুসুম কলিকা সবে,
দেয় না সুবাস তারা মধু নিরমল,
আপন গরবে যেন সদাই চঞ্চল।

নিবিড় অরণ্যে কোথা কোন্ এক পাশে—
ফুটে আছে কেতকিনী আপন সুবাসে ;
করেছে জগত স্তব্ধ নিজ গুণে, নাহি শব্দ,
শত দূর থেকে সবে টানে সযতনে,
আকুল সতৃষ্ণ হয়ে ধায় তার পানে।

তেমনি এ কণ্টকিত সংসার কাননে—
রমণী কুসুম ফোটে অতি সংগোপনে ;
কোমল জীবনগুলি, ফুলের কোমল কলি,
ফোটে তারা নিতি নিতি সুগন্ধ সুন্দর,
স্রষ্টার উদ্দেশ্য মহা সাধে নিরন্তর।

ভক্তি, প্রীতি, প্রেম দিয়ে সাজাইয়ে সবে,
পাঠালেন ধাতা এই মরুময় ভবে,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যেথানে যা কিছু ধরে,
সকলই দে'ছেন, কিন্তু সকলই অসার ;
কেহই করে না কার্য্য জগতে তাঁহার !

সকলেই স্বার্থপর, নিজ স্বার্থ লয়ে
কাটাতেছে দিন যামী ব্যতিব্যস্ত হয়ে,
নিজের সুখের তরে, ঘুরে মরে নারী নরে
ঢালে না নিঃস্বার্থ প্রেম জগতের পরে,
চাহে না অনাথ পানে বারেকের তরে !

এ'রো মাঝে দেখা যায় রমণী রতন
দেবতার আশীর্ব্বাদে দেবীর মতন।
মানবীতে দেবী যারা, খুঁজে মেলা ভার তা'রা,
থাকে কোথা কোন্ এক নিভৃতে গোপন,
নীরব নিস্তব্ধ ভাবে কাটায় জীবন।

তেমনি তুমি লো সখি ! রমণী-প্রধান,

দেবতার আশীর্ব্বাদে দেবীর সমান।
আছে তোর হৃদে যত, মণি মুক্তা মরকত,
পেয়েছি যে দিন সখি! সন্ধান তাহার
হয়েছি বিমুগ্ধ আমি কি ক'ব লো আর?

জগতের কোথা এক নিভৃত প্রদেশে—
জন্মেছ তুমি লো সখি দেবের আশীষে,
তাঁর প্রিয় কার্য্য তরে, পাঠায়ে দেছেন তোরে
অসম্পূর্ণ কত কাজ রয়েছে জগতে,
সম্পূর্ণ করিতে হবে তোর জীবনেতে।

জগতের ধনৈশ্বর্য্য গৌরব-বিক্রম—
তোর কাছে নহে সখি কিছুই তো কম
সে সকল তুচ্ছ তোর, ভগবৎ-প্রেমে ভোর
তোর ও অমূল্য হৃদি সদা প্রেমময়,
নিভৃত কামিনী ফুল প্রেমই বিতরয়।

নিভৃতে থাকিয়া সখি করিছ সাধন—
আপন জীবন ব্রত করিয়ে যতন;
নানাদেশে প্রেম রাজ্য, করিতে তাঁহার কার্য্য,
তাই কি প্রবাসে সখি করিছ প্রয়াণ,
করিবে প্রেমের কার্য্য—প্রেম শিক্ষা দান?

ভাই বোন্ আমাদের রয়েছে তো কত,
ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন জীবন সতত;
যাও সখি সেই খানে, তাদের বিশুষ্ক প্রাণে
ঢালো গে অমৃতধারা প্রেমবারি দিয়া,
তৃপ্ত হোক মরু প্রাণ তোমা পরশিয়া।

চারি দিকে কত কাজ রয়েছে পড়িয়া,
সম্পূর্ণ করগে সব জীবন ভরিয়া—
ভগবান সাথী করে, চলে যেও পথ ধরে,
জীবনের সদাব্রত ক'রো উদ্‌যাপন,
মস্তকে রাখিয়া সদা বিভুর চরণ।

এ প্রার্থনা করি আজি তাঁহার চরণে—
চরণে রাখেন (তোমা) যেন জীবনে মরণে,
বিদায়ের শেষদিনে, এনেছি অতি যতনে
সামান্য এ ক্ষুদ্র অতি কবিতার হার,
নে'বে কি লো সখি এই প্রীতি-উপহার?
ল'ও যদি হাসি মুখে,
চলে যাব মহা সুখে,
বিদায়ের দিনে সখি এই উপহার।

তোমার স্নেহের ভগিনী—
মেদিনীপুর।

বাল্যসখী সরলা।

প্রাণাধিকা প্রিয়তমা বাল্য সহচরি,
স্নেহের কুসুম-হার সরলা আ মরি!
ভুলি নাই প্রাণসখি ভুলিতে কি পারি?
শয়নে স্বপনে সদা তোমারে নেহারি। ১

যত স্নেহ করিয়াছ সব আছে মনে,
শৈশব কালের মিল ভুলিব কেমনে?
বাল্য-স্নেহ ডোরে বদ্ধ আছি গো দুজনে,
ভুলিতে নারিব সখি তোরে এ জীবনে। ২

রেখেছি তোমারি স্নেহ হৃদে সদা ধরি,
তব প্রীতি-ফুল-মালা গলে আছি পরি,
ও কমল মুখ চারু অঙ্কিত এ হৃদে,
পারে কি ছাড়িতে হৃদি সরলা সুহৃদে? ৩

শিশুকালে কত গল্প করেছি দুজনে,
এখনও সে কথা জাগে সদা মোর মনে।
সে সুখের দিন ফিরে আসিবে কি আর,
ফিরে কি গো দেখা সখি! পাইব তোমার? ৪
প্রাণসখী সরলার কি সরল মন,
স্রোতস্বিনী ভাগীরথী বহিছে যেমন!
অমন সরল মন আমি যদি পাই,
ধরা ছাড়ি স্বর্গধামে যাইতে না চাই। ৫
আহা সতী পতিব্রতা সরলা কুসুম,
এ ধরার নও তুমি স্বর্গের প্রসূন,
এ সরল ফুলে সাধ করে পরি গলে,
আহা মোর প্রিয় ভগ্নি সরলা নির্ম্মলে। ৬

প্রাণ-ভগ্নি! আছ কত দূরদূরান্তরে,
তব বাল্যসখী-প্রাণ কাঁদিছে কাতরে।
দুজনে সুদিনে কি গো দেখা হবে ফিরে,
পুনশ্চ সে দিন বিধি ফিরাইবে কিরে? ৭
হইবেক দেখা ভাই আশা আছে মনে,
আশা নাহি ত্যজে কভু মনুষ্য জীবনে,
তোমারি মিলন আশা আছে মোর মনে,
রেখেছি আশায় হৃদি বাঁধিয়া যতনে। ৮
এখন বিভুর পায় এই ভিক্ষা চাই,
যে, যেখানে আছ সবে সুখে থাক ভাই,
ইহার অধিক আর কি বলিতে পারি,
জানেন হৃদয়-কথা হৃদয়-বিহারী। ৯

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

চুরি।

আমি অভাগা বলিয়ে
মা কি মোরে ভুলে রবে?
অধম চঞ্চল বলে
কোলে তুলে নাহি লবে?
অপদার্থ বলে কি গো
মা তোমার স্নেহধারা
বর্ষিবে না শুষ্ক হৃদে
রহিব কি মরুপারা?
সবিত দিয়াছ মোরে
কিছু অপ্রতুল নাই।
কিন্তু হায়! দীনা আমি
ভুঞ্জিতে অক্ষম তাই।
দৃঢ়তা কিছুতে নাই
উচ্ছৃঙ্খল এ জীবন,

তাই উপেক্ষিয়া আছি
মার দত্ত সব ধন।
হৃদয়েতে যত কিছু
বিভবের প্রয়োজন,
দিয়াছে সকলি সে যে,
তবু আমি অভাজন।
সবারে যতনে আমি
রক্ষিতে পারিনে বলে,
উপেক্ষা করিয়া সবে
একে একে গেছে চলে।
দয়া প্রীতি প্রেম ভক্তি
পবিত্র বিভব যত,
সত্য ক্ষেম ধৈর্য্য নীতি
অমূল্য ভূষণ কত।

আদরে যতনে মাতা
সাজায়ে দিছিল মোরে,
সব হয়ে গেছে চুরি
আমার দুর্ভাগ্য-ফেরে
কখন করিল চুরি
নাহি জানি অচেতন,
দুর্জ্জয় অলস ঘুমে
ছিনু মোহে নিমগন।
অবসর পেয়ে চোর
পশিয়া প্রাণের পুর,
নিয়াছে সর্ব্বস্ব হরি—
মম হৃদি-কোহিনুর।

শ্রীঅম্বিকা সুন্দরী সেন।

গুরু-দক্ষিণা।

কৈশোরের গুরুদেব তুমি গো আমার,
ভকতি কুসুম দলে,
প্রেম জাহ্নবীর জলে,
প্রাণে প্রাণে নিতি পূজি চরণ তোমার।১
তব চিত্রপট যদি নেহারি নয়নে,—
বুকে কৃতজ্ঞতা স্রোত,
বহে মোর ওত প্রোত,
অমনি নমি গো দেব লুটায়ে চরণে। ২
কল্পনা সুন্দরী মোরে তোমারি দয়ায়,—
অসীম সোহাগ ভরে,
ধরিয়া যুগল করে,
স্বরগ আসন মাঝে যতনে বসায়। ৩
তোমারি দয়ায় দেব তোমারি দয়ায়,—
কবিতা সুন্দরী আসি,
ঢালেগো অমিয়ারাশি,
অমনি কৃতজ্ঞ রসে চিত উথলায়। ৪
বুঝেছি আমি গো দেব! তোমারি কারণ—
নবীন (১) নবীন কবি,
বঙ্কিম (২) স্বর্গের ছবি,
রবিতে (৩) নাহিক ছায়া সবি অতুলন। ৫
ভারত মাতার তুমি উজ্জল রতন!
দয়া ক্ষমা স্নেহ প্রীতি
ও হৃদয়ে রাজে নিতি,
আমি দেখি ও হৃদয়ে অমর ভুবন। ৬
দলাদলি সম্প্রদায়ী তোমারি দয়ায়,
শিখিয়াছি বড় হেয়,
জগতের অবজ্ঞেয়,
সেই গো দেবতা সত্য প্রেম যে ছড়ায়।
বামাবোধিনীতে করে বামা-বোধোদয়।
আমি তোমা দেখি যেন,
স্বর্গীয় দেবতা হেন,
সাধে কি কৃতজ্ঞ রসে উথলে হৃদয়! ৮
শতবার পড়ি তব পত্র যবে পাই,
দেব গো তোমার পত্রে,
সুধা ঝরে ছত্রে ছত্রে,
সাধে কি বিভল হ'য়ে চরণে লুটাই! ৯
স্মরিতে তোমার গুণ উথলে হৃদয়,
যত দিন রবে বিশ্ব,
তুমি গুরু আমি শিষ্য,
এ সম্বন্ধ যেন নাহি বিদূরিত হয়। ১০

কি দিয়া তোমারে গুরু! করিব পূজন,
দুর্ব্বলা অবলা নারী,
কি তোমারে দিতে পারি?
ধর কৃতজ্ঞতা-গুরু-দক্ষিণা এখন। ১১

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

মরণ।

জীবনের ঊষারাণী!
কোথায় মরণ এস!
বড় ভাল বাসি তোরে
এ দুখ তামস নাশ।১।

পারি না বহিতে আর
এ অলস দেহ ভার,
নামাতে তোমারি পায়
ডাকি তাই বারেবার। ২।

সুধাময়ী হাসি মুখে
মরণ ত্রিদিব রাণী,
জুড়াও দগধ হিয়া
বল দুটি সুধা-বাণী।৩।

কি কাজ জীবনে আর
বৃথা ভার বহি সদা,
এ নাম তুলিয়ে লও
হতে, তব এ বসুধা।৪।

নাশিতে সংসার-জ্বালা
কেহ নাহি অবনীতে,
তোমার কৃপায় মৃত্যু!
হাসে জীব ফুল্ল চিতে।৫।

কল্পনায় স্বপ্নাবেশে
জ্যোৎস্না নিঝুম নিশি,
বসি নীলাকাশ তলে
হেরি তব রূপরাশি। ৬।

মরি! কি মধুর কান্তি
ঝলকে ঝলকে ক্ষরে,
অমিয় সুধার বিন্দু
প্রাণ বিমোহিত করে।৭।

তোমায় পরশে নর
নূতন জীবন পায়,
মরতের অশ্রুকণা
সে নয়নে নাহি বয়।৮।

তব কৃপা কটাক্ষেতে
বহিবে বসন্তানিল,
ভগন পরাণে সদা
ফুটিবে চামেলি বেল।৯।

জীবনের শান্তি-দাত্রী
সুখৈশ্বর্য্য অধীশ্বরী,
শান্তিময় কোলে তব
তুলে লও ত্বরা করি।১০।

শত শত কালানলে
জ্বলিতেছে এ- হৃদয়,
অশান্তি আবাসভূমি,
রাখিয়া কি ফল তায়?১১।

তাপিত পরাণ মম
জুড়াইব স্নেহ-ছায়ে,
এস তরী মরণের
দিব দেহ তব নায়ে।১২।

হাসি মুখে যাব দোঁহে
সেই বৈতরণী তীরে,
ধরার এ সুখ দুখ
পড়ে রবে পরপারে।১৩।

সহে না সহে না দেবী!
এই জ্বলন্ত পরাণী—
ঢালিব তোমারি পায়
এস গো মরণ রাণী!১৪। শ্রীহে।

১৩০৫ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।